অদ্বৈত মল্লবর্মণ
ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার

বিমল চক্রবর্তী

অক্ষর পাবলিকেশনস্
প্রধান কার্যালয় ঃ 'সঞ্জীব ভিলা', জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা-৭৯৯০০১

ADWAITA MALLABARMAN : BRATYA JIBANER BRATYA KATHAKAR
a collection of writings, biographical notes and reminscences on adwaita mallabarman
By : Bimal Chakraborty

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার - বিমল চক্রবর্তী

ISBN- 978-81-89742-65-2

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০১২

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

অলংকরণ
পুষ্পল দেব

অক্ষর সংস্থাপন ও মুদ্রণ
ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, জে বি. রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা।

প্রকাশক
শুভব্রত দেব
অক্ষর পাবলিকেশনস্
জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

আগরতলায় নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র
'বইঘর' জে বি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা-৭৯৯০০১

সার্বিক যোগাযোগ
অক্ষর পাবলিকেশনস্, সঞ্জীব ভিলা, জগন্নাথবাড়ী রোড, , আগরতলা, ত্রিপুরা -৭৯৯০০১
email jraksharpub@gmail com
visit us www aksharagartala.com
দূরভাষ : (০৩৮১)- ২৩০-৭৫০০/২৩২-৪৫০০/৯৪৩৩৮১৯১০৩/৯৪৩৬১২১১০৯

মূল্য : ৪০০ টাকা

মা'কে

যিনি ভয়শূন্য চিত্ত নিয়ে
তাঁর সন্তানদের বড়ো করেছেন

প্রকাশকের কথা

ত্রিপুরা বিষযক এক কবিতায় সাহিত্য জগতের খাঁটি সোনা অদ্বৈত মল্লবর্মণ লিখেছিলেন,

'ত্রিপুবাব মাঠে ঘাটে পূর্ণ ফসলেব হাসি নিযে
আয এ সময।
অরুণ মুকুটশিবে
চবণে কুসুমমালা পবি' হস্তে পূর্ণ শস্য আশীর্বাদ,
চবণমঞ্জুবী নবজীবনেব উঠুক ঝংকার
জাগাযে দে বাঁচিবাব সাধ।'

বাঁচিবার সাধ জাগায়ে দেবাব জন্য —বাংলা সাহিত্যের ব্যতিক্রমী কথাসাহিত্যিক, উজ্জ্বল পুরুষ অদ্বৈত মল্লবর্মণ কাজ করেছেন জীবন বাজি বেখে। তিনি জীবন সংগ্রামেব দিক দিয়ে ছিলেন ব্রাত্য, মন্ত্রহীন। তিনি ছিলেন ব্রাত্যমানুষেব কথাকাব। তিনি স্মরণীয় 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের জন্য। কিন্তু শুধু 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে অখন্ড মানবতাবাদী—প্রগতির যাত্রী এই লেখকেব জীবন ও সৃষ্টিকে বোঝা যাবে না।

একথা আমার কাছে মনে হয়েছে ত্রিপুরার একজন প্রকাশক হিসেবে। ত্রিপুরায় যে ক'জন কমবয়সী লেখক, চিন্তাবিদ অদ্বৈত মল্লবর্মণ চর্চার সঙ্গে যুক্ত, তার মধ্যে কবি বিমল চক্রবর্তী অন্যতম। ব্যতিক্রমী এই সাহিত্যিকের জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন জানা-অজানা দিক অনুসন্ধান করেছেন বিমল চক্রবর্তী।

২০১৩ সালে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্মশতবর্ষ শুরু হবে। ২০১৪ সালে পূর্তি হবে। তাঁর জন্মের শতবর্ষের প্রাকলগ্নে আমাদের এই শ্রদ্ধানিবেদন আপনাদের হাতে বিনম্রচিত্তে তুলে দিলাম।

শুভব্রত দেব

সবিনয় নিবেদন

'তিতাস একটি নদীর নাম' কথাসাহিত্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণ সৃষ্ট চরিত্র দয়ালচাঁদ তামসীর বাপকে উদ্দেশ্য করে বলছে "ভাবিয়া দেখ, কায়েতের সঙ্গে মিসিতেছে বলিয়া তারা তোমাকে কায়েত বানাইবে না। তুমি মালোই থাকিবে। তারা তোমার বাড়িতে আসিলে যদি সিংহাসন দাও, তুমি তাদের বাড়ি গেলে বসিতে দিবে ভাঙ্গা তক্তা। তুমি রূপার হুকাতে তামাক দিলেও, তোমাকে দিবে শুধু কলকেখানা।" অথবা "তারা আমার কে? তারা মালোদের ঘরে নেয় না। মালোরা কোন জিনিষ ছুঁইলে সে জিনিষ তারা অপবিত্র মনে করে। পূজা পার্বণে মালোবা তাদের বাড়ির প্রসাদ পাইলে এটো পাতা নিজে ফেলিয়া আসিতে হয়।----এবা মালোদের ঘৃণা করে। মালোরা লেখাপড়া জানে না, তাদের মত ধূতি চাদর পরিয়া জুতা পাযে দিয়া বেড়ায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা ছোঁয়ারও অযোগ্য? মালোরা মালো বলিয়া কি মানুষ নহে?" অথবা "মনের অসন্তোষ বাহিরে প্রকাশের ভাষা হয়তো ইহাদের আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাহীন জীবনে সাহসের স্বভাবসুলভ অভাবই ইহাদিগকে যুগে যুগে দাবাইয়া রাখে।---অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস হারাইলেও অন্যায়কে এরা কোন যুগেই হজম করিয়া নেয় না। তাই কালে কালে দেশে দেশে এরা আগাইয়া সামনে আসিতে না পারিলেও এই অব্যক্তের দল প্রতিবাদ ঠিক জানায়। কোথাও হাসিয়া, কোথাও কাঁদিয়া কোথাও শিস দিয়া। আবার কোথাও তৈজসপত্র ভাঙ্গিয়া বা দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া ও কোরোসিন সিক্ত বস্ত্রাঞ্চলে দেশলাইয়ের কাঠি ধরাইয়া।" ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনবোধ কিরকম তীক্ষ্ণ ছিল; ব্রাত্য মন্ত্রহীন মানুষজনের সংগ্রামের আলোকে তা লিখে, নির্মাণ করে, বিনির্মাণ করে বোঝানোর দরকার নেই।

সৃষ্টির দায়বদ্ধতা থেকে তিনি দলিত মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যেমন চিত্রায়িত করেছেন, তেমনি সময়ের বা যুগের চিত্রকল্পকেও সৃষ্টিতে প্রবেশ করিয়ে তার ইতিহাসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। নিজস্ব পরিচয়-পুরান বা শিকড়ের সন্ধানে তিনি ছিলেন প্রগতিবাদী। তার সাহিত্য

সৃষ্টি সরাসরি হাত পেতেছিল জীবনের কাছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া তিনি কোন সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি। একারণেই দেবীপ্রসাদ ঘোষ অদ্বৈতকে নিয়ে লেখা তার পুস্তকের শিরোনাম করেন এরকম — *অদ্বৈত মল্লবর্মণ : একটি সাহিত্যিক প্রতিস্রোত*।

তাঁর সাহিত্য বর্ণাঢ্যতা রামধনু বয়ে এনেছে। নদী বয়ে এনেছে ছায়াপথ। নৌকা বয়ে এনেছে জীবনের রামধনু। তাঁর লেখায় জীবনের সামগ্রিক ছায়াপথ হয়ে গেছে রামধনু। ঐ ছায়াপথ লৌকিক মানুষের ছায়াপথ। অন্তজ মানুষের ছায়াপথ। নিম্নবর্গ বা সাবঅলটার্ন মানুষের ছায়াপথ। অদ্বৈত মল্লবর্মণের অখন্ড জীবনের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, সাহিত্যের বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে, আমরা নিম্নবর্গীয় চেতনার পাঠ সন্ধান করতে পারি। বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে তো বটেই। অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন অখ্যাত লেখক। আখ্যানও নির্মাণ করেছেন মানুষের অখ্যাত গল্প নিয়ে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিয়ে অচিন্ত্য বিশ্বাস সুসংহত কাজ করেছেন। কাজ করেছেন শান্তনু কায়সার এবং তপোধীর ভট্টাচার্য। নিতাই বসু প্রথাগত জীবনী লিখেছেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম : উপন্যাসেরও' — এই শিরোনামে তিতাস উপন্যাস নিয়ে ভালো এবং বিস্তৃত কাজের সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায়। দেবী প্রসাদ ঘোষ অন্য চোখে অদ্বৈত মল্লবর্মণকে বিনির্মাণ করেছেন। তিতাসের সঠিক পাঠের সন্ধানে বড়ো কাজ করেছেন অচিন্ত্য বিশ্বাস। উপন্যাসের বিশ্লেষণও করেছেন সবিস্তার। ১৯৯৪ সালে 'চতুর্থ দুনিয়া' সাহিত্য পত্রিকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যায় প্রচুর নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। উদ্যোগ ছিল বাঙলা দলিত সাহিত্য সংস্থার। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির মুখপত্র 'ভাসমান' অদ্বৈত মল্লবর্মণের ৮৩তম জন্ম জয়ন্তীতে ১৯৯৭ সালে এক সংকলন প্রকাশ করে। এই সংকলনটিও অদ্বৈত মল্লবর্মণ চর্চার এক উজ্জ্বল দলিল। ত্রিপুরায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ চর্চার প্রাণপুরুষ অনিল সরকার এবং ড. কমল কুমার সিংহ। সঙ্গে দলিত সাহিত্য পত্রিকার একদল তরুণ। ত্রিপুরা সরকার প্রকাশিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মারক গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য দলিল অদ্বৈত চর্চায়।

আমি অদ্বৈত মল্লবর্মণের নিম্নবর্গীয় চেতনার, আখ্যান বা কথাসাহিত্যে তাঁর ব্যতিক্রমী ভূমিকার একনিষ্ঠ পাঠক হিসাবে সবগুলো চিন্তার বিচ্ছিন্নতাকে সংহত রূপ দিয়ে এক অখণ্ড বা সমগ্র অদ্বৈত মল্লবর্মণ নির্মাণের চেষ্টা করেছি। সফলতা পেলে আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে। কাজটিকে আরও বিস্তৃত করব। এই পুস্তক প্রকাশের সামগ্রিক কৃতিত্ব আমার স্বজন এবং প্রকাশক শুভব্রত দেবের।

অনুপ্রেরণা দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় বিধায়ক সুকুমার বর্মণ। সাহায্য করেছেন বিধান রায়, সাত্ত্বিক নন্দী। সারাক্ষণ পাশে ছিলেন আকবর আহমেদ, পুষ্পল দেব। কষ্ট সহ্য করেছেন আমার স্ত্রী তন্দ্রা। মেয়ে প্রকৃতি। ছেলে খুব ছোট্ট। তাকেও উপেক্ষা করেছি বলেই মনে হয়।
প্রচ্ছদ এঁকেছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। তাঁকে প্রাণউৎসারিত শ্রদ্ধা।
এই মহৎ উপন্যাস চলচ্চিত্র হয়েছে। নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। এমনকী যাত্রাভিনয়ও হয়েছে। চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য বা উৎপল দত্তের নাট্যরূপ তুলনায় সহজলভ্য। আমরা এই গ্রন্থের পরিশেষে যোগ করেছি বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শ্যামল ঘোষের লেখা যাত্রাপালা 'তিতাস একটি নদীর নাম'। এই লেখা পেতে সহায়তা করেছেন বিশিষ্ট সম্পাদক ও গবেষক শ্রী প্রভাত কুমার দাস। আমরা দুজনকেই আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।
প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, শ্রদ্ধেয় শ্যামল ঘোষের যাত্রাপালাটি ত্রিপুরাতেও অভিনীত হয়েছে। সে সময় অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্মস্থান থেকে, তিতাসের তীর থেকে অনেক মানুষ সেই যাত্রাপালা দেখতে এসেছিলেন।
কিছু নিবন্ধ, কিছু চিঠিপত্র ও অন্যান্য লেখা সংকলিত হল গ্রন্থের সংযোজনী হিসাবে। বাংলাদেশ, বরাক, উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ ত্রিপুরা— সাহিত্যের যে তৃতীয় ভুবন তৈরি করেছে, সেই ভুবনের চর্চায় চতুর্থ দুনিয়ার লেখক বা ব্রাত্য লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্রাত্য, মন্ত্রহীন মানুষজনের মনের মণিকোঠা থেকে যে আখ্যান তুলে এনেছেন তা যদি পাঠকরা নতুন করে বিনির্মাণ করেন তাহলে তাঁর জন্মশতবর্ষের প্রবেশকালে আমাদের এই প্রণতি নিবেদন সার্থক হবে।

বিমল চক্রবর্তী

সূচীপত্র

১৯১৪—১৯৫১

নবশক্তি দপ্তর

প্রেসের বাড়ি

ফুলবাগান ষষ্ঠীতলায় যে বাড়ির দোতলায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া আনন্দবাজার

রূপান্তরিত তিতাস

জন্ম, সময়, পারিবারিক ভিত্তি এবং জীবন
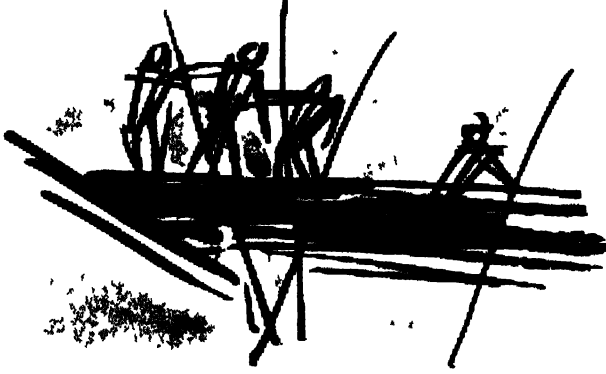
১৯১৪ সাল। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজতন্ত্রের ভাবী উ ওরসূরি আর্চ ডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দ ও তাঁর স্ত্রী ডাচেস অব হোহেন বার্গ সারাজেভোয় এক ছাত্রের গুলিতে নিহত। এই ঘটনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনুঘটকের কাজ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯১৪ সালের ১লা জানুয়ারি বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল পুরুষ, নদী ও মানুষের যুগলবন্দির রচনাকার নদী কেন্দ্রিক সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম ব্যক্তিত্ব এবং ব্রাত্য মানুষের ব্রাত্য কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ জন্মগ্রহণ করেন। এর আগের বছর, ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে উৎকর্ষ সৃষ্টির জন্য সাহিত্যের নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন ১৯১০ সালে প্রকাশিত গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য। অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্মস্থান ছিল গোকর্ণঘাট গ্রাম। গোকর্ণঘাট তিতাসপাড়ের একটি গ্রাম। গোকর্ণঘাটের দূরত্ব ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আড়াই-তিন মাইল। বর্তমানে গোকর্ণঘাট ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুরসভার অন্তর্গত। দেশভাগের পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অংশ ছিল। যা বৃহত্তর ত্রিপুরার অংশ হিসাবে চিহ্নিত ছিল। তাঁর পিতা ছিলেন অধরচন্দ্র মল্লবর্মণ। তার মায়ের নাম সারদা দেবী। তিন ভাই এবং এক বোন নিয়ে ছিল তাঁদের পরিবার। বয়সের ক্রমপঞ্জি অনুসারে অদ্বৈত ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর দিদির বিয়ে হয়েছিল গোকর্ণঘাটের বাড়িতে। স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর দিদি বিধবা হলে দিদি ও তার দুই পুত্র সন্তানও অদ্বৈত মল্লবর্মণদের গোকর্ণঘাটের বাড়িতে থাকতেন।

যৌবনে প্রবেশ করার পূর্বেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ হন মাতৃহারা এবং পিতৃহারাও হলেন। অল্পবয়সেই তিনি দুই সহোদরকেও হারিয়েছিলেন। মৃত্যুশোক শৈশবে তাঁকে উপহার দিয়েছিল বিষাদগ্রস্ততা। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত মোট কুড়ি বৎসর অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গোকর্ণঘাটে বসবাস করেছিলেন। কুড়ি বৎসর বয়সে অদ্বৈত মল্লবর্মণ কলকাতায় যাত্রা করেছিলেন— তরুণ বয়সের স্পর্ধা নিয়ে। ১৯৩৪ সাল মানেই অদ্বৈত দেখেছেন তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক। শুনেছেন লঙ মার্চের কথা। হিটলারের ক্ষমতা লাভের কথা। ইতালিতে ফ্যাসিস্ত দল গঠনের কথা। ১৯১৭ সালে তাঁর যখন তিন বছর বয়স তখন ঘটে গিয়েছিল পৃথিবীর মহৎ বিপ্লব 'নভেম্বর বিপ্লব'।

১৯৩৪ সালে কলকাতা যাওয়ার পূর্বে তিনি আরও একটি বিষাদসিন্ধু উপহার হিসাবে পেয়েছিলেন যা তাঁর চোখের জলকে পাথরে পরিণত করেছিল। তা হল তাঁর বোনের মৃত্যু। তাঁর প্রিয় বোনের ছেলে চিন্তা ও কাঙালী ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। প্রিয় ছিল তাঁর খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে চন্দ্রকিশোর।

গোকর্ণঘাট গ্রামের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট

তিতাস পাড়ের গ্রাম গোকর্ণঘাট। গোকর্ণঘাটের যে পাড়ায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ জন্মেছিলেন তাকে সবাই জানত মালো পাড়া বলে। মালো পাড়ার অপর নাম ছিল গাবর পাড়া। শান্তনু কায়সার লিখছেন, "গোকর্ণঘাটের অদ্বৈত মল্লবর্মণের পাড়াটিকে ভদ্রভাবে মালোপাড়া বলা হলেও সাধারণত এটি গাবরদের পাড়া বলেই বহুল পরিচিত। 'গাবর' শব্দটি সম্ভবত 'গাবুর' (মজুর) থেকে এসেছে। শ্রমবিচ্ছিন্ন 'ভদ্র' মানুষের শ্রমজীবী মালোদের শ্রমের প্রতি ব্যঙ্গ ও অবজ্ঞা থেকেই এই নামের সৃষ্টি।" বিংশ শতাব্দীর (প্রায়) অন্তিমাংশে মালোদের প্রতি যখন 'ভদ্র' মানুষদের এই মনোভঙ্গি তখন অদ্বৈত মল্লবর্মণের শৈশবে, এই শতাব্দীর প্রারম্ভে, তা কেমন ছিল সহজেই অনুমেয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে গ্রাম বাংলার মালো সমাজের মধ্যে তৈরি হয়েছিলো উচ্চতর সামাজিক অবস্থানের মধ্যে প্রবেশ করার তীব্র বাসনা। মালো পদবির পরিবর্তে মল্লবর্মণ লেখার পেছনে এক আর্থ-সামাজিক মনোবিভাস লুকিয়ে আছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিস্মৃত পরিচয় লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ মালো বা মল্লবর্মণদের এই আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার চিত্রকল্প চিত্রায়িত করেছিলেন। তিনি লিখছেন, "ওরা কারা? ওরা মালোদের জেলেরা। আর মালোদের মেয়েরা। ওরা তারা নয় যাদের দেয়াল ঘেরা বাড়ি, সামনে আছে পুস্করিণী পাশে আছে কুয়া, যাদের আঙিনার পার থেকেই শুরু হইয়াছে পথ - সে পথ গিয়াছে শহরের দিকে, পাশের গাঁ গুলিতে এক 'একটা শাখা' পথ ঢুকাইয়া দিয়া। সে পথে ঘোড়ার গাড়ি চলে। আর মালোদের ঘরের আঙিনা থেকে শুরু হইয়াছে যত পথ সেসবই গিয়া মিলিয়াছে তিতাসের জলে। সেসব পথ ছোট ছোট। পথের এধার থেকে বুকের শিশু কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিলে ওধার থেকে মা টের পায়। এধারের তরুণীর বুকের ধুক্‌ধুকানি ওধারের নৌকার মাচানে বসিয়া মালোদের তরুণরা

শুনিতে পায়। এ পথ অতিখর্ব। দীর্ঘপথ গিয়াছে মাঝ - তিতাসের বুক চিরিয়া। সে পথে চলে কেবল নৌকা।

তিতাস সাধারণ একটি নদী মাত্র। কোন ইতিহাসের কেতাবে, কোন রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারাবাহিক বিবরণীতে এ নদীর নাম কেউ খুঁজিয়া পাইবে না। কেননা, তার বুকে থুথুধনি দুই দলের বুকের শোনিত মিশিয়া হইাকে কলঙ্কিত করে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তার কি সত্যি কোন ইতিহাস নাই ? " এরকম অবস্থায় তাঁর শৈশব স্বভাবতই ছিল সংকুচিত ও বিড়ম্বিত। তাঁর এই বিব্রত ও একধরনের অপরাধবোধের সলজ্জ ভঙ্গিটি স্কুলজীবনে ও কলেজজীবনের স্বল্প সময়ে তাঁর সতীর্থরাও লক্ষ্য করেছেন।

কিন্তু তিতাসপাড়ের গ্রামগুলোতে, গোকর্ণ গ্রামে এবং মালোপাড়ার মূল আর্থ-সাংস্কৃতিক ভিত্তি ছিল লোকসংস্কৃতি। একারণে অদ্বৈত মল্লবর্মণ পরবর্তী সময়ে পল্লীগীতি, পুতুল বিয়ের ছড়া, বাউল সঙ্গীত, আম্রতত্ত্ব, উপাখ্যান মূলক সঙ্গীত, জল সওয়া গীত, বারমাসী গান, নাইওরের গান, পালা গান, পরিহাস সঙ্গীত, ভাই ফোঁটার গান, মাঘমন্ডল, বরজের গান ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন। মাটির সংস্কৃতি ও তার চেতনাকে উর্দ্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

লেখাপড়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মাইনর স্কুলে অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রথাগত লেখাপড়া শুরু। যে স্কুলটিতে তিনি পড়াশুনা শুরু করেছিলেন, সেটি ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের প্রথম মাইনর স্কুল। তপোধীর ভট্টাচার্য লিখছেন, "ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের প্রথম মাইনর স্কুলে তাঁর বিদ্যার্থিজীবন শুরু হয়। মালো সমাজের কয়েকজন চাঁদা তুলে অদ্বৈতের পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। তখন বহুধা-লাঞ্ছিত নিম্নবর্গীয় জনেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পীড়ন থেকে নিশ্চয় মুক্তির উপায় খুঁজছিলেন। তাঁরা চাইছিলেন যেন অদ্বৈত শিক্ষিত হয়ে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের নিগড় থেকে তাঁদের রক্ষা করার আয়ুধ হয়ে ওঠেন।

----সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, গোকর্ণ ঘাটে অদ্বৈতের সম্পর্কিত কাকা সনাতন মল্লবর্মণ শিক্ষক ছিলেন। মূলত তাঁর সহযোগিতায় অদ্বৈত বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করেন। ইনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এডওয়ার্ড হাইস্কুলে পড়াতেন।"

শান্তনু কায়সার তার 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ, জীবন, সাহিত্য ও অন্যান্য' গ্রন্থে লিখছেন : অদ্বৈত মল্লবর্মণ মাইনর স্কুলের পর পড়াশুনা করেছিলেন অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয়ে। কিন্তু তপোধীর ভট্টাচার্য লিখছেন, "শান্তনু কায়সার জানিয়েছেন, মাইনর স্কুলের পাঠ শেষ হওয়ার পরে অদ্বৈত অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তে যান।" কিন্তু এই তথ্যকে ভুল মনে করেছেন অন্য গবেষকেরা। অদ্বৈতের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের মত উদ্ধৃত করে তাঁরা জানিয়েছেন, মূলত সনাতনের উৎসাহে অদ্বৈত এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই ১৯৩৩ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই স্কুলের বর্তমান নাম রামকানাই একাডেমি। তার লেখাপড়া

নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখছেন, "গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে যান অদ্বৈত। অন্য সব মালো শিশুরা সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে যেত— সে শিক্ষার পরিণতি কেমন, তার একটু আঁচ পাওয়া যায় 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ।

"বাসন্তীর মাঘ মণ্ডলের ব্রত উদ্‌যাপনের সময় কিশোর আর সুবল 'বাল্যশিক্ষার বই খুলিয়া উঠোনের মাটিতে হাতি ঘোড়া আঁকিতে বসিল—।"

"তারপর একদিন দুই জনেরই বাপ তাদের পাঠশালায় পাঠাইল। প্রথম দিন তারা চুপচাপ কাটাইল। পরের দিন ভিন্ন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করিয়া শিক্ষকের মার খাইল। তার পরের দিন নিজেদের মধ্যে মারামারি করিয়া শিক্ষকের হাতে যে মার খাইল, তাহার মাত্রা সহনাতীত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দুজনেই একসঙ্গেই বাহির হইয়া পড়িল। পাঠশালায় আর গেল না।"

'বাল্যশিক্ষার বই'— এর ছবি আঁকা থেকে পাঠশালায় অন্যায় কাজের জন্য নিষ্ঠুর মার খেয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়ার ঘটনাই সাধারণত ঘটত। অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি পড়াশুনায় টিকে গেলেন। তাঁর মতো প্রান্তিক পরিবেশের এক বালকের পক্ষে শিক্ষালাভ মোটেই সহজ ছিল না।

মালোজীবনের এক বিরুদ্ধ ও বৈরী পরিবেশে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়েছিল। অত:পর অদ্বৈত ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের প্রথম মাইনর স্কুলে ভর্তি হন। এসময় মালোদের কয়েকজন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তাঁর পড়ার খরচ সংগ্রহ করেন। যাই হোক ১৯৩৩ সালে অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথম শ্রেণীতে। ১৯৩৪ সালে ভর্তি হন ভিক্টোরিয়া কলেজে। পড়াশুনা সম্পূর্ণ করেননি। 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় যোগ দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন।

জীবন কথা

অদ্বৈত মল্লবর্মণের সাহিত্যের অন্তর্নিহিত যে সুর—তার ভিতর এক বৃন্দগান আছে। তার সাহিত্যের মূলকথা মানবিকতাই মোক্ষের অনিবার্য পথ, যার সঙ্গে যুক্ত থাকে জীবন সংগ্রাম এবং জীবনকে পরিবর্তিত করার তীব্র আকাঙ্খা।

সমসাময়িক বাস্তবতার তীব্র ও চরম অমানবিকতা তার ভিত্তি তৈরি করেছে। মনে রাখতে হবে, এখন বাংলা কথাসাহিত্যের কালজয়ী লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ একসময় আমাদের কাছে বিস্মৃত পরিচয় লেখক ছিলেন। এক আন্দোলনের ফসল হিসাবে অদ্বৈত মল্লবর্মণ এখন অতি জনপ্রিয়। নিম্নবর্গ বা সাবঅলটার্ন মানুষের প্রিয়জন, স্বজন। বাংলা সাহিত্য জগতে অভিভাবক হিসাবে যিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন সেই বিমল মিত্র এক লেখায় বলেছেন "এক-একজন মানুষ থাকে যারা সব সময়েই নিজেকে আড়াল করতে ব্যস্ত। অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন সেই জাতীয় মানুষ। তাই বিকেল বেলার দিকে যে আমাদের লেখকদের জমায়েত হত তাতে তিনি নিয়মিতভাবেই অনুপস্থিত থাকতেন।"

নিজেকে আড়াল করা সেই কালজয়ী লেখকের জন্মশতবর্ষ ২০১৩ সালে। জন্মশতবর্ষের পূর্তি হবে ২০১৪ সালে।

পূর্বেই আমরা বলেছি, প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপকণ্ঠ তিতাস নদীর গোকর্ণঘাটের মালো পাড়ায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্ম হয়েছিল। অদ্বৈতের পিতা ছিলেন অধরচন্দ্র মল্লবর্মণ। মায়ের নাম সারদা। মালো পাড়াকে বিদ্বজনেরা, তথাকথিত ভদ্রসমাজের মানুষেরা, গাবর পাড়া হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। ডাকতেনও গাবর পাড়া বলে। 'গাবর পাড়া'-র সন্তান বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী কথাপুরুষ অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তিনি জন্মেছিলেন ১৯১৪ সালের পয়লা জানুয়ারি। ১৯৫১ সালের ১৬ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত তিনি বেঁচেছিলেন। ৩৬-৩৭ বছরের জীবন। আমাদের প্রিয়তম, বাংলা কবিতা আন্দোলনের অন্যতম কালজয়ী পুরুষ-সুকান্ত ভট্টাচার্যের মত তাঁরও সৃষ্টি জীবনের দৈর্ঘ্য খুবই ক্ষুদ্র। সুকান্ত ভট্টাচার্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে। আরও কম বয়সে। কি রকম ছিল অদ্বৈত মল্লবর্মণের শৈশব? কম বয়সের যাপন চিত্র? তার শৈশবের যাপনচিত্র ছিল বৈচিত্র্যময়। শৈশবে অদ্বৈত মল্লবর্মণ জারি গানের দলে 'গানদার' বা খলিফা হিসেবে বেশ নাম করেছিলেন। গোকর্ণঘাটের এক নাগরিক আব্দুল খালেকের বক্তব্য অনুসারে "দুর্বল চেহারার অদ্বৈত অল্প বয়সে বড় ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যায়াম করতেন। গোকর্ণঘাটের বাসিন্দা লেবু বর্মণের দেওয়া বর্ণনা অনুসারে অদ্বৈত মল্লবর্মণ আকাশের তারা চিনতেন এবং চেনাতে ভালবাসতেন। ভালবাসতেন আড্ডা দিতে। আড্ডা দিতেন শৈশবের বন্ধু রেবতীমোহন দেবনাথের বাড়িতে। চন্দ্রদয়াল বর্মণের বাড়িতে। রেবতীমোহন দেবনাথ এবং চন্দ্রদয়াল বর্মণ দুজনেই পরবর্তী সময়ে আগরতলার বাসিন্দা হয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আগরতলায় বসে চন্দ্রদয়াল বর্মণ তার স্মৃতি থেকে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবন ও নিয়ে যিনি বিস্তৃত কাজ করেছেন, লেখক অচিন্ত্য বিশ্বাসকে বলছেন, "রেবতীমোহন গোকর্ণঘাটেই বাজার অঞ্চলে থাকতেন - বড়লোক ছিলেন তাঁরা, বাড়িতে রেশন দোকান ছিল। জোড়া দালান বাড়ির মালিক ছিলেন বলে গোকর্ণঘাটের লোকজন তাকে বলতেন দালাইন্যা রেবতী। দুটি দালান বাড়ি ছিল পাশাপাশি - মাঝখানে সিঁড়ি, কামরাঙা লিচু আর নারকেল কূলের গাছ দিয়ে তৈরি জোড়া দালানের সিঁড়ি দিয়েই দুদিকে যাওয়া যেত। তিন বছর এগিয়ে থাকা অদ্বৈত রেবতীদের এই সিঁড়ির ওপর বসে আড্ডা দিতেন। তাঁর মুখে সবসময় একটা পেনসিল থাকত, আর থাকত একটা নোটবই। সঙ্গী ছিলেন চন্দ্রমোহন সূত্রধর। চন্দ্রমোহনের হাতে থাকত ডিকশনারি। জেলে নৌকায় ভেসে যেতেন তাঁরা - অদ্বৈত, চন্দ্রমোহন আর দালাইন্যা রেবতী।"

অদ্বৈত মল্লবর্মণও মৃত্যুবরণ করেছিলেন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে। দারিদ্রতা ও যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত না হলে আমরা হয়তো বা তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত অন্যভাবে পেতাম। কারণ তিনি যখন প্রকৃতপক্ষে সম্পাদক হিসাবে 'নবশক্তি'

সাহিত্য-সংবাদ পত্রিকায় কাজ করতেন তখন অসাধারণ সব রচনা ও রচনাভঙ্গীর জন্ম দিয়েছিলেন। লোক সংস্কৃতিকে প্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, লোকায়ত পরম্পরা ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বে কার প্রাধান্য প্রকট এই প্রশ্নের মীমাংসা করার চেষ্টা করেছিলেন। তার সংগ্রাহক, বিশ্লেষক এবং সৃজনশীল মন ছিল অসামান্য। তিনি বিধিবদ্ধ গম্ভীর জীবন বনাম উৎসবের জীবনের মধ্যে উৎসবের জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন নদী ও জীবনের যুগলবন্দী হল ব্যতিক্রমী বিষয়। আনন্দঘন বিষয়। তিনি জানতেন, লোকজীবনই পারে, লোকসমাজই পারে ভদ্রসমাজের কর্তৃত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে নস্যাৎ করতে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' তাই নদী ও জীবনকেন্দ্রিক সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম ব্যতিক্রমী উৎসমুখ। বিভিন্ন লোক উৎসব ও লোক সংস্কৃতির ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে তিতাস ও তাঁর চরিত্ররা বড়ো হয়ে উঠেছে প্রতিবাদে আনন্দ উৎসবে সঙ্কটে। চরিত্রের সৃজনাত্মক বিকাশ ঘটেছে তিতাসে। তিতাস এর নৌ বাইচ ও তার বিস্তৃত বিররণ সাবঅলটার্ন সংস্কৃতির মুখাবয়বকে কেন্দ্র করে এক ব্যতিক্রমী জীবন ইশারা দেয়। এক প্রতীকায়িত বাস্তব ও জীবনের সংঘর্ষের মধ্যে তিতাসের মানুষেরা অন্য এক সমান্তরাল কাঠামো নির্মাণ করেছে অদ্বৈতের সৃষ্টিশীল ভাবনার রসায়নে। তিনি নদী ও সাহিত্যের যুগলবন্দী তৈরি করেছেন। তিতাসের চরিত্র 'কিশোর' অনুভব করছে, "বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের নদী-বিহারীদের কতকগুলি নিজস্ব সম্পদ আছে। এমনিতেই তারা শুইয়া পড়ে না। ঐগুলিকে (লোক সঙ্গীতগুলিকে) ভোগ করিয়া তবে নিদ্রার কোলে আশ্রয় নেয়।" অচিন্ত্য বিশ্বাস বলছেন, "তিতাসের কোন নৌকায় হচ্ছে মুর্শিদ-বাউল গান, কোথাও হচ্ছে পুঁথি পড়া-হাচন রাজার দেশেরে উত্তরিল শেষেরে।" কোথাও শোনা যাচ্ছে কথার ফাঁকে ফাঁকে গান ভাসিতেছে/ শুধু নৌকা নয়, নৌকার ওপরকার মানুষ আর তাঁর গান। এমনভাবে আর কোন উপন্যাসে ধরা পড়েনি। লোকসঙ্গীতের জগতে ব্যক্তি মুখ্য থাকেনি— নামহীন—ভনিতাহীন সুরলোকে ভেসে ফিরেছে তরঙ্গায়িত নর-নারী। ওয়াই এম শক্লব বলছেন— "Folklore has been and continues to be a rejection and weapon of class conflict" অদ্বৈত দুরঙা প্রজাপতির ছবি এঁকেছেন। সামাজিক মগ্ন চৈতন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার এক কৌশল-সৃষ্টি হল তাই তিতাস। একদিন তাই শোনা যায় এরকম ভাষা, "এখন রাত গভীর হইয়াছে। এখন ভাটিয়ালি গাহিবার সময়, যখন জীবনের ফাঁকে ফাঁকে জীবনাতীত আসিয়া উঁকি দিয়ে যায়। এখন কান পাতিলে রাত্রির হৃদস্পন্দন শুনিতে অনেক গভীর ভাবের অজানা স্পর্শ অনুভব করা যায়। অনেক অব্যক্ত রহস্যের বিশ্বাতীত সত্ত্বা এই সময় আপনা থেকে মানুষের মনের ভিতরে নিভৃতে কথা কহিয়া যায়।" প্লেখানভের ভাষায় বলা যায়। "This is an old but eternally new story. When a class live by exploiting another class which is below it in the economic scale, and when it has attained full master in society, from then on its forward movement is a downward movement. Therein lies the explanation of

the fact which at a first glance seems incomprehensible and even incredible, that the ideology of the rulling classes in economically backward countries is often far superior to that of the rulling classes in advanced countries." এই তাত্ত্বিক কথামালারই শিল্প তিতাস। একারণেই তিতাসের ইংরেজী অনুবাদ যিনি করেছেন, সেই লেখিকা কল্পনা বর্ধন লিখছেন— "Ananta is more a Catalyst. His Personality forming a child's sense of wonder with an adult's sense of sorrow and pity and his location in the relationship make him crucial for the three femine protagonists's". তিন নারী— অনন্তর মা, সুবলার বউ তথা বাসন্তী আর উদয়তারা অনন্তকে সঙ্গে নিয়ে জন্ম দিয়েছে নয়া বসত। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের দ্বন্দ্বকে সঙ্গে নিয়ে। গড়ে তুলেছে রামধনু। 'তিতাস একটি নদীর নাম'। উপন্যাসের গঠন বিশ্লেষণ করতে গিযে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, "লেখকের প্রকৃত আকর্ষণ নদী তীরের গ্রাম সমাজের ধর্মকেন্দ্রিক ও উৎসছন্দ গ্রথিত জীবনযাত্রায়"। প্রকৃতপক্ষেই তিতাস নদী জীবনকেন্দ্রিক পাঁচালী। তিতাসের পাড়ে আখ্যানকে বলা হয় পরস্তাব। তিতাস হল অন্যদিক দিয়ে মালোদের—গাববদের নদীকেন্দ্রিক জীবনের পরস্তাব। পদ্মানদীর মাঝি, গঙ্গা, চিংড়ি এবং তিস্তাপারের বৃত্তান্ত এমন নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস অথবা কবি, ঢোঁড়াই চরিত মানস এসব আঞ্চলিক সাহিত্যকে কেন্দ্রে রেখে বলা যায় তিতাস একটি মহৎ সাহিত্য। আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবেও তার যাত্রাপথ খুবই মহৎ। নদী যেমন ছোট ছোট ঢেউ তুলে আবর্ত রচনা করে কিছুটা এগিয়ে তারপর বাঁক নেয়, তিতাসের প্লটও তেমনি—এক এক বাঁকে নতুন চরিত্র, নতুন ঘটনা; তবে মূল ধারা একই থেকে যায়। অদ্বৈত মল্লবর্মণ জীবন দিয়ে বুঝেছিলেন, "নদীর একটা দার্শনিক রূপ আছে। নদী বহিয়া চলে; কালও বহিয়া চলে। কালের বহার শেষ নাই। নদীরও বহার শেষ নাই।" অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখছেন, "পূর্ব বঙ্গের জল চুম্বিত ভূগোলে কায়ক্লেশে জীবনপাত করা মৎসজীবী সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয় জ্ঞাপনের শিল্প-চেতনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। জেলে-মালু জলবিহারী মানুষদের এমন করে তাঁর আগে সাহিত্যে কেউ প্রকাশ করেছেন বলে জানা নেই। শুধুমাত্র এই কারনেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মরণীয়।" পূর্ববঙ্গের অখ্যাত গ্রাম গোকর্ণ ঘাটের বাস্তবতা অদ্বৈত মল্লবর্মণকে সাহিত্যের বিবর্তিত বাস্তবতা শিখিয়েছে। জীবন শিখিয়েছে তিতাস নদী। জেলে পাড়ার মানবিকতা।

অদ্বৈত নিজে মালো সম্প্রদায়ভুক্ত, গাবর সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় তার চিন্তায় বাস্তবতার রসায়ন আমদানি হয়ে আসেনি। তাঁর পিতা অধরচন্দ্রের কোন জমি জায়গা ছিল না। নামে মাত্র বসত ভিটে ছিল। বেড়ার ঘরে বড়ো হয়েছেন অদ্বৈত। তাঁর পূর্বপুরুষরা মৎস্যজীবী হওয়া সত্ত্বেও কোন ডিঙ্গি জাল ছিল না। এতটাই দারিদ্রতা ছিল তাঁর পরিবারের। প্রকৃতপক্ষেই তাঁরা ছিলেন জলমজুর।

তবে অদ্বৈত মল্লবর্মণের রক্তে শিল্প রস প্রবাহিত হয়েছিল তাঁর পিতা অধরচন্দ্রের ক্রোমোজোম থেকে। অধরচন্দ্র গান তৈরি করতেন মুখে মুখে।

বাবা, মা, বোন, বিধবা পিসিদের নিয়ে বড়ো হয়েছেন অদ্বৈত। অদ্বৈতের দুই ভাই ছিল। যদিও তাঁরা মারা যায় খুব অল্প বয়সে। তাঁর দিদি তরঙ্গাময়ীর বিয়ে হলেও স্বামী খুব অল্প বয়সে মারা যান। দিদি তরঙ্গাময়ীর দুই পুত্র সন্তান চিন্তাহরণ ও সুশীলকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ খুব ভালবাসতেন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের সাহিত্যচর্চার মূল অনুপ্রেরণাদাতা ছিলেন বিপিনবিহারী বর্মণ। তিনি বাংলার শিক্ষক ছিলেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিপিনবিহারী বর্মণের অনুপ্রেরনায় নিজের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে একটি কবিতা লিখে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। দেয়াল পত্রিকায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ লেখালেখি শুরু করেন। ব্রাহ্মনবাড়িয়া এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশনের পাশের স্কুল ছিল জর্জ স্কুল। জর্জ স্কুলের দেয়াল পত্রিকার নাম ছিল 'সবুজ'। 'সবুজে'র সম্পাদক ছিলেন 'আফতাবউদ্দীন'। 'সবুজ' পত্রিকায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'সনেট' লিখেছিলেন। বিষয় ছিল তিতাস নদী ও তার তীরবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা-কষ্ট বেদনা। ছাত্রবয়সে অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্বদেশপ্রেম নিয়েও কবিতা লিখেছিলেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ সাহিত্যের বিষয়কে কেন্দ্র করে বিতর্কসভায় যোগ দিয়েছিলেন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ যখন কলেজে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হয়েছিলেন, তখন তার সহপাঠী মতিউল ইসলামকে এক সাহিত্যবিষয়ক চিঠিতে লেখেন, "সাধনা না করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে নাই। আর সাধনা যাহা করিবেন তাহা নীরবে নীরবেই করিবেন। আগুন কখনো ছাই ঢাকা থাকে না। আপনার প্রতিভাও একদিন নিশ্চিন্ত সুধীজন সমাজে আদৃত হইবে। ইহা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি। আমার প্রতি যদি আপনার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ও ভালবাসা থাকে তবে আমার কথায় বিশ্বাস করুন, অনবরত লিখিতে থাকুন।"

এ কারণেই ১৯৩৩ সালে অদ্বৈত মল্লবর্মণ যখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন তখন বাংলা ভাষা সাহিত্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ছিল সর্বোচ্চ।

১৯৩৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ করার পর অদ্বৈত মল্লবর্মণ কুমিল্লা শহরে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা আছে— "স্কুলের শিক্ষা শেষ হইলে তাহার শুভানুধ্যায়ীবন্ধু ও শিক্ষকেরা পুরস্কারলব্ধ ধাতুখণ্ডগুলি বালকের বুকে আঁটিয়া দিয়া উচ্চশিক্ষার জন্য তাহাকে কুমিল্লা পাঠাইয়া দেন।"

১৯৩৪ সালের মধ্যবর্তী সময়রেখায় কলকাতায় পদার্পণ ঘটেছিল অদ্বৈত মল্লবর্মণের। কলকাতা এসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রথমে যোগ দেন ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা'র মুখপত্র 'ত্রিপুরা' পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে। তিনি সম্পাদনা ও সাংবাদিকতার কাজ একসঙ্গো করতেন। ঐ সময় তিনি তাঁর পড়াশুনার নিবিড় পাঠকে কেন্দ্রায়িত করেন লোকসংস্কৃতিকে মূল ভাবনায় রেখে। সময় সমাজ ও প্রগতির সঙ্গো তিনি লোকসংস্কৃতিকে মিশ্রিত করেছিলেন। 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় তিনি ত্রিপুরাকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন।

১৯৩৫ সাল। অদ্বৈত মল্লবর্মণ যোগ দেন 'নবশক্তি' পত্রিকাতে। 'নবশক্তি' একটি জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক। মালিক ছিলেন ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন শিল্পপতি। তিনি ছিলেন—কুমিল্লার শ্রীকাইল গ্রামের সর্বজন পরিচিত দত্ত পরিবারের সন্তান। 'নবশক্তি' পত্রিকার অফিস ছিল পার্কসার্কাসে। নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গো বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভাবগত ঐক্য ছিল। নরেন্দ্রনাথ দত্ত বেঙ্গাল ইমিউনিটি, র‍্যাডিক্যাল লাইফ ইনসিওরেন্স কোং লি:, ওয়েস্টবেঙ্গাল ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট লি:, ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট লি: প্রভৃতি সংস্থার মালিক।

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র কাগজে পত্রে 'নবশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কাজ করতেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। কাগজে পত্রে অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন সহকারী সম্পাদক।

'নবশক্তি' পত্রিকাতে কাজ করার সময় অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'রাঙামাটি' উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল। প্রেসে হারিয়ে গেছিল। পরে উদ্ধার হয়। ১৯৪১ সালে 'নবশক্তি' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

'নবশক্তি' বন্ধ হবার পর অদ্বৈত মল্লবর্মণ কাজ নেন প্রথমে 'আজাদ' পরে 'মোহাম্মদী' পত্রিকাতে। 'মোহাম্মদী' পত্রিকাটি অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনে খুবই উল্লেখযোগ্য কারণ এই পত্রিকায় তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রকাশিত হয়।

'মোহাম্মদী' পত্রিকা থেকে বেরিয়ে যাবার পর অদ্বৈত মল্লবর্মণ কর্মহীন হয়ে যান। মুখোমুখি হন একেবারে অনিশ্চিত জীবনের। তিনি একটি প্রকাশনা সংস্থা তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। 'চয়নিকা পাবলিশিং হাউস' নাম দিয়েছিলেন। প্রকাশক হিসাবে ছিলেন সতী নাগ। এই চয়নিকা প্রকাশনী থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল তার অপর বিখ্যাত গ্রন্থ— 'ভারতের চিঠি-পার্লবাককে'।

ইতিপূর্বে সতী নাগ ও সনৎকুমার নাগের সহযোগিতায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। গল্প সংকলনটির নাম ছিল 'দলবেঁধে'। 'দলবেঁধে' গল্পগ্রন্থে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'স্পর্শদোষ' গল্পটি ছাপা হয়েছিল।

অদ্বৈতের জীবিতকালে একমাত্র প্রকাশিত বই ছিল 'ভারতের চিঠি-পার্ল বাককে'। এর প্রধান বিষয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের পদধ্বনি। রাজনৈতিক সংকটের রিপোর্ট এই গ্রন্থ। বই প্রকাশের সময় পরিচিতিতে লেখা হয়— "লেখক বাংলা সাহিত্যে নবাগত নন। 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী' প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা অনেক বেরিয়েছে। তাছাড়া তিনি 'নবশক্তি' নামক জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

ভীষণ সংকটের সময় অদ্বৈত মল্লবর্মণ যোগ দিয়েছিলেন 'দেশ' পত্রিকায়। ১৯৪৫ সালে। সম্পাদক ছিলেন ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় কৃতি সন্তান সাগরময় ঘোষ। দেশ পত্রিকায় কাজ করার সময় তাঁর লেখা 'জীবনতৃষা' দেশে প্রকাশিত হয়। অসাধারণ অনুবাদ সাহিত্য। পৃথিবী বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ভ্যান গখের অসাধারণ জীবন-উপন্যাস "Lust for Life" এর অনুবাদ। 'দেশ' পত্রিকা ছাড়াও অদ্বৈত মল্লবর্মণ কাজ করেছিলেন 'বিশ্বভারতী'-র গ্রন্থন বিভাগে।

'দেশ' পত্রিকার বন্ধুরা তাঁর আর্থিক সমস্যার কথা বুঝতে পেরেছিলেন। এবং আনন্দবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক কানাইলাল সরকারের নজরে নেন তারা বিষয়টি। কানাইলাল সরকার তাঁকে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগে একটি পার্টটাইম কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে যক্ষ্মা রোগ গ্রাস করে অদ্বৈত মল্লবর্মণের শারীরিক প্রক্রিয়াকে। 'দেশ' পত্রিকার সহকর্মী সুশীল রায় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন, "অদ্বৈত মল্লবর্মণ একটি অদ্ভুত চরিত্র। তিনি 'দেশ' পত্রিকায় চাকরি করতেন, এবং পার্টটাইম কাজ করতেন 'বিশ্বভারতী'-তে। এই সূত্রে তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়, ও তাঁকে নিবিড়ভাবে জানতে পারা যায়।— তিনি নিজেকে বঞ্চিত করেই আনন্দ পেতেন। তিনি দুই জায়গায় কাজ করতেন, অন্য মানুষ হলে হেসে-খেলে চলে যাবার কথা। কিন্তু তাঁর বাই ছিল দুটি—এক, স্বজন বাৎসল্য; দুই বই কেনা।"

স্বজনের প্রতি বাৎস্যল্যতা দেখাতে দেখাতে, বই কিনতে কিনতে, লিখতে লিখতে— ১৬ই এপ্রিল ১৯৫১ সাল— প্রয়াত হন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৮ এপ্রিল ১৯৫১ অদ্বৈত মল্লবর্মণের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়। লেখা হয়— "সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক সু-সাহিত্যিক শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ বৎসরাধিককাল রোগ ভোগের পর গত সোমবার ১৬ এপ্রিল নারকেলডাঙার ষষ্ঠীতলা রোডস্থ গৃহে পরলোক গমন করিয়াছেন।" তাঁর হাসপাতাল পর্বের জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে 'তিতাসের লেখক' এই শিরোনামে স্মৃতিকথায় অমর মুখোপাধ্যায় লেখেন— "১৯৪০-৫০ সালের কথা। কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডে পড়ে আছি। যুদ্ধ করছি রাজরোগের সঙ্গে। পাশের বেডের রোগী সকলের প্রিয় আমাদের বর্মণদা ছিপছিপে চেহারা। চোখ দুটোতে কোন সুদূরের দৃষ্টি। কথা বলেন ধীরে ধীরে সদা হাসি মুখে। দূরন্ত রোগের অসহ্য জ্বালার কোন প্রকাশ কোনদিন দেখিনি বর্মণদার মুখে-চোখে, বই পড়া আর চিঠি লেখা— প্রতিদিনের তাঁর বাঁধা রুটিন।"

আনন্দবাজার পত্রিকা অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রয়াণের পর তাদের প্রতিবেদনে যে চিত্রকল্প তাঁর জীবনের তুলে ধরেছিলেন তা খুবই শ্রদ্ধামিশ্রিত। "সাহিত্য ও সাংবাদিক জীবনের প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণবশত তরুণ বয়সে তিনি সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে কলকাতা আসেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত দীর্ঘ ১৫ বৎসর তিনি সাহিত্য ও সংবাদপত্রের সেবা করিয়া গিয়াছেন।---তাঁহার সাহিত্য কীর্তি স্বল্প হইলেও তাহা প্রাণস্পন্দনে পূর্ণ ছিল এবং তাঁহার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর মৌলিকতায় এবং বলিষ্ঠরূপে পাঠক চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হইত। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'Irving Stone' এর 'Lust for life'—এর অনুবাদ 'জীবনতৃষা' তাঁহার এই ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'সোনার তরী' মাসিক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় তাঁহার সুবৃহৎ উপন্যাস 'শাদা হাওয়া', মাসিক 'মোহাম্মদী'-তে প্রকাশিত ধারাবাহিক উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার লেখা বহু গল্প, প্রবন্ধ ও অনুবাদ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। তাঁহার পিতার নাম অধরচন্দ্র মল্লবর্মণ। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৩৭ বৎসর হইয়াছিল এবং তিনি অকৃতদার ছিলেন।"

১৯৫২ সালের ১৯ এপ্রিল প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকায় প্রয়াণের পর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে লেখা হয়— "এক বৎসর হইল, আমাদের প্রিয় সহকর্মী অদ্বৈত মল্লবর্মণ ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুদিবসটি বৎসরান্তে আমাদিগের চিত্তে নিতান্ত বেদনাকর এক স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়াছে; ইহা বলিতে পারি না যে, তিনি তাঁহার জীবনের সকল ব্রত ও কর্মের মাঝখান হইতে হঠাৎ চলিয়া গেলেন। --- তিনি সুসাহিত্যিক ছিলেন কিন্তু ইহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয় নহে অথবা আসল পরিচয় নহে। এমন মানুষও পৃথিবীতে দেখা যায়, যাঁহারা তাঁহাদের কীর্তির ও কৃতিত্বের তুলনায় অনেক বেশি মহৎ। কিন্তু খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার বাজারে তরুণ বাণী সাধক অদ্বৈত মল্লবর্মণ হয়তো আর পাঁচজন শ্রুতকীর্তির মত সফলতা লাভ করেন নাই, কিন্তু জীবনের যে ক্ষেত্রে তিনি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, সে ক্ষেত্রে তিনি বহু খ্যাতিমানে ও কীর্তিমানের তুলনায় অগ্রণী। --- সংসারের রৌদ্রতপ্ত পথে তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে, বহু বাধা, অভাব ও বিরুদ্ধতার আঘাত তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু সেই কঠোর জীবনের সব দুঃখকে তিনি জীবন দেবতারই উপহার রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষয়িক আকাঙ্খা ও লোভের হানাহানি এবং কাড়াকাড়ির জগৎ হইতে তিনি সরিয়া থাকিতেন, স্বার্থের ক্ষেত্রে কাহারও সহিত তাঁহার দ্বন্দ্ব ঘটে নাই। কাহাকেও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া কোন মানুষকে বিষণ্ণ না করিয়া, কাহারও কোন ক্ষতি না করিয়া জীবন যাপনের এক দুরূহ ব্রতে তিনি যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আজকের যুগে বিরল। জীবন দেবতা দুরূহের বেশেই তাঁহার সন্মুখে আসিয়াছিলেন, সেই দুরূহকে শান্ত চিত্তে ও কুণ্ঠাহীন নিষ্ঠার সহিত তিনি পূজা করিয়া গিয়াছেন। আমরা আজ সেই জীবনেরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।"

এরকমভাবেই শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বিমল মিত্র লিখছেন— "---একটা মর্মান্তিক দুঃসংবাদ শুনে আমার নিজের দুর্ভাগ্যও তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। শুনলাম অদ্বৈত মল্লবর্মণ আর নেই।--- অনেক আর্থিক দুর্গতি আর অনুগত গলগ্রহদের বোঝা শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচতে দেয়নি। বুঝলাম অদ্বৈতবাবু হয়ত গেলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের একটি অক্ষয় সাক্ষর তিনি রেখে গেলেন। তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে। সাহিত্যের বিচারে কোনটা গিল্টি আর কোনটা খাঁটি সোনা তা বেশিরভাগ পাঠকের কাছেই ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে আখেরে। আজ এতকাল পরে ধরা পড়েছে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' সত্যিই ছিল খাঁটি সোনা।"

কবি অদ্বৈত মল্লবর্মণ

অদ্বৈত মল্লবর্মণ মালোসমাজের জীবন পাঁচালীকে, অন্ত্যজ মানুষের জীবন সংস্কৃতিকে চিরায়ত সাহিত্যে রূপান্তর ঘটিয়েছেন। ব্রাত্যজীবনের কথাকার তিনি। ম্যাজিক রিয়ালিটির সন্ধান করেছেন তিনি। সময়, প্রকৃতি ও জীবনের সমাপতন ঘটেছে তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে, অদ্বৈতের অন্যান্য কথাসাহিত্যে। প্রবহমান তিতাসে কবিতা খুঁজে পেয়েছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। অধ্যাপক শান্তনু কায়সার একারণে তিতাস উপন্যাসকে নদী ও মানুষের যুগলবন্দী বলেছেন। সুস্নাত জানা বলেছেন, জেলে জীবনের মহাকাব্য।

এটা কী করে সম্ভব হয়েছে? না, অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর সাহিত্যকর্ম শুরু করেছেন— কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে।

তিনি শুধু কবিতা লিখতেন না। চলমান সময়ের সমস্ত পৃথিবীর কবিতার গতিপ্রকৃতির খোঁজ রাখতেন। ১৯৪৮ সালে অদ্বৈত মল্লবর্মণ টি.এস. এলিয়ট ও তাঁর কবিতার ওপর যে প্রবন্ধ লেখেন তা আজও সমালোচনা সাহিত্যের সম্পদ। রচনাটির কিছু অংশ নিম্নে পুনঃপাঠের জন্য দেওয়া গেল।

"মিঃ টি এস এলিয়ট (Thomas Stearns Eliot) এ বৎসর নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। গত ৪ঠা নভেম্বর সুইডিস একাডেমির সাহিত্য শাখার এক অধিবেশনে এই পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়। এই সংবাদে পৃথিবীর নানা দেশের কাব্যরসিকগণ নিশ্চয় আনন্দিত হবেন। কারণ, বড় কবি মাত্রই দেশকাল ভেদে সকল কবিরই স্বগোত্র হলেও,

কবি এলিয়েটের প্রভাব সমসাময়িক কবিতায় ও কবিদের মধ্যে যত গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে, তেমনটি খুব কমই দেখা যায়। সেদিনের রোমান্টিক পৃথিবী থেকে আজকের পৃথিবী অন্য রকম; তার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর কাব্যাদর্শেরও যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন হবার ছিল, এলিয়টের ন্যায় শক্তিধর কবি সে কাজ সিদ্ধ করে যুগের চাহিদা পূরণ করেছেন বলা চলে।

রোমান্টিক কবিতা ও এলিয়টের কবিতার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য, তা অল্প কথায় বোঝানো সম্ভবপর নয়। কথা, ছন্দ, ভাবের ললিত বিলাস ও তার বাহুল্য রোমান্টিক কবি ও পাঠক উভয় গোষ্ঠীকেই মশগুল করে রাখে। মানুষকে সেখানে মাটিতে পাওয়া ভার, তারা হাওয়াতে উড়ে বেড়ায়, সেখানে মানুষ সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলাই রসের উৎকর্ষের পরিচায়ক। এই অতিবিরাট, সুতীব্র অনুভূতিপ্রবণ, প্রভাবশালী কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রামশীল আজকের এই টি এস. এলিয়ট। রোমান্টিক কবিতার মূলে আছে ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধ প্রেবণা মাত্র, কিন্তু এলিয়টের কবিতার মূলে আছে সমষ্টির দুঃখবেদনা অভাব নৈরাশ্যকে বিশেষজ্ঞেব চোখ দিয়ে দেখার এবং এমনকি নির্মম হয়েও, তার অন্তরের হাহাকারকে ভাষা দেবার ক্ষমতা। তাঁর এই অসাধারণ ক্ষমতার বলেই রোমান্টিকের সঙ্গে তাঁর এই বিরোধ তাঁর নিজেব মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নানা দেশের কাব্যজগতে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং সর্বত্রই কবিচিত্তে একটা সংগ্রামশীলতা জাগিয়ে তুলেছে। এই একটি মাত্র লোককে কেন্দ্র করে কাব্যের, একটা বিরাট জগৎ গড়ে উঠেছে— আকাশে তার পক্ষ বিস্তার নয়, মাটিতে তার পদ দৃঢ়সংবদ্ধ। তাঁর প্রতিভা যেমনি মৌলিক তেমনি প্রচন্ড না হলে, এটা সম্ভবপর হত না।

সম্ভবত এই দিকটি লক্ষ করেই 'ক্ষুরস্য ধারা'র (Razor's Edge) –ঔপনিষদিক পট-ভূমিকায় রচিত যুগন্তকারী উপন্যাস) লেখক সমারসেট মম এলিয়টকে বলেছেন, বর্তমান যুগেব সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর মৌলিক কবি।

কোথায় এই মৌলিকতার উৎস, সে বিচার করতে হলে আমাদের অধিক দূর যেতে হবে না।

ইংরাজী ১৯৩০–এর কাছাকাছি সময়টা ইংরাজী সাহিত্যে ভাবধারার দিক দিয়ে এক দুরপ্রসারী পরিবর্তনের যুগ। এই সময়ের নূতন এক সাহিত্যিক গোষ্ঠী দৃঢ় পদচারণায় এগিয়ে আসেন সাহিত্যের পাদ-প্রদীপে; একদিকে তরুণ বুদ্ধিজীবী মানসে এবং অন্য দিকে সংস্কৃতিসম্পন্ন পাঠক সাধারণের মধ্যে তাঁরা গভীর ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলেন।

১৯৩০-এর কাছাকাছি সময়েই তাঁদের যুগান্তকারী লেখাগুলো প্রকাশিত হয়। ত্রিশ সালের এই তরুণ বিদ্রোহীদের দলে অগ্রগণ্য রূপে পাই কথাশিল্পীদের মধ্যে জেমস জয়েস, অলডাস হাক্সলি ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফকে এবং কাব্যস্রষ্টাদের মুখপাত্ররূপে পাই টি এস এলিয়টকে। যুদ্ধপূর্ব যুগের জনপ্রিয় কথাশিল্পী গলসওয়ার্দি, ওয়েল্‌স, বেনেট প্রভৃতির বিরুদ্ধে

জয়েস ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফ তো পুস্তিকা লিখে সংগ্রামই ঘোষণা করে দিলেন। এদিকে অলডাস হাক্সলিও ঔপন্যাসিক ধারণায় ঘটালেন বিপ্লব।

এদিকে এঁরা অগ্রযুগের গদ্য-রচয়িতাদের বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রাম চালালেন, এলিয়টও তেমনি পদ্য- রচয়িতাদের বিরুদ্ধে তূণ থেকে বার করলেন ব্রহ্মাস্ত্র; নূতন নূতন টেকনিক, নূতন মননের নিদর্শন নিয়ে বেরুল তাঁর কবিতা। এই 'নূতন' আসলে কি? তাঁদের রচনাগুলো বিশ্লেষণ করলে এই নূতনকে আমাদের চিনতে বিলম্ব হবে না। বহুপুরাতনের মণিকোঠা থেকে উৎসারিত হয়ে এসেছে এই নূতন। এই নূতনই হাক্সলি ঈশার-উডকে যোগী বানিয়েছে! এলিয়টের কাব্যের যে রোমাঞ্চকর মৌলিকতা, এরও উৎস কি এখানেই? সমুদ্র মৌলিক, কিন্তু তাকে মন্থন করে যে সুধা ওঠে, তাকেও কি মৌলিক বলব না? উপনিষদের ক্ষীর-সমুদ্র থেকে মন্থন করেই তোলা হয়েছে এই মৌলিক কাব্যসুধা। আজকের দিনে একথা অসম্ভব মনে নাও হতে পারে! অন্তত এ যুগের যে সকল পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে বিবর্তিত করেছেন তাঁদের অনেকেই যে মনে প্রাণে বৈদান্তিক একথা সুবিদিত। এলিয়টের কাব্য পাঠে মনে হবে বেদান্তের হাওয়া এর গায়েও কিছু লেগেছে। রোমান্টিসিজমের সঙ্গে সংগ্রাম এক হিসাবে ভোগ-লালসা ও ক্লেদাক্ত রাজসিকতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারায় সর্বত্র ত্যাগকে ছোট করে ভোগকে বড় কবা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের আদর্শ তার ঠিক উলটো। এখানে মানুষকে মানুষরূপেই দেখা হয়েছে এবং পার্থিব অসারতা ও নশ্বর ভঙ্গুরতাকে ইন্দ্রিয় সুখলালসার থালা সাজিয়ে চাপা দেবার চেস্টা হয়নি। এলিয়টের কাব্যজগৎ যদি এইখানে ভূমিস্পর্শ পেয়ে থাকে তো সেটা অসম্ভব কিছু নয়।"

এলিয়ট নোবেল প্রাইজ পেলেন ষাট বৎসর বয়সে। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান মাতাপিতার সন্তান এলিয়ট মিসৌরীর অন্তর্গত সেন্ট লুইনাতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি ইংলন্ডে বসবাস করছেন।

এলিয়ট পিতার সপ্তম ও কনিষ্ঠ সন্তান। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং কলেজ শিক্ষা সমাপ্ত করে হারভার্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুলে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের Sorbonne-এ ফরাসী সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। পরের তিন বৎসর তিনি আবার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম, মনোবিজ্ঞান, ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব এবং সংস্কৃতি শিক্ষা করতে থাকেন। ১৯১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দে দর্শন বিভাগে সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন, কিন্তু ট্রাভেলিং ফেলোশিপ পেয়ে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বক্ষণে জার্মানিতে কাটান।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ডের Merton কলেজে গ্রীক দর্শন অধ্যয়ন করতে আসেন। ঐ সময়ে তিনি ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখতে থাকেন। লিব্‌নিজ ও ব্র্যাডলির উপর দুটি স্মরণীয় প্রবন্ধও তিনি ঐ সময়েই রচনা করেন। কবিতায় তাঁর প্রথম পরিণত রচনা হচ্ছে Alfred Prufroch-এর প্রেমের কবিতা; বেরোয় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। ঐ সময়েই তাঁর বিবাহ

হয় এবং ঐ সময়েই লন্ডনের নিকটস্থ হাইগেট্স স্কুলে ফরাসী, ল্যাটিন, গণিতশাস্ত্র, ড্রইং, সন্তরণ, ইতিহাস, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করতে থাকেন। এর পর লয়েড্স ব্যাঙ্কে কিছুদিন চাকরি করেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ– বিভাগে চাকরি পেয়েও স্বাস্থ্যের অজুহাতে বঞ্চিত হন।

১৯১৭ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত এলিয়ট 'এগোয়িস্ট' পত্রের সহকারী সম্পাদকতা করেন; এবং 'এথেনিয়ান' পত্রে অনেক প্রবন্ধাদি লেখেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ত্রৈমাসিক পত্র 'ক্রিটেরিয়নের' সম্পাদক পদে বৃত হন। এখন তিনি 'ফেবার অ্যান্ড ফেবার' নামক পুস্তক প্রকাশালয়ের একজন ডিরেক্টর।

তাঁর প্রধান রচনা—

কবিতা

The Waste land (1922); Ash Wednesday (1930); East Coker (1940); Burnt Norton (1941); Dry Salvages (1941); Poems (1909-25); Later Poems (1925-35);

নাটক : Murder in the Cathedral, (1915), Family reunion (1939)

প্রবন্ধের বই

Homage to John Dryden (1928); Selected Essays (1917-32); Elizabethan Essyas (1908); In Criticism; An Essay on poetic Drama; The Sacred Wood.

বর্তমান সভ্যতা কিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত তার বিশ্লেষণ করে দেখলে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার যৌক্তিকতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হবে। এই সভ্যতা যেন নিজে যা নয়, তার চাইতেও বেশি বলে নিজেকে জাহির করতে ব্যস্ত। এলিয়ট এর বিরুদ্ধে বজ্রসম, তীব্রতম অভিযোগ এনেছেন;তাঁর Waste Land কবিতা-পুস্তকে তিনি এই সভ্যতার স্বরূপ, এই সভ্য মানুষের খাঁটি রূপ নির্মমভাবে উদঘাটিত করেছেন। এই সভ্যতা যে কতখানি অসার, তাকে নিয়ে গর্বান্ধ মানুষ যে কত অকিঞ্চিৎকর, কবি তা নির্মমভাবে নগ্ন করে দেখিয়েছেন। এই দেখানোর মধ্যে অবশ্য একটা দুঃখবাদের রেশ নৈরাশ্যের সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে যা মানুষকে আনন্দ না দিয়ে দেবে বেদনা। কিন্তু এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য যে, প্রচলিত মেকি অথচ দুর্বার এক সভ্যতা-স্রোতের প্রতিকূলে মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করে দাঁড়িয়েছেন তিনি একা। কিন্তু আজ আর তিনি একা নন। তাঁর বজ্রদৃঢ় অভিযোগই প্রধানত এ যুগের সাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করে চলেছে।

ইংরাজী কাব্য সাহিত্যের বিবর্তনে এলিয়টের দান অসামান্য। ১৯১১ থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আধুনিকপন্থী কবিদের রচনা নিয়ে জর্জিয়ান পয়েট্রি নামে কতকগুলি কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে এবং ইংরাজী কাব্যে সেগুলি বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। এই কবিগোষ্ঠীর অন্যতম রুপার্ট ব্রুক যুদ্ধের কবিতা লিখে খ্যাতি লাভ করেন এবং

যুদ্ধেই নিহত হন। এ দলের আরো একজন কবি,উইলফ্রেড ওয়েন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। এঁদের মধ্যে সিগ্‌ফ্রিড সেশুন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসেন এবং সেখানকার লেখা কিছু কবিতা সঙ্গে করে আনেন। সেগুলি ছাড়া, ঐদলের লেখা কবিতা যুগের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধবদ্ধ ছিল না। অর্থাৎ তাঁরা যে যুগে বাস করতেন, সে যুগের প্রকৃত জগতের কোন ধারণাই সেগুলিতে পাওয়া যায়নি। এই অধোগতিকে দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন বাংলা কাব্য সাহিত্যের অধোগতির সঙ্গে তুলনা করা চলে। তখন ফ্যাসিবিরোধী গান ও কবিতা হয়ে পড়েছিল বাংলা কবিতার নিরিখ। যা হোক, তখন চলছিল শ্রেণী-সংগ্রাম আর অতৃপ্ত সাম্রাজ্যবাদের লড়াই। চিন্তারাজ্যের ভিত্তি তখন বিপ্লবমুখী সমাজ-বিশ্লেষণ, ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণী ধারণা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কলরব প্রভৃতির অভিঘাতে প্রায় নড়ে ওঠেছিল। জর্জিয়ান কবিরা এগুলোকেই গেঁথে গেঁথে কবিতা সৃষ্টি করে চললেন কিন্তু এলিয়ট প্রগতিপন্থী হয়েও গড্ডলিকা প্রবাহে পা বাড়াতে অস্বীকার করলেন। এঁদের থেকে তাঁর সাহস যেমন ছিল অধিক, তেমনি সত্যিকার বুদ্ধি ও মননের দিক থেকেও তিনি ছিলেন তাঁদের অনেক ওপরে।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বই Prufroch এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে Poems বের করলেন। এই দুটি বই সেই সময়ের কবিতা লেখার ফ্যাশনকে অগ্রাহ্য করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। সেই কবিতাগুলিতে অভ্রান্ত সিনিসিজম-এর যে সুর ধ্বনিত হয়েছিল, অত্যল্পকালের মধ্যেই তা বুদ্ধিজীবীগণ-মানসে বিশেষ আবেদন জাগিয়ে তোলে। যেন তারা এইরকম সুর শোনবার জন্যেই এত দিন কান পেতে ছিলেন।

তার পর বেরোয় তাঁর যুগান্তকারী কাব্য গ্রন্থ Waste Land, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে। এ বই বেরুলে তরুণ সমাজ তাঁকে আদর্শ প্রেরণার প্রতীকরূপে গ্রহণ করল এবং তাদের মনোরাজ্যে তিনি একক কাব্যস্রষ্টারূপে স্থান পেলেন। এই বইটিতে প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগের গতিপ্রকৃতির অসারতা নির্মল রেখায় রূপ পেয়েছে; সভ্যতার চক্র আটকে পড়েছে। তার আর ঘুরবার ক্ষমতা নেই। এই ভাবটি কবি তাঁর কাব্যের লাইনগুলিতে নিবিড়ভাবে রূপদান করেছেন। কিন্তু এই ভঙ্গুর সভ্যতা আর জীবন্মৃত মানুষ চিত্রিত করতে করতে তিনি মাঝে মাঝে আপনাকে শুধিয়েছেন 'কবি একবার নিয়ে এস স্বর্গ হাতে বিশ্বাসের ছবি।' সেই বিশ্বাসের ছবিই তাঁর Ash Wednesday বইখানা।

এলিয়ট ইংলন্ডের গত বিশ বছরের চিন্তাধারাকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করেছেন। গত বিশ বছর ধরে যাঁরা কবিতা লিখে আসছেন,তাঁদের মধ্যে সমালোচক হিসাবেও আজ তাঁর আধিপত্য সর্বজনস্বীকৃত। চিন্তাশীল মানবমনে তিনি ধর্মবোধ উজ্জীবনার্থে নিজের পড়াশোনা ও প্রতিভাকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

কাব্যশাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্য অসাধারণ। সর্বযুগের কবিতা সম্বন্ধেই তাঁর অগাধ বুৎপত্তি। তাঁর ছন্দ ও ব্যঞ্জনা স্বভাবসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্তিতে প্রবাহিত। যেন মনের ঐকান্তিকতা থেকে বিনা

চেষ্টায় এগুলি বেরিয়ে আসে। তাঁর রচনা ও জীবনদর্শন ভাষার দিক বিবেচনায় ইংরাজী ও আমেরিকান সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে বিশ্ব-সাহিত্যকে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ মূলত কবি ছিলেন। তার অন্তর্গত রক্তের ভেতরে এক দার্শনিকতা ছিল। তিনি ক্রান্তদর্শী ছিলেন। কিন্তু কবি অদ্বৈত মল্লবর্মণের কবিতার সামগ্রিক অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। সামগ্রিক পুন:পাঠ সম্ভব নয়। সময়ের আলোকে ফিরে দেখা সম্ভব নয়। তিতাস চৌধুরী ও অন্যান্য কয়েকজন মানুষজনের উদ্যোগে তাঁর কয়েকটি কবিতার সন্ধান পাওয়া গেলেও তাঁর কবিতার সামগ্রিক পান্ডুলিপি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত 'ত্রিপুরা লক্ষ্মী' ও অন্যান্য সাহিত্য সাময়িকী থেকে কয়েকটি কবিতার সন্ধান পাওয়া গেলেও এগুলো অখন্ড কবি সত্তাকে বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়। অচিন্ত্য বিশ্বাস মহোদয় অদ্বৈত মল্লবর্মণের যে রচনাসমগ্র দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশ করেছেন, তাতে সংকলিত হয়েছে বিদেশী নায়িকা, শুশুক, যোদ্ধার গান, ধারা শ্রাবণ, মোদের রাজা মোদের রাণী ও ত্রিপুরা লক্ষ্মী কবিতাগুলো। 'ত্রিপুরা লক্ষ্মী' কবিতাটির দুটো পাঠ পাওয়া যায়।

রচনাসমগ্রে যে পাঠ পাওয়া যায় তা হল :

'বড় দুঃখী, শোকতপ্ত, বড় ভাগ্যহারা
সন্তপ্ত পরাণ;
তুই না চাহিলে ফিরে কে এদেরে করিবে জননী
স্নেহভরে কৃপা দৃষ্টি দান?
অনশনে, অর্ধাশানে জীর্ণ-শীর্ণ কংকালের মত
রয়েছে পড়িয়া,
নাহি মা প্রাণের সাড়া, নাহি উৎসবের ধারা
প্রাণে আছে যেন মরমে মরিয়া।
বুকগুলো ধুকিতেছে, মুখগুলো ব্যথায় মলিন
বলহীন দেহ
তোর ছেলে দুঃখে মরে তুই না চাহিলে ফিরে
মাগো অন্য কেহ করিবে কি স্নেহ?
সবাই জুড়িছে তর্ক বড় বড় কথা নিয়া হায়
কয় বড় কথা
ছোট ছোট প্রাণগুলো মৃত্যু মোহ তন্দ্রাতে বিলীন,
কে বুঝিবে ব্যথা?
দিন যায় মাস যায়, বর্ষ যায়--এক এক করি
হয় অবসান,
দুঃখ দুর্ভিক্ষের বোঝা দিনে দিনে হয়ে ওঠে ভারি
জ্বলে চিতা দাবাগ্নি সমান।'

শান্তনু কায়সার "অদ্বৈত মল্লবর্মণ ঃ জীবন সাহিত্য ও অন্যান্য" গ্রন্থে 'ত্রিপুরা লক্ষ্মী' পত্রিকায় ১৩৪২ এর শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ত্রিপুরা লক্ষ্মী' নামক কবিতার উল্লেখ করেছেন, তা নিম্নরূপ :

আমার তিমিরাচ্ছন্ন ব্যথা -দুঃখ ঘেরা
ভাগ্যাকাশ পটে প্রসারিয়া
পূর্ণিমার সুবিমল জ্যোৎস্নারাশি;
মাগো, আয মা নিকটে
আয় মা ত্রিপুরা লক্ষ্মী,
স্বপ্ন বুলায়ে দে চোখে, জাগা মা হরষ;
উঠুক আনন্দ-হাসি, ব্যথাম্লান মুখগুলো হতে
পেয়ে তব স্নেহের পরশ।
আয় মা করুণা করি
দেখ মাগো, দেখ ভালো করে মেলিয়া দু'নয়ন
সম্মুখে মরণসিন্ধু,
বেলাভূমে দুঃখের পসার করিছে চয়ন।
বড় দুঃখী, শোকতপ্ত, বড় ভাগ্যহারা সন্তপ্ত পরান,
তুই না চাহিলে ফিরে কে এদের করিবে জননী
স্নেহভরে কৃপাদৃষ্টি দান?
অনশনে অর্ধাশনে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালের মত রয়েছে পড়িয়া
নাহি মা প্রাণের সাড়া, '
নাহি উৎসবের ধারা প্রাণে, আছে যেন মরমে মরিযা।
বুকগুলো ধুকিতেছে, মুখগুলো ব্যথা মলিন, বলহীন দেহ
তোর ছোলে দুঃখে মরে
তুই না চাহিলে ফিরে
মাগো, অন্য কেহ করিবে কি স্নেহ?
সবাই জুড়িছে তর্ক বড় বড় কথা নিয়া হায়,
কয় বড় কথা
ছোট ছোট প্রাণগুলো মৃত্যুমোহ তন্দ্রাতে বিলীন
কে বুঝিবে ব্যথা?
দিন যায়, মাস, বর্ষ যায় ... ...
এক এক করি হয় অবসান
দুঃখ দুর্ভিক্ষের বোঝা
দিনে দিনে হয়ে ওঠে ভারী-
জ্বলে চিতা দাবাগ্নি সমান।

আয় মা ত্রিপুরা লক্ষ্মী,
ত্রিপুরার আকাশ -বাতাস করি মধুময়
ত্রিপুরার মাঠেঘাটে পূর্ণ ফসলের হাসি নিয়ে
আয় এ সময়।
অরুণ মুকুটশিরে
চরণে কুসুমমালা পরি' হস্তে পূর্ণ শস্য-আশীর্বাদ;
চরণমঞ্জরী নবজীবনের উঠুক ঝংকার
জাগায়ে দে বাঁচিবার সাধ।

এভাবে বাংলা ভাষায় অনেক কথাসাহিত্যকারের মতোই অদ্বৈত মল্লবর্মণ তার লেখালেখির শুরুতেই কবিতা দিয়ে শুরু করেছিলেন। এবং তার কবিতাবোধ ছিল, সহজ এবং কমিউনিকেটিভ্। আমরা জানি স্কুল জীবন থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন, 'মাসপয়লা' 'খোকাখুকু' এবং 'শিশুসাথী' পত্রিকায় তাঁর মাস্টারমশাই বিপিন বিহারী বর্মণ তাঁকে কবিতা চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছেন। স্কুল জীবনে কবিতা লিখে পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রভাবিত হয়েছিলেন কবি ও গীতিকার কামিনী ভট্টাচার্য এবং অজয় ভট্টাচার্য দ্বারা। যে কবিতাটির জন্য অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছাত্রজীবনে পুরস্কার পেয়েছিলেন তার নাম ছিল "পুব গগনের অরুণ"। কবিতাটির প্রথম স্তবক ছিল এরকম ঃ

"পুব গগনের রক্ত অরুণ আমরা তরুণ শক্তিমান
বিশ্বহিতে রক্তকিরণ করবো মোরা করবো দান॥
মোদের চরণ স্পর্শে রে
জাগবে ধরা হর্ষে রে
বিশ্বহিতে করবো মোরা তপ্ত বুকের রক্তদান॥

আমরা সকলেই এটা এখন জানি, অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রথম জীবনের কবিতার খাতা হারিয়ে গেছে। ভূপেন্দ্রনাথ সাহিত্যভূষণের সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে সমকালীন সময়ে 'ত্রিপুরা লক্ষ্মী' নামে একটি সাময়িকী বেরোয়। 'ত্রিপুরা লক্ষ্মী' কাগজে প্রকাশিত কিছু কবিতা তিতাস চৌধুরী কয়েকটি কবিতা নামে আবিষ্কার করেছেন। তাদের মধ্যে 'ত্রিপুরা লক্ষ্মী' বাদ দিলে পর 'বিদেশী নায়িকা', 'শুশুক', 'যোদ্ধার গান' 'ধারা শ্রাবণ' অন্যতম। 'যোদ্ধার গান' একটি আরবী কবিতার অনুবাদ হলেও এটি একটি মৌলিক কবিতা।

পুরো কবিতাটিই টানটান চিত্তে অনুবাদ করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

করুণায় আর গৌরবে সুমহান
আল্লা ব্যতীত কারো কাছে আমি নুয়াইনি কভু শির –

উপলাকীর্ণ বন্ধুর পথে ধরি কর-অঙ্গুলি
চালায়েছে মোরে চির বিজয়ের পথে –
দিয়েছে আমায় সম্পদ রাশি, দিয়েছে সিংহাসন,
হস্তে দিয়েছে বিজয়ীর তরবারি।

অজানা দেশেতে আমার, জানার গৌরব দিয়াছেন,
মোর রাজত্ব-ছায়া দিয়ে তিনি ধরারে ঢাকিয়াছেন
অজ্ঞাত ছিনু, অখ্যাত ছিনু, তাঁহারি মেহেরবাণী
দিকে দিকে মোরে বিজয় দিয়েছে আনি।
তার শত্রুরা পতঙ্গসম পলাইয়া গেল
মোর সম্মুখ হতে।
তিনি চাহিলেন করুণা করিতে, নিলো না সে দান তারা
জাহান্নামের চির তমসায় সব শয়তানী সহ
বিরাম লভিল তারা।

আমরা লভেছি বীরের মৃত্যু,
আমরা শুয়েছি বীর-শয্যার সমর অঙ্গনেতে।
তিনি আমাদের ঠাঁই করেছেন তৃণ পুলকিত
চির সবুজের দেশে মধুগন্ধী সে শাশ্বতী নদী কূলে 'ধারা শ্রাবণ' কবিতায় লিখেছেন ঃ
শাওন রে তোর কেমন ধারা।
দিবস নিশি ঝরাস বসি
কোন্ বিরহীর আঁখির তারা ?
কানন ভরে বাদল সাজাস
ঝাঝর সুরে মাদল বাজাস
কেয়ার বুকে জাগাস সাড়া
কেমন ধারা।

নীপের শাখে কেশর সাখি
তুইরে বহাস উতল বাতাস
মনোমোহন গন্ধ তারি
কানন মাতাস।
নুয়ায়ে দিয়ে ফুলের বীথি
তুই শুধু গাস জলের গীতি
কল্লোলে আকুল পারা,
কেমন ধারা।

গত দিনের কত স্মৃতি
হৃদয়পটে তুইরে জাগাস,
চক্ষেতে তুই মোহাঞ্জনের
আবেশ লাগাস।

রসঘন কেশর রেণু
ব্রজের কালার কিশোর বেণু
দুর্যোগভিসারের সাড়া
কেমন ধারা।

শাওন রে তোর কেমন ধারা
তোর গানেতে কান পাতিয়ে
হয়ে যাইযে আপন হারা।
অবিশ্রান্ত বারি ঝরাস
গানে গানে পরার ভরসা
জলে ভরাস চোখের তারা
কেমন ধারা।

এখানে বহমান নদী স্রোতের জীবন দার্শনিকতা ফুটিয়ে তুলেছে কবি। 'শুশুক' কবিতায় নগণ্য বিষয়কে বড়ো করে দেখার চোখ খুলে দিয়ে লিখছেন :

অগাধ জলের তলে সঞ্চরি' ফিরে গো,
কভু চলে উচ্ছ্বাসে, কভু চলে ধীরে গো,
ভোঁস করে ভেসে উঠে
নিশ্বাস ছাড়ে সে,
মসৃণ কালো রূপ অতলের কালিমায়
মিশে হয় একাকার, কিছুই না ধরা যায়,
দুরে দূরে থাকে সদা
ঘেঁসে নাকো পাড়ে সে।

অগাধ মানব-স্রোত বিচারিয়া ফিরে সে
কভু চলে ডাঙ্গায়, কভু চলে নীড়ে সে,
হাজারের ট্যাঁকে কেটে
ট্যাঁকে গুঁজে মারে ডুব
গোপনের কালিমায় লুকিয়ে সে চলে গো,

মসৃণ দেহে কোনো দাগ নাহি জ্বলে গো,
মানুষের স্রোতে মিশে
তলাইতে পারে খুব ॥

'বিদেশী নায়িকা' কবিতায় কবি লিখেছেন

বাধাহীন বারিধির কালো কলধ্বনি
তারই ওপারে তোমার দেশ—সেই শ্বেতদ্বীপে।
রূপসী সপ্তদশী তুমি—
সপ্তসমুদ্রের শূন্যতা পেরিয়ে
আমার তটে এসে মূর্ছনা জাগায়– তোমার রূপের ঢেউ।
এত রূপ তোমার, এত যৌবন।
তুমি বাস্তবের নও, কল্পনার
নইলে এত রূপ তোমার থাকতো না–
ঈশ্বরের অপটু হাতের খেয়াল তুমি নও,
কল্পনার রাজ্য উজাড় করে তোমাকে সৃষ্টি করেছে এক কথাশিল্পী–
বিদেশী উপন্যাসের তুমি এক নায়িকা
আর তুমি এত সুন্দর!
গল্পের মাঝখানে তুমি মরে গেছো
নির্মম শিল্পী তোমার ডুবিয়ে মেরেছে
পুষ্প হিন্দোলিত এক সরোবরের জলে
সেই ক্ষণিকার বুকে লেখা হয়ে রইলো
ডিভাইন কমেডির এক অক্ষয় স্বর্গ
— জীবনের ট্রাজেডি সেই থেকে তোমার পদচিহ্নকে
বৃথাই খুঁজে মরছে।

তুমি যদি বেঁচে থাকতে—
প্রত্যহের ক্ষয়িষ্ণু ধরিত্রীর নির্মম বিবর্তনের বুকে
যদি তুমি বেঁচে থাকতে—
কালের রথচক্রের তলায়—এত রূপ এত যৌবন
জরার কুঞ্চনে কুঁচকে যেতো–'দলিত দ্রাক্ষা সম'।
তোমায় পারতাম না এমন করে ভালোবাসতে,
মুগ্ধ মধুপের মতো স্পর্শকাতর মন আমার,
সপ্তদশ বসন্তে সরায়িত তোমার ঐ তনুমনের কূপে কূপে
মেলাত কি নিষ্ঠার বহু—বেণী-সঙ্গম!

দু'শো বছর তোমার বয়েস—
অষ্টাদশ শতাব্দীর এক প্রাচুর্যময় প্রাতে তোমার আবির্ভাব —
এতদিনের প্রাত্যহিকতায় তোমার জীবনে কী না আনতে পারতো!
ব্যর্থতা, গ্লানি,ঈর্ষা, নৈরাশ্য আরো কত কী।
আর,আর কল্পান্তিক সত্যের ছাঁচে ঢালাই করা
সেই রোগশয্যায় বিশ্রী রকমের মৃত্যু!

সেই যে ডুবেছিলে আর ওঠো নি —
মৃত্যুর বিধাতাকে তুমি দিয়েছ ফাঁকি
– যারা তোমায় জানতো ভালোবাসতো,
অন্তত তারা তো কেউ দেখে নি!

কাহিনীর আধেক পথে তুমি মরে গিয়েছিলে,
তাই আজো তুমি বেঁচে আছো —
আজো তুমি রূপসী, সপ্তদশী, যৌবনবতী
— আজো তুমি প্রিয়া!

তাঁর কবিতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখেছেন ... ... ছাত্র বয়সে অদ্বৈতের কবিতাচর্চার সামান্য সংবাদ পাওয়া গেছে। তারও আগে মুখে মুখে জারিগান বাঁধতেন বলে জানা গেছে। সেই সমস্তের উদ্দেশ্য নেই বললেই হয়। অগ্রজ সতীর্থ সুবোধ চৌধুরীর স্মৃতিতে ধরা ছাত্র বয়সে লেখা অদ্বৈত মল্লবর্মণের কবিতার একটি স্তবক। স্বাধীনতা সংগ্রামের আবেগ সঞ্চারিত করার প্রয়াস রয়েছে সেই কবিতায়। স্তবকটি উদ্ধার করা যাক:

পুব গগনে রক্ত অরুণ আমরা তরুণ শাক্তিমান।
বিশ্বহিতে রক্তকিরণ করবো মোরা করবো দান।
মোদের চরণ স্পর্শে রে
জাগরে ধরা হর্ষে রে
বিশ্বহিতে করবো মোরা তপ্তবুকের রক্তদান।

নিছক স্মৃতি ধৃত এই কবিতাংশ। সুবোধবাবুর সাক্ষ্য– কবিতাটির জন্য ছাত্র অদ্বৈত পুরস্কৃত হয়েছিলেন।[২]

জর্জ স্কুলের ছাত্ররা হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করতেন। নাম ছিল 'সবুজ'। সম্পাদক ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকটস্থ গ্রাম শাহবাজপুরের শাহ আফতাবউদ্দিন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ জর্জ স্কুলে পড়তেন না। তবে আফতাবউদ্দিনের অনুরোধে 'সবুজ'এর জন্য তিনি একটি চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছিলেন, নাম 'তিতাস'।[৩] সে কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনার পাশাপাশি ছিল তিতাস তীরের মালো মৎস্যজীবীদের জীবন সংগ্রামের চিত্র।

সুবোধ চৌধুরীর ধারণা ছিল, তখনকার শিশুপত্রিকা 'মাসপয়লা' 'খোকাখুকু', 'শিশুসাথী' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর কবিতা। এখন পর্যন্ত তেমন কিছু আমরা খুঁজে পাই নি। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে (১৯৩৫) অদ্বৈত মল্লবর্মণ একটি কবিতা লেখেন—'ত্রিপুরালক্ষ্মী'। ত্রিপুরা লক্ষ্মী-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সাহিত্য-ভূষণের অনুরোধে কবিতাটি লেখা হয়। উক্ত পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৪২ সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশ পায়। ত্রিপুরার ভাগ্যলক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে একুশ বছর বয়সী কবিকণ্ঠের সেই আহ্বান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ:

আয় মা ত্রিপুরা লক্ষ্মী ত্রিপুরার আকাশ বাতাস
করি মধুময়,
ত্রিপুরার মাঠে ঘাটে পূর্ণ ফসলের হাসি নিয়ে
আয় এ সময়।
অরুণ মুকুট শিরে, চরণে কুসুম মালা পরি
হস্তে পূর্ণ শস্য আশীর্বাদ
চরণ মঞ্জরী নবজীবনের উঠুক ঝঙ্কার
জাগায়ে দে বাঁচিবার সাধ।

এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, বৈষ্ণব পদাবলীর অনুষঙ্গ, কালিদাসের কাব্য জগতের অল্পাধিক সূত্র পাওয়া যায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের কিছু কবিতায়। যেমন 'ধারাশ্রাবণ' কবিতায় মিলছে অনামী-বিরহীর বেদনা :

শাওন রে তোর কেমন ধারা
দিবস নিশি ঝরাস বসি
কোন্ বিরহীর আঁখির তারা?
কানন ভরে বাদল বাজাস
ঝাঝর সুরে মাদল বাজাস
কেয়ার বুকে জাগাস সাড়া
কেমন ধারা।

কিংবা—

শাওনরে তোর কেমন ধারা
তোর গানেতে কান পাতিয়ে
হয়ে যাইরে আপন হারা।
অবিশ্রান্ত বারি ঝরাস
গানে গানে পরান ভরাস
জলে ভরাস চোখের তারা
কেমন ধারা

অনুরূপ একটি কবিতা 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে।' সেখানে কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর অনুষঙ্গ।

মেঘ তুমি নিনাদিত আষাঢ়ের
প্রথম দিবসে
স্মৃতির পশরা লয়ে বসে আছি
আকুল হরষে
বাতায়ন পথে, মোর দৃষ্টি যায়
দূর-দুরান্তরে,
কত বিস্মৃতির হায় কত কথা
আজই মনে পড়ে।

তিতাস-নদীর প্রসঙ্গ এখানেও অদ্বৈত মল্লবর্মণের মনকে আচ্ছন্ন করে। লেখেন তিনি :

সম্মুখে তিতাস বহে এলায়ে
বিপুল দেহ ভার
পথে পথে বেড়ে ওঠে, বুকে তার
কি ক্ষুব্ধ ঝঙ্কার।
কত সুখ, কত দুঃখ, কত হাসি,
কত কান্না হায়,
কত পরিচিত মুখ ভাসি ওঠে
আজি গো হিয়ায়।

কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতার ('মানসী' কাব্যের অন্তর্গত) কিছু প্রভাব আভাষিত হয়। অবশ্য অনুশীলন-পর্বে যে কোন তরুণ কবির পক্ষেই অনুরূপ প্রভাব আয়ত্ত করা স্বাভাবিক।

'মোহাম্মদী'-তে কাজ করার সময় স্বনামে ও বেনামে মৌলিক ও অনুবাদমূলক কিছু কবিতা মুদ্রিত করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। অতীত কোন উৎস থেকে অনূদিত কবিতা 'যোদ্ধার গান'-এ মুসলমান জেহাদ-এর চিত্র ও আবেগ উপস্থিত।

করুণায় আর গৌরবে সুমহান
আল্লা ব্যতীত কারো কাছে আমি নুয়াইন কভু শির
উপলাকীর্ণ বন্ধুর পথে ধরি কর-অঙ্গুলি
চালায়েছে মোরে চির বিজয়ের পথে—
দিয়াছে আমার সম্পদ রাশি, দিয়াছে সিংহাসন,
হস্তে দিয়াছে আমার বিজয়ীর তরবার।

আল্লাহর করুণাতেই এই যোদ্ধা চিরবিজয়ী হয়েছেন। দেশে-দেশান্তরে তার অপরাজেয় অভিযান। শত্রুরা চলে গেছে দূর-দূরান্তরে। যারা থেকে গেছে মুসলমান-প্রভাবিত অঞ্চলে

তারা 'জাহান্নামের চির তমসায়' তাদের আশ্রয় হয়েছে। জেহাদীরাও শহীদ হয়েছে, তবে তাদের জন্য ঈশ্বর নির্দিষ্ট করেছেন সুন্দর স্থান : তৃণ পুলকিত/ চির সবুজের দেশে/ মধু গন্ধী সে শাশ্বতী নদীকূলে। বাংলায় মুসলিম-জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এই কবিতা। গদ্য ছন্দে রচিত অদ্বৈত মল্লবর্মণের আর একটি কবিতার সংবাদ মিলেছে।

'মোহাম্মদী-তে প্রকাশিত একটি কবিতার নাম 'শুশুক'। অগাধ জলে সঞ্চরমান বিচিত্র প্রাণী।

অনুরূপ শুশুক-স্বভাবের মানুষও দেখেছেন কবি। তারা আরও অদ্ভুত।

অগাধ মানব স্রোত বিচরিয়া ফিরে সে
কভু চলে ডাঙ্গায়, কভু চলে নীরে সে,
হাজারের ট্যাঁক কেটে
ট্যাঁকে গুঁজে মারে ডুব
গোপনের কালিমায় লুকিয়ে সে চলে গো,
মসৃণ দেহে কোনো দাগ নাহি জ্বলে গো,
মানুষের স্রোতে মিশে
তলাইতে পারে খুব।।[৪]

কলকাতার নগর জীবনের পরিচয় তখন তাঁর অভিজ্ঞতাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করছে। জানছেন তিনি বহু মানুষকে— তাদের কেউ কেউ অনুরূপ বিচিত্র চরিত্রের হওয়া সম্ভব। হতে পারে, অদ্বৈত মল্লবর্মণের মানুষ চেনার অভিজ্ঞতাই এই কবিতায় ধরা পড়েছে।

'মৃত্তিকা' ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ লিখেছেন একটি কবিতা—'বিদেশী নায়িকা'। এটি গদ্যছন্দে লেখা। সপ্তসিন্ধুর ওপারে 'শ্বেতদ্বীপ', সেখানকার কোন 'রূপসী সপ্তদশী'র কথা এখানে লিখেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ:

সপ্ত সমুদ্রের শূন্যতা পেরিয়ে
আমার তটে এসে মূর্ছনা জাগায়—তোমার রূপের ঢেউ।
অবশ্য এই নায়িকা বাস্তব জগতের কেউ নয়।
কল্পনার রাজ্য উজাড় করে তোমাকে সৃষ্টি করেছে এক কথা শিল্পী—
বিদেশী উপন্যাসের তুমি এক নায়িকা।

গল্প শেষ হবার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। আর অদ্বৈত মল্লবর্মণ লিখেছেন, সেই রূপবতীর প্রতি জাগতিক আকাঙ্ক্ষার কিন্তু মৃত্যু নেই।

জীবনের ট্রাজেডি সেই থেকে তোমার পদচিহ্নকে
বৃথাই খুঁজে মরছে।

আজ যদি সেই নায়িকা বেঁচে থাকত, তাহলে তার যৌবন নিশ্চয় অমলিন থাকত না— 'জরার কুঞ্চনে কুঁচকে যেতে।' সেরকম সময় কবি নিশ্চয় আর তাকে ভালবাসতে

পারতেন না। কাহিনীর অর্ধপথে মারা গেছে বলেই, বেদনার অপরূপ আঘাতে আজও মানুষের আকাঙ্ক্ষা, মোহ, ভালোবাসা, সমবেদনা রয়ে গেছে। বিধাতার সৃষ্টিতে ফাঁকি থাকতে পারে, থাকতে পারে অপূর্ণতা—কিন্তু কল্পনার অধিজগতের বাসিন্দা বলেই জরা তাকে স্পর্শ করে নি। আজও এই অপার্থিব নায়িকা কবি আর কবির মতো অনেক উপন্যাস পাঠকের মনে যৌবন স্বপ্নের মতো মনে হয়।

কাহিনীর আধেক পথে তুমি মরে গিয়েছিলে,
তাই আজো তুমি বেঁচে আছো—
আজো তুমি রূপসী, সপ্তাদশী, যৌবনবতী
— আজো তুমি প্রিয়া![৫]

এ পর্যন্ত অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিনটি উপন্যাস পাওয়া গেছে। 'রাঙামাটি,' 'শাদা হাওয়া' আর 'তিতাস একটি নদীর নাম'। 'রাঙামাটি-তে একটি মৌলিক আর দুয়েকটি অনুবাদ কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। হুইটম্যানের একটি কবিতার অনুবাদ উপন্যাসটির কবি-চরিত্রে বিজনেশ নায়িকাকে শুনিয়েছে; সেই অনুবাদ নিশ্চয় অদ্বৈতেরই।

তোমার ও দেহ নারী ও তব যৌবন
পূর্ণভাবে ভোগ আমি চাহি করিবারে
এ মোর জীবন দেহে মেলি আপনারে
তব ভবিষ্যৎ মাঝে নহে অকারণ।

'যারা বিরাট সাম্রাজ্য' স্থাপন করবে, 'মহান *সৌন্দর্য যারা*' সৃজন করবে, '*আত্মত্যাগ* দীপ্তি' নিয়ে যারা 'ত্যাগী কর্মী রূপস্রষ্টা' হিসাবে পৃথিবীতে নাম করবে, নারী-দেহের সৌন্দর্য তো তাদেরই উদ্দীপ্ত করার জন্য।

তোমার মাঝারে রূপ দেব সে ছায়ায়
তাই তো এ মন তব দেহখানি চায়।

বিজনেশ অকুণ্ঠিত নারী সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার উপায় হিসাবে এই অনুবাদ ব্যবহার করেছে। তার চরিত্রের অনুগত হলেও অনুবাদটি স্বতন্ত্র কবিতা হিসাবেও গণ্য হতে পারে।

'ঋতুসংহার'-এর শরৎ বর্ণনার একাংশের সারানুবাদ রয়েছে 'রাঙামাটি'তে।

প্রস্ফুটিত পঙ্কজেরা
যাহার বরানন
যুগ্মনীলোৎপলের দলে
যাহার দুনয়ন
রূপের আধার সকল প্রকার
এই যে শরৎ করুক আবার
প্রেমোন্মত্তা নারীর মতো
চিত্ত বিনোদন।

এ অবশ্য আংশিক অনুবাদ

বিজনেশের মুখে আর একটি আদিরসাত্মক কবিতা শুনিয়েছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। সে কবিতা তাঁর মৌলিক রচনা বলেই মনে করি। ছন্দ সুন্দর, অনেকটা যেন মোহিতলাল মজুমদারের ভাবজগতের সঙ্গে কবির পরিচয়ের আভাস এখানে মিলতে পারে। বিজনেশ রূপ তন্ময় – রেণুকার দেহ রূপের প্রতি তার বাসনা অনাবরণ। সেকথাই কবিতাটিতে ব্যক্ত :

আজকে প্রিয় পূর্ণিমা রাত
পূর্ণ-চাঁদের চূর্ণ হাসি
লতায় পাতায় কীর্ণ হয়ে
দিল সকল সমুদভাসি।

প্রকৃতি এরকম অনুকূল, তাই বিজনেশের প্রার্থনা :

অনেক দূরে অনেক দূরে
যেথায় কভু যায় নি কেহ
সেই অজানা স্বপনলোকে
রবে ক্ষণিক সুখের নেহ

সেই ক্ষণিক সুখের হ্রদে যুগল সন্তরণ করার আকাঙ্ক্ষা তার – প্রেমপূর্ণ সেই উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা। মৃত্যুর পরপারে যে স্বর্গ তাতে তার বিশ্বাস নেই।

হেই আমায় জড়িয়ে ধরো
ক্লান্ত তোমার কোমল করে
আজকে যদি স্বর্গ না পাই
স্বর্গ কি সই পাবোই মরে?

অকুণ্ঠিত দেহবাদী চেতনার জন্য কবিতাটি স্বতন্ত্র মনে হয়।

কবি অদ্বৈত মল্লবর্মণের সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। বিশেষত তিনি কিছু শিশু-পাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন – সেগুলি এখনও সংগ্রহ করা যায়নি। কালস্রোতে হারিয়ে গেছে সে সব।

কালস্রোতে হারিয়ে না গেলে হয়তো তাঁর অখন্ড কবিতাবোধের একটা সামগ্রিক রূপ পাওয়া যেত।

জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন কবিতা ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। যদিও কথাটি অতিব্যবহারে ক্লিশ হয়ে গেছে। "সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি।" জীবনানন্দের ভাষায কবি হতে গেলে হৃদয়ে কল্পনা থাকতে হবে। কল্পনার ভিতরে থাকতে হবে চিন্তা এবং অভিজ্ঞতার সারবত্তা। সমস্ত গুণাবলী ছিল অদ্বৈত মল্লবর্মণের। অদ্বৈত মল্লবর্মণের চিরায়ত সৃষ্টি 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত হলেও একথা বলা যায় উপন্যাসটি কাব্যগুণে ভরা। এককথায় কাব্যিক উপন্যাস। একারণেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ ঠিক এভাবে সৃষ্টি করছেন

উপন্যাসের ভাষা : - "এর পারে পারে খাঁটি রক্তমাংসের মানুষের মানবিকতা আর অমানুষিকতায় অনেক চিত্র আঁকা হইয়াছে। হয়ত সেগুলি মুছিয়া গিয়াছে। হয়ত তিতাসই সেগুলি মুছিয়া নিয়াছে!

কিন্তু মুছিয়া নিয়া সবই নিজের বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে। হয়ত কোনোদিনই কাহাকেও সেগুলি দেখাইবে না, জানাইবে না। কারো সেগুলি জানিবার প্রয়োজনও হইবে না। তবু সেগুলি আছে। যে - আখর কলার পাতায় বা কাগজের পিঠে লিখিয়া অভ্যাস করা যায় না, সে - আখরে সে সব কথা লেখা হইয়া আছে। সেগুলি অঙ্গদের মত অমর। কিন্তু সত্যের মত গোপন হইয়াও বাতাসের মতো স্পর্শপ্রবণ। কে বলে তিতাসের তীরে ইতিহাস নাই।"

ছোটগল্পের অদ্বৈত মল্লবর্মণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ছোটগল্প লিখতে শুরু করেননি, তখন তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন চেকভ, তুর্গেনিভ, তলস্তয়, হর্থন, পো, ব্রেটহার্ট, মোপাসাঁ এবং দোদে।

ছোটগল্পের ইতিহাসের আলোকে বাংলা ছোটগল্পের বয়স একটু কম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষায় ছোটগল্পকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রকৃতপক্ষে।

ছোটগল্প শব্দটি প্রথম ব্যবহারই করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯১৪ সালের ১৬ই এপ্রিল কথাসাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্ম। সুতরাং ছোটগল্প সম্পর্কে একটা সার্বিক শিক্ষা অদ্বৈত মল্লবর্মণের ছিল। যেহেতু তাঁর জীবনের প্রধানতম অসুখ ছিল বই কেনা এবং বই পাঠ। তিনি বইপোকা ছিলেন। ছোটগল্পের সেসমস্ত ইতিহাস মাথায় রেখে অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর স্বল্প আয়ুর জীবনে মাত্র পাঁচটি ছোটগল্প লিখেছিলেন, এ প্রমাণ পাওয়া গেছে এখন পর্যন্ত। কিন্তু তাসত্ত্বেও—অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তীর ভাষায় "অদ্বৈত মল্লবর্মণের ছিল প্রকৃত ছোটগল্পকারের বিশিষ্ট প্রতিভা।" তাঁর পাঁচটি ছোটগল্প হল (১) সন্তানিকা (২) স্পর্শদোষ (৩) কান্না (৪) বিস্ময় (৫) বন্দী বিহঙ্গ।

'সন্তানিকা' প্রথম প্রকাশ পায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৯৩৮ সালে। তখন তিনি 'নবশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক। গল্পটির পাণ্ডুলিপি কোন সময়ের তা জানা সম্ভব হয়নি। সন্তানিকা একটি চরিত্রকে বিকশিত করে নির্মিত হয়েছে। কিন্তু এ গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র ধনঞ্জয় বিকশিত হয়েছেন একটি কেন্দ্রীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে। কেন্দ্রিয় বিষয়টি হল 'ক্ষুধা'। "সকাল আটটা

বাজিতে না বাজিতেই ধনঞ্জয়ের বড় ক্ষুধা পায়। সে অন্য সব সহ্য করিতে পারে, গালমন্দও নির্বিকার চিত্তে হজম করা তার অসাধ্য নয়। কিন্তু ক্ষুধা সে সহ্য করিতে পারে না। এই সময় রাগটা একটু বাড়ে।"

ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই ধনঞ্জয় ঘোষাল গৃহশিক্ষকতার খোঁজে ধর্মনিষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মন বীরেশবাবুর বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন। অচিন্ত্য বিশ্বাস তাই লিখছেন, "সন্তানিকার প্রধান চরিত্র ধনঞ্জয় ঘোষাল—একজন সর্বহারা মানুষ। তার একমাত্র instinct হল ক্ষুধা। বীরেশবাবুর বিদ্যার্থী পুত্র-কন্যার দেখা শোনা, পড়াশোনায় সাহায্য করা তার কাজ। কাজটি ধনঞ্জয় নিজেই যোগাড় করে নিয়েছে। মৃত্যুর স্পর্শ পায় হামেশাই—মেধা অকিঞ্চিৎকর তবু এই রেসিডেন্সিয়াল টিউটরটির কোন আত্মীয় পরিজন নেই। বীরেশবাবু তাড়িয়ে দিলেও ঘোষালের যাবার কোন জায়গা নেই। ব্যর্থ, রিক্ত, অসহায় এক মানুষ। বীরেশবাবুর ছেলেটি পড়ায় ফাঁকি দেয়, অত্যাচারের ভয় দূর করতে চমৎকার উপস্থিত বুদ্ধি মতো এনে দেয় এক বাটি মুড়ি। ধনঞ্জয়কে সরবরাহ করে সাজানো তামাক। গিন্নিমাও পেট চিনে খাওয়াতে জানেন। তার স্নেহচ্ছায়ায় এই স্নেহবুভুক্ষ মানুষটির আত্মীয় পরিজন বিচ্ছিন্ন যন্ত্রনার সামান্য উপশম হয়। ছাত্ররা ফেল করলে বীরেশবাবু ধনঞ্জয়কে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিছু দূর গিয়ে আবার ঐ অল্পবয়সী গিন্নিমার কাছে ফিরে আসে ধনঞ্জয়। তাকে খেতে ডাকেন জননী। সন্তান না হোক ধনঞ্জয় তার কাছে সন্তানের তুল্যই। এই গল্পে একধরনের আদর্শবোধ সঞ্চার করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। নারী তাঁর কাছে জননী সত্তার প্রতিনিধি।"

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের অন্যতম ব্যক্তিত্ব অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তীও একই কথা বলার চেষ্টা করেছেন-তাঁর লেখা 'ছোটগল্পের অদ্বৈত মল্লবর্মণ' লেখায়। তিনি লিখছেন, 'সন্তানিকা' এক নিরাশ্রয় বৃদ্ধের কাহিনী। গল্পটি কিন্তু শুরু হয়েছে সরাসরি একটি দৃশ্যের উপস্থাপনায়। 'একটি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র স্কুল-ছুটির পর বাড়ির পথ ধরেছে। তার পিছু নিয়েছে এক বৃদ্ধ-পশ্চাতে যে এক বুড়া ডিটেকটিভের মত তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে পিছু লইয়াছে, ইহা সে লক্ষ্য করে নাই। লক্ষ্য করিলে বুড়ার ক্ষুধিত দৃষ্টি হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য সচেষ্ট হইত।' একেবারে গোড়াতেই গল্পের নায়ক বৃদ্ধ ধনঞ্জয় ঘোষাল আদ্যন্ত এক ব্যক্তি-চরিত্র রূপে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার আচরণ থেকে আমরা বুঝে নিই যে সে ক্ষুধার্ত এবং বিশেষ মতলব নিয়েই সে গোয়েন্দার মত অনুসরণ করেছে বালকটিকে। ছোটগল্পে বাহুল্যকথন বর্জনীয়। অদ্বৈতের গল্পের মূল বিষয়টি তার প্রথমেই স্পষ্ট হয়েছে তা হল ক্ষুধা। বৃদ্ধ ধনঞ্জয়ের বাঁচবার জন্য, আশ্রয় ও খাদ্যের জোগাড়ে নানা মতলব ও ফিকির বার করতে হয়। তেমনি একটি মতলব লেগে যাবার প্রত্যাশায় এক গোবেচারা ধরনের বালকের পিছু পিছু সে তার বাড়িতে গিয়ে ওঠে।

ধনঞ্জয়ের চেহারার বর্ণনাটি পড়তে পড়তে অনিবার্যভাবেই সত্যজিৎ রায়ের 'অশনি সংকেত' এর মন্বন্তর-পীড়িত বৃদ্ধটির স্মৃতি জাগে। হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, ছেঁড়া জামা, পুটলি,

তালি দেওয়া চটি-হাতে, ছাতা আর লাঠি অন্য হাতে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের রচনার চিত্রগুণ ও চলচ্চিত্র সম্ভাবনা আবিস্কারে তাই ভুল করেননি ঋত্বিক ঘটক।

ধনঞ্জয় ঘোষাল বালক নরেশের পিতা বীরেশবাবুর কাছে আশ্রয় ও দু'বেলা আহার প্রার্থনা করে। বিনিময়ে সে তাঁর ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষকতার দায়িত্ব নেবে। প্রথমে আপত্তি করলেও বীরেশবাবু শেষ পর্যন্ত রাজি হন। তিনি ধর্মনিষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ—সম্পন্ন গৃহস্থ। তাঁর স্ত্রী যত্ন করেই নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণকে থাকতে ও খেতে দেন। ধনঞ্জয় বেঁচে যায়।

কিন্তু সমস্যার শুরু তার পরে। ধনঞ্জয়ের পূর্ব জীবনের বিশেষ পরিচয় লেখক দেননি। কিন্তু এই ইঙ্গিত স্পষ্টই হয়ে ওঠে যে সে সারা জীবন ভোগ করেছে দারিদ্র্য। সহ্য করেছে ক্ষিধের জ্বালা। তার সমস্ত মন পড়ে থাকে খাবারের দিকে। গিন্নি-মা কে প্রসন্ন রাখার ব্যাকুলতা বোধ করে সে, কারণ অন্ন বেড়ে দেন তিনিই। তার দুর্বলতা টের পেয়ে বালক ছাত্র এক ধামা মুড়ি ও গুড় এনে দিয়ে পড়ার হাত থেকে নিস্তার পায়। পড়াশুনার কাজে মন থাকে না ধনঞ্জয়ের। সে কাজে তার নৈপুণ্যও তেমন নেই। বৃদ্ধ গল্প করতে ভালোবাসে, সত্য মিথ্যা-নানা ধরনের গল্প বলে ছাত্রকে—শিশু ছাত্রীকে। গল্প শুনতে আপত্তি নেই তাদের। ছাত্রটি শিক্ষককে তামাক সেজে দেয় এবং গল্প শুনতে চায় কেবলই। পড়াশোনা বন্ধ থাকে।

সমস্ত চিত্রটি বেশ যত্নে স্পষ্ট ও সজীব করে তুলেছেন লেখক। সম্পন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ির স্নেহে, শাসনে, পারস্পারিক প্রীতিতে ঘেরা সংসার। সুস্থ, স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ। সেই প্রীতি, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাভাবিক জীবন ছন্দের অঙ্গীভূত হয়ে যায় একদা নিরাশ্রয় বৃদ্ধ ধনঞ্জয়।

ধনঞ্জয় ঘোষালকে বেশ বর্ণময় করে এঁকেছেন লেখক। তাঁর খাদ্য-লোভ ও খাদ্য-প্রীতি, তার নিজের বিষয়ে গল্প বলবার উৎসাহ, আরামের ঘুম—আয়ু, প্রায় শেষ হয়ে আসা বৃদ্ধ যেন সর্বদেহ-মন নিয়ে কেবল বাঁচবার সুখ পান করে নিতে চায়। ধনঞ্জয়ের কথা বলবার সময়ে মাঝে মাঝেই লেখক তাঁর ভাষাকে একটি সার্বজনিক চরিত্র দেন। ধনঞ্জয়ের বিবরণ কেবল ধনঞ্জয়ের থাকে না— যেন নির্মম জীবন ও সেই জীবনের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে প্রেমে-অপ্রেমে-ছলে-চাতুরিতে-ভয়ে- ভক্তিতে মোকাবিলা করতে বাধ্য হওয়া মানবজাতির সম্পর্কের আয়না হয়ে ওঠে। কয়েকটি উদাহরণ—

(ক) বাঁশের দুইটা চোঙা সে আপন হাতেই তৈয়ার করিয়াছে তামাক টিকা রাখিবার জন্য। বাবুর ছেলে নরেশকে সে হুকুম দিতে ভয় পায়, বাবু যদি রাগ করেন!

(খ) এখন সে মৃত্যুকে ভয় পায় না। কিন্তু বেঘোরে মরাটকে সে ভয় করে। কোথায় কোন পথের পার্শ্বে, বৃক্ষতলে, নদীতটে কিংবা উন্মুক্ত প্রান্তরে পড়িয়া মরিবে, ভীষণ পিপাসার কালে ক্ষীণকণ্ঠে জল জল বলিয়া চেচাঁইবে, কেহ শুনিবে না। তার ক্লান্ত নিমীলিত আঁখিযুগল বৃথাই আকাশে বার দুই মৃত্যু স্পর্শ হইতে পরিত্রানের উপায় খুঁজিবে— কেহ দেখিবে না, কেহ শুনিবে না, ইহা সে বড় কষ্টের বিষয় বলিয়া মনে করে।

(গ) নরেশ মাথা নিচু করে। মাষ্টার ক্ষিপ্তের ন্যায় চক্ষু লাল করিয়ে বলে, তোর কিছু হবে না। তোকে মেরে ফেলা উচিত! ঐ ঔচিত্যের ভারটুকু সে অন্য কাহারও জন্য রাখিয়া দেয়।

(ঘ) এক একবার তাহার মনে হয়, বীরেশবাবু সর্বশক্তিমান— সৃষ্টিকর্তার নাড়ীর সঙ্গে তাঁহার নাড়ীর কোথায় যেন একটা অচ্ছেদ্য যোগসূত্র রহিয়াছে— সেইটা দুনিয়ায় আর যেন কোন মানুষের সঙ্গে নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই ধনঞ্জয়ের অদূরাগত মৃত্যুটার উপরেও যেন কারিকুরি করিতে পারেন।

(ঙ) রাত্রিতে আহারের পর সে তার নিজের উচ্ছিষ্ট বাসন ধুইতে পুষ্করণীর ঘাটে যায়। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বাঁধানো ঘাটে।

এইভাবে জীবন তার বিভিন্ন মুখ নিয়ে ধনঞ্জয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। ধনঞ্জয় তাঁর সুখ ও অসুখ নিয়ে বেঁচে থাকে।

নিতাই বসু তাঁর 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ' গ্রন্থে বলার চেষ্টা করেছেন যে, 'সন্তানিকা' গল্পের সঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। তিনি লিখছেন, "সন্তানিকা'র বৃদ্ধ ধনঞ্জয় ঘোষাল এক তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রের পিছন পিছন এসে ওই বাড়িতে আশ্রয় পায়। মনে হয়, গল্পটিতে অদ্বৈতর আত্মজৈবনিক দূর-প্রভাব রয়েছে। তাঁর বিদ্যালয়-জীবনে তিনি হয়তো এ ধরনের ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকবেন, আর ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র থাকার সময় কুমিল্লার এক কায়স্থ পরিবারে তিনি থাকতেন বলে জানা যায়। বিশ শতকের কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বা জীবন থেকে উঠে আসা আখ্যানের বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সময়ের প্রেক্ষাপট সহ সাহিত্য বিশ্লেষণে 'সন্তানিকা' অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ সময় যদি হয় ঝকঝকে মড়কগ্রস্ত সময় তাহলে 'সন্তানিকা' গল্পরচনার সময়ে ছিল রিক্ত ও ধ্বস্ত সময়। দুই সময়ের পার্থক্য রেখায় দাঁড়িয়ে চলুন আমরা তাঁর ছোটগল্প পাঠ করি। "দরিদ্র হওয়াটাই কষ্টকর নয়। দারিদ্র্যের কুয়াশার ফাঁক দিয়া প্রাচুর্যের প্রতি ব্যর্থ চাহনিটাই জ্বালাময়। যে মানুষ সারাদিনের উপার্জনের সম্বল দুই এক বোঝা তাচ্ছিল্য ও অনাদরের সহিত দুই এক পয়সা লইয়া শহরের খোলা রাস্তা দিয়া নির্বিকারচিত্তে পথ চলিতে পারে, দেখিয়া আমাদের দৃষ্টি বেশি ভারাক্রান্ত হয় না, মনও বেশি পীড়াবোধ করে না— মনে হয় শহরের সে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু যে ব্যক্তি কৃচ্ছতার ছিটানো কালির তিলক পড়িয়া ও বুকজোড়া বুভুক্ষা নিয়া কাঁচের দরজার ফাঁকে রেস্টুরেন্টের সুখাদ্যের দিকে অসহায়ভাবে তাকাইয়া কিছুকাল কাটাইয়া দেয়— তাহাকে দেখিয়া বুকের ভিতরটা খচ্ করিয়া উঠে বৈকি!"

এই হল 'স্পর্শদোষ' গল্পের বাক্যবন্ধের তীব্রতা ও সংহত রূপ। 'স্পর্শদোষ' গল্পটি অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পাদিত 'দলবেঁধে' নামক সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে। ১৩৪৭ রথযাত্রার দিন 'দলবেঁধে' প্রকাশ পায়। 'চতুর্থ দুনিয়া' অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা (১৯৯৪)-য় এই গল্প পুনর্মুদ্রিত হয়। 'স্পর্শদোষ' গল্পের সঠিক রচনাসময় আমরা জানি না। সুমিতা চক্রবর্তী লিখছেন,

"১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অদ্বৈত মল্লবর্মণের নিয়মিত কোনো চাকরি ছিল না। 'নবশক্তি' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনিয়মিতভাবে দু'একটি পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু কাজ করেছেন। সেই সময়ে লিখেছেন গল্পও। তারই একটি হল 'স্পর্শদোষ'। গল্পটিতে ১৯৪০-৪২ এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হিটলার-এর তান্ডবের উল্লেখ আছে। লেখাটি ১৯৪১-৪২-এর মধ্যে বলেই মনে হয়। মন্বন্তরের কোনো উল্লেখ নেই বলে মনে হয় ১৯৪৩-এর আগেই লেখা।"

স্পর্শদোষ গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র এক কাগজ কুড়োনো ব্যক্তি। দ্বিতীয় চরিত্র এক নামহীন কুকুর। দুজনেরই প্রতিনিধিত্বমূলক দুটি নাম গল্পে দিয়েছেন লেখক চরিত্রের সঙ্গে মিল রেখে। প্রথম চরিত্রের নাম— 'ভজা'। দ্বিতীয় চরিত্রের নাম— 'খেঁকী'।

'সন্তানিকা' গল্পের পটভূমি ছিল গ্রাম। ছিল একটি গ্রামীণ ব্রাহ্মণ পরিবার। নায়ক এক দরিদ্র কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তার নিজের গৃহ না থাকলেও সে আশ্রয় পেয়েছে। সে কাজ করে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু 'স্পর্শদোষ' গল্পের কেন্দ্রভূমি কলকাতা শহরের রাস্তা। কেন্দ্রিয় বিষয় সাধারণভাবে ১৯৪২ সাল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কঠিন সময়ে গরিব মানুষদের অন্ন সংস্থানের সমস্যা। এ গল্পের নায়ক ভজার কোন জাত নেই। লেখক লিখছেন,"— কুলী মজুর বা ভিখারী, বেশভূষা দেখিয়া যে কোন একটি ভাবিয়া নেওয়া যায়। নাম কাহারও জানা থাকিবার নয়। ইচ্ছামত ভজা বলিয়া ধরিয়া নিলেও কাহারও আপত্তি উঠিবার কথা নয়।" এই গল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুমিতা চক্রবর্তী লিখছেন, "ভজার কোন পূর্বজীবন বা কোনো ঘরের সন্ধান নেই। সে কলকাতার ফুটপাথের অগনিত বাসিন্দার একজন। তার কোনোরকম শিক্ষারও উল্লেখ নেই। পথে ও ডাস্টবিনে পড়ে থাকা ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে সে বিক্রি করে এবং তাতে যা জোটে তাই তার খাদ্য।" তিনি আরও লিখছেন 'স্পর্শদোষ' এর ভজার কোনো রকম শিকড়ের কথাই বলা হয়নি। লেখকের কথন-রীতির মধ্যেই ভজাকে দেওয়া হয়েছে এক প্রতীকত্ব। তার নাম যেন নিজস্ব নাম নয়— লেখক যে কোন একটি নাম তাকে দিয়েছেন। সে সেই প্রাণীদের একজন— অনন্ত ক্ষুধা, বৃশ্চিকদংশী ক্ষুধা যাদের নিয়ত অস্থির করে রাখে। সেই নির্দয় ক্ষুধার সঙ্গে তার নিরন্তর লড়াই। যাদের লড়াই নেই, তাদের চেয়ে— যারা এই অসম সংগ্রামেই নেমে পড়ে তাদেরই লেখক বিশেষভাবে এই গল্পে দেখেছেন। তার এই গল্পটি কোন চিত্র বা ঘটনার বর্ণনায় নয়, শুরু হয়েছে যেন এক জীবন স্রষ্টার বহু অভিজ্ঞতা-লব্ধ ভাবনার উন্মোচনে। যে অনাহারকে নির্বিকারভাবে বহন করে চলতে পারে সে আমাদের চোখে পড়ে না, "কিন্তু যে ব্যক্তি কৃচ্ছ্রতার ছিটানো কালির তিলক পরিয়া ও বুকজোড়া বুভুক্ষা নিয়া কাঁচের দরজার ফাঁকে রেস্টুরেন্টের সুখাদ্যের দিকে অসহায়ভাবে তাকাইয়া কিছুকাল কাটাইয়া দেয়— তাহাকে দেখিয়া বুকের ভিতরটা খচ্ করিয়া উঠে বৈকি।" অসামান্য দুটি একটি কলমের টানে ভজার এই যুদ্ধেরই একটা রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। ছেঁড়া কাগজ বিক্রি করে সামান্য পয়সায় সে সামান্য খাবার কেনে কিন্তু খাবার আগে মিষ্টির দোকানের

সামনে দিয়ে একবার ঘুরে আসে। তার চোখ, তার ঘ্রাণ, তার মস্তিস্ক দিয়ে গ্রহণ করতে চায় সুখাদ্যের স্বাদ। যখন যুদ্ধের বাজারে ছেঁড়া কাগজও দুস্প্রাপ্য; আর সমব্যবসায়ী অগনন তখন বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তিই গ্রহণ করে ভজা। কিন্তু দুটি একটি পয়সা পেলে মুড়ি বা ছাতু নয়— বিলাসী ভজা ঢুকিল তেলে ভাজার দোকানে।" এই বিলাসটুকুই তার যুদ্ধ।

গল্পের দ্বিতীয় চরিত্র হল একটি পথের কুকুর। কুকুরের নাম খেঁকী। সে-ও সারাক্ষণ খাদ্য-সন্ধানে ফেরে। রাস্তায় একদিন তাদের ধাক্কা লেগে গেল। খুব বড় কিছু ঘটল না। পথচারীরা হাসল। দুজনেই, অপ্রস্তুত হয়ে সরে গেল দু'দিকে। দ্বিতীয়বার— কাগজের মোটের গায়ে গুঁজে রাখা ভজার খাবারের ঠোঙা নিয়ে পালাচ্ছিল খেঁকী— ভজা এসে উদ্ধার করল সেটিকে। তারপর খেঁকীর লোলুপদৃষ্টির সামনে বসে তাকে দেখিয়ে খাওয়া শেষ করে ঠোঙাটা ছুঁড়ে মারল কুকুরটির দিকে। ক্ষুধায় ক্ষিপ্ত কুকুর দাঁত বার করে তার দিকে তেড়ে আসতেই ভজা প্রথমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেও খেঁকী-র আক্রমনোদ্যোগ তাতে প্রশমিত হল না। তখনই ঘটল সেই ঘটনা "ভজা কোমর গোড়ালি পর্যন্ত নত করিয়া কনুই পর্যন্ত হাত দুইটি ভূমিতলে স্থাপন করিল। তারপর খেঁকির কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া থুতনি বাড়াইয়া বিকট এক শব্দ করিয়া উঠিল। খেঁকী উহার মধ্যে নিজের স্বরূপ দেখিয়া পিছাইয়া গেল।" ক্ষুধার্ত পৃথিবীতে নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্রয়োজনে ভজা কুকুর হয়ে গেল এক মুহূর্তে। কুকুরের ছোঁয়া লেগেছিল ভজায়। 'সেই স্পর্শদোষ' ভজা আর কুকুর। কিন্তু আসলে সেই হিংস্র ও বৈনাশিক সময়ের স্পর্শে মানুষ ও কুকুর সম-তলে এসে দাঁড়াল। অন্য এক দিন এল যে দিন খেঁকীর মুখ থেকে রুটি কেড়ে নিতে অকৃতকর্ম হল ভজা। তারপর থেকে ভজা আর খেঁকী পরস্পরের শত্রু হয়ে দাঁড়াল। খেঁকী ভজার সঙ্গে পেরে ওঠে না। ক্রমে ভজার কাছে খেঁকীকে কুকুরের মত আচরণে ভয় দেখানো হয়ে উঠল একটা নেশা। সে খুঁজে খুঁজে বার করে খেঁকীকে— আর ভয় দেখায় কুকুর সেজে। খেঁকীর সঙ্গে গড়ে ওঠে তার শত্রুতার বন্ধন। তারা দুজনেই এই পৃথিবীতে একই খাদ্যের ভাগিদার। লেখক লেখেন, "খেঁকীর দিনরাত্রির শান্তি যেন ভজা চুষিয়া খাইয়াছে। ভজার এ কয়দিনের অত্যাচারে খেঁকী আরও শুকাইয়া গিয়াছে। পথ চলে সে সন্তর্পনে। পাছে ভজার সঙ্গে মুখোমুখি হয়। পথ চলিতে ভজার ছায়ামাত্র দেখিলে খেঁকী ছুটিয়া পালায়। আবার, খেঁকীর ছায়ামাত্র দেখিলে ভজা তাড়া করিয়া যায়— দৌড়াইয়া গিয়া ভয় দেখাইয়া আসে। ক্রমে খেঁকীর সহনশক্তি সীমা অতিক্রম করিল। রাস্তায় বাহির হওয়াটি সে বন্ধ করিয়া দিয়াছে, ভজা তাহাকে বৃথাই খুঁজিয়া মরে।" কত বড় লেখক ছিলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ— তার প্রমাণ উদ্ধৃত অংশটি। মানুষ যখন কুকুরের মতো হয়ে ওঠে তখন সে হয় কুকুরের চেয়ে ভয়ঙ্কর। কুকুরকে সে এক্সপ্লয়েট করে শুধু নয়। কুকুরটির উপর সে প্রভুত্ব কায়েম রাখতে চায়। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা মানুষের আদি আকাঙ্ক্ষাগুলির মধ্যে অন্যতম। সেই মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও এই গল্পটি অসাধারণ।

তারপর একটি দিন আসে যখন ভজার তাড়নায় শ্রান্ত, ভীত, বিমূঢ় খেঁকী সামনের দু'জন পথচারীকে কামড়ে দিয়ে পালাতে যায়। জনতার লাঠির ঘায়ে মরতে হয় তাকে।

গল্পশেষে ভজা এসে মৃত খেঁকীর দেহ বুকে তুলে নিয়ে নীরবে চলে যায়।— "কেহ বাধা দিল না, কেহ কিছু বলিলওনা জনতার মধ্য হইতে একজন হিন্দুস্তানী আধা বাংলায় শুধু বলিল, এ ভি পাগল হোয়ে গেছে।" গল্পটি কুকুর ও মানুষের সম্পর্কের গল্পের চেয়ে বেশী। এ নির্মম ক্ষুধা-প্রজ্জ্বলিত পৃথিবীতে কুকুর ও মানুষের একই শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবার গল্প। অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখছেন, " 'স্পর্শদোষ'এর পটভূমি শহর কলকাতা। এটি লেখা হয় ১৯৪০ সালের জুন মাসে। তখন অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। 'নবশক্তি' বন্ধ হবার উপক্রম। সনৎকুমার নাগ আর সতী নাগের সঙ্গে যৌথভাবে 'দলবেঁধে' নাম দিয়ে একটি গল্প সংগ্রহ সম্পাদনা করেছেন তিনি। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় আংশিক সময়ের কাজ করে শৈলেন রায় মেসে ফেরার পর অদ্বৈত মল্লবর্মণকে এই কাহিনীর নির্যাসটুকু বলেছিলেন। বলেছিলেন তিনি— এক ভিখিরীকে খেঁকি কুকুরের দিকে কুকুরের ভঙ্গিতে চার পায়ে হেঁটে ঘেউ ঘেউ করতে দেখলেন তিনি। জায়গাটি নর্থ রেঞ্জের থেকে বেশি দূরে নয়। নর্থ রেঞ্জে তখন অদ্বৈত মল্লবর্মণ আর শৈলেন রায় থাকেন। কথাটুকু শোনা মাত্র অদ্বৈত মল্লবর্মণ বলেছিলেন, মানুষটি পশু হয়ে গেছে।

গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র এক নামহীন পরিচয়হীন দুঃখী মানুষ। জীবনযুদ্ধে পরাজিত এই মানুষটির অদ্বৈত মল্লবর্মণ নাম দিয়েছেন ভজা। এই রকম একটি সংকটাপন্ন পথ-কুকুর। তার নাম খেঁকি। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তুঙ্গে। গল্পের মধ্যে বলা হচ্ছে— 'হিটলার প্রতিবেশীদিগকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে কাগজের দাম বেড়ে যাবার কথা। আছে 'হিটলার হল্যান্ড ও বেলজিয়াম আয়ত্তে এনেছে' আছে প্যারিস আক্রমণ করার সময়কার সংবাদ। ঘটনাটি ১৪ জুন ১৯৪০-এর। গল্পের রচনাকালও কাছাকাছি সময়। এই গল্পে কাগজ কুড়িয়ে খাওয়া ভজা-র সংগ্রাম অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। খাদ্যান্বেষণ খেঁকী'র পক্ষেও জটিল হয়ে উঠে। একদিন ভজা খেঁকিকে নকল করে তারই মতো চার পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে যায়। কুকুরের মতো ডাক দেয়। ফলে খেঁকী অসম্ভব রকম ভয় পায়। ভজার পক্ষে এ হয়ে ওঠে খেলার মতো। খাবার দোকানে উচ্ছিষ্ট বা লোকের করুণা ভিক্ষুক, ভিক্ষুক খেঁকী এখন ভজাকে দেখেই পালায়। শুধুমাত্র খাদ্য অন্বেষণ করে জীবন কাটানো এই দুই অসমপরিস্থিতির প্রাণী বর্তমান কাহিনীর কথাবস্তু। শেষ পর্যন্ত খেঁকী মারা যায় এক দুর্ঘটনায়। ভজা তখন তাকে কোলে তুলে নেয়। জীবন—সংগ্রামের রুক্ষতা যাদের পরস্পরের মধ্যে টিকে থাকার জন্য দুর্বার বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করে, একজন তাদের মরে যাওয়ায়—অন্যজন বোঝে তাদের অবস্থা ও অবস্থান ছিল এক রকম। সমাজ আর্থিক পরিবেশ ও অন্য যেকোন মানদন্ডে একেবারে প্রান্তবাসী এই দুই চারিত্রের স্পর্শ-দোষে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে গল্পটি বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত।"

'সন্তানিকা' গল্প অদ্বৈত মল্লবর্মণ শেষ করেছেন, নিম্নরূপ বাক্যবিন্যাসে। "গিন্নিমা থমকিয়া দাঁড়ায়— এই ব্যথাক্লিষ্ট সর্বহারাটির দিকে চাহিয়া বুকের দরদ যেন উথলিয়া উঠে—

এ যেন বিশ্বের স্নেহ বভুক্ষিত সন্তান মাতৃহৃদয়ের দ্বারদেশে মাথা খুরিয়া মরিতেছে। গিন্নিমার মুখখানাও বেদনা ও করুণায় এমন আকার ধারণ করিয়াছে— যেন বিশ্বের চিরন্তন মাতৃমূর্তি অজস্র স্নেহ বক্ষে লইয়া তৃষিত সন্তানকে অভয় দিতেছে।

বুড়া অভিভূতের ন্যায় বসিয়া পড়ে। গিন্নিমা বলে, শীগ্‌গির ওখানে বস গিয়ে, আমি খাবার নিয়ে অসছি।" ক্ষুধার গল্প 'সন্তানিকা'। সন্তান স্নেহ দিয়ে শেষ হয়। চিরায়ত এক মানবিকতার চিত্রকল্পের মাধ্যমেই শেষ করেছেন লেখক 'সন্তানিকা'। 'স্পর্শদোষ'ও মূলত ক্ষুধার গল্প। ক্ষুধাকে কেন্দ্র করে মানুষে পশুতে প্রতিযোগিতা। ক্ষুধা যে একটি প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির তো খতম চাই। তাই প্রতিযোগিতা। কিন্তু লেখক 'স্পর্শদোষ' গল্পও 'সন্তানিকা' গল্পের মতো চিরায়ত মানবিকতার চিত্রকল্প দিয়েই শেষ করেন। মানুষে পশুতে মানবিক বন্ধনের চিত্রকল্প ও তার বাক্যবিন্যাস নিম্নরূপ :

"ক্ষুদ্র জনতার এক কোন ভাঙ্গিয়া ভজাও আগাইয়া আসিল। খেঁকীকে চিনিতে তাহার একটুও বিলম্ব হইল না। প্রথমে সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, যেন তাহার প্রিয়বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, এমনি ভাবে সে জ্ঞানহারা হইয়া লুটাইয়া পড়িতে পড়িতেও সামলাইয়া লইল। তারপর বিস্মিত স্তম্ভিত জনতাকে ভাবিবার অবসর না দিয়া সে খেঁকীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে চলিয়া গেল। কেহ বাধা দিল না, কেহ কিছু বলিল না। জনতার মধ্য হইতে একজন হিন্দুস্থানী আধা বাংলায় শুধু বলিল, এ ভি পাগল হোয়ে গেছে।"

অদ্বৈত মল্লবর্মণ তার সাহিত্যে চিরায়ত মানবিকতার কেন্দ্রিয় বিষয়কে শত ভাঙ্গানের মাঝেও পরিত্যাগ করেননি। 'সন্তানিকা' এবং 'স্পর্শদোষ' ছাড়া তার অপর গল্প হল 'কান্না'। 'কান্না' গল্পটির শুরুতেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ লিখছেন, "গুরুদয়ালের পায়ে ব্যথা, হাঁটিতে কষ্ট হয়। তবু না হাঁটিলে বুঝি তার চলে না? সকালবেলা বাহির হইয়া যায়। কোনদিন দুপুরে ফিরে, কোনদিন ফিরেও না। কোনদিন সূর্যের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে ফিরে, ফিরিয়া হয়তো অপরিচ্ছন্ন বিছানাটা হাতড়াইয়া দেশলাই বাহির করিয়া 'ডিবা' জ্বালিল, না হয়তো বাড়ির পুব দিককার নিমগাছটার তলায় হাত-পা ছড়াইয়া দিয়া গান ধরিল :

রাধে, রাধে গো রাধে,
তোর লাগি মোর পরাণ কাঁদে;
নইলে কি আর কালো শশী
অতি সাধের চূড়া বাঁশী
অই চরণে তুলে দিল সাধে,
রাধে, রাধে গো রাধে ...

বাড়ির একমাত্র অধীশ্বর সে। সে ছাড়া এবাড়িতে আর একটিও জীবন্ত প্রাণী নাই। কাজেই তার এই স্বেচ্ছাচারিতা। কেহই বাধা দেয় না।" এ গল্প সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তপোধীর ভট্টাচার্য লেখেন : " 'কান্না' গল্পটি অনেকখানি ভিন্নগোত্রীয়। একটু ছন্নছাড়া ধরনের গুরুদয়াল

এই গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র। নামকরণে করুণ রসের পরিচিত অনুষঙ্গ থাকলেও বয়ানের উপসংহারে পৌঁছে আমরা বুঝতে পারি, গল্পকার আসলে নামের শ্লেষগর্ভ বিনির্মাণ করে নিয়েছেন। জগদীশ গুপ্তের ঘরানার কথা আরও একবার মনে পড়ে আমাদের। কেননা অদ্বৈত এই গল্পের শেষেও পাঠকের জন্যে অপ্রত্যাশিত মোচড় রেখে দিয়েছেন। যার উৎস গহন মনের আলো–আঁধারিতে। গুরুদয়াল খুব বড়ো জগতের বাসিন্দা নয়, তার জীবনবৃত্ত ছোটো। তার নিঃসঙ্গ অস্তিত্বের সমস্যা ও যৌবনের দাহকে কেন্দ্র করে কথাবস্তু গড়ে উঠেছে। গল্পকার কোন ভনিতা ছাড়াই, অল্প দুই-একটি ইঙ্গিতপূর্ণ অনুপুঙ্খের সাহায্যে গুরু দয়ালের অস্তিত্বকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। ঘরে তাঁর মন টেকে না বলে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে খানিকটা বিবাগীর মতো হয়ে গেছে সে। ছন্নছাড়া জীবনের সঙ্গে মানানসই তার অপরিচ্ছন্ন বিছানা, প্রায়ান্ধকার বাড়িতে স্বেচ্ছাচারী বিচরণ। পাড়াপড়শির সহানুভূতি সূচক কথাবার্তা, নারীমহলের জল্পনা, দূরসম্পর্কীয় পিসির খেদ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কোনো নিটোল কাহিনী বৃত্ত গড়ে ওঠে না। গল্পকারের অভিপ্রেতও নয় তা।

গুরুদয়ালের নিরুদ্দেশ যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন, পোশাক চেহারা ও ব্যবহারের পরিবর্তন বিবৃত হয়েছে নিতান্ত কথাচ্ছলে। এভাবেই পাঠক জানতে পারেন তার পুন·বিবাহের উদ্যোগের কথাও। কিন্তু ভাবী শ্বশুরবাড়িতে দৃষ্টিকটুভাবে যাতায়াত করেও গুরুদয়ালের বিয়ের সম্বন্ধ টিকল না। কন্যাকর্তা চিঠি দিয়ে জানালেন, মেয়ের বিয়ে অন্যত্র দেওয়া হচ্ছে। গল্পকারের উদ্দেশ্যে যে ঘটনা বিবৃত করা নয়, মনের গহণে আলো নিক্ষেপ করতে চান তিনি–তার অভ্যাস পাই কথকে'র এই বাচনে : "কী এক উৎকৃষ্ট আনন্দে গুরুদয়াল সহসা হাসিয়া উঠিল। এ যেন শ্মশানবাসীদের অট্টহাসি। কিন্তু সে যে কতখানি জ্বালা-ক্রোধ ও প্রতিহিংসার ইচ্ছা বুকে চাপিয়া এমনভাবে হাসিতে পারিয়াছে তাহার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেই তাহা ধরা পড়িত।" এর অব্যবহিত পরে আবার তার গৃহত্যাগ এবং দু-মাস যেতে না যেতে সস্ত্রীক ঘরে ফিরে আসা। যেহেতু এই গল্পের পরিসর খুব বড়ো নয়, গল্পকার কোনো ভণিতা ছাড়াই পাঠককে তড়িৎগতিতে অবরোহী বিন্দুতে নিয়ে যান। গুরুদয়ালের স্ত্রী কুৎসিত এবং সে প্রেমহীন। তার মানে, অকথিত হলেও এই সত্য আমরা বুঝে নিই যে মনস্তত্ত্বের জটিল তাড়নায় গুরুদয়াল আসলে বিশ্ব সংসারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চাইছে। স্ত্রীকে সে নিত্যই মারধোর করে। এমন সময়, এই গল্পের সঙ্গে খানিকটা বেমানানভাবে, লঞ্চে আহ্লাদির সঙ্গে তার দেখা হল। এই তরুণীর সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব হয়েছিল। খানিকটা অতি নাটকীয় কথোপকথনে যেন গ্রন্থির সঙ্গে আরও গ্রন্থি যুক্ত হল। দুদিন পরে তার বিয়ের রাতে গুরুদয়ালের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিল স্বয়ং আহ্লাদি।

কিন্তু গল্পকার জীবনের অগাধ আবাধ জটিলতার কথা জানেন। আহ্লাদির মোহজালে ব্যগ্রভাবে সাড়া দিতে চেয়েও গুরুদয়াল অদৃশ্য বাধা পেরিয়ে যেতে পারল না। এই সন্ধি-মুহূর্তের বিবরণ কথক-গল্পকার এভাবে দিয়েছেন : "যেদিন·আহ্লাদির বিবাহ হইবার কথা, সেইদিন

বিকালে গুরুদয়াল বেশ একটু সাজগোজ করিল। বৌকে ডাকিল, বৌ আসিয়া নতমুখে নিকটে দাঁড়াইল। তাহার মৌন মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে নানা কথা ভাবিতে লাগিল। তুলনা করিল একখানা কলহমুখর অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত মুখ, আর একখানা নির্বাক স্ত্রী হীন বেদনাময় মলিন মুখ। অন্য সময় হইলে সে অনায়াসে বৌটিকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু আজ তাহার কি যেন হইল, সে দুঃখদগ্ধ রূপহীন মুখখানার দিকে চাহিয়া কেবল ভাবিতেই লাগিল। ভাবল, এটা বড়ো অসহায়!' অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখছেন · " 'কান্না' গল্পটি অদ্বৈত মল্লবর্মণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এখানে আছে তাঁর জন্মগ্রাম ও পরিবেশের চিত্র। আছে তিতাস নদীর কথা।" লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ তার 'কান্না' আখ্যানে লিখছেন, "গোকর্ণঘাট হইতে নবীনগর পর্যন্ত তিতাস নদীতে মোটর-লঞ্চ চলে। গুরুদয়াল কি একটা কাজে কোথায় যাইতেছিল। লঞ্চে উঠিয়াই যাহা দেখিল, অবাক না হইয়া পারিল না। যাহার সহিত পূর্বে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল সেই বিধবা তরুণী। গুরুদয়ালের বুকটা হঠাৎ মোচড় দিয়া উছিল।

তিতাস নদীর ঢেউগুলিকে দুইধারে ভাগ করিতে করিতে দ্রুত গতিতে মোটব-লঞ্চ চলিয়াছে, দুই পাড়ে সবুজ গ্রামগুলি একে একে চোখের আড়াল হইয়া যাইতেছে। গুরুদয়াল লঞ্চ হইতে নামিযা পডিতে পাবিলে যেন রক্ষা পাইত। বুঝি সাপ দেখিয়াছে। অন্যদিকে মুখ ফিবাইযা বসিয়া রহিল।"

'কান্না' গল্পের পুন পাঠ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মানুষই মহৎ শিল্প। মন ব্যতিরেকে মানুষের কিছুই দেযার নেই। স্মৃতি, প্রেম, ভালবাসা, শরীর, মন সব একাকার হয়ে যায় নদী-নারী এবং প্রকৃতির জলরঙে জারিত হওয়া মগ্নজীবনের কাছে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'বন্দী বিহঙ্গ' গল্পটি ছাপা হয় 'মোহাম্মদী' পত্রিকায়। ১৩৫২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়। গল্পটি প্রথম সংগ্রহ করেন ড. ইসরাইল খান। ঢাকার সাহিত্য সাময়িকী 'লোকায়ত'-তে ১৯৯৮ সালে 'বন্দী বিহঙ্গ' পুনঃমুদ্রিত হয়েছিল। ফাল্গুন যখন বনে বনে রঙ চড়ায়, সে রঙে তারো মনে জাগে নেশা। এর পর জ্যৈষ্ঠের বাউল বাতাস আমের তলায় শুকনো পাতাগুলো ওড়ায়, তারো বুকটা শূন্যতায় খা খা করে ওঠে। কলকাতায় বসে কিছুই দেখছে না সে, কিন্তু যখনি ভাবতে বসেছে, মনে হয়েছে তখনি, তাদের গাঁয়ের পাশে পুকুর পাড়ে আপনি-ফোটা ফুলের বনের অস্তরাগ আর উদাস দুপুরের ঝরাপাতার মড়মড় খসখস শব্দ সবই দেখতে ও শুনতে পাচ্ছে। বড় বড় দুতলা তিন তলা বাড়িগুলোর উপর দিয়ে যে আকাশটুকু দেখা যায়, তাতে যখন মেঘ করে আসে, আর আসে একটা হাল্কা হাওয়া, তখন আবু মিয়ার বিশেষ করে মনে পড়ে একটি মানুষের কথা। তাদের আকাশ কত বড়ো তাতে যখন ঈশান কোন আঁধার করে মেঘ জমে, পুকুরের জলে নেমে আসে তার কালো ছায়া, অতটুকু ছোট পুকুরের বুকে এত বড় কালো ছায়া ধরে না বুঝি হায়, সেকি তখন খড়ো-ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় না, আরো কি মনে এমন একটি বড় ছায়া

ধরিধরি করে ও উপচে ওঠে না—সে কি অনেক কথা— বন্দি বিহাঙ্গা গল্পে নানা মানবিক চিত্রকল্প ছোট ছোট প্লটে আখ্যান হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন : "চিঠিটা আবু মিয়ার বুক পকেটেই থাকে। স্টালিনগ্রাদে নাৎসি সৈন্যের অভিযান— তার ফলাফল ঘড়ির কাঁটার মতো দুলছে— আপিসে বসে আবু মিয়া একপিঠ ছাপা প্যাডের কাগজে তারই খবর সংক্ষিপ্ত করে লিখছিল। আগে থেকে ধারণা করা একঘেয়ে খবর। অচেতন মনকে ছেড়ে দিয়ে কেবল হাতে পাওয়া মনটুকু নিয়েও খসখস করে কলম চালানো যায় এ লেখা লিখতে। লেখা খারাপ হয়, লাইন বেঁকে যায়, মাঝে মাঝে শব্দ ছাড় পড়ে। কিন্তু তাতে মারাত্মক কিছু কাণ্ড ঘটে না। কম্পোজিটররা, খারাপ লেখা বোঝার পোকা। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখা কাগজগুলো ডাস্টবিনে ঢোকে বলে লাইন বাঁকা হওয়ার অসম্মান থাকে না। আর ছাড় যাওয়া শব্দগুলিও কম্পোজিটররাই বসিয়ে দিতে পারে। তারও শেষ প্রুফ তো তারই হাতে।" অথবা— 'বারো মাসের ছটা ঋতু আবু মিয়ার মনে ছত্রিশ রকমের চিন্তা বয়ে আনে। অনেক দিনের রাতের টুকরো টুকরো অনেক কথা ভাবে না!" সত্যিই 'বন্দী বিহঙ্গ' দিনের রাতের টুকরো টুকরো কথা। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য লিখছেন : "বন্দী বিহঙ্গাকে বলা যেতে পারে রেখাচিত্রধর্মী ছোট গল্প। রবীন্দ্রনাথের বহুপরিচিত সংজ্ঞার বেশ-কটি বৈশিষ্ট্য এখানে উপস্থিত : "ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখকথা/ নিতান্তই সহজ সরল/ --- নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা/ নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।' ছোটো-ছোটো রেখার আঁচড়ে গল্পকার নিম্নবিত্ত, আবু মিয়ার জীবনসংগ্রামের আভাস দিয়েছেন। এই গল্পে ঘটনা বিরল। অদ্বৈতের অন্বিষ্ট হল আবুর অন্তর্জীবন, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও সুধা শ্যামলিন মরুদ্যানের জন্যে তার আকাঙ্খা নামের মধ্যে যে কাব্যিকতার ছোঁয়া আছে, তা বয়াণের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদে প্রসারিত হয়েছে যেন। গ্রামের নিসর্গ নিবিড় জীবন থেকে জীবিকার তাড়নায় যে কলকাতা মহানগরের রূপ ও বিরুদ্ধ পরিবেশে স্বেচ্ছানির্বাসিত, সেই আবু মিয়াঁর সহজসরল জীবনের 'ছোট ব্যাথা' এই গল্পের উপজীব্য। সম্ভবত গল্পকারের একান্ত নিজস্ব অনুভূতির রঙে রঞ্জিত হয়েছে বন্দী বিহঙের-এর বয়ান। এর প্রাকৃতিক বর্ণনাও নিরাভরণ এবং সারল্যমন্ডিত। তাই গল্পের শেষ পর্যায় কবিতার স্তবকের মতো ইঙ্গিতবাহী। জলরঙের ছবির মতো সরল অথচ জটিলধর্মী।

"আবু মিয়া রুদ্ধ নি:শ্বাসে পড়ে চললো : সেদিন তোমার ছেলে দুটো করলো কি, না একটা পাখি ধরে আনলে। এনে খাঁচায় পুরলো। খাঁচার বন্ধনে পড়ে পাখিটা লাগল ছটফট করতে। খাবে না, নাবে না, কিছু করবে না, খালি খালি ডানা ঝাপটাবে। শেষে তোমার মেয়েটা করল কি, না খাঁচার দরজা খুলে পাখিটাকে ছেড়ে দিল।

জীবনতৃষা'র অদ্বৈত মল্লবর্মণ

আরভিং স্টোন এর বিখ্যাত উপন্যাস 'লাস্ট ফর লাইফ' এর অসাধারণ অনুবাদ। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত বইটি বেস্ট সেলার বই হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। আলোড়ন তুলেছিল। ১৮.৪.১৯৫১ আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয় অদ্বৈতের অনুবাদ করা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই অনুবাদ রচনা তাঁর সাহিত্য অনুধাবনের ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মনে রাখতে হবে তখনও 'তিতাস একটি নদীর নাম' গ্রন্থভুক্ত হয়নি। অচিন্ত্য বিশ্বাস মহাশয়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ ১৯৯৪ সালে বলেছিলেন, তিনি 'লাস্ট ফর লাইফ' (Lust for life) বইটি অদ্বৈত মল্লবর্মণকে পড়তে দিয়েছিলেন এবং অনুবাদ করতে অনুরোধ করেছিলেন। আমরা জানি ১৯৪৯ সালের ১৯ মার্চ থেকে 'দেশ' প্রত্রিকায় জীবনতৃষা প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। ১৯৫০ সালের ২০মে পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

এই অনুবাদের গুণাগুণ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখছেন, "অনুবাদ সম্পর্কে কিছু কথা বলে নেওয়া প্রাসঙ্গিক। প্রথমদিকে অনুবাদ যথাযথ করার চেষ্টা থাকলেও শেষের দিকে দ্রুত করার জন্যই হোক, কর্তৃপক্ষের তাগিদের কারণেই হোক, কিংবা অজ্ঞাত যে কোন কারণেই হোক অনুবাদ করা হয়েছে ছেড়ে ছেড়ে। এসব ক্ষেত্রে বর্তমান ... প্রথম দিকে ফরাসী কিছু শব্দবন্ধ অনুবাদ করার প্রয়াস লক্ষ করি। শেষ দিকে সেরকম শব্দবন্ধ লেখক বাদ দিয়েছেন। ৩০ জুলাই ১৯৪৯ দেশ-এ বিজ্ঞপ্তি হয়— "আগামী সপ্তাহ হইতে শ্রী সতীনাথ ভাদুড়ী কর্তৃক লিখিত উপন্যাস ঢোড়াই চরিত মানস (দ্বিতীয় চরণ) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।"

মনে হয় এই লেখা এসে যাওয়ার পর দ্রুততার সঙ্গে 'জীবনতৃষা' শেষ করা হয়েছে। 'জীবনতৃষা' কখনোই পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়নি।" জীবনতৃষা বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মাইলস্টোন। গ্রন্থ এবং বিষয় নির্বাচন ছিল ব্যতিক্রমী। অনুবাদের গুণও ছিল উঁচুমানের শেষদিকে কিছু অংশ বাদ দিলে। কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়ার অন্য যুক্তিও থাকতে পারে। "ও মশাই ভ্যান গখ, ঘুম কি আপনার ভাঙ্গালো?"

"আজ্ঞে না, জেগে ছিলেন না, এখন জেগেছেন।" তরুণী হাসতে হাসতে বলল। ভ্যান গখ শুনতে পাচ্ছে যে সিঁড়ি দিয়ে সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।"

এরকম সহজ এবং সাবলীল ভাষায় 'জীবনতৃষা' অনুবাদ করেছিলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। মনে রাখতে হবে Lust for life কিন্তু ব্যতিক্রমী উপন্যাস। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র ভ্যান গখ। ভ্যান গখের জীবন সমকালীন সময়েই ব্যতিক্রমী হিসাবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিল। তিনি জীবিত অবস্থায়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি তার সময়ের সেরা ইম্‌প্রেশানিস্ট চিত্রশিল্পী।

যক্ষ্মারোগের সঙ্গে, দারিদ্র্যতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে সারা জীবন যুদ্ধরত, সংগ্রামী শিল্পী ভ্যান গখের সঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিশ্চই প্রাণের একাত্মতা খোঁজে পেয়েছিলেন। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য লিখছেন, "জীবনের বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে সংগ্রামরত শিল্পী ভ্যান গখ এর সঙ্গে নিজের একান্ত নিবিড় আত্মীয়তা নিশ্চয় অনুভব করেছিলেন। কেননা ওই সময়েই ক্রমশ চূড়ান্ত রূপ নিচ্ছিল 'তিতাস' এর জীবন নিংড়ানো পাঠকৃতি। আসন্ন অবসানের আশঙ্কা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা-ভরা আকাঙ্খা অদ্বৈতের সৃষ্টির চেতনাকে অনিবার্য রেখেছিল, যেমনটি ছিল দারিদ্র্য—মালিন্য উন্মাদ রোগের যুদ্ধরত ভ্যান গখ এর ক্ষেত্রেও। এই অনুবাদ কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হওয়ার পরে অদ্বৈত যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সাম্প্রতিক তাত্ত্বিকেরা যে জীবনকে বলেন পাঠকৃতি (Life as Text) এবং পাঠকৃতির মধ্যেও খুঁজে পান তার নিজস্ব জীবন (Text as life) —সে কথা এখানে মনে পড়ে আমাদের।

এই প্রেক্ষিতে আরও একটি তাত্ত্বিক প্রশ্নেরও মীমাংসা হওয়া সম্ভব। সার্থক অনুবাদকে মৌলিক রচনার গুরুত্ব দেওয়া যায় কিনা, এ নিয়ে সমালোচকদের অভিমত দ্বিধাবিভক্ত। কিন্তু 'জীবনতৃষা'য় Lust for life — এর সাবলীল ও সৃজনশীল ভাষান্তর সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে মৌলিক প্রতিবেদনের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিজীবনের উপলব্ধি অনুরণিত হয়েছে অনন্য স্রষ্টা ভ্যান গখ এর জীবনবৃত্তান্তের অনুষঙ্গে। তাই অদ্বৈতের স্রষ্টা চক্ষুতে দুই সমান্তরাল জীবনের (উদ্দীষ্ট চিত্রশিল্পীও গ্রহীতা অনুবাদক) আশ্চর্য ঐক্য প্রতীতি উন্মোচিত হয়েছে।"

এ প্রসঙ্গে শান্তনু কায়সার লিখছেন, "যে ভ্যান গখের জীবন নিয়ে লাস্ট ফর লাইফ লেখা, তার প্রসঙ্গে ডাক্তার প্যাচেট বলেন : 'All Artists are crazy. That's the best

thing about them. I love them that way. I Sometimes wish I could be crazy myself ! 'No excellent soul is exempt from a mixture of madness !' Do you know who said that ! Aristotle, that's who' কিন্তু শিল্পী যখন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তখন তাঁর ভাই থিয়ো ডাক্তারকে স্মরণ করিয়ে দেয় : "I know, Doctor, but he is a youngman, only thirty seven. The best part of life is still befor him". একথা থেকে বুঝা যাচ্ছে অদ্বৈত মল্লবর্মণ আর ভ্যান গখ যেন একই তরণীর যাত্রী। অন্তর্গত রক্তের ভেতর দুজনেরই একই বোধ খেলা করে। বোধের কেন্দ্রিয় ভাবনা একই। "He could do without a wife, a home and children : he could do without love friendship and health; he could do without security, comfort and food ; he could do even without God. But he could do not do without something which was greater than himself. Which was his life--the power and ability to create---. He will never die. His love is genius. The great beauty he has created will go on for ever---I look at his paintings and bind there a new faith, a new meaning of life' --- He fell a martyr to his love of art." ঐ বোধকে ভিত্তি করে তপোধীর ভট্টাচার্য বলছেন, "এই অসামান্য উপলব্ধি সঞ্চার করে বলেই অদ্বৈতের জীবনতৃষা নিছক অনুবাদ এর গন্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, হয়ে ওঠে তাঁর সৃষ্টিজীবনেরই আলেখ্য।"

আলেখ্য বলেই জীবনের সব আখ্যান উঠে এসেছে। যেমন "---কিন্তু আমার সেই প্রেম নষ্ট করে দিয়েছিল ওরাই। এর কারণ আমি জানি না। আমি যা চেয়েছি ওরা তা নষ্ট করে দিয়েছে। এই আমার জীবনের ইতিহাস। শহরে গিয়ে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত করেছি কিন্তু ওরা আমাকে যেতে দেয়নি। আমি পড়তে চেয়েছি, কিন্তু ভাল বই বাড়িতে আনতে দেয়নি। কোন ভদ্রলোককে বাড়িতে নেমন্তন্ন করলে, তাঁর সম্বন্ধে ওরা অজস্র অপবাদ ছড়িয়েছে। আমি জীবনটাকে সফল করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কোনটাই পারিনি। ওদের বাইরে আমি যেতে পারব না। ওরা যা ভাবে বা যেভাবে চলে আমাকেও তাই ভাবতে হবে, সে ভাবেই চলতে হবে।" নিজের জীবনের বোধ, অনুভব, অভিজ্ঞতা এবং নির্যাসের রসায়ণ ব্যবহার করে জীবনতৃষা অনুবাদ সাহিত্য নির্মাণ করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

শাদা হাওয়ার অদ্বৈত মল্লবর্মণ

"১৯৪২ ইংরাজী সাল।

কলিকাতায় বিস্তর টমি এসেছে। অনেক, অজস্র, অসংখ্য। কতক এসেছে বিভিন্ন রণাঙ্গণ থেকে, বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে। বাদবাকী সব এসেছে খাস বিলাতের মাটি থেকে; আনকোরা, নেমে এসেছে জাহাজ থেকে।

বাংলাদেশ বিজাতীয় বহি:শত্রুর আক্রমণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারই বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়াবার জন্য টমিদের এই বিরাট প্রাদুর্ভাব।

বাংলায় বাঙালীর শ্রেণী তিনটি : দাম-কমে যাওয়া বিত্তের গৌরব-গর্বে স্ফীতবান তালুকদার জমিদার, মধ্যবিত্ত নামধেয় বিত্তহীন কেরাণী বর্গ, আর দধিচী চাষী-মজুর শ্রেণী। প্রথমোক্ত শ্রেণী নইলে প্রমোদের জীর্ণদশায় জের টেনে বিলাস করবে কে, মধ্য ভোক্তেরা নইলে সরকারী চাকরি বজায় রেখে এডমিনিস্ট্রেশন চালাবে কে? আর শেযোক্ত শ্রেণী নইলে এক্সপ্লয়েটেড হবে কে? দেশের আসলে যারা দেশবাসী, তাদের নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম নির্ধারিত রয়েছে।

দেশরক্ষার কাজ এদের দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না। যারা অনেক দেশ রক্ষা এবং গ্রহণ দু-ই করেছে তারা এসব বিষয়ে ঝানু লোক। এদেশ রক্ষা করার দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করে তারা এসেছে। তারা বিলাতি টমি। রাইফেল বাগিয়ে, সঙ্গীন উঁচিয়ে, কামান দেগে আর

বিমান উড়িয়ে এরা এদেশ রক্ষা করবে। এত সব কাজ এদের করতে হবে। আর, কে না জানে এসব কাজ বাঙ্গালীর কর্ম নয়। ধুতি পাঞ্জাবী পরে, টেঁকুর তুলে, পান চিবুতে চিবুতে একখানা আনন্দবাজার হাতে করে ট্রামে চড়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে চাকুরি করা যায়। কিন্তু এ দেশ রক্ষা করা যায় না। দেশ রক্ষা করতে হলে যুদ্ধ করতে হয় এবং এই যুদ্ধই করতে এসেছে এই টমিরা। এদের সাম্রাজ্য রক্ষা আর আমাদের দেশটিকে রক্ষা দুই কাজই একই সঙ্গে এরা করে ফেলবে। এক ঢিলে দুই পাখী মারার মত। কিংবা এককালীন উভয়-দণ্ড ভোগ করার মত। এরকম অনেক দাগ দেবার মত কথা সংবাদপত্রে পাঠ করতাম। সকালে পাঠ করতাম, আর অফিস যাবার পথে ভুলে যেতাম। ভুলতাম না কেবল ঐ দুই আখরের টমি কথাটা।"

এই হল অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'শাদা হাওয়া' উপন্যাসের ভাষা এবং চিন্তাতাত্ত্বিক গঠন পদ্ধতি, বুনন পদ্ধতি। 'সোনার তরী' নামক সাহিত্য সাময়িকীর শারদ সংখ্যায় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়। প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল 'শাদা হাওয়া' উপন্যাসটি। বিপ্লব মাঝি যিনি অদ্বৈত মল্লবর্মণের চেতনাকে ছুঁয়ে বড় হয়েছেন আবিষ্কার করেছেন 'শাদা হাওয়া'। প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। অচিন্ত্য বিশ্বাসের সম্পাদনায় 'বৃন্দবাক প্রকাশনা' প্রকাশ করে। অচিন্ত্য বিশ্বাস তার সম্পাদিত 'শাদা হাওয়া' উপন্যাস গ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন অধ্যাপক শান্তনু কায়সার, 'ভাসমান' এর সম্পাদক সুশান্ত হালদার, রণবীর সিংহবর্মণ, মনোহর বিশ্বাস এবং অনিল সরকারকে। 'শাদা হাওয়া' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় ইউরোপীয়ান চিন্তাপদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত তৃতীয় দুনিয়ার দেশের জীবনসমস্যার স্বরূপ এবং রূপের বিনির্মাণ। আমরা দেখেছি 'ভারতের চিঠি—পার্ল বাক-কে' এই কথনেও একই ঢঙের বক্তব্য সংস্থাপিত হয়েছিল। 'শাদা হাওয়া' আখ্যানে অদ্বৈত মল্লবর্মণ চারভাগে ভাগ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে ব্যাখা করতে এক পটভূমি তৈরি করেছিলেন। অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখছেন, "ভাবাদর্শটাই এখানে প্রধান হয়েছে—কাহিনী কেবল যোজকের কাজ করেছে। চারটি ভাগে বিভক্ত পরিস্থিতি তখন—প্রতিমুখ সন্ধিতে দণ্ডায়মান। (১) দেশীয় স্বাধীনতাকামী শক্তি, যারা আন্দোলনকে তীব্র করতে চান। (২) দেশীয় স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি; যারা ব্রিটিশ সরকারের হয়ে কাজ করাকেই চরিতার্থতা ভাবছেন। (৩) *সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, যারা ভাবছে এই যুদ্ধে জেতার জন্য যতটা দরকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাক।* (৪) *সাম্রাজ্যবাদকে যারা পরোক্ষে প্রয়োগের পক্ষপাতী।* মৌখিকভাবে অন্তত যারা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সমর্থক—এই চারটি মৌল প্রবণতার চারটি চরিত্র এই উপন্যাসে-র উপজীব্য। বিনয় বাগচী, গোবিন্দ শর্মা, টমজিল, দুজন বিদেশীকে নিয়ে, সৈনিক-মনের আন্তরিক পরিচয় দিতে পেরেছেন অদ্বৈত। বৃটিশ আর মার্কিন মনের পার্থক্য ফুটেছে চমৎকার। সেদিক থেকে বিচার করলে — 'শাদা হাওয়া' অদ্বৈত প্রতিভার সুন্দর প্রকাশ। উপন্যাসের শেষে একটি তারিখ প্রদত্ত। ১৯.১২.৪২ ইং। ধারণা, এটি রচনা তারিখ। ১৯৪৮-এ প্রকাশ পেলেও অদ্বৈত এ লেখা আর দেখেননি — পাল্টাবার কথা

ভাবেননি। উপন্যাসের বিষয়বস্তু খেয়াল করলে বোঝা যায় ১৯৪২ এর ৯ আগষ্ট-এর পর সারা দেশ জুড়ে তুমুল ভারত ছাড়ো আন্দোলন-এ কাহিনীর পটভূমিটি গড়ে তুলেছে। ১৯৪১ এর ২২ জুনের পর যখন বিশ্বযুদ্ধের মৌল চরিত্র বদলে গেছে — যখন থেকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধের চেহারা পেয়েছে, তখনকার যুগ বাস্তবতা অনেকটাই আন্তর্জাতিক মন নিয়ে দেখার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন অদ্বৈত। সাহসী, পরীক্ষামূলক — নাগরিক পটভূমিতে লেখা প্রতীকধর্মী এই উপন্যাস। বহুক্ষেত্রেই যুগাতিশায়ী। 'শাদা হাওয়া' আবিষ্কারের পূর্বে মনে করা হতো কেবলমাত্র 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসেরই সৃষ্টি করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। 'শাদা হাওয়া' উপন্যাসটি পাঠ এবং পুন:পাঠের পর মনে হয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃখ করে যে কথা বলেছিলেন তা কতোটা সত্য। তিনি বলেছিলেন, "তাহার অকালমৃত্যু বাংলা উপন্যাসের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ অধ্যায়ের সংযোজনপথ অবরুদ্ধ করার জন্য আমাদের মনে গভীর ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে।" অচিন্ত্য বিশ্বাসের ভাষায়— 'শাদা হাওয়া' অদ্বৈতের সাহিত্য প্রতিভার শিরোপায় যুক্ত করছে আরও একটি উজ্জ্বল পালক, অদ্বৈত মল্লবর্মণ কখনই একমাত্রিক লেখক নন। তিনি শুধুমাত্র নিজের গোষ্ঠীর জীবনভাষাই রচনা করেননি। লেখক হিসাবে তাঁর সামর্থ্য বিন্দুমাত্র নয়; পাশাপাশি যাঁরা খ্যাতির শিখরে উঠে গেছেন, সমসাময়িক সেই সব লেখকদের অনেকের চেয়ে তিনি ছিলেন অনেক গভীর ও ব্যাপক অনুসন্ধিৎসু। তিনি ছিলেন অনেক বড় মাপের লেখক। শাদা হাওয়ার বিষয়বস্তুতে আছে অভিনবত্বের দোলা, রচনারীতিতে আছে সংহত পরিকল্পনার ছাপ, নাটকীয় বর্ণনার অভিজাত, চরিত্র চিত্রণের কৌশল আর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রবাহকে আয়ত্ত করার ক্ষমতায় 'শাদা হাওয়া' হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস। এতে আছে মননশীলতার অন্তর্ভেদী জীবন দর্শন।

এ রচনায় তিনি ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' বা 'মোহনা'; গোপাল হালদারের 'একদা' বা সতীনাথ ভাদুরীর 'জাগরী'-র সিদ্ধিকে স্পর্শ করার দাবি রেখেছেন। 'শাদা হাওয়া' যেভাবে ১৯৪২ এর আর্থ-সামাজিক ও আর্থ- রাজনৈতিক পটভূমিকে তুলে ধরেছে, তুলে ধরেছ যুদ্ধকে, স্বাধীনতা আন্দোলনকে – তা একজন দক্ষ ঔপন্যাসিকের সমাজসচেতনতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। শাদা হাওয়ায় বিষয়বস্তুর পাশাপাশি চরিত্র নির্মাণের ঢঙও চমকপ্রদ। অচিন্ত্য বিশ্বাস বলছেন, "এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্বের দুজন ফৌজ-এর চরিত্র ও তাদের টানাপোড়েন, ব্যবহার, ক্ষুদ্রতা, মহত্ত্ব, কলকাতা শহরের বদলে যাওয়া পরিবেশ সর্বোপরি বিশ্বরাজনীতির পটভূমিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাষ্য ধরা পড়ল।" ফৌজ দুজন যথাক্রমে টম আর জীল। বৈপরীত্যের বিচিত্র সম্ভারে উজ্জ্বল তারা। মিত্রশক্তির বাহিনীতে সম্ভাব্য জাপ আক্রমণ বুখতে এই দুই ফৌজের কলকাতা আগমন।

এদের মনস্তত্ত্ব অদ্বৈত মল্লবর্মণের কাছে ছিল পরিষ্কার। টমিদের কথা লিখতে গিয়ে তিনি লিখছেন উপন্যাসে — "ভুলতাম না কেবল ঐ দুই আখরের টমি কথাটা। না ভুলবার

কারণ পন্ডিতীভাষায় এই বলা চলে যে, এরা সর্বত্র পরিদৃশ্যমান। ছোটবড়ো রাস্তায়, যাবতীয় অলিগলিতে, দিনদুপুরে রাত-বেরাতে ঘুরে বেড়ায় সাহেব পাড়ার সিনেমা — থিয়েটারের কোন ছবি বা নাটক বাদ দেয় না। শ্বেত তরুণীদের যোগাড় করে রেস্তোরাঁয় যা খুশী খায়। দেখে মনে হয় এরা মানব নয়। হয় মানবাতীত নয় তো বোকার আকিঞ্চন এরা। অকিঞ্চিৎকর এদের জীবন। খালি মারা আর মরার প্রয়োজনে এদের গড়ে তোলা হয়েছে। হিটলারের দেশের হলে বলা যেত প্রজনিত করা হয়েছে। রক্তারক্তি আর অগ্নিকান্ডের বাইরের সৃষ্টিধর্মী কোন-কিছু এই বিপুল জন-বাহিনীর যেন অধিকার-বহির্ভূত।" এই মনস্তত্ব আবিষ্কার করেছে গোয়েন্দা গোবিন্দ শর্মা। তার মন নিজের অজ্ঞাতে দার্শনিক হয়ে উঠেছিলো।

তার দার্শনিক মন আরো ভাবছে "মরতে কেন এরা যুদ্ধ করে। দুনিয়ার সব সৈন্য এক-আমাদের দাবীদাওয়া আশা-কামনা সুখ দুঃখ এক। আমরা সব সৈন্য ভাই ভাই। আমরা দুনিয়ার সবচাইতে সর্বহারা— সবার চেয়ে বেশী এক্স্‌প্লয়েটেড্‌। যুদ্ধ করে কেবল ভাই ভাইকে মারছি আর ভাইয়ের হাতে মরছি। অন্য কেউ তো মরছে না। এবার আমাদের ভুল ভেঙ্গেছে।"

এভাবে মজা ও সিরিয়াস কথা মিলিয়ে তিনি এক সামাজিক দ্বন্দের যুগলবন্দি তৈরি করছেন 'শাদা হাওয়া' উপন্যাসে। সিরিয়াস উপন্যাসে কিভাবে বিনোদনের আফিম মিশিয়ে পাঠককে টানটান রাখতে হয় তা জানতেন। শাদা হাওয়ার প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ পর্যায়ে তিনি লিখছেন, "জীলকে টম ভালোবাসতো সব চেয়ে বেশি। গোবিন্দ ইত্যাদি লোকের সঙ্গে তার ভালোবাসা ছিল কৃপামিশ্রিত। তা ছিল ঠিক অনুকম্পারই নামান্তর। সিনেমা দেখিয়ে, রেস্তোরাঁয় খাইয়ে দিনের ভালোবাসা শেষ হয়ে যেত। কিন্তু জীলের সঙ্গে তার যে ভালোবাসা জন্মেছিল, তা একেবারে খাঁটি প্রণয়। পানভোজন আর সিনেমার পরেই তা মন্দীভূত হয়ে আসতো না। বিদায় গ্রহণের পর শয্যা গ্রহণ পর্যন্ত জীলের কথা মনে থাকতো। বস্তুত জীলের কথাগুলো তার ভালই লাগতো। খুব বেশি পড়াশোনা না করলেও জানবার উগ্র আকাঙ্ক্ষা তার ছিল। উত্তম ছাত্রের যা গুণ, তাঁর সবই জীলের মধ্যে ছিল। ছিল না একটা জিনিষ। টমের সাম্রাজ্যবাদী মনের অহমিকাটুকু কথায় কথায় প্রকাশ হয়ে পড়তো, জীলকে সেইটা বড়ই পীড়া দিত।" অদ্বৈত মল্লবর্মণ এখানে সাম্রাজ্যবাদী অহমিকার বিরুদ্ধে সরাসরি কথা বলছেন।

অনেকে বলার চেষ্টা করেছেন নানা জায়গায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন একটি সুনির্দিষ্ট চেতনার লেখক। 'শাদা হাওয়া' পাঠ-পুন:পাঠ এবং বিনির্মাণ -এর পর একথা কোনভাবেই কারও পক্ষে মনে হওয়া সম্ভব নয়। 'শাদা হাওয়া' সমকালীন গণমানস ও ফ্যাসিবাদ, গণমানস ও সাম্রাজ্যবাদ, এবং গণমানস ও যুদ্ধ এই তিনটি দ্বিপাক্ষিক বন্ধনকে মনস্তাত্বিকভাবে জলরঙের ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছে। এই বিষয়টি বাংলা সাহিত্যে নতুন আঙ্গিকে, নতুন ভাষায়

একটি উজ্জ্বল সংযোজন। অভিনব সব চরিত্রের রসায়ন হাজির করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'শাদা হাওয়া' উপন্যাসে। "মেথামেটিক্স ইনস্ট্রুমেন্টের কারখানায় কাজ করা গৌরাঙ্গ আর অন্য একটি মোটর সারাই কারখানার শ্রমিক সুনীল এর মধ্যে কথোপকথন চলছে — এমন সময় গৌরাঙ্গ চকমকি ঠুকে বিড়ি ধরায়। বলে "যুদ্ধ শালাও থামবে না আর ম্যাচিস শালারও দাম কমবে না।"

"ওড়িয়াদের দ্বারা পরিচালিত 'হফকফ' চায়ের দোকান, যেখানে দৈন্যের সবরকম শাখা প্রশাখার কস নিঙরে 'ইতরতা বাসা বেঁধেছে'। যেটাকে তার মনে হল ফিফ্‌থ কলামিস্টদের আড্ডা।"

"পথের মানুষ একজনের সঙ্গে গান্ধী আর এম.এন.রায় সম্পর্কে প্রশ্ন করে জানল গোবিন্দ। প্রথমজন তার কাছে 'বুড়ো' আর 'ভণ্ড', দ্বিতীয়জন 'ঠিক যেন এঞ্জেল'! এরপর মানুষটি এক লাফে সরে যায় ফুটপাত থেকে — ভীত, সন্ত্রস্ত।"

এভাবে গৌরাঙ্গ, গোবিন্দদের পাশাপাশি অচিন্ত্য, মতিলাল, কান্তগোপাল দীর্ঘাঙ্গী, ধনপতি দাস, ললিত পাকড়াসী বা হরিদাস প্রামাণিকরা এক একটি উজ্জ্বল ঢঙের চিন্তাবৃত্ত তৈরি করেছে আমাদের জন্য। সমকালীন সময়ের চিত্রকল্পও উঠিয়ে এনেছেন তারা।

'শাদা হাওয়া' উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ ১৯৪১-৪২ সালের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের চিত্রকল্প তুলে আনতে গিয়ে— কমিউনিষ্ট পার্টির তৎকালীন অবস্থান যেমন পরিষ্কারভাবে দেখানোর প্রয়াস নিয়েছিলেন, তেমনি দেখিয়েছিলেন — ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনের দিশেহারা অবস্থার চিত্রকল্প।

'শাদা হাওয়া' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র শ্রমিকনেতা বিনয় বাগচী একটি নির্দিষ্ট সময়ের শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও চরিত্রকে চিহ্নিত করে।

অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখছেন : বিনয় বাগচীর ভাবাদর্শ লক্ষ করলে মনে হয় ইনি কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিস্ট। অদ্বৈতের সঙ্গে বিশেষত কমিউনিস্টদের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর পুস্তক সংগ্রহ যেটুকু আমরা দেখতে পেয়েছি তাতে এই যোগাযোগের পরিচয় মিলবে। বিশেষ করে তখনকার দিনে সুবোধ চৌধুরী পরিচালিত পুঁথিঘর ছিল বামপন্থীদের আড্ডা, বলেছেন পুঁথিঘর প্রকাশকারীর স্বত্বাধিকারী, ১৮.১০.৯৪ তারিখে—"১৯৪০-৫০ সালে সেটাই ছিল বামপন্থীদের বিশিষ্ট প্রকাশন সংস্থা।"

অদ্বৈতের পুস্তক সংগ্রহের তালিকা থেকেও অদ্বৈতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আগ্রহের রূপরেখা পাওয়া যায়। তাঁর পুস্তক ভাণ্ডারে পাওয়া গেছে— (১) লেনিনের কথা : গোর্কি (লতিকা চক্রবর্ত্তী অনুদিত) (২) চীনে ইতিহাসের ধারা : অমর সান্যাল (৩) সোভিয়েত ইউনিয়ন : রেবতী বর্মণ (৪) বিপ্লবী স্টালিন ও রুশিয়া - ক্ষিরোদ কুমার দত্ত (৫) সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা : ভিয়ানা লেভিন (৬) মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র : কস্তুরচাঁদ লালুআনি (৭) গান্ধী ও

স্টালিন : লুই ফিশার (৮) আমার জীবন : চেখভ (৯) চীন দেখে এলাম : মনোজ বসু (১০) বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ : রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১১) Marxism and National Question : Stalin Selected works of Lenin vol II-VI (১২) India From Primitive Communism : SA Dange প্রভৃতি।

তাঁর 'শাদা হাওয়া' উপন্যাসের নায়ক বিনয় বাগচী ছিলেন বাগ্মী, তাত্ত্বিক এবং লেখকও বটে। উপন্যাসের ভাষায় "সাদা ধবধবে খদ্দর পরা। মাথায় গান্ধী ক্যাপ, চেহারাটি খাসা। আত্মসমাহিতভাব। আর তার বক্তৃতাও জাদুকরী। কায়দা করে বলার ভঙ্গিটা আয়ত্ত করেছে, তাই মজুরদের ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছে। ও যেন এক বজ্জাত শিশু, আর মজুরেরা পুতুল সব। — বলছে বিশ্বের মজুরেরা এক হও। —।" বিনয় বাগচীর অবস্থানের মধ্য দিয়ে আমরা মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের চরিত্র অবলোকন করতে পারি। মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের চরিত্র নিয়ে সন্দেহ থাকলেও আন্দোলনের তীব্রতা নিয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি লিখছেন — "কালো হাতী নড়ে উঠেছে। দিকবিদিকে লাখো বুভুক্ষু মানুষেরা বিক্ষুব্ধ ফেনায়িত হয়ে এলোমোলোভাবে এগিয়ে আসছে— সশস্ত্র, সুশৃঙ্খল সামরিকতার সামনে। বুভুক্ষুর এ প্রেতায়িত অভিযান বজ্রপতনেব মতো আকস্মিক, সাগর তরঙ্গের মতো দুর্বার।" উপন্যাসের সময়ের চিত্রকল্প অসাধারণভাবে চরিত্র সহ সংস্থাপিত করেছেন ঔপন্যাসিক।

এ উপন্যাস বহন করেছে ইতিহাসের গোলমাল, জটিলতা, অমীমাংসিত প্রশ্ন এবং অসমাহিত সমস্যাগুলি। এই উপন্যাস নিজেই চরিত্র হয়ে দেখেছে "ফ্যাসিসবাদ গলছে। সাম্রাজ্যবাদ গলছে। গলে গলে ক্ষয়ে পড়ছে। - সেদিন আর দূরে নয়।" কেন দূরে নয় মীমাংসা হিসাবে - অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'শাদা হাওয়া' উপন্যাসে যে চিন্তাসূত্র সংস্থাপিত করছেন তা নিম্নরূপ - "এরা বামপন্থী। কিন্তু ভারতীয় কংগ্রেসের - এরা সব ছোট ছোট খুঁটি। কংগ্রেস প্রত্যক্ষভাবে দেখে শক্তি সঞ্চিত করেছে। এরা ভেতরে ভেতরে সাম্রাজ্যবাদে ফাটল ধরিয়েছে। শ্রমিকদের জাগিয়েছে, জাগিয়েছে সর্বহারাদের। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধেই কেবল নয়, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে এরা জাগিয়েছে গণচেতনা।

এভাবেই ইতিহাস, সময়, সময়ের চরিত্র একক ব্যক্তি এবং তাদের নানাবিধ সংকটকে—দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

‘রাঙামাটি’-র অদ্বৈত মল্লবর্মণ

“রাঙামাটি ও তার চারপাশের গ্রামের কাঁকরে রাঙামাটির উপর দিয়ে তখন সবুজের বান বয়ে চলেছে। সবুজ শুধু সবুজ। আখের ক্ষেতের গাঢ় সবুজের সঙ্গো ধান ক্ষেতের দিগন্তবিস্তৃত ঈষৎ হরিদ্রাভ সবুজ সমুদ্রের আনন্দে মিলন। কপি ক্ষেতের সাদা কালো আভাবিশিষ্ট সবুজের সঙ্গো আলু, মূলা, বেগুনের সবুজ তরঙ্গ মিলে এক হয়ে গেছে। চক্ষুকে বিশ্রাম দেবার জন্যই যেন জলাশয়ের স্বচ্ছ সলিল কৃষিলক্ষ্মীর কৃষ্ণ চক্ষুর মত উন্মীলিত হয়ে রয়েছে। কোন কোন স্থানে হরিদ্রা বর্ণের অসংখ্য সরিষার ফুল তার গলার সোনার হারের মত শোভা পাচ্ছে। ললিত চমৎকৃত হলেন। কোথায়ও একটুখানি অনাবাদী জমি নেই। পথঘাট ঝরঝরে, গ্রামের পুকুর সুসংস্কৃত, ডোবা বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। পল্লীর প্রত্যেকটি গৃহ পরিষ্কার, তকতকে, ঝকঝকে। ললিত বাঙলার বহুস্থানে ঘুরছেন, কিন্তু কোথাও এমনটি দেখেননি। অথচ শুনেছিলেন যে, এ জেলার মাটি নাকি অত্যন্ত অনুর্বর, অনাবৃষ্টির জন্য প্রায় প্রত্যেক বৎসরই দুর্ভিক্ষ হয়ে থাকে। বললেন, “তুমি অসাধ্য সাধন করেছ হরগোবিন্দ। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের স্বপ্নকে সত্য করেছ। পল্লীর সমস্ত দলাদলি হিংসা দ্বেষ দূর করে তার মধ্যে এমনি সাম্য আনা, এমনি শ্রী দেওয়া যেতে পারে তা তোমার এ জমিদারী না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। শুনেছি জাপানে নাকি উগানমুরা নামে এক পল্লী আছে। তারই সঙ্গো মাত্র তোমার এই জমিদারীর তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু জাপানে সেই পল্লী একটা পল্লীমাত্র, মাত্র ছ’শ ঘর লোকের বাস সেখানে। কিন্তু তোমার কীর্তি তোমার

বিরাট জমিদারিকে ব্যাপ্ত করে জাপানকে তুমি ছাড়িয়ে গেছ। বুঝতে পারছি না। আমাদের দেশের এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও তুমি এ সম্ভব করলে কি করে?"

'রাঙামাটি' উপন্যাসের অংশবিশেষ। 'রাঙামাটি' উপন্যাস প্রথম গ্রন্থ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৯৭ সালে। প্রকাশ করে, 'বৃন্দবাক প্রকাশনী'। এর কিছুকাল পরে 'পুঁথিঘর' প্রকাশনী 'রাঙামাটি' গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করে। 'রাঙামাটি' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল একটি লিটল ম্যাগাজিনে। লিটল ম্যাগাজিনটির নাম 'চতুষ্কোণ'। সম্পাদক ছিলেন শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী জানিয়েছিলেন প্রসঙ্গক্রমে — "রাঙামাটির পাণ্ডুলিপি ছিল 'নবশক্তি'র ম্যানেজার লালমোহন দত্তের কাছে। তবে এই বিষয়ে অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখেছেন, "চতুষ্কোণ এর সম্পাদক প্রয়াত শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী জানিয়েছেন 'রাঙামাটি'র পাণ্ডুলিপি ছিল নবশক্তির ম্যানেজার লালমোহন দত্তের কাছে। এই তথ্য পাচ্ছি শ্রী বিশ্বজিৎ সরকারের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত গবেষণামূলক নিবন্ধতে (১৬.১.১৯৯৪ তারিখে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে জমা দিয়েছেন)। বৃন্দবাক সংস্করণে চক্রবর্ত্তীর মন্তব্যে এই সাক্ষ্য যথাযথ বলে ধরেছিলাম। তবে নতুন একটি সংবাদ পাওয়ার পর শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর উক্তি যথাযথ কিনা তাতে সামান্য সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। 'নবশক্তি' বন্ধ হয়ে যায় ১৯৪১ সালে। সুতরাং এই বইটি তার আগেকার লেখা হবার সম্ভাবনা। বৃন্দবাক সংস্করণে লিখেছিলাম ১৯৩৮-১৯৪১ এই সময় সীমায়, যখন অদ্বৈত 'নবশক্তি' সম্পাদনা করেছেন তখন লেখা হয় 'রাঙামাটি'। আমার অনুমানের ভিত্তি ছিল তিনটি।

১) 'রাঙামাটিতে' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত নেই।

২) জাপানের একটি আদর্শ গ্রাম উগানমুরা-র কথা লন্ডনের ইলাস্ট্রেটেড উইকলিতে প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ পাই নবকুমারের ইঙ্গিতে।

৩) হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় রাশিয়া ও জাপানে গিয়ে কৃষিপদ্ধতি শিক্ষা করেছেন — এরকম সংবাদ আছে রাঙামাটিতে। ১৯৩৭ সালে রাশিয়ায় যৌথ কৃষির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। History of the Communist Party of the Soviet union / Bolsheviks — এ এই যৌথ কর্ম সম্পর্কে সংবাদ পাওয়া যায়। History of the CPSU — বইখানা ভারতে এসেছিল। প্রকাশকাল ১৯৩৮। 'রাঙামাটি' ১৯৪৩-এর আগে লেখা নয়, তার একটি প্রমাণ পাওয়া গেল 'পূর্বাশা চতুর্থ আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র' গ্রন্থের এই সংবাদে। আমরা মডেল ফার্ম এন্ড ইন্ডাস্ট্রি লি: এর কথা বলছি। ১৯৪৩ সালের ১৯ মে তারিখে এই কোম্পানি রেজিস্ট্রি হয়, ৫০ এর মন্বন্তরের ৩-৪ মাস পূর্বেই। (পূর্বাশা চতুর্থ আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র'! সত্য প্রসন্ন দত্ত। দীপঙ্কর প্রেস, আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা -৯, ৮৪ পৃ.) মডেল ফার্ম দেশের নানাস্থানে জমি খরিদ করে, বিভিন্ন অঞ্চলে যৌথ কৃষি উদ্যোগ গড়ে তুলতে চায়।

সত্যপ্রসন্ন লিখছেন : "৫০-এর মন্বন্তর মডেল ফার্মের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। খাদ্যাভাবে লোক না খেয়ে মরছে, অথচ হাজার হাজার একর পতিত জমি মূলধনের অভাবে

সংস্কার হয় না।' (ঐ, ৮৫ পৃ:) কিছুদিনের মধ্যে মডেল ফার্ম নানাভাবে কার্যকলাপ ছড়িয়ে দেয়। ৫৪ গনেশচন্দ্র এ্যাভিনিউর দোতলায় কার্যালয় গড়ে ওঠে। ট্রাক্টর কেনা হয় তিনটি। মাটিকাটার স্ক্রেপার, বুলডোজার, তাছাড়া ছিল বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি। (ঐ, ৮৭ পৃ)। এই বিবরণের সঙ্গো 'রাঙামাটি'র কৃষি উদ্যোগকে মিলিয়ে নিলে বলতে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না। 'রাঙামাটি'র যৌথ কৃষির উদ্যোগের ভিত্তি হল 'মডেল ফার্ম'। বলে রাখি মডেল ফার্ম- এর কোম্পানি কর্মারম্ভের সার্টিফিকেট [Commencement Certificate] পায় ১৯৪৫ সালের মে মাসে। (ঐ, ৮৬ পৃ.)। সুতরাং 'রাঙামাটি' রচনার উৎসে এই উদ্যোগের চিত্রপট আছে এবং উপন্যাসটি নিশ্চয় ১৯৪৩-১৯৪৫ এর কোন এক সময়েই লেখা হয়।

রেণুকা চরিত্রটির সঙ্গো উক্ত কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তের সামান্য মিল থাকা সম্ভব। খুব সম্ভব অদ্বৈত মল্লবর্মণ এই উদ্যোগের আয়োজনটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'রাঙামাটি' ছিল মডেল ফার্মের পরিকল্পনাটির সাহিত্যিক রূপায়ন। ক্যাপটেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গো পূর্বাশা কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং এর সূত্রে এই উদ্যোগ আয়োজনের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিশ্চয় এই গোষ্ঠীর সঙ্গো পরিচিত ছিলেন।"

যাই হোক 'রাঙামাটি' উপন্যাসটির গুরুত্ব নানাভাবে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনে প্রাসঙ্গিক। প্রথমত: অদ্বৈত মল্লবর্মণের কথাসাহিত্যের প্রস্তুতিপর্বের লেখা হলেও লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিষয় নির্বাচন অসাধারণ। নাগরিক জীবনের ছদ্মজগতকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ চিহ্নিত করলেন। কথা সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত করলেন। 'রাঙামাটি' উপন্যাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য লিখছেন, "রাঙামাটি'র গুরুত্ব চরিত্র পরিকল্পনার জন্য নয়, বিষয়বস্তুর জন্যেও নয়, নয় রচনা নৈপুন্যের জন্যেও। প্রতীচ্যাগত আধুনিকতা ও মলাটসর্বস্ব সভ্যতার শ্লেষাত্মক উপস্থাপনা এবং বিকল্প পন্থা হিসাবে প্রকৃতায়নের ইশারা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই তার গুরুত্ব। পল্লী পুনর্গঠনের প্রেরণাকে নবকুমার-রেণুকার সম্পর্ক বিন্যাসে সম্পৃক্ত করে ঔপন্যাসিক অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

'ছায়াঘেরা পল্লীর সজলতা' যে ভোলেননি লেখক এবং সেই সঙ্গো মেনে নেননি ক্ষমাহীন নাগরিক রুক্ষতার ধূসর রণের আগুনে জ্বলে যাওয়াও – এইটুকু স্পষ্ট।"

'রাঙামাটি' উপন্যাসের চরিত্র নবকুমার, রেণুকা, ললিত মুখুজ্জে, হরগোবিন্দ, মনোরমা, বিনয়েন্দ্র, জ্ঞানদা, হীরন, বিজনেশ প্রত্যেকেই রাঙামাটির পথে ভিতরে ভিতরে হাঁটতে চাইলেও কেন যেন ক্লান্ত। মাঝে মাঝে কবিতার কথা খোঁজে। অতুল প্রসাদের কথায় গানটি খুবই প্রাসঙ্গিক।

"ওগো সাথী মম সাথী আমি সেই পথে
যাব সাথে ——
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ
তিলক সাথে
আমি সেই পথে যাব সাথে।"

এই গান শেষ হলে রেণুকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, "চমৎকার। এমন সুন্দর গান আমি খুবই কম শুনেছি। কী সুন্দর কথাগুলি। সত্য বলছি আপনাকে, ভালো গান আর কবিতা মানুষের চিত্ত বিনোদন যেমন করতে পারে অমন কিছুতেই নয়। বিজনেশ কিছু না বলে চুপ করে রইলো। তারপর যখন বুঝল এতক্ষণ হয়ত রেণুকার গানের মোহ কেটেছে তখন ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু পুরুষের সবচেয়ে বেশি চিত্ত-বিনোদন কে করতে পারে জানেন? কালিদাস তার ঋতুসংহারে শরৎ বর্ণনা এই বলে শেষ করেছেন, —

প্রস্ফুটিত পঙ্কজেরা
যাহার বরাণল
যুগ্মনীলোৎপলের দলে
যাহার দু'নয়ন
রূপের আধার সকল প্রকার
এই যে শরৎ করুক আবার
প্রেমোন্মিতা নারীর মতো
চিত্ত বিনোদন।

প্রেমিক নারী পুরুষের চিত্তে যেমন আনন্দের ধাবা বয়াতে পারে এমন কিছুতেই নয়। বলে রেণুকা কিছু বলে কিনা তা শুনার জন্য সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। কিন্তু রেণুকা কিছুই বললে না। তখন বিজনেশই আবার আরম্ভ করলেন, আর সত্যই তাই। নারীরও একমাত্র কাজ পুরুষের চিত্ত বিনোদন করা। ফুল যেমন রূপে, রসে, গন্ধে ভ্রমরকে নিজের কাছে আকর্ষণ করে নারীর কাজও ঠিক তেমনি। সেও হৃদয়ের প্রেমে, মনের মাধুর্যে, দেহের সৌন্দর্যে, পুরুষের প্রেম আকর্ষণ করবে। শরৎচন্দ্র কিরণময়ীর মুখে বলেছেন, সৃষ্টিধারণের ক্ষমতাই নারীর সৌন্দর্য। হুইটম্যানের নাম শুনেছেন বোধ হয়? আমেরিকান পোয়েট। বলিষ্ঠ তাঁর কল্পনা সূক্ষ্ম তার প্রকাশভঙ্গি। তিনি বলেছেন —

'তোমার ও দেহ নারী তব যৌবন
পূর্ণভাবে ভোগ আমি চাহি করিবারে
এ-মোহ জীবন দেছে মেলি আপনারে
তব ভবিষ্যৎ মাঝে। নহে অকারণ, —
উদ্ভাসিত মানবের বিমূঢ় চেতন।
আত্মত্যাগ দীপ্তি দিয়ে যারা বারে বারে
মোদের মিলনে সখি, সে সব মহান
ত্যাগী, কর্মী, রূপশ্রষ্ঠা, পৃথিবীর কোলে
আসিবে সৃজিবে দোহে, এই চাহে প্রাণ
সেই অনাগতদের ছায়া সখি দোলে

তোমার মাঝারে রূপ দেব সে ছায়ায়
তাই-তো এ মন তব দেখোনি চায়।

বিজনেশ প্রতিটি কথায় অপরূপ ভাব মিশিয়ে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে গেল। আবৃত্তি শেষ করেই সে রেণুকার একখানি হাত নিজের হাতের উপর রাখল। রেণুকা বাধা দিল না। তার স্নায়ু উপস্নায়ু উত্তপ্ত হয়ে যেন শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে চায়। বহুক্ষণ পরে বিজনেশ আবেগতাড়িত কণ্ঠে বললে, কেমন লাগল হুইটম্যানের কবিতা, ঠিক বলেছেন, না? রেণুকার কথা বলবার শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। প্রাণ-পণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করে সে কম্পিত কণ্ঠে বললে, হুইটম্যানের কথা থাক।

আপনি তো নিজের কবিতা একটাও বললেন না?

বিজনেশ রেণুকার মুখের দিকে চাইলে। তারপর একবার আকাশের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে ভাব বিভোর কণ্ঠে আবৃত্তি করে বলল ——

"আজকে প্রিয়া পূর্ণিমা রাত
পূর্ণ চাঁদের চূর্ণ হাসি

লতায় পাতায় কীর্ণ হয়ে
দিল সকল সমুদ্ভাসি।

বর্ষার-শেষ-মেঘের-বেলুন
ফাটল হঠাৎ নীলাম্বরে
জীর্ণ তাহার পাঁজর রাশি
উড়ছে মৃদু হাওয়ার ভরে।
তাদের ফাঁকে তারার বিভা
যেমন তর তোমার আমার চোখে
আজকে চল মেঘের ভেলায়
যদি দুজনে স্বপন লোকে।

স্বপ্ন আর বাস্তবতার দ্বন্দ্বকে ভিত্তিভূমি করে অদ্বৈত মল্লবর্মণ গান গাহিতে চেয়েছিলেন একবার মাটির দিকে তাকাও। একবার আকাশের দিকে।

প্রায় ২৫টির মতো প্রবন্ধসাহিত্যের সন্ধান এখন অব্দি পাওয়া গেছে। তা থেকে এক কথায় বলা যায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন শিকড়ে জলবাড়ি নির্মাণ করার লেখক। মাটির কাছাকাছি কান পেতে থাকা লেখক। লোকায়ত চেতনার লেখক।

তার প্রবন্ধের বিষয় হল— পল্লীগীতি, বারমাসী গান, পালাগান, শেওলার পালা, বরজের গান, জলসওয়ার গীত, নাইওরের গান, পাখীর গান, উপাখ্যানমূলক সঙ্গীত, ভাই ফোঁটার গান, পরিহাস সঙ্গীত, মাঘমন্ডল, পুতুল বিয়ের ছড়া, এদেশের ভিখারী সম্প্রদায় ইত্যাদি। তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, রোকেয়ার জীবনী নিয়ে। টি.এস.এলিয়টের সাহিত্য ও জীবন নিয়ে। সাগর সঙ্গমের তীর্থপথ নিয়ে।

প্রবন্ধগুলো তিনি লিখেছিলেন, মোহম্মদী, নবশক্তি, দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকায়। তার প্রবন্ধগুলোকে বলা যায় সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালার প্রবন্ধ। ভাষা ও সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি এইসব ভাবগুলোকে চিন্তার ভিত্তিভূমিতে রেখে অদ্বৈত মল্লবর্মণ অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে ভাবতেন। ভাবনার বিনির্মাণ করতেন। মানসগত লোকসংস্কৃতিকে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। লোকসংগীতের সমাজপ্রযুক্তির ভিত্তি তিনি সন্ধান করেছেন। বস্তুগত লোকসংস্কৃতিকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। সন্ধান করেছেন প্রেক্ষাপট।

সারিগান নিয়ে ভাবতে গিয়ে তিনি লিখছেন, "নদীবহুল পূর্ববঙ্গে বর্ষাকালে নৌকা দৌড় বা বাইচ খেলা হয়। নৌকা ও তার বৈঠাগুলো থাকে যেমন রঙ মাখানো, যারা বৈঠা মারে তাদেরো মনে থাকে রঙের ছোঁয়াচ। গানগুলিও গায় তারা মনে রঙ মিশাইয়া। গাথা সঙ্গীত নিয়ে ভাবতে গিয়ে তিনি লিখছেন, "চাষীর ছেলে বিনন্দ কোড়া পাখি শিকার করিতে গিয়া সাপের কামড়ে প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহারই করুণ কাহিনী পল্লীবাসীরা কথায় ও সুরে বাঁধিয়া রাখেন।" বারমাসী গান নিয়ে তিনি বলছেন, "বারমাসী গানগুলি পল্লীর নিরক্ষর সমাজের প্রাণস্বরূপ।" পল্লীসঙ্গীতে পালাগানের প্রসঙ্গ নিয়ে ভাবতে গিয়ে লিখছেন, "ভাটিয়ালি গান, বারমাসি গান, মহাজনী গান প্রভৃতির 'পালা' গানগুলিও পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলের নিজস্ব সম্পদ।" বরজের গান নিয়ে তিনি লিখছেন, "তাহাদের গান সাধারণত প্রেম ও সাধনামূলক।"

হস্তেতে লইয়া লাঠি
কান্ধেতে ফেলিয়া ছাতি,
যায়ে বরজ
যায়ে বরজ দীঘল পরবাসে।

নাইওরের গান নিয়ে বলছেন, "একটি বালিকা বধূর স্বামীগৃহে অবস্থানকালে পিতৃগৃহে গমনের উন্মুখতা পল্লীসঙ্গীতে চমৎকার বিকাশ পাইয়াছে।" 'পাখীর গান' প্রবন্ধে লিখছেন, "প্রেমাস্পদকে পাখীর সঙ্গে উপমা দিয়া গান রচনা করা গ্রাম্য কবিগনের এক বাতিক ছিল। বিভিন্ন গ্রাম্য সঙ্গীতে তাই পাখীর প্রচুর উদাহরণ রহিয়াছে। পাখী উপলক্ষ-করা গান দুই শ্রেণীর। প্রেমমূলক ও তত্ত্বমূলক। প্রেমমূলক গানগুলিতে পাখীকে প্রণয়িনীর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। পাখী যেমন শত আদর যত্ন উপেক্ষা করিয়া সুযোগ পাইলেই গগন-মার্গে উড়িয়া যায়, কোন কোন প্রেমাস্পদ ব্যক্তিও প্রণয়িনীর সকল কামনার মুখে ছাই দিয়া চলিয়া যায়।"

'এদেশে ভিখারী সম্প্রদায়' প্রবন্ধে তিনি ভিখারী সম্প্রদায়ের উদ্ভব, বিকাশ ও বিভাগগুলো নিয়ে ব্যতিক্রমী সমাজবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন।

বর্ষার কাব্যে বর্ষার ইতিহাস ও তার রূপ বর্ণনার ইতিহাস কবির চিত্তরসে জারিত করে সংস্থাপিত করেছেন।

তাঁর প্রবন্ধগুলো লোকসংস্কৃতি নিয়ে চিন্তার অবলম্বন। তাঁর ভাবনার ক্ষেত্র আমাদের উৎস সন্ধানের অনন্ত আকাঙ্খা জাগায়।

নদী কেন্দ্রিক আখ্যান এবং তিতাস

নদী হল এক গতিশীল আধার। নদী অবশ্যই স্ত্রী বাচক শব্দ। অরণ্য, পাহাড় এবং উপত্যকা পেরিয়ে নদী বয়ে যায় কলকল শব্দে। তার কলতান গানের মত মধুর। ঘন মেঘ থেকে বৃষ্টি। বৃষ্টি থেকে বান। আর তার থেকে নদী। নাচের ছন্দের মতো করে নদী বয়ে যায়। সময়ের মতো করে নদীও থেমে থাকে না। বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। নদী জন্ম দেয় নরম উর্বর পলি, মৃত্তিকা, অরণ্য এবং নদী মানুষের জন্ম ও সভ্যতাকে বিকশিত করেছে। নদীকে কেন্দ্র করে তৈরী হয়েছে বসতি। তৈরী হয়েছে শহর ও বন্দর। জন্ম হয়েছে সভ্যতার। নদী তো মায়ের মতো। যে শুধু জন্ম দেয় না, লালনও করে।

বৃষ্টি, ঝরণা আর পাহাড়ের ঠান্ডা বরফের রসায়ন নদীর জন্ম দিয়েছে। নদীর উৎস বড় লোভনীয় স্থান। হিমবাহ ঝরণা এবং বৃষ্টিপাতপ্রবণ জায়গাকে কেন্দ্র করে নদী জন্মেছে। নদী বয়ে যায় সমুদ্রের দিকে। মোহনা বড় লোভনীয় বিষয়। তিন অবস্থা নিয়ে নদী বড়ো হয়। তরুণ পরিণত এবং প্রবীণ। নদী অনেক হ্রদের জন্ম দেয়, ব-দ্বীপ থেকে শুরু করে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ। নদী হল অটনী, অঙ্গিনী, প্রবাহিনী, শৈবলিনী, স্রোতস্মতী, শ্রবন্তী এবং পয়স্বিনী।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। বলা হয় নদ নদীর জাল বিছিয়ে আছে। নদীর অববাহিকা বাদ দিলে ভারতের সম্পদ যে প্রায় শূন্য হয়ে যায়। নদীগুলো অববাহিকার দৈর্ঘ্য অনুসারে তিনভাগে বিভক্ত। এক, বড় নদী, দুই, মাঝারী নদী এবং তিন, ছোট নদী। সিন্ধু আমাদের

সভ্যতা, গঙ্গা আমাদের অহঙ্কার। ব্রহ্মপুত্র আমাদের চেতনা। নর্মদা, তাপ্তী, সরস্বতী, সুবর্ণরেখা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী এবং পেন্নার আমাদের দেশের বড় নদী। বড় নদীর সংখ্যা আমাদের দেশে ১৪টির মতো। মাঝারী নদী আমাদের দেশে ৪৪টির মতো। শ্বেতরতী, ভাদর, ধাধার, বুড়িবালাম, বৈতরণী, পূর্ণা, অম্বিকা, বৈতস, উল্লাস, সাবিত্রি, মন্দাদরি, কালীনদী, গঙ্গাবলী, শাবাবতী, নেত্রবতী, খালিয়ার, ভারতপূজা বা পোন্নানী, পেরিয়ার, পাম্বা, রসিকুল্ল্যা, বংশধারা, শারদা, ইলেরু, গুডলকাম্মা, মুমি, পালেয়, মুনেরু, কুনলেরু, স্বর্ণমুখী, কোরলহিয়ায়, পালার, জিংগি, পেন্নাইয়ার, ভেল্লার, ভাইগাই, বর্ষালী, কুনদার, ভাইপ্পার, তাম্রপনি, কর্ণফুলী, কালাদান, ইমফল, তিব্বু এবং ননীতালুক। নদীর নাম এরকমও হয়, বৌডুবি, আগুনমুখা, রজতরেখা, আন্ধারমানিক, ডাহুক, কীর্তিনাশা এবং মহুয়া।

মানুষ যেমন গতি ভালোবাসে তেমনি নদীও গতি ভালোবাসে। নদীর গতি মানুষের সভ্যতার গতিকে বহুগুণ প্রসারিত করছে। নদীকে কেন্দ্র করে জলবিদ্যুৎ, নদীকে কেন্দ্র করে পরিবহন এবং নদীকে কেন্দ্র করে মাছ চাষ। আর এসব সব বিষয়ই সম্পৃক্ত জীবনের সঙ্গে।

জীবনের ধরণী, জীবনের প্রান্তর এবং মানুষ নামক মনোচিত্রকের দ্বন্দ্ব নিয়ে জীবনের সহিত জড়িয়ে আছে সাহিত্য। তাই নদীকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের কথাই ভাবা যায় না। আফ্রিকার নদ-নদী, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন, উত্তর আমেরিকায় মিসিসিপি, চীনের ইয়াংসি কিয়াং যেমন সাহিত্য আখ্যানের জন্ম দিয়েছে তেমনি জন্ম দিয়েছে রাশিয়ার ভোলগা এবং ভারতের সিন্ধু-গঙ্গা।

আমাদের দেশ থেকে ভাগ হয়ে আলাদা স্বাধীন স্বতন্ত্র দেশে হয়েছে বাংলাদেশ। আমাদের প্রাণের দেশ, ভালবাসা ও ভাললাগার দেশ। এই দেশও নদী মাতৃক। বাংলাদেশের নদীগুলোকে যদি আমরা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজিত করি, তাহলে দেখব – রংপুর অঞ্চলে ২৫টি নদী আছে। রাজশাহিতে ১০টি। পাবনায় ৮টি। বগুড়ায় ৭টি। ঢাকায় ১৮টি। ময়মনসিং-এ ৩৭টি। সিলেটে ৩৬টি। কুমিল্লায় ৪৪টি। নোয়াখালিতে ১৯টি। চট্টগ্রামে ৩০টি। কলিয়ায় ৪টি। যশোরে ২৮টি। ফরিদপুরে ৫টি। খুলনায় ৭টি। বরিশালে ৫৭টি। সুন্দরবন অঞ্চলে ১৭৭টি। বাংলাদেশেও নদীকে কেন্দ্র করে প্রচুর কথা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নদীকেন্দ্রিক কথাসাহিত্য বা আখ্যানের প্রসঙ্গ কোথাও উঠে এলে সঙ্গে সঙ্গে যে শব্দ উচ্চারিত হয় সেগুলো হল গঙ্গা, পদ্মানদীর মাঝি, ইছামতী, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, মালয়ালম ভাষার চিংড়ি, বিদেশের ওল্ড ম্যান এন্ড দা সী, সমকালীন সময়ে লেখা। অমর মিত্রের সোনাই ছিল নদীর নাম, শঙ্কু মহারাজের গঙ্গা যমুনার দেশে, দীপক চন্দ্রের গল্পে গল্পে গঙ্গা, দীপ্তি ত্রিপাঠীর শিপ্রানদীর পারে ইত্যাদি। কিন্তু ঐসব কোন কথাসাহিত্যেই আখ্যানের কোন রাসায়নিক বা ভাবগত ঐক্য নেই। কিছুটা আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' বাদ দিলে পর অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'-উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'পোস্টমাস্টার' এবং 'অতিথি'তে দার্শনিকতা যুক্ত করেছিল নদী। তিতাসে নদী যুক্ত

করেছে জীবন-পাঁচালী, জীবন ভঙ্গি, মহাকাব্য এবং দার্শনিকতা। আমরা জানি বিভূতিভূষণ লিখেছেন ইছামতী কে নিয়ে। তারাশঙ্কর লিখেছেন কোপাই এবং ময়ূরাক্ষীকে পটভূমি করে। পদ্মা ও কোপাইয়ের স্মৃতি বেশী ধরেছেন রবি ঠাকুর।

লোকায়ত এক ব্রতকথায় আমাদের অন্তরমহলের এক নারী প্রাণ উৎসারিত বর্ণমালায় শব্দ তৈরি করে ছড়া কাটছেন -"নদী নদী কোথা যাও/বাপ ভাইয়ের বার্তা দাও।/নদী নদী কোথা যাও/সোয়ামী শশুরের বার্তা চাও।/" নদী মানে এই লোকায়ত চেতনা। নদী মানে আমাদের জীবনযাপন। সকল কর্মকাণ্ডে, সংস্কৃতিতে, ঐতিহ্যে। ইতিহাসে, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে প্রতিটি পরতে পরতে জুড়ে আছে 'নদী'। নদীর খাত পরিবর্তনের ইতিহাস মানেই সভ্যতায় ইতিহাসের নির্মাণ ও বিনির্মাণ। 'বাংলা- উপন্যাস : নদীর কোলে কোলে' এই প্রবন্ধে সরোজকুমার রায়চৌধুরী অন্যবোধ থেকে লিখছেন "তিতাস এক সামাজিক ইতিহাস রচনা করেছে। বাংলাদেশের এক ব্রাত্য অঞ্চলের ব্রাত্য মানুষজনের যে জনপদ তার আকৃতি-প্রকৃতিকে মনন দিয়ে ছুঁয়ে দেখেছেন। ঘরবাড়ী, বাগান, শষ্য-ক্ষেত্রাদি তার গর্ভে বিলীন করে দিয়ে, কখনও কখনও উর্বরভূমিতে বালি ও লবন ছড়িয়ে তিতাস আপন খেয়ালে নিজের যে কাজ করত একদিন তাকে বস্তুনিষ্ঠ মননশীলতা দিয়ে দেখেছেন অদ্বৈত। তিতাস তীরে বাস করা ব্রাত্য মানুষদের সৃষ্টি জীবনের জয়যাত্রাকে ব্রত করেছেন অদ্বৈত। দেখিয়েছেন কিভাবে বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম, নগর, বাজার, বন্দর, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প, বাণিজ্য, মেলা, ধর্মকর্ম সবকিছুই আবর্তিত হয় প্রিয় নদীকে কেন্দ্র করে। অদ্বৈত দেখিয়েছেন কিভাবে মালো নামক একটি ব্রাত্য সমাজ শাসিত হচ্ছে, নদী দ্বারা ঘোরাফেরা করছে লোকবৃত্তে। লোকউৎসব ও মেলা, ব্রত পরিচয়, ক্রীড়া বা অবসর বিনোদন, আচার-আচরণ এবং কর্মযজ্ঞ, শিল্প ও কলা সব যেন লাটিমের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে নদীর সঙ্গে।"

এ বিষয়ে সাহানা মৈত্রের ভাবনা রসায়নের কথা উল্লেখ করতে পারি একটু বিস্তৃতভাবে। "তিতাস একটি নদীর নাম – বাংলা কথাসাহিত্যে একটি ব্যতিক্রমী আঞ্চলিক উপন্যাস। ব্যতিক্রম এর দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং নামকরণ প্রক্রিয়াটি আঙ্গিকেরই অন্তর্ভুক্ত, তাই ব্যতিক্রম সেখানেও। সেটি স্পষ্ট করাই এ প্রবন্ধের অভিপ্রায়। উপন্যাসটিকে ঔপন্যাসিক চারখণ্ডে বিভক্ত করেছেন, চারটি খণ্ড আবার আঠারটি পর্বে বিভক্ত। আটটি পর্ব স্বতন্ত্র নামকরণযুক্ত। কিন্তু অদ্বৈত মল্লবর্মণ এই নামকরণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রথিতযশা ঔপন্যাসিকদের সনাতন অনুবর্তনের পথে হাঁটেননি। শরৎচন্দ্রের পূর্ববর্তী অনেকেই (বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ) উপন্যাসের স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণে সচেষ্ট ও ফলপ্রসূ হয়েছেন। কিন্তু বিষয়, কাহিনী বা চরিত্রানুসারে নামকরণগুলো ছিল সরল। শীর্ষ নামেই পরিচ্ছেদের মর্মার্থ বোঝা যেত। কিন্তু 'তিতাস একটি নদীর নাম' এ নামকরণের নেপথ্যে ঔপন্যাসিকের মননপ্রসূত বিশিষ্ট ভাবনা কাজ করেছে। আপাত অর্থে নামকরণের সঙ্গে বিষয়ের সাদৃশ্য নেই। কিন্তু

বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করলে, অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে গোটা উপন্যাসের নামকরণ ও পর্বভিত্তিক নামকরণগুলি যথার্থতা লাভ করে।"

উপন্যাসের পর্বভিত্তিক নামকরণগুলি ক্রমানুসারে এরকম –

প্রথম খণ্ড – প্রথম পর্ব-তিতাস একটি নদীর নাম। দ্বিতীয় পর্ব -প্রবাস খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড – প্রথম পর্ব – নয়া বসত, জন্ম-মৃত্যু বিবাহ

তৃতীয় খণ্ড – রামধনু, রাঙা নাও

চতুর্থ খণ্ড – দুরঙা প্রজাপতি, ভাসমান।

এই খণ্ডগুলি ধরেই ক্রমানুসারে উপন্যাসের কাহিনী দ্রুত এগিয়ে গেছে পরিণতির দিকে। নদীর প্রবহমানতায় তার চারপাশের পরিদৃশ্যমান জগতের দৈনন্দিন চিত্র যেমন পরিবর্তিত হয় ঠিক তেমনি উপন্যাসের আখ্যানও এগিয়ে যায় দ্রুত প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে। 'পরস্তাবের' পর 'পরস্তাব' বিবৃত হয়েছে। নদীর গতির সঙ্গে সমান্তরাল উপন্যাসের গতিও এগিয়ে গেছে পরিণতির দিকে।

'তিতাস' -এর নামের মধ্যে আছে এক রোমান্টিক আবেদন। যদিও উপন্যাসের আখ্যানের সঙ্গে এক্ষেত্রে সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। উপন্যাসের বিষয় বস্তুতে রয়েছে মালোসমাজের অস্তিত্বের সংকট ও টিকে থাকার চূড়ান্ত সংগ্রাম। সেই রুক্ষ কঠিন সংগ্রামে এবং বিষাদময় পরিণতিতে রোমান্সের স্পর্শ নেই। তথাপি তিতাস নামের মধ্যে যে সরল শিশুসুলভ রোমান্সের স্পর্শ আছে, তা চারপাশের জনপদ জীবনের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। তাই নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ – এই দুই 'সদাহাস্যময়' বৃদ্ধের বিদায় দৃশ্যটি অনন্তের দৃষ্টিতে মনে হয় স্বপ্নিল রূপকথার মতো – যেন দুটি শিশু – "যেন চাঁদের দেশের দুটি শিশু যাত্রাগানের বুড়ার পোষাক পরিয়া নাও বাহিয়া চলিয়াছে। এ জগতের নয় তারা। কেন আসিয়াছিল – আর থাকিবে না, ক্রমেই উপরে উঠিয়া ছোট হইয়া যাইতেছে – এখন মিলাইয়া যাইবে।"

উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পর্বের নাম 'তিতাস একটি নদীর নাম' – তিতাসের জলজীবনের কথা এই পর্বে ব্যক্ত হয়েছে। তিতাসের সঙ্গে পদ্মা গঙ্গার ব্যতিক্রম আছে। তিতাস একটি সাধারণ মাঝারি নদী। সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি তাকে হাতছানি দেয় না। – "তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণ ভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়।" এক অদ্ভুত সমৃদ্ধ নদীজীবন নিয়ে সে প্রবাহিত হয় সরলগতিতে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র পদ্মার মতো সে রহস্যময়ী চারিত্রিক সত্তা নিয়ে উপনীত হয় না। আবার সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'র মতো তার প্রবাহমানতার বিস্তৃতি নেই। পাহাড়ী নদীর খরস্রোতা গতি নিয়ে উপলরাশিকে ফুৎকারে সরিয়ে দিয়ে সে প্রবাহিত হয় না। পদ্মা গঙ্গার মতো সে অমরত্বেরও দাবীদার নয়। কারণ মানব-জীবনের মতো জীবন-মৃত্যুর স্বল্প পরিসরের নিরিখে একদিন তার গতি স্তব্ধ হয়েছে। তিতাস শুকিয়ে গেছে কিন্তু জন্মসূত্রে সে মেঘনার এক শাখা। মেঘনা থেকে বের হয়ে আবার মেঘনাতেই

উপনীত হয়েছে – 'কাঁকনের মতোই তার বলয়াকৃতি'। আর এই বলয়াকৃতি গতিপথের চারপাশে বসবাসকারী মালোগোষ্ঠীরা একেবারেই ব্রাত্য সমাজের অংশ। তারা ধীবরবৃত্তিধারী। তাদের সংস্কৃতিও লোকায়ত। তিতাসের মতোই তাদের জীবন সরল, স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবহমান ছিল।

তিতাসের জীবনকাহিনীই এই পর্বের মূল নির্যাস। আর তিতাসের জল জীবনের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র ধরেই আসে বিজয়পারের গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের জীবনসংগ্রামের কথা। এর সঙ্গে কৃষিজীবীদের উপস্থিতিতে শ্রেণীবিভাজনের চিত্রটাও এখানে প্রতীকায়িত হয়েছে জোবেদ আলী ও তার দুই মুনিষ করমালী ও কদালী প্রসঙ্গে। সব মিলে তিতাসে পরিচয়টাই এই পর্বের মূল বিষয়। জনশ্রুতি আছে চরে জনপদ গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে তিতাস নদীতে বিশুদ্ধ জলের অভাব দেখা যায়। সমস্ত চরের জনপদ জুড়ে একটি তিয়াস বা তিতাশ্বাস তৈরি হয়েছিল। পিপাসা থেকে শুরু হয়ে পূজা এবং মানত। শুরু হয় জলের প্রবাহ। দূর হয় তিয়াস বা পিপাসা। নদীর নাম হয় তিতাস। তাই এই পর্বটির নামকরণটি যথাযথ হয়েছে। ১ম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্বটির শীর্ষ নাম প্রবাস খণ্ড। উপন্যাসে ঘটনাবর্ত শুরু হয়েছে এখান থেকেই। কিশোর-সুবল-বাসন্তীর উপাখ্যানের এই পর্বেই সূচনা হয়েছে। বাসন্তীর সঙ্গে কিশোর সুবলের সম্পর্কের একটা ইঙ্গিতও দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। কিশোরের বয়ঃসন্ধিকালের রোমান্টিক স্বপ্নময়তার একটা আভাসও দিয়েছেন এখানে। আর এই রোমান্টিক স্বপ্নময়তার হাত ধরেই এসেছে কিশোরের প্রবাস দেখা। তার একটা বাস্তব রূপ দেখা যায় উজানি নগরের খলায় বাঁশীরাম মোড়লের গ্রাম শুকদেবপুর যাত্রার মধ্যে দিয়ে। প্রবহমান নদীতে নৌকায় ভেসে যেতে যেতে কিশোর দেখেছে তাদের মালোপাড়ার "ঘরবাড়ি, গাছপালাগুলি, খুঁটিতে বাঁধা নৌকাগুলি, অতিক্রান্ত ঊষার স্বচ্ছ আলোকেও, কেমন অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।" এই প্রবাসের পথেই কিশোরের দৃষ্টি পড়েছে ভৈরবঘাটের মালোদের বসতির ওপর "এ গাঁয়ের মালোরা গরীব নয়। বড় নদীতে মাছ ধরে। রেলবাবুর পাশে থাকে। গাড়িতে করিয়া মাছ চালান দেয়।" তার দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাসিত হয় নয়াকান্দার মালোবসতি। "এখানে জমিদার নাই। বেশ শান্তিতে আছে।" গতিচঞ্চলা নদীর গতিপথে আবার চোখে পড়ে শুকদেবপুরের মালোসমাজের স্বচ্ছল, সমৃদ্ধ আর্থ সামাজিক চিত্রটি "এখানে ঘরে ঘরে জাল যেমন আছে, তেমনি হালও আছে।" এই খণ্ডেই নিজের গোকর্ণঘাটের সংকীর্ণ পরিসর লঙ্ঘিত উত্তীর্ণ হয়ে কিশোরের দৃষ্টি পড়েছে পরিদৃশ্যমান বৃহত্তর জগতে। এই খণ্ডেই বাসন্তীকে অস্বীকার করে সে বধূ হিসাবে নির্বাচন করেছে শুকদেবপুরের এক কিশোরী কন্যাকে। এই বিবাহ একান্তভাবে রোমান্টিকতায় পূর্ণ। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। কিশোর প্রবাসের পথেই হারিয়েছে তার কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসার সেই নববধূটিকে। বাসন্তী সুবলের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনীতে এসেছে নাটকীয়তা – টান্ টান উত্তেজনা। কিন্তু কিশোরের সেই সদ্যবিবাহিতা বধূটি কোথায় গেল? কি হল? প্রবাসখণ্ডেই দেখা যায় মালো জনজীবনের তুলনামূলক চিত্রটি। এখানে ক্ষুদ্র কাহিনী সীমা

লজ্জিত হলেও বৃহত্তর জগতের সীমানুভূতি কোন স্পষ্ট ইতিবাচক রূপ পায় না। প্রবাসের দৃশ্য পাঠকের মনে কোন সুখস্মৃতি রচনা করে না। বরং এক বিষাদময় আবহে তলিয়ে দেয়। তাই 'প্রবাসখণ্ড' নামকরণটিও সার্থক।

এরপর ক্রমানুসারে উপন্যাসের আখ্যানভাগে এসেছে ২য় খণ্ডের প্রথম পর্ব-নয়াবসত। যেখানে প্রবহমান নদীর উৎস ও পরিণতির রহস্যের মতোই এখানকার অন্ত্যজ জনপদগোষ্ঠীর অনেক চরিত্রেরই উৎস ও পরিণতি অজ্ঞাতই থেকে যায়। তাই অনন্তর মা, নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গের মতোই এমন অনেক মানুষই এসেছে এখানে – কোথা থেকে তারা এসেছে কেউ জানে না। কোথায় চলে গেল তাও রহস্যাবৃত। এরা যেন তিতাসের নদীর বুক থেকে উঠে এসে আবার তিতাসেই মিলিয়ে যায়। তিতাসের বুকে রেখে যায় পরস্তাবের পর পরস্তাব। কোন রাজতন্ত্রের উত্থান-পতনের ইতিহাস সেখানে নেই। নেই তাদের রণরক্ত সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলিলও। তিতাসের চারপাশে তাই "হাজার বছরের না শোনা গল্প দুই তীরের বাঁধনে পড়িয়া একদিকে বহিয়া চলিয়াছে।"

এই পর্বেই অনন্ত আর অনন্তর মাকে মালোজনপদ জীবনের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করে নতুন বসত গড়ার উদ্দেশ্যে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ নিয়ে গেছে গোকর্ণঘাটে। গোকর্ণঘাটের সংলগ্ন অঞ্চলে তার স্বামীগৃহ বলে জানা যায়। এটুকু স্থানিক পরিচয় ছাড়া গোকর্ণঘাটের জনপদজীবন একেবারেই অনন্তর মার কাছে নতুন, অজ্ঞাত।

গোকর্ণঘাটের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাটিও যেন নতুন। সমাজে শ্রেণী বিভাজন স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বিজয়পাড়ের বোম্বাই মালোর মতো এখানে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে কালোবরণের মতো মহাজনীরা। অন্যান্য মালোরা তুলনায় অনেক হীনবল হয়ে পড়েছে। হয়ে পড়েছে বিগতশ্রী। জমিদারের খাজনা দিতে অসমর্থ হয়েছে। খাজনার টাকা অসৎ উপায়ে আত্মসাৎ করে প্রতারণা করেছে গোটা মালোসমাজকে। নাগরিক সভ্যতাঋদ্ধ চটুল সংস্কৃতি অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে কালের নিয়মে তামসীর পিতার সূত্র ধরেই। এই নতুন আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রথিত হয় অনন্ত ও অনন্তর মা। এই নতুন আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় রামপ্রসাদের মতো মহানুভব, সৎ ও প্রথাগত ঐতিহ্যে বিশ্বাসী মানুষ ক্রমে একাকী নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। তবু 'বৃথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না' – রামপ্রসাদের মতো ঐতিহ্যবান মানুষেরা তথাপি অনাগত ভবিষ্যতের অবকাশে দিন গোনে, তাই শিশু অনন্তর সঙ্গ কামনা করেন। 'নয়া বসত' নামকরণটিও তাই নতুন আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের ২য় পর্বের নাম ঔপন্যাসিক দিয়েছেন জন্ম-মৃত্যু বিবাহ। এই পর্বে গতিচঞ্চল নদীর চারপাশের দৈনন্দিন চিত্র পরিবর্তনের মতো উপন্যাসের কাহিনীরও দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। নদীর একই গতিপথে যেমন প্রতিদিন চারপাশের দৃশ্য পরিবর্তন হয় তেমনি তিতাসের গতিপথের সঙ্গে উপন্যাসের প্লট পরিবর্তিত হয়েছে সমদ্রুততার সঙ্গে। পরস্তাবের পর পরস্তাব ঘটে গেছে গোকর্ণঘাটের জনপদজীবনে। এই পর্বেই উদঘাটিত হয়েছে

অনন্তর মার প্রকৃত পরিচয়টি। তার সঙ্গো উন্মোচিত হয় অনন্তের পিতৃপরিচয়। আবার বিপ্রতীপে জানা যায় সুবল বাসন্তীর বৈবাহিক বন্ধন ও সুবলের মৃত্যুর কথা। কিশোর অনন্ত, সুবল-বাসন্তীর সুখের নীড় বাধার প্রত্যাশা ও তার অপূর্ণতাজনিত বিষাদময় পরিণতি পাঠক মননকে হতাশ করে। বিপ্রতীপে দেখা যায় কালোবরণের মতো সুদখোর মহাজনীর ঘরে নবজাতকের জন্মের উৎসব। তাই একদিকে স্বপ্ন ভূলিণ্ঠিত হবার চিত্র, এবং আর একদিকে আগ্রাসী অর্থনীতির সম্প্রসারণ ও সংক্রমণ সূচিত হয়েছে জন্মোৎসবের মধ্যে দিয়ে, এই পর্বেই কিশোর ও অনন্তর মা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে। এই মৃত্যু একদিকে বিষাদময় আবহের সৃষ্টি করেছে। আর এই দুটি মৃত্যুতেই অনন্তর চারপাশের সম্পর্কের বন্ধনও যেন শিথিল হয়ে গেছে। তিতাসের বুকে নৌকার মতো অনন্ত ভেসে চলে। তাই জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এই চক্রাবর্তনের মধ্যে পর্বের নামকরণটি যথার্থতা লাভ করেছে।

এরপর তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিক নামকরণ করেছেন 'রামধনু'। সাতরঙা রামধনু মানেই অনাবিল সৌন্দর্য, রামধনু মানেই রহস্যময়তা। রামধনু মানেই বিরাটত্বের অনুভূতি। এই রামধনুর বর্ণময়তা তিতাসকেও রাঙিয়ে তোলে। "ধনুকের মত বাঁকা আসমানের রামধনুটা বুঝি উল্টাইয়া তিতাসের উপর পড়িযা গিয়াছে।" রামধনু আকস্মিকভাবে আকাশে আসে এবং মিলিয়ে যায়। বস্তুত তা তিতাসের মালোজীবনের বর্ণাঢ্যতাকেই প্রতিকায়িত করে। আবার অনন্তর মায়ের মৃত্যু তাকে চাবপাশের বন্ধনমুক্ত করে। তার সামনে পরিদৃশ্যমান বৃহত্তর জগত যেন উন্মোচিত হয়। মাথার ওপর অনন্ত আকাশ। সে আকাশ রোমান্টিক স্বপ্নময়। আকাশে রামধনু। তাই হাটের পরিবেশে যেখানে হিসাব-নিকাশের কোলাহল, উর্দ্ধে তখন রামধনুর সৌন্দর্য "আজি নুপুরের গাছ গাছালির মাথার উপর দিয়া আকাশে রামধনু উঠিয়াছে। ছেলেটা (অনন্ত) তারই দিকে চাহিয়া আছে।"

অনন্ত দৃষ্টিপথ অনুসরণ করে বনমালীও দেখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই রামধনুর বর্ণময় সৌন্দর্য। কিন্তু দারিদ্র্য লাঞ্ছিত জীবনে রামধনুর সৌন্দর্য অবলোকন করার অবসর নেই। তাই তা ক্ষণিকের মুগ্ধতামাত্র। চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু অনন্তর মধ্যে কিশোরের অস্তিত্বের একটা ছাপ পাওয়া যায়। মায়ের মৃত্যুর পর সে আশ্রয় ত্যাগ করে। সে পৌছায় অন্যঘাটে। উদয়তারার সঙ্গো নবীনগরে গিয়ে মন্দিরের মোহান্তের অনুপ্রেরণায় সে লেখাপড়া শেখে, বৃহত্তর শিক্ষাজগতে প্রবেশের পথ পায়। রামধনুর বর্ণময়তাই যেন তার হৃদয়ে বৃহত্তর আবহের স্বপ্ন রচনা করে ক্ষুদ্র জীবনের গণ্ডী পেরিয়ে বাইরের জগতে নিয়ে যায়। তাই 'রামধনু'-নামকরণ অনন্তর রোমান্টিক স্বপ্নাভিসারের প্রতীক। বৃহতের মধ্যে নিজেকে সম্প্রসারিত হবার স্বপ্ন।

তারপর শুরু হয়েছে তৃতীয় খণ্ডের ২য় পর্ব। যার শীর্ষনাম রাঙা নাও। নাও চলমানতা, ভাসমানতার প্রতীক। এই প্রবহমানতার সঙ্গো সৌন্দর্যের বর্ণময়তা সম্পৃক্ত হয়ে তা হয়ে উঠেছে 'রাঙা নাও'। কাদিরের ছেলে ছাদিরের মধ্যে প্রোথিত হয় এই 'রাঙা নাও' এর স্বপ্ন। সনাতন লোকায়ত ঐতিহ্যের প্রতি সন্দিগ্ধতা ও প্রশ্ন জাগে তার শিশুপুত্র রমুরের মধ্যেও।

অনন্ত ও রমু – দুই স্বতন্ত্র ঘরানার মানুষের মধ্যেও প্রথাগত লোকায়ত ঐতিহ্যের অনুবর্তন থেকে বেরিয়ে আসার উদগ্র ইচ্ছা দেখা দেয়। তাই ছাদিরের 'রাঙা নাও' গড়ার স্বপ্নের বাস্তবায়িত হবার কাহিনী প্রায় গোটা পর্ব জুড়ে। তথাপি পর্বের শেষে আছে স্বপ্ন ভঙ্গের চিত্রটি। রাঙা নাও বিদীর্ণ হয় অজ্ঞাত শত্রুর হাতে –। উপন্যাসের বক্তব্যের অনুসারী বর্ণময় রামধনুর মতো রাঙা নাও। একরকম 'রহস্যময় আকস্মিক ব্যাখ্যাতীত প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় কালের গর্ভে রাঙা নাও অদৃশ্য হয় রামধনুর মতো আকস্মিকভাবে।' 'রাঙা নাও' কেবল 'নাও' নয়। তা লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতীক-ও সংস্কৃতির অবলুপ্তির পথে কার্যকারিতা হারিয়ে সে একদিন দৃষ্টি পথের বাইরে চলে যায়। আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তথাপি তার চলমান চিত্রের মধ্যে ধরা পড়ে সংগ্রামী মানুষের অস্তিত্বের নির্যাসটুকু। তাই 'রাঙা নাও' – এই ব্যঞ্জনাধর্মী নামটিও এখানে সার্থকতা লাভ করেছে।

এরপর চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পর্ব। যার নাম দুরঙা প্রজাপতি। উপন্যাসের গতি, নদীর গতির সঙ্গে সমান্তরালে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে পরিণতির দিকে। এক অনিবার্য ও অমোঘ কালপ্রবাহ বা কালের সম্মার্জনী আঘাতে সনাতন লোকায়ত সংস্কৃতি ও নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতি দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। একই মালোসমাজে দুটি সাংস্কৃতিক শ্রেণীবিভাজন প্রকট হতে থাকে। একদিকে ঐতিহ্যশ্রয়ী মালোসমাজ ও অন্যদিকে আধুনিক সংস্কৃতির রঙিন, চোখ ধাঁধানো বিকৃতি। এই নতুন সংস্কৃতির চটুল নাচ গান নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করে। নারীদের কর্মক্লান্ত জীবনের অবসরেও ছোটখাটো রঙ্গ-তামাসার কাহিনী চালু হয়ে যায়। একে প্রতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হয় বাসন্তী ও মোহনের মতো অনেকেই। তার ফলে প্রবল হৃদয়ে অর্ন্তদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয় মালোসমাজ। এছাড়া কৃষিজীবীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ধীবরজীবীরা ধীরে সরে দাঁড়াতে থাকে। একই প্রজাপতির মধ্যে ভিন্ন বর্ণের সমাবেশের মতো দুটি ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্নবৃত্তিধারী মানুষের সহাবস্থান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। তাই এই পর্বের নামকরণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

৪র্থ খণ্ডের ২য় বা অন্তিম পর্বের নাম ভাসমান। গণসংস্কৃতি ও নাগরিক সংস্কৃতির দ্বন্দ্বে কালের নিয়মে অবক্ষয়িত লোকায়ত বা জনপদ সংস্কৃতি অবলুপ্তির পথে চালিত হয়। উদীয়মান বিকারগ্রস্থ চটুল নাগরিক সংস্কৃতি গ্রাস করে মালোসমাজকে। নারীদের রুচিতেও পরিবর্তন লক্ষিত হয় "শেষে মেয়েদের বিলাসিতাও বাড়িয়া গেল। সুযোগ পাইয়া স্যাকরারা নানারকম গহনার, মনোহারী দোকানের লোকেরা তেল, গামছা, সাবান লইয়া ঘন ঘন আসা যাওয়া করিতে লাগিল।" জনপদজীবনের নৈতিক অবস্থায়ও স্পষ্ট হয় "ক্রমে মনুষ্যত্বের হইতে তারা অনেক নীচে নামিয়া গেল।" এছাড়া কৃষিজীবীদের দ্রুত সম্প্রসারণে ধীবরগোষ্ঠী অবলুপ্তির পথে পা বাড়ায়। তারা ভাসমান শৈবালের মতো শুধু টিকে থাকে। টিকে থাকার অসহনীয় সংগ্রামের পরিণতি স্বরূপ মহাজনের ঋণদান সমিতি ও বাজারের দোকানীরা ঋণ বিরোধের জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে। এরই মধ্যে প্রকৃতিও হয় প্রতিকূল। প্রাকৃতিক

প্রতিকূলতায় তিতাস শুকিয়ে যেতে থাকে। নদী ছাড়া মালোদের জীবন জলহীন জীবনের মতো দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। কেউ কেউ ভিক্ষুকে পরিণত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মারা যায়। "পাড়াতে আর কেউ বাঁচিয়া নাই কেবল দুইজন বাঁচিয়া আছে।" কেউ দেশ ছেড়ে চলে যায়। অনন্ত এই প্রবল অভাবের সময় অন্নসত্র খুলে মালোসমাজের অন্নসংস্থান করতে চায়। কিন্তু প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। তাই অবক্ষয়কে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয় সে। শিকড়হীন শিথিল চূড়ান্ত দারিদ্র্য লাঞ্ছিত মালোসমাজ ভাসতে ভাসতে একদিন অবলুপ্ত হয়। তাই এই পর্বের নামকরণ 'ভাসমান' সার্থক নামকরণ।

তথাপি সর্বশেষ আমাদের আলোচ্য সমগ্র উপন্যাসের নাম 'তিতাস একটি নদীর নাম' কতটা সার্থকতাবহ হয়েছে। এই উপন্যাস শুধু মালোজীবনের করুণ পরিণতির কথাই বলে না। বলে শাশ্বত মানব জীবনের ট্র্যাজিক সত্যকে। সেই সমস্ত গণ মানুষের কথা – যারা ঢেউয়ের তরঙ্গে আসে। স্বপ্নিল ছন্দে বয়ে যায়। আবার তাদের অস্তিত্বের মধ্যে থেকেই ভেসে ওঠে ভাসমান চর। এখানে তিতাসের চারপাশের মালোসমাজের জীবনচর্যা ও জীবনচর্চা আদ্যন্ত সম্পৃক্ত হয়ে গেছে নদীটির সঙ্গে। তাই নদী শুকিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এদের অস্তিত্বের সংকট সূচিত হয়। উপন্যাসের অন্তিমে তাই তিতাসের চরে "ধানের শীর্ষে শীর্ষে যেন সেই ঢেউয়ের প্রবহমান ধারা।" ভূমিজীবীরা গ্রাস করতে থাকে ধীবরবৃত্তিকে। তারা তিতাস সমেত তার জনপদজীবনের বিরুদ্ধতা করেছে। স্তব্ধ করে দিয়েছে নদীসমেত গোষ্ঠীজীবনের স্বচ্ছন্দ প্রাণস্পন্দনকে। "এখন মালোপাড়ায় কেবল মাটিই আছে। সে মালোপাড়া আর নাই। শূন্য ভিটাগুলিতে গাছ গাছড়া হইয়াছে। তাতে বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝি বা নিঃশ্বাস ফেলে।" যদিও এই বেদনাদায়ক পরিণতি যাদের হয়েছে তারা কিন্তু শেষ পর্যন্তও কৃষিজীবীতে রূপান্তরিত হয়নি, বৃত্তির পরিবর্তন করেনি, কারণ তিতাসকে এরা হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবেসেছে। তাই প্রাণের বিনিময়েও এরা ধীবর বৃত্তি থেকে কর্ষণজীবনীতে পরিণত হয়নি। তিতাসের প্রতি ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ ভালোবাসা তার প্রমাণ। নদীই তাদের প্রাণ। তাই তিতাসের একবুক জলে দাঁড়িয়ে তারা যেমন মিথ্যাচার করতে পারে না তেমনি তিতাস ছাড়া তাদের জীবিকার বিকল্প পথ তারা ভাবতে পারে না। 'পদ্মা নদীর মাঝি'তে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধীবরগোষ্ঠীর এই প্রতিশ্রুতি রাখা সম্ভব হয়নি। পদ্মাপারের ধীবর গোষ্ঠীর প্রতিনিধি স্থানীয় জেলেমাঝি কুবের শেষ পর্যন্ত হোসেন মিঞার অজ্ঞাত ময়না দ্বীপের হাতছানি অস্বীকার করতে পারেনি। কপিলার সঙ্গে নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে বৃত্তির পরিবর্তন করেছে সে। সেখানে গিয়ে সে চাষ করবে। কুবেরের মতো আরো অনেকেই হোসেন মিঞার কৌশলের শিকার হয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত এটি নদী নির্ভর আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি। সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'য় সর্বত্র আঞ্চলিকতা সুস্পষ্ট হলেও এখানে উত্তরপ্রদেশ বিহার উড়িষ্যা থেকে এসেছে দলে দলে নতুন মানুষ। তাদের আগমনে স্থানীয় গ্রাম্য মৎস্যজীবীরা ধীরে ধীরে উৎখাত হতে থাকে।

এক গতিশীল সুবিস্তৃত আর্থসামাজিক আবহের পরিবর্তন হতে থাকে। মৎস্যজীবীদের এক গভীর অর্থনৈতিক সংকট সূচিত হয় মহাজনী ব্যবস্থায়। এখানেও প্রকৃতির ভূমিকা নেতিবাচক। প্রকৃতি প্রতিকূল, কৃষিজীবীদের শেষপর্যন্ত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি ঘটেছে। আর নারীদের জালবোনার ও চারিত্রিক ব্যভিচারে তাদের জীবনচর্যার উপস্থাপনা অনেকটাই প্রতিহত হয়েছে। তথাপি এখানে ধীবর বৃত্তিধারী ব্রাত্যমানুষের জলজীবনের ইতিকথা রচনা করতে গিয়ে লেখক তাদের মুখের ভাষা, তাদের হৃদয়ের অস্পষ্ট সংরাগ, লোকায়ত সংস্কৃতি, জীবনসংগ্রাম মথিত বাস্তব ও প্রাঞ্জল চিত্র তুলে ধরেছেন।

কিন্তু 'তিতাস একটি নদীর নাম' এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী। এখানে এই রোমান্টিক নামের সঙ্গে বিষয়গত সাদৃশ্য না থাকলেও উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে আদ্যন্ত তিতাসময়। তিতাসের জীবন সত্তাতেই আখ্যান গুলির সত্তা প্রতিকায়িত হয়েছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ মালোদের জনজীবনের বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র অঙ্কণ করেছেন সম্পূর্ণ রূপে তাদের ভাষায়। তাদের ভঙ্গীতে তাদের মত করে। এক শিশুসুলভ দৃষ্টি নিয়ে পরস্তাবের পর পরস্তাব শুনিয়েছেন পাঠককে। আর তাই তিতাস শুকিয়ে যাওয়ায় মালোদের লোকায়ত সংস্কৃতির বিলুপ্তি ও তাদের অস্তিত্বেরও বিলুপ্তি ঘটেছে। একটা নদী শুকিয়ে যাওয়ার সাথে একটা গোটা জনগোষ্ঠী এক বুক পিপাসা নিয়ে হাহাকারময় শূন্য পরিণামের দিকে এগিয়ে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কাহিনীই 'তিতাস একটি নদীর নাম।' নদীজীবনও এখানে মানবজীবনের আঙ্গিকেই গতিশীল। – "একবার যে জন্মিয়াছে, সে একদিন মরিবেই" অথবা "জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু – এই তিন নিয়েই তো সংসার" তাই তিতাসের মৃত্যু ও জনপদ জীবনের অস্তিত্বের বিলুপ্তি এখানে সম্পৃক্ত। একারণে সমগ্র উপন্যাসের নামকরণ 'তিতাস একটি নদীর নাম' এখানে সার্থক হয়েছে।

শুধু তাই নয়, 'তিতাস একটি নদীর নাম' শিরোনামটির মধ্যেই কোথায় যেন একটা প্রমাণের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে। লেখক কি প্রমাণ করতে চান? উপন্যাস পাঠ শেষে মনে হয় না কি লেখক প্রমাণ করতে চাইছেন – এখানে একটি নদী ছিল, যার নাম তিতাস, নদীটি শুকিয়ে গেছে, নদী পাড়ের মানুষগুলিও সেই সূত্রে শুকিয়ে গেছে। আজ বলে না দিলে কেউ জানবে না তিতাস একটি নদীর নাম।

এ কারণেই অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তী 'চিংড়ি', 'গঙ্গা', ও 'তিতাস একটি নদীর নাম' এই তিন উপন্যাসের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন ...

"তাকাজি শিবশঙ্কর পিল্লাই -এর 'চিংড়ি', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (এবার থেকে 'তিতাস') তিনটি বিশিষ্ট ভারতীয় উপন্যাস। মালয়ালাম ভাষায় লেখা 'চিংড়ি' কেরলের সমুদ্র উপকূলের পটভূমিতে লেখা এক অনবদ্য রচনা। অন্যদিকে 'গঙ্গা' ও 'তিতাস' দুটি রচনারই মূল বিষয় মৎস্যজীবীদের জীবন। সম্পূর্ণ তিনটি পৃথক পরিবেশ ও পটভূমি নির্ভর রচনা হলেও এই তিনটি রচনাতে মৎস্যজীবীদের জীবনচর্যার সমাজতাত্ত্বিক পরিচয় ফুটে উঠতে দেখা যায়। 'চিংড়ি' ও 'গঙ্গা'র সাদৃশ্য চোখে পড়ে বেশি

এবং 'তিতাস' -এর বর্ণনায় এইসব সাদৃশ্য-সূত্র কম বেশি থাকলেও এই উপন্যাসটি কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

'চিংড়ি' উপন্যাসের পটভূমিতে যে সমুদ্র তা সীমিত অর্থে 'গঙ্গা'য় থাকলেও 'তিতাসে' একেবারেই নেই। তিতাস এমন একটি নদীর নাম যার সঙ্গে সমুদ্রের কোনো যোগ নেই, নদী মেঘনা থেকে উৎপন্ন হয়ে মেঘনাতেই মিশেছে। গঙ্গা, মেঘনা বা পদ্মা নদীর মত তিতাস ভীষণ নয়, তার জলও অত গহন নয়। এই উপনদীর তীর ঘেষে ছোট ছোট গ্রাম, চাষের জমি আব ঘাটের পর ঘাট। 'চিংড়ি'র সমুদ্র উপকূল আর তিতাসের তীর ছুঁয়ে যাদের ঘরবাড়ি আর জীবনযাপন তারা অধিকাংশই মৎস্যজীবী। ধনুকের মত বাঁকা তিতাসের তীরে দক্ষিণপাড়ায় যে মালোদের বসবাস তাদের কথা 'গঙ্গা'তে শোনা যায়। আর 'চিংড়ি'তে আরায়ান ওয়ালাকারণ, মুকাওয়ান প্রভৃতি নানাজাতের মৎস্যজীবীদের উল্লেখ ও তাদের জীবিকার সংগ্রাম কাহিনী। এই সংগ্রামকাহিনী রূপেই তিনটি রচনার সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোও সাদৃশ্যযুক্ত হয়ে ওঠে।"

অর্থাৎ তিনটি উপন্যাসের স্রষ্টারা তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাহিনী রচনার কাজে লাগিয়েছেন বলেই সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো এত স্পষ্ট। মালয়ালাম লেখক শিবশঙ্কর পিল্লাই কেরলের আম্বালাপুষার সমুদ্র উপকূলে জেলে পাড়ায় তার শৈশব ও কৈশোরের অনেক দিন কাটিয়েছেন এবং এই অঞ্চলের আইন ব্যবসায়ী রূপেও তাঁর অভিজ্ঞতা বহুদিনের। সমরেশ বসু তাঁর রচনাতে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ব্যবহারের কথা বলেছেন 'গঙ্গা'তে তারও পরিচয় মেলে। উপন্যাসটির ভূমিকাতেও তার উল্লেখ আছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতালাভের ক্ষেত্রটি ছিল একেবারে স্বতন্ত্র। নিজে মালো বংশের সন্তানরূপে তিনি এই সম্প্রদায়ের জীবন কাহিনী রচনায় নিজস্ব অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন একথা বলাই বাহুল্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' এই ধরনের বস্তুনিষ্ঠ ও সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত বাংলা উপন্যাসের অগ্রদূত। ইংরেজি সাহিত্যেও এই ধরনের রচনার মধ্যে আর্নেষ্ট হেমিংয়ের অতুলনীয় রচনা 'ওল্ড ম্যান এন্ড দি সী' অথবা ডেনিস লাংসিসের 'জেলের ছেলে' (১৯৩৪) এই বিষয়ে স্মরণীয়। তবে এই ধরনের উপন্যাস অপেক্ষা মৎস্যশিকার কাহিনী রচনায় অনেক ইংরেজ লেখক উৎসাহ দেখান। স্টিফেন গুয়ইন এর 'ডাফার লক্ অ্যা ফিসার ম্যানস অ্যাডভেঞ্চার' (১৯২৪) নরমান হিলের 'অ্যা ফিসারম্যানস রিফ্লেকশনস' (১৯৪৪) অথবা অলিভার কাইটারের 'অ্যা ফিসারম্যানস্ ডাইরি' (১৯৬৯) প্রভৃতি গ্রন্থে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কাহিনীর পরিবর্তে মাছ শিকারের খুঁটিনাটি বর্ণনাই গুরুত্ব পেয়েছে।

'চিংড়ি' ও 'তিতাসের' প্রকাশ কাল ১৯৫৬ এবং 'গঙ্গা'র প্রকাশকাল ১৯৫৭। অর্থাৎ প্রকাশকালের বিচারে উপন্যাস তিনটি সমসাময়িক রচনা। এই সময়ের কিছু কিছু বস্তুগত তথ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। ১৯৬১-৬২ সালের এক নমুনা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল

ভারতের সমুদ্র উপকূলের মৎস্যজীবীদের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে কম এবং কেরলে সবচেয়ে বেশি। এইসব মৎস্যজীবীরা দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। এইসব তথ্য আলোচ্য উপন্যাস তিনটিতেও পাওয়া যায়। সমাজতাত্ত্বিক বিচারে যাদের বলা হয় ক্ষুদ্রমৎস্যজীবী তাদের কথাই এই তিনটি রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। দারিদ্র্য, জীবিকার অন্তর্গত অনিশ্চয়তা ও কারিগরী দক্ষতা এবং সর্বোপরি বংশগত বিশ্বাস ও ঐতিহ্য এগুলিই সাধারণ সাদৃশ্য-সূত্ররূপে পারিবারিক আর্থিক সামাজিক ও লৌকিক জীবনের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। 'তিতাসে'র গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, 'চিংড়ি'-র চেম্পনকুঞ্জু ও 'গঙ্গা'-র বিলাস একই দারিদ্র্যের শিকার, একই ধরনের দোচালা ঘরের বাসিন্দা এবং একই ভাবে কর্মশক্তি প্রয়োগে দারিদ্র্য দূর করার নিরন্তর প্রয়াসে মগ্ন, কিন্তু দারিদ্র্য, মহাজনের ঋণ আর ক্রমাবর্তিত দুঃখ চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়েই চলে। জীবিকাগত অনিশ্চয়তা তার সাথে সমস্যাকে গভীর করে তোলে। 'তিতাসে'-র চৈত্রের খরায় নদী যখন নিষ্করুণ হয় তখন 'সামনে মহাকালের শুষ্ক এক কঙ্কালের ছায়া দেখিয়া তারা এক সময় হতাশ হইয়া পড়ে।' 'গঙ্গা' এই ছায়ারই অন্য নাম চৈত্র টোটকা অর্থাৎ চৈত্র মন্বন্তর। আর 'চিংড়ি'তে সমুদ্রতীরের প্রতি জেলেই উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করে মাছের মরশুমের। কেননা অন্য সময় কাপ্পা আর ফেনভাত খেয়ে তাদের দিন কাটে।

প্রকৃতপক্ষে জীবিকার সংগ্রাম চিত্র আঁকতে গিয়ে আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটির কথা অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। 'চিংড়ি'-তে ত্রিকন্নপুড় পালানি পাঁচ বছর থেকে পরের নৌকায় দিন মজুরি করে খায়। তার নিজের নৌকা ও জাল নেই। প্রথমে সে দড়ি টানার কাজ করত, পরে একটু বড় হয়ে নৌকাতে কাজ পেল। নীরকুন্নাথর চেম্পনকুঞ্জু পেশাগত দক্ষতায় অন্যদের শ্রদ্ধা অর্জন করে। 'গঙ্গা'র বিলাস নিজস্ব দক্ষতায় সাঁইদার হয়ে ওঠে। 'তিতাসে'ও দেখি সুবলের বাবা গগন দিনমজুরি করে অন্যের নৌকায়-'সে সারা জীবন কাটাইয়াছে পরের নৌকায় জাল বহিয়া।' তার ছেলে সুবল 'মনিবের অসঙ্গত আদেশ পালন' করতে গিয়ে নৌকার তলায় চাপা পড়ে মারা যায়। তার বৌ-যার মধ্যে 'বিপ্লবী নারী বাস করে' এবং তার পাগল হয়ে মরে যাওয়া বন্ধু কিশোরের ছেলে অনন্ত – এই দুটি চরিত্রে অবশ্য ভিন্নতর সমাজতত্ত্বের পরিচয় ফুটে ওঠে। এই পরিচয় 'তিতাস'কে শুধু স্বাতন্ত্র্যদানই করেনি, সমাজতাত্ত্বিকতার রস রূপায়নের গৌরবদান করেছে।

'গঙ্গা' উপন্যাসে মৎস্যজীবীদের মাছধরার একটি বিশেষ মরশুমি আশাকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে। জেলে, কৈবর্ত, নিকিরী, চুনুরী, মালো প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের মৎস্যজীবীদের পূর্ব-দক্ষিণ থেকে লম্বা রাস্তা পেরিয়ে কেষ্টপুরের খাল গেট দিয়ে বাগবাজারের গঙ্গার মাছ ধরতে আসার কাহিনী দিয়েই শুরু। কিন্তু মূলত মালোবংশের বিলাস ও তার বাগখুড়োর কার্যকলাপই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। জনৈকা দেহাপজীবিনীর মেয়ে হিমির সঙ্গে বিলাসের প্রেম এই উপন্যাসের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। অবশ্য হিমির প্রেম বিলাসের অনির্দেশ্য ছুটে চলা জীবনে প্রেরণা দিয়েছে। এই রকমই একটি সমাজনিন্দিত

প্রেমের কথা বর্ণিত হয়েছে 'চিংড়ি' উপন্যাসেও। কারুতাম্মা নামে এক জেলের মেয়ে ভালবেসেছিল মুসলমান মৎস্য ব্যবসায়ী পারীকুট্টিকে। প্রথমদিকে কারুতাম্মার বাবা চেম্পনকুঞ্চু পারীকুট্টির কাছে টাকা ধার নিয়ে দেনাগ্রস্ত হলেও মেয়ের বিয়ে দেয় পালনি নামে এক চালচুলোহীন কিন্তু সাহসী জেলের সঙ্গে। কিন্তু জেলের বৌ অসতী হলে তার স্বামীকে সমুদ্রদেবী শাস্তি দেয় – এই লৌকিক বিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত পালনির জীবনে সত্য হয়ে ওঠে। যদিও বিবাহের পর কারুতাম্মার অসতী হয়ে উঠতে দেখা যায়নি। প্রেমে ও একনিষ্ঠ সাধনায় পারীকুট্টি নিজেকে বিলিয়ে দেয় ও চেম্পনকুঞ্চের শঠতায় পথে বসে, অন্যদিকে বিবাহ-পূর্ব প্রণয় কারুতাম্মার জীবনে অভিশাপ হয়ে ওঠে।

'গঙ্গা'র সঙ্গে 'চিংড়ি'র যেটুকু কাহিনীগত সাদৃশ্য 'তিতাস'-এর ক্ষেত্রে তা আশা করা যায় না। কিন্তু কিছু কিছু অন্তর্মিল লক্ষ করার মত। 'গঙ্গা'র মরশুমি যাওয়া আসা, সমুদ্রে আহ্বানে ধেয়ে চলা অথবা 'চিংড়ি'র সমুদ্র পটভূমির বিশালত্ব 'তিতাসে' পাওয়া যাবে না। 'গঙ্গা' উপন্যাসে বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্যজীবীদের উল্লেখ আছে। 'চিংড়ি'র আরায়ান, ওয়ালাকারন, মুকাওয়ান, মরয়াকান প্রভৃতি নানা জাতের মৎস্যজীবীদের নিজস্ব কর্মজগৎ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ অংশ হয়েছে। 'তিতাসে' মালোদের কথাই বর্ণিত। তার সঙ্গে মিশে আছে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। যে নীতিবোধের শাসন 'চিংড়ি'র জেলেদের জীবনের প্রধান প্রেরণা, তা 'গঙ্গা' বা 'তিতাসে'ও সত্য। গোষ্ঠীগত জীবনে মোড়ল বা মাতব্বরদের পরামর্শ, স্বজাতে ও কমবয়সে মেয়েদের বিবাহ, ঋণগ্রস্ত জীবনে অভাব ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও কর্মতৎপরতা অর্থবল ব্যক্তির প্রভুত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলোও এই সব উপন্যাসে কমবেশি একই ভাবে বর্ণিত। 'তিতাসে'র ছড়িয়ে থাকা কাহিনীর মধ্যে বীজকারের সেই সব বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব যা 'চিংড়ি' বা 'গঙ্গা'য় পাওয়া যায়। কিন্তু 'তিতাসে' বর্ণিত কিছু বৈশিষ্ট্য একান্তভাবেই গ্রন্থটির নিজস্ব।

'তিতাস' কাহিনী চারটি ভাগে এবং প্রত্যেকটি ভাগ আবার দুটি উপবিভাগে বিভক্ত। উপবিভাগের নামগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম ভাগের দুটি উপবিভাগের নাম 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও 'প্রবাস খণ্ড'। এখানে মূলত তিতাসের কূলে বসবাসকারী মালো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার সাধারণ পরিচয় এবং মালো যুবক সুবল ও কিশোরের উত্তরে প্রবাস যাত্রা বর্ণিত। 'তিতাস' ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, মালোদের অফুরন্ত চাহিদা মেটাতে গিয়ে, দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এই যাত্রা। তারপর শুকদেবপুর গ্রামে তাদের যাত্রা ভঙ্গ। বাঁশিরাম মোড়লের আতিথ্যলাভ সেখানে প্রেমের ফাঁদ ও কিশোরের বিবাহ এবং ফেরার পথে নতুন বধূর অন্তর্ধানে কিশোরের পাগল হওয়ার কাহিনীর সঙ্গে মিশে পূর্বাঞ্চলের নদী বিহারীদের জীবনযাত্রার বর্ণনা। বাউল গান, বারোমাসি, পুঁথিপড়ার সুর ছাড়াও দোলমণ্ডলে কৃষ্ণকথার গান প্রভৃতিও পরিবেশরচনার উপযুক্ত উপাদান হয়ে ওঠে। এখানে 'গঙ্গা'য় খুড়োর সঙ্গে বিলাসের নদী

যাত্রার ভাগের নৌকায় মাছ ধরা, গান গেয়ে নৌকা চালান ইত্যাদি কিছু আপাত সাদৃশ্য থাকলেও বাঁশিরামের মত মোড়লের বর্ষার জলে একাকার বিলে মাছ ধরা, মালোদের বসন্তোৎসব বা বিবাহ রীতির উল্লেখ প্রভৃতি 'তিতাস'-এর নিজস্ব।

'চিংড়ি' উপন্যাসে আছে মোট ২০টি পরিচ্ছেদ এবং প্রথম দশটিতে কারুতাম্মার বিবাহ, পূর্ব জীবন ও পরের দশটিতে বিবাহ-পরবর্তী জীবনের কাহিনী সমানুপাতিকভাবে বর্ণিত। 'গঙ্গা' উপন্যাস কোনো পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়নি,কাহিনীর ধারাবাহিকতা বা নদীর বহমানতার প্রতীকী রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য। 'তিতাস'-এ এই ধারাবাহিকতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙে আবার জোড় দিয়ে লেখক অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন। তাই দ্বিতীয় ভাগের 'নয়া বসত' ও 'জন্ম-মৃত্যু বিবাহ' উপবিভাগ দুটিতে নাটকীয় চমৎকৃতির সাথে কাহিনীর ক্লাইমেক্স সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। 'নয়া বসতে' কাহিনী যেন আবার কুমারীদের ব্রত মাঘমণ্ডলের পুজো ও নৌকাযাত্রায় নতুন করে শুরু হয়। আসলে তো এই ভাগে কিশোরের হারিয়ে যাওয়া বৌ, ছেলে অনন্তকে সঙ্গে করে স্বামী সন্ধানে আসে বিধবার বেশে। এই গ্রামে অপরিচিত হয়েও সে পায় আশ্রয় ও কিশোরের মৃত বন্ধু সুবলের বিধবা বৌ-এর সখীত্ব এবং পাগল স্বামী কিশোরের সাক্ষাৎ। শেষ পর্যন্ত তার সেবা শুশ্রূষা রোগ নিরাময়ের চেষ্টা। শেষ পর্যন্ত তা বিফল হয় যখন পাগল কিশোরের হাত থেকে উদ্ধারের সময় সমবেত জনতার হাতে মার খেয়ে কিশোরের ও পরে অসুস্থতাবশত তার নিজের মৃত্যু ঘটে।

দ্বিতীয় ভাগের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে 'তিতাস' -এর সঙ্গে অন্য দু'টি উপন্যাসের অন্তর্মিল লক্ষ করা যায়। প্রথম ভাগে কিশোরের সঙ্গে বিবাহের সময় তাঁর বৌ ছিল পঞ্চদশী এবং এটা ছিল জেলে সমাজের একটা অনিয়ম। 'পদ্মানদীর মাঝি', বা 'চিংড়ি'তে অল্প বয়সে জেলে মেয়েদের বিবাহের নিয়মের কথা শোনা যায়। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তার জীবনে যে প্রশ্ন বড় হয়ে উঠতে পারত তা হল, 'পাগল যদি কোনদিন ভাল হয় সেও বলিবে, ডাকাতে তোমাকে অসতী করিয়া ছাড়িয়া দিয়েছে।' কিন্তু এই প্রশ্ন ইচ্ছা করেই উপন্যাসে অবান্তর করে তোলা হয়েছে। কেননা কিশোরের বৌ-কে তার আপাত বিধবার বেশ নিয়েই নবজন্ম লাভ করতে হয়েছে, তবুও প্রশ্ন জাগে 'পুরুষ যদি বউ মরিলে আবার বিবাহ করিতে পারে, নারী কেন স্বামী মরিলে আবার বিবাহ করিতে পারে না।' 'চিংড়ি' উপন্যাসে সতীত্বের প্রশ্ন উপন্যাসের মূল ভিত্তি আর 'তিতাসে' মালোদের জীবনে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রতিবাদটাই যেন উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে।

এই উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'নয়া বসতে' বর্ণিত 'দশ জনের সভার বৈঠকে'। এই সভাতেই ঠিক হয় যে 'গোকর্ণ মালোরা মাছ বেচতে কোনও দিন মাশুল দেয় না, দিবেও না'। একথা সকলেরই জানা যে 'রায়তেরাই সত্য। তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মাটির মালিক হয় তারাই। কাগজপত্রের মালিক নয়, বাস করার মালিক। সেই রূপ তিতাসের মালিক জেলেরা।

কাগজপত্রের মালিক আগরতলার রাজা। মাছ ধরার মালিক মালোরা'। এই ইঙ্গিতের বেশি আর কিছু বর্ণনা লেখক ইচ্ছা করেই দেন না উপন্যাসের রসসৃষ্টির ব্যাঘাত না ঘটানোর কারণে। তাই সুবলের মর্মান্তিক মৃত্যুদৃশ্য আমাদের ভাবায় 'একটা মনিবের অসঙ্গত আদেশ আর একটা নিরুপায় ভৃত্যের তাহা পালনের জন্য মৃত্যুর মুখে ঝাঁপাইয়া পড়ার দৃশ্যটা'। এখানে মনে রাখতে হবে যে 'চিংড়ি'তে মোড়লকে পয়সা দিয়ে প্রভাবিত করেছিল চেম্পনকুঞ্জু। সামাজিক অন্যায়ের ও দুর্নীতির সামাজিক চিত্র ফুটে ওঠে উপন্যাসে। এটা কিছু সৃষ্টির অন্তরায় হয়নি বলা যায়। 'তিতাসে' মোড়লরা প্রভাবশালী ও তাদের অনুমতি ভিন্ন তিতাসে মাছ ধরা যায় না। তবে এ উপন্যাসে সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে দুই বিপরীত ধর্মী দুই নারী চরিত্রের সহাবস্থানে – সুবলার বউর মধ্যে বিপ্লবী নারী বাস করে। কিন্তু অনন্তের মার মনে বাসা বাঁধিয়াছে এক সর্বনাশা সাংসারিক কামনা।'

পাগল কিশোরের বৌ অর্থাৎ অনন্তের মা এবং সুবলার বৌ (অর্থাৎ দীননাথ মালোর মেয়ে বাসন্তী) দুই ভিন্ন ধরনের ব্যর্থতা ও বঞ্চনার প্রতীক চরিত্র। আর অনন্ত চরিত্রটি হল সেই ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে সার্থকতার এক নতুন মাত্রা। উপন্যাসটির বাকি দুটি ভাগে এই মাত্রা সংযোজিত। তৃতীয় ভাগের দুটি উপবিভাগের নাম 'রামধনু' ও 'রাঙা নাও' ও চতুর্থ ভাগের উপবিভাগ দুটির নাম যথাক্রমে 'দুরঙা প্রজাপতি' ও 'ভাসমান'। দ্বিতীয় ভাগে ও বাবার মৃত্যুর পর অনাথ অনন্তকে সুবলার বউ মানুষ করলেও তৃতীয় ভাগে তাকে প্রায় কেড়ে নিয়ে অন্য গ্রামে যায় উদয়তারা। এই ভাগের কাহিনী যেন নতুন করে শুরু হয়। উদয়তারার ভাই বনমালীর নৌকাযাত্রার বর্ণনায়। শ্রাবণমাসে মালোদের ঘরে ঘরে পদ্মাপুরাণ পাঠের প্রথা ও ঐ মাসের শেষ দিন মনসা পুজোর বর্ণনার সঙ্গে মিশে যায় অনাথ অনন্তের নতুন পরিবেশে বড় হয়ে ওঠার কাহিনী। অনন্তের সঙ্গে 'চিংড়ি'র অনাথ বালক পালানির একটা সাদৃশ্যও দুর্লক্ষ্য নয়। পালানির কেউ ছিল না, সে ছোটবেলা থেকেই জেলেদের সঙ্গে কাটিয়ে একদিন সেরা ও সাহসী জেলে হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রায় নিয়তির মত এক অদৃশ্য শক্তির কাছে তার পরাজয় ও সাগরের ঘূর্ণি ঝড়ে পড়ে তার লড়াই ও বীরত্বপূর্ণ মৃত্যু পাঠককে এক ট্রাজিক নায়কের সন্ধান দেয়। অনন্তর সঙ্গে তার সাদৃশ্য ঐ অনাথ কিশোরের পাকা জেলে হয়ে ওঠার সময় পর্যন্ত। কিন্তু 'তিতাসের' লেখক অনন্ত নামে এই বালক চরিত্র সৃষ্টির দ্বারাই উপন্যাসে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। কেননা অনন্তই অধ:পতিত মালোদের মধ্যে আশার আলো জাগিয়েছিল। এখানে 'তিতাসে'র সমাজতাত্ত্বিক এক ভিন্ন রূপ ধরা পড়ে।

চতুর্থ ভাগে বর্ণিত হয়েছে মালোদের আঁটোসাঁটো সামাজিক সংবন্ধ-গাঁথুনির ভাঙন, দুঃসময় ও অনন্তর লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে ওঠা। তৃতীয়ভাগে অল্প রঙে আঁকা মাগন চরিত্রে দেখা যায় সে কেমন করে লোককে ঋণের জালে জড়িয়ে তাকে ভিটেমাটি ছাড়িয়ে জমি জিরাত দেনার দায়ে নিলাম করিয়ে অবশেষে শেষ সর্বনাশটুকু করতে চায়। অনুরূপে সর্বস্বান্ত হবার উপক্রম হল কাদিরের। অবশেষে হতভম্ব কাদির যখন সব সহ্য করতে মনস্থ করে তখন একদিন

নারকেল গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে তার আত্মহত্যা বিস্ময়াবহ বলেও এ কাহিনীতে স্বাভাবিক। আবার মালোদের একতায় যে ভাঙন ধরল তাও তাদের নিয়তি হয়েই দেখা দিল। কিন্তু আসলে তো তা অর্থ বুদ্ধিতে বলবান শ্রেণীর জয়। মালোদের নিজস্ব গান তথা সংস্কৃতি থেকে আলাদা যাত্রা-সংস্কৃতি এসে যখন তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল তখন তারা দু'ভাগ হল। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়ল, বৃদ্ধ রামদয়াল, গুরুদয়াল প্রতিকারে অক্ষম। ভাটিয়ালী, হরিবংশগান প্রভৃতির স্থান গ্রহণ করল হালকা কবির গান। এসময় সুবলার বৌ, মোহন প্রভৃতি কেউ কেউ বিপন্ন সংস্কৃতি রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে মাত্র। সুবলার বৌ -এর মধ্যে যে বিপ্লবী নারী বাস করত এই স্থানে সে আত্ম প্রকাশের চেষ্টা করে।

'চিংড়ি' যে অর্থে ব্যক্তির ট্রাজেডি 'তিতাস' সেই অর্থেই ব্যষ্টির ট্রাজেডি। সমষ্টির বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি, সামাজিক নীতির বন্ধন, এসব কিছু যখন ভাঙনমুখী তখন আত্মক্ষয় ও কলহ মর্মান্তিক। তাই 'ক্রমে মানুষ্যত্বের পর্যায় হইতে তারা অনেক নীচে নামিয়া গেল। এত নীচে নামিয়া গেল যে, শত্রু নাকের ডগায় বসিয়া শত্রুতা করিয়া গেলেও মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিত না।' লোন কোম্পানীর বাবুরা বন্দুকধারী পেয়াদা নিয়ে টাকা আদাযের জন্য মালোদের ওপর যে অত্যাচার করে তাও মর্মান্তিক। তারপর যখন তিতাসে চড়া পড়ে গেল তখন অনেক মালোই গ্রাম ছেড়ে যেখানে চলে গেল 'সেখানে বড় লোকেরা মাছ ধরার বড় রকমের আয়োজন করিয়াছে।' এটা হল সেই 'মেকানাইজেশন' যা ছোট মৎস্যজীবীর অস্তিত্বকেই বিপন্ন করেছে। 'চিংড়ি'-তে এই ছোট ব্যবসায়ীদের বিপন্নতার কথা থাকলেও ব্যষ্টির ব্যাপক ধ্বংসের কথা নেই।

আধুনিক সমাজতত্ত্বের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক 'তিতাস' এর মধ্যে ফুটে উঠতে দেখা যায়। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকরা যে 'অ্যাকশন গ্রুপ' বা কর্মীসংঘের কথা আলোচনা করেছেন তা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শহর বা গ্রামে 'অ্যাকশন গ্রুপ' বলতে তাদেরই বোঝায় যারা কোনো বিশেষ এলাকার গোষ্ঠী বা মানুষের দল এবং যারা কোনো দরিদ্র, অনুন্নত অথবা সামাজিকভাবে অনুন্নত অথবা সামাজিকভাবে উৎপীড়িত জাতি বা সম্প্রদায়ের মানুষকে তাদের নিজেদের জীবনের মান উন্নয়নের বিষয়ে সচেতন করার কাজ করে। এই দলের সঙ্গো কোনো রাজনৈতিক বা প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর কোনো সম্পর্ক থাকে না, যদিও এই বিষয়ে তারা সচেতন হতেও পারে। এই তত্ত্ব কথাটা 'তিতাসে'র শেষ ভাগের কাহিনীতে সাহিত্যরূপ লাভ করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। মালোদের বিপর্যয় দিনে তাদের আত্মবোধ ও নিজস্ব সংস্কৃতিবোধে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছে মোহন ও সুবলার বৌ। সেই সময়েই এই 'অ্যাকশান গ্রুপের' শুরু। মোহন ও তার দল নবাগত যাত্রাদলের সঙ্গো প্রতিযোগিতায় নিজেদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে রক্ষার চেষ্টা করেছে – 'মোহনের বাড়িতে যারা আসরে মিলিয়া বসিয়া গিয়াছে তাদের চোখে মুখে সংস্কৃতি রক্ষার দৃঢ়তা।' কিন্তু সারা মালোপাড়া যে দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়াছে – যাকে লেখক 'দুরন্ত প্রজাপতি' বলতে চেয়েছেন – তার হাত থেকে মোহন স্বজাতিকে বাঁচাতে পারেনি।

মালোরা যখন নিজেদের পুরুষানুক্রমিক সংস্কৃতি চর্চার ভুলে হালকা যাত্রার আসরে ডুবে গেল তখন 'মাত্র দুটি নরনারী গেল না, তারা সুবলার বৌ আর মোহন'। এই পরাজয়কেই লেখক মালোদের আত্মসত্তা হারানোর অবস্থা বলেছেন। কিন্তু সেই দুর্দিনে সেই আত্মক্ষয়ী কলহ ও অবক্ষয়ের দিনে – মাথা তুলতে চাইল অনন্ত। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় 'বাবুদের সঙ্গে মিলিয়ে সে লোকের উপকার করিয়া ফিরিতেছে।' বিরামপুরের ঘাটে যখন তাদের নৌকা লাগল তখন তাকে কেউ চিনতে পারেনি। মালোদের জন্য সহৃদয় কাদির নিজের ধানের গোলা খুলে দিল অভুক্ত নিরন্ন মালোদের অন্ন যোগাতে। অনন্তর চেষ্টা – যাদের সঙ্গে তার শিক্ষার সংস্কৃতির বেশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তাদের মরণের সময় মুখে জল দেবার জন্যও সে প্রস্তুত। এই প্রস্তুতিকে সমাজতাত্ত্বিকরা 'অ্যাকশন গ্রুপের'র স্তর বা 'সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারিজম' বলেছেন। উপন্যাসের শেষে তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। তবে এই সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উপন্যাসের রসভঙ্গ করেনি, বরং একান্তভাবে তা উপন্যাসটির শিল্পসুষমাকে উজ্জ্বল করেছে। 'অ্যাকশন গ্রুপের' দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের কথা (যাকে সমাজতাত্ত্বিক বলেছেন 'র‍্যাডিক্যাল ন্যাশানালিজম' ও 'সোসালিস্ট ওরিয়েন্টেশন') এ উপন্যাসে যে পাওয়া যায় না তা ঐ শিল্প সুষমারই অন্য দিক।

'চিংড়ি'র পরিণতিতে সমুদ্রগর্ভে পালানির নৌকাসহ মৃত্যুর এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য বর্ণিত। 'তিতাসের' সমাপ্তিতে মালোদের ব্যাপক বিপর্যয়, অবক্ষয় ও ধ্বংসের ছবি আছে। মালোপাড়ার মাটিতে মালোরা নেই, সেখানে ঢেউ লুটিয়ে পড়ে, কিন্তু অবক্ষয়িত মালোরা সম্প্রদায়গত ঐক্যবন্ধন ত্যাগ করে মৃত্যু ও বিচ্ছেদের শিকার হয় একথা সত্য হলেও শেষ সত্য নয়। 'চিংড়ি'-তে পালানিরা স্বজাতির ধর্মীয় তথা লৌকিক বিশ্বাসে ভর দিয়ে পথ চলে আর 'তিতাসে'র অনন্ত স্বজাতির মঙ্গলকার্যে ব্রতী হয়ে নতুন করে পথ সন্ধান করে। 'চিংড়ি'তে ব্যক্তির পরাভব, 'গঙ্গা'র ব্যক্তির বিদ্রোহ নতুন করে জেগে ওঠার লক্ষণ আর 'তিতাসে' ব্যক্তি ও সমষ্টির পারস্পরিকতায় সমাজ রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি। তিনটি রচনাই তিন শক্তিশালী ভারতীয় লেখকের অনন্য জীবনসন্ধান এবং সাহিত্যিক বিচারে তিনটি অবিস্মরণীয় রস-সৃষ্টি।

তিতাস রস-সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে কবি মঞ্জুভাষ মিত্র তার প্রবন্ধ "তিতাস-বাস্তবতার স্বরূপ ও পাশ্চাত্য প্রভাব" - এ বলছেন :

"তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসটি তার লিরিকলাবণ্যময় নামের জন্য শুরুতেই পাঠকের মনে একটা প্রত্যাশা জাগিয়ে দেয়, প্রথম অ"শে রয়েছে ঘটনার এক তরল রঙীন বহতা এবং জীবন-অনুভূতির আনন্দময় বিস্তার। রাখালিয়া পট মনের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করে এবং অপরূপ লোকগানের ছন্দ ও স্বর এসে হৃদয়কে যেন অধিকার করে নেয়। কিন্তু এই আনন্দময় শুরুটুকু কাহিনীর পরবর্তী অংশের সঙ্গে বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছে, তিতাস কোনো সুখনদী নয়, ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে একটি দুঃখনদীর নাম।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটিকে বাস্তবতাবাদী বা realistic উপন্যাস বলতে পারি, এ উপন্যাসে বাস্তবতাবাদ অথবা realism -এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। উপন্যাসে বাস্তবতার অর্থ শুধু দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ও ক্ষুদ্র, খণ্ড ঘটনাবলী এবং দৃশ্যাবলীর বিবৃতি নয়, মানবজীবনের বাস্তব দুঃখ, বঞ্চনা, নিপীড়ন ইত্যাদির বিশ্বস্ত চিত্র নির্মাণ। তিতাসে মানবজীবনের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার কিছু বিবরণ রয়েছে, রয়েছে সাদামাটা জীবনযাপন চিত্র, অন্যদিকে পাচ্ছি হতশ্রী দারিদ্রবিড়ম্বিত জীবনের ছবি, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বর্ণনা। অতএব এই উপন্যাসে বাস্তব সমাজবাস্তবের পথ ধরে এবং গোর্কির 'মাদার' যে অর্থে রিয়েলিজমের পথবাহী, তিতাস একটি নদীর নাম, সেই অর্থে রিয়েলিজমের পথবাহী। যদিও অদ্বৈত মল্লবর্মণ, গোর্কির মত করে নিপীড়িত মানুষের বিপ্লবে ওঠার ছবি আঁকেননি, তবু তিনি দেখিয়েছেন এক বিপুল সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র এবং সেই ক্ষয় ও ভূমিমূল থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মানুষের অপসারণ অনেকটাই মানুষের দ্বারা সৃষ্ট।"

'ভাসমান' নামক শেষ অধ্যায়ে দুঃখ চিত্রের একটা সংক্ষিপ্তসার লেখক দিয়েছেন। মালোদের সঙ্গে কায়স্থ ইত্যাদি অন্যান্য জাতিসম্প্রদায়ের মনোমালিন্য এবং পাশাপাশি তিতাস নদীর সংকুচিত হয়ে আসা পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। "শেষে এমন হইল যে, লোন কোম্পানীর বাবুরা বন্দুকধারী পেয়াদা লইয়া আসিয়া টাকা আদায়ের জন্য মালোদের উপর যখন অকথ্য অত্যাচার চালাইয়া যথাসর্বস্ব লইয়া গেল, তখনও তারা কিছুই বলিতে পারিল না।" এ হল এক ধরণের সামাজিক অন্যায়। অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার বাস্তব ছবিও লেখক এঁকেছেন, "বর্ষাকালে জল বাড়িয়া তিতাস কানায় কানায় পূর্ণ হইল। বর্ষা অন্তে সে জল সরিয়া যাওয়াতে সেই চর ভাসিয়া বুক চিতাইয়া দিল। কোথায় গেল এত জল, কোথায় গেল তার মাছ। তিতাসের কেবল দুই তীরের কাছে দুইটি খালের মত সরু জলরেখা প্রবাহিত রহিল, তিতাস যে এককালে একটি জলেভরা নদী ছিল তারই সাক্ষী হিসাবে।" চর দখল করতে এল নানাখান থেকে কৃষকরা। "দুই তীরের উচ্চতা ডিঙ্গাইয়া একদিন দূর-দূরান্তের কৃষকেরা লাঠিলাঠা লইয়া চরের মাটিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পরস্পর লাঠালাঠি করিয়া চরটিকে তারা দখল করিয়া লইল।" এখানে মালোদের ভূমিকা শুধু দর্শকের। তারা জেলে, জলের সঙ্গে তাদের মেলবন্ধন, মাটিতে বাসা বাঁধলেও মাটি তাদের কেউ নয়। রামপ্রসাদের মত বয়স্ক মালো চরের মাটি দখল করতে গিয়ে মারা গেল। "তবে পাইল কে। দেখা গেল, যারা অনেক জমির মালিক যাদের জোর বেশি, তিতাসের বুকের নয়ামাটির জমিনের মালিকও হইল তারাই।" এখানেও লেখক সরাসরি একটা উদ্যত প্রশ্নের দিকে আমাদের ঠেলে দিয়েছেন – দেখা যাচ্ছে গরীবরা আরো গরীব হচ্ছে, ধনীরা আরো ধনী। সবচেয়ে বড় কথা মালোরা ভাগ্যের কাছে নিস্তেজ আত্মসমর্পণে কোন মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে না।

উপন্যাসের শেষে দেখি একটানা একটা বিদায় ও মৃত্যুর মিছিল চলেছে। "অনেক মালো পরিবার গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেছে।" কেউ বইছে মালের বস্তা, কেউ বা করছে ভিক্ষা। কেউ মরে রক্ষা পেল। বাসন্তী,যার পরিচয় সুবলের বউ, সে মৃত্যুকালে স্বপ্ন দেখেছিল গরম ভাতের।

বালজাকের ভিতর এঙ্গেলস লক্ষ্য করেছিলেন রিয়েলিজমের জয়। সত্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও আন্তরিকতা যদি রিয়েলিজমের ধর্ম হয়, তিতাসের লেখকের মধ্যে তা রয়েছে। যে গল্পের ছবি তিনি এঁকেছেন তার দর্শক শুধু তিনি নন, সে সমাজের মধ্যে তিনি বাস করেছেন। গেওর্গ লুকাচ মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, বালজাক অথবা টলস্টয়ের মত রিয়েলিস্টরা সমাজের জ্বলন্ত সমস্যাকেই তাঁদের উপন্যাসের প্রারম্ভবিন্দু করেছেন। তাঁর উক্তি, "No one experienced more deeply than Balzac the torments which the transition to the capitalist system of production inflicted or every section of the people, the profound moral and spiritual degradation which necessarily accompanied this transformation on very level of society –" ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি যে পরিবর্তন আনলো তাতে সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষেরই দুর্দশা ঘটল – সমাজের সর্বস্তরে দেখা গেল প্রচণ্ড নৈতিক ও আত্মিক অধঃপতন। (Studies in European Realism – ভূমিকা – George Lukacs)। এই পরিবর্তিত সময়ে ঔপন্যাসিক একসাথে হয়ে উঠলেন মহান রিয়েলিস্ট ও জনপ্রিয় মানবতাবাদী। অদ্বৈত মল্লবর্মণের মধ্যে এই বাস্তবতাবাদী ও মানবতাবাদীর সম্মিলন দেখা যায়। উপন্যাসের জীবনদর্শনেই রয়েছে মানবতাবাদ, এই মানবতা বীজরূপে উদগত হয়েছে পরবর্তীকালীন অনন্ত চরিত্রের মধ্যে।

সার্তর বলেছেন, উপন্যাস জীবন নয় কিন্তু তা জীবনেরই মত। উপন্যাসে বাস্তবতার ভাবসংকেত রয়েছে এখানেই। এটা মানতে হবে, নভেলের বাস্তব পরিকল্পিত বাস্তব, সত্যিকারের পৃথিবীটায় তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। 'তিতাস একটি নদীর নাম' পাঠ করলে উদয়তারা, বাসন্তী, কিশোর, সুবল, অনন্তবালা চরিত্রগুলিকে বাস্তবের খাঁটি ছেলে মেয়ে বলেই মনে হয়, যদিও এও বুঝতে পারি বাইরের পৃথিবীতে তারা ঠিক অবিকল এইভাবে ছিল না।

"All fiction is fiction" সব উপন্যাসই লেখকের কল্পিত, এ কথা অবশ্যই সত্যি। কিন্তু আধুনিক বাস্তববাদী উপন্যাসে কার্যকারণের সঙ্গত ব্যাখ্যা ও তথ্যবস্তুর প্রতি সত্য-আনুগত্য অবশ্যই থাকে। আবার রিয়েলিজম সবসময়েই যে প্রত্যক্ষ প্রমাণযুক্ত বস্তু সম্পর্কিত তা নয়। ভার্জিনিয়া উল্‌ফকে এজন্যই একজন রিয়েলিস্ট ঔপন্যাসিক বলা যায় যে তিনি তাঁর উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা দেখিয়েছিলেন। জর্জ লেভিন "Realism Reconsidered প্রবন্ধে ঔপন্যাসিক বাস্তবতার দশটি লক্ষণ বা সূত্র দেখিয়েছেন। উপন্যাস কল্পনার ফসল – এ কথাটাই মূল্যবান – Mimetic language, the language of

'realistic' fiction, explores not only the possibilities of what is but the possibilities of what should be'. (দ্রষ্টব্য Essentials of the theory of Fiction : Ed. by Hoffman & Murphy)। রিয়েলিস্টিক উপন্যাসের ভাষা আসলে শিল্পের অনুকৃত ভাষা, শুধু যা আছে তা নয় যা হতে পারত তারও অনুসন্ধান করে। বলাবাহুল্য এখানে রয়েছে অ্যারিস্টটলীয় অনুরণন। যা হোক, 'তিতাস একটি নদীর নাম' রিয়ালিস্টিক উপন্যাস এ কথা যদি বলা হয়, তখন স্বভাবতই মনে রাখতে হবে লেখক শুধু বাস্তবকে প্রতিফলিত করেন নি, যা ঘটেছে তাকে দেখান নি, যা ঘটতে পারত তাকেও দেখিয়েছেন। তাই তাঁর প্রবর্তিত তিতাস-পরিবেশ, মালোজীবন, বিভিন্ন চরিত্র, ঘটনাসংঘাত সব নিরাভরণ নিছক বাস্তব নয় – সেখানে কল্পনার যথাযথ প্রলেপও পড়েছে। নইলে শুধুই কাঠামো হোত, প্রতিমা হোত না। অতএব বলতে পারি রিয়েলিজমের একটা নমনীয় সংজ্ঞাই উপন্যাসটির পক্ষে বেশী কার্যকরী। উত্তীর্ণ বাস্তবতার একটি দুটি উদাহরণ দিচ্ছি –

"স্ফটিকস্বচ্ছ জলের দিকে অনন্ত একবার মুখ বাড়াইয়া দেখিল। জলে তার ছোট মুখের ছায়া পড়িয়াছে। তারই ভিতর দিয়া দেখা যায় জলের স্বচ্ছতা ভেদ করিয়া জাগিয়া আছে বালিময় তলদেশ, দুই একটা শামুক হাঁটিয়াছে, তার রেখা বালিব বুকে আঁচড় কাটিয়াছে। ছোট ছোট বেলে মাছ সে বালিতে বুক লাগাইয়া চুপ কবিয়া আছে, যেন হাত বাড়াইলেই ধরা যাইবে। একটুও নড়িবে না।"

অথবা,

"শীতল পাটীর মত স্থির, নিশ্চল তিতাসের বুকের উপব একবার চোখ বুলাইয়া উদয়তারা কহিল, 'আর সু-শয্যা পইড়া আছে শুইবার লোক নাই – এর 'মান্‌তি' কই শুল ! সু-শয্যা এই গাঙ কেমন সু-বিছানা। ধূলা নাই, ময়লা নাই, উঁচা নাই নিচা নাই – পাটীর মত শীতল। শুইলে শরীর জুড়ায়, কিন্তু শুইবার মানুষ নাই।"

– এইসব দৃশ্য, এইসব মানুষ, এইসব কথাবার্তা বাস্তবে, কখনও ঘটেনি, সেই মুহূর্তে এরা অনুষ্ঠিত হয়নি, তবু কল্পনা দিয়ে এদের সম্ভাব্যতাটুকু নির্মাণ করে নিয়েছেন – এরা হয়ে উঠেছে সেরা বাস্তব। এবার অন্য প্রসঙ্গ।

সাহিত্যে নদী নিয়ে উপন্যাস লেখা হয়েছে। মিখাইল শলোকভের লেখা Quite Flows the Don. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পদ্মানদীর মাঝি' ইত্যাদির নাম সহজেই মনে পড়ে 'তিতাসে'র পূর্বসূরি অবশ্যই – 'পদ্মানদীর মাঝি'। তিতাসের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৫০, তুলনায় 'পদ্মানদীর মাঝি' আয়তনে ছোট। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র ১০৪। পাশাপাশি দুটি উপন্যাস পড়তে গেলে মনে হয় 'পদ্মানদীর মাঝি'র ভাষাই যেন, কিছুটা দিকবদল বাকবদল করে 'তিতাস একটি নদীর নামের' ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন – "তবু নদী ছাড়া সবই বাহুল্য। আকাশের রঙীন মেঘ ও ভাসমান পাখি, ভাঙন ধরা তীরে শুভ্র কাশ

ও শ্যামল তনু, নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এসব কিছুই যদি না থাকে শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জলস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালোবাসিবে সারাজীবন। মানবী প্রিয়ার যৌবন চলিয়া যায়, পদ্মা তো চিরযৌবনা। বৈচিত্র্য? কী তার প্রয়োজন? নূতন পৃথিবী কে খোঁজে, কে চায় পদ্মার রূপের পরিবর্তন, শুধু ভাসিয়া চলার অতিরিক্ত মোহ। অদ্বৈত মল্লবর্মণ লিখছেন – "তারার স্বল্প আলোয় নদীর বুক ঝাপসা সাদা। তারই উপর দুই একটা মাছ ফুট দিতেছে আর তারাগুলি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে উঠিতেছে। অনন্তের বিস্ময় জাগে। উপরে তো ওরা এক এক জায়গায় আঁটিয়া লাগিয়া আছে? জলে কি তবে তারা আলগা। মাছেরা কেমন তাদের কাঁপাইতেছে, নাচাইতেছে, তাদের লইয়া ভাইবোনের মত খেলা করিতেছে। কি মজা! অনন্তর মন মাছ হইয়া জলের ভিতর ডুব দেয়।" দুজনার উপন্যাসেই নদী চরিত্র হয়ে উঠেছে, দুজনের উপন্যাসেই আঞ্চলিকতা ডানা বিস্তার করেছে। তবে 'পদ্মানদীর মাঝি'র চেয়ে 'তিতাস একটি নদীর নামে'র আঞ্চলিকতা আরো বেশি সম্পূর্ণ ও সর্বাত্মক।

'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রসঙ্গে মিখাইল শলোকভের Quite Flows the Don উপন্যাসের নাম মনে পড়ে যায়, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত শলোকভের উপন্যাসটিরও কেন্দ্রে একটি নদী স্বর্ণসূত্রের মত প্রবাহিত। জননদী অঞ্চলে বসবাসকারী কশাকদের জীবনগাথা এখানে, সে হিসাবে আঞ্চলিকতা এ লেখাটিরও প্রাণকেন্দ্র। শলোকভ (১৯০৫-১৯৮৪) তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসটি লিখেছিলেন ১৯২৫-১৯৩৯ সালের সময়কালে। বিশাল মহাকাব্যিক আয়তনের এই রুশ ভাষার উপন্যাসটি মস্কোর রাদুগা পাবলিশিং কর্তৃক চারখণ্ডে প্রকাশিত। অনুবাদক রবার্ট ড্যাগলিশ। স্টকহোমে নোবেল প্রাইজ নেয়ার ভাষণে শলোকভ বলেছিলেন – "আমি চাই আমার বই যেন মানুষকে আরো ভালো হতে এবং নিজের প্রতি আরো সৎ হতে সাহায্য করে, মানবজাতির প্রতি জাগায় ভালোবাসা, এবং মানবতার আদর্শ, প্রগতি নিয়ে কাব্যরচনার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে।"

রাশিয়ান উপন্যাসটি এইভাবে শুরু হয়েছে – "তুর্কীদের সঙ্গে শেষ অভিযানের আগেরটি চলার সময় কশাক প্রোকফি পেলিকভ তারা গ্রামে ফিরল।" বিখ্যাত ডন কশাকদের ইতিহাস রীতিনীতি প্রথা ঐতিহ্য তাদের ডন-আশ্রিত জীবনধারা লেখক অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। আঞ্চলিকতা তাই এই উপন্যাসের একটি প্রধান গুণধর্ম। ডন নদীর দু'তীরে বাসকারী কশাকজাতি – 'কশাক' শব্দটি মূলে তুর্কী, অর্থ মুক্ত মানুষ। তারা বীর যোদ্ধাজাতি। উপন্যাসের বহুলাংশ জুড়ে আছে কশাকদের যুদ্ধ বিবরণী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া মিত্রশক্তির পক্ষে লড়েছিল জার্মানীর বিরুদ্ধে। ভয়াবহ ওইসব সংঘাতে কশাক অংশগ্রহনের কথা অনেকে বলেছেন। বলশেভিকদের বিদ্রোহে কশাকদের অংশগ্রহণের কথা এককথায় রাশিয়ার ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ অংশই রয়েছে উপন্যাসে। নায়ক গ্রেগরি পেলিকভ অথবা নারী চরিত্র আকশিনিয়া অবশ্য ঔপন্যাসিকের কল্পনার সৃষ্টি। কিন্তু এমন বহু চরিত্র আছে যারা বাস্তবে ছিল। উপন্যাসটি জীবন্ত হয়েছে, কারণ স্বয়ং লেখক ছিলেন এই কশাকভূমির বাসিন্দা। এখানেই তাঁর মহাকাব্যিক

আয়তনের উপন্যাসটির লেখা শুরু হয় এবং ১৯৮০ সালেও এখানেই একটা বিশাল বাড়ীতে তিনি বাস করতেন যেখান থেকে বাইরে তাকালে দেখা যেত প্রবহমানা ডন নদীকে। উপন্যাস থেকে ডন নদীর বর্ণনা-দিচ্ছি – "At Vyo-shenskaya the Don bends like the strem of a tartar bow. At first it seems about to swing away to the right, but a little further on, at the village of Bazki it straightens out again magistically and carries its greenish, blue tinted water past the chelly bluffs of the right-bank hills, past the villages that line the right bank, past the lonely staintsas of the left bank, and on to the sea, the blue sea of Azov."

অথবা

"It was a dry, smouldering summer. The Don grew shallow by the village, and where the current had once been fast and dangerous a crossing formed that the oxen could ford without wetting their backs. At night a clinging sultriness slid down the hill into the village and the breeze filled the air with the cloging scent of schorchd grass."

ডন চলেছে বাঁকের পর বাঁক নিয়ে, তার নীল-হালকা জল গ্রাম ছুঁয়ে পাহাড় ছুঁয়ে রাজেন্দ্রাণীর মত চলে যাচ্ছে সাগরের দিকে। ডন থেকে ভেসে আসছে একটা সরসর ঝর্ঝর ধ্বনি সারাদিন যেন এক দীর্ঘাঙ্গী রূপসী চলেছে আন্দোলন করে। এসেছে এক খর গ্রীষ্ম। গ্রামের কাছে ডন এখন বিশীর্ণা, বলদগুলো পর্যন্ত পার হয়ে যাচ্ছে পিঠ না ভিজিয়ে। রাত্রিবেলা বাতাসে ভেসে আসছে রোদে ঝলসে থাকা শুকনো ঘাসের গন্ধ। রাত্রিবেলা ঝড় আসছে কিন্তু এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। কখনো আবার ডনের তীরে তীরে বয়ে যায় সবুজ ঘাস আর সূর্যমুখীর খেলা। উষ্ণ দক্ষিণাবাতাসের তরঙ্গ থেকে বেজে ওঠে পশুদের গলার ঘন্টার ধ্বনি।

অদ্বৈত মল্লবর্মণও তার উপন্যাসে তিতাস নদীর নানা রঙের বর্ণনা দিয়েছেন। তিতাস একটি নদীর নাম। "তিতাস নামটি তাদের কাছে বড় মিঠা। তাকে তারা প্রাণ দিয়া ভালোবাসে, তাই এই নামের মালা তাদের গলায় ঝুলানো। তার নানা ঋতুতে নানা রঙ নানা রূপ। এখন বর্ষাকাল। এখন রামধনুর রূপ। দুই তীরে সবুজপল্লী। মাঝখানে সাদা জল। উপরের ঘোলাটে আকাশ হইতে ধারাসারে বর্ষণ হইতে থাকে। ক্ষেতের গৈরিক মাটিমাখা জলে শতধারে সহস্রধারে বহিয়া আসে। তিতাসের জলে মিশে। সব কিছু মিলিয়া সৃষ্টি করে এক মায়ালোকের একটা আবেশমধুর সরসী রামধনুলোকের।" তিনি আরও বলেছেন –

"তারা বহুপুরুষ ধরিয়া এই নদীর সঙ্গে পরিচিত। তাদের দিন রাতের সাথী বলিতে এই নদী। এর মনের অলিতে গলিতে তাদের অবাধ পথচলা। এর নাড়ি নক্ষত্র তাদের নখদর্পণে। চলাতেই স্রোতের একটুখানি আড় টিপিয়াই বুঝিতেই পারে কোথায় এর ব্যাধি ঢুকিয়াছে।"

মালোদের প্রাণের নদী তিতাস। ডনও তেমনি কশাকদের প্রাণের নদী। ডনের নামে তারা ছড়া কাটে – জীবন্ত ডন চির বহমান – "The Don's awake and stirring, ... /

It marches on, it marches on" কিন্তু তিতাস পারের মালোদের পরিচয় তারা দরিদ্র অশিক্ষিত জেলে। ডন পারের কশাকরা যোদ্ধাজাতি, সম্পদ ও স্বাস্থ্য তাদের বহুলমাত্রায় রয়েছে। অবক্ষয় নয় শলোকভ যেন মানবসভ্যতার ক্রমপ্রগতি আঁকতে বসেছেন। অতএব তুলনার উপসংহারে বলা যায় 'নদীর নামে দুটি উপন্যাস নামাঙ্কিত হলেও উপন্যাস ধর্মে তাদের মধ্যে নানা পার্থক্য আছে।'

ম্যাক্সিক গোর্কির 'ছেলেবেলা'তে লেখক বলেছেন, একদিন তিনি চলে গেলেন জীবনের পথে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের নায়ক অনন্তও একদিন চলে গিয়েছিল জীবনের পথে। সে তার জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়েছিল কিনা, অনন্তবালার সঙ্গে তার মিলন হয়েছিল কিনা, এসব কথা আমরা জানতে পারি না। বইটি পড়ার পর বন্ধ করে রাখলেও শুধু একটা করুণ মূর্ছনা আমাদের প্রাণে অনেকক্ষণ অনেক দিন ধরে বাজতে থাকে। উপন্যাসটি সত্যিই একটু অন্য ধরনের, বহুর ভীড়েও এর জাত চেনা যায়।

এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মূল কেন্দ্রীয় বিষয় হল তার জীবন ও ছন্দ। তিতাসের অন্তর্নিহিত ছন্দের কথা বলতে গিয়ে শ্রী জীবেন্দু রায় তার "তিন নদী তিন ছন্দ" প্রবন্ধে লিখছেন ...

"উপন্যাসে পটভূমির গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই। ঠিকই যে, চরিত্রকে কেন্দ্র করেই সব কিছু। কিন্তু তার আশ্রয় তো এই স্থানকাল। শুধু আশ্রয় বললে হবে না। শব্দটিকে আরও ব্যাপ্তি দিয়ে এই কথা বলা সঙ্গত হবে যে এই পটভূমি একটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মানুষের জীবনে রক্তের অন্তর্গত সংস্কারের মত। তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিদিনের আরাম-অভ্যাস সব কিছুতেই এই পটভূমি বা অঞ্চলের অমোঘ অস্তিত্ব। অনেক সময়ই অবশ্য লেখক শুধু চরিত্রগুলির ওপরেই আলো ফেলেন বা ঝোঁক দেখান। সেখানে পটভূমি বা অঞ্চল অনেকটাই বাইরের ব্যাপার। স্পষ্ট যে, হয় লেখক তার ওপর জোর দিতে রাজি নন অথবা দুটি ব্যাপারকে সমন্বিত করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। পাঠক-পাঠিকা সেক্ষেত্রে চরিত্র ধরেই এগিয়ে যান।"

এতো গেল ঘাটতির দিকের কথা। অর্থাৎ পটভূমি বা অঞ্চলের যেখানে সীমিত প্রকাশ। কিন্তু যেখানে তার প্রাচুর্য বা আতিশয্য এবং যেখানে তা ব্যক্তি চরিত্রকে সর্বজনীন মানবতায় পৌঁছে দিতে পারছে না সেখানে সব ব্যাপারটিই নিতান্ত আঞ্চলিক বা স্থানিক সামগ্রী হয়েই থাকে, সাহিত্য-শিল্পের যা সবচেয়ে বড় দাবি অর্থাৎ সর্বজনের কাছে সমান মান্যতায় গৃহীত হওয়া, তার থেকে এর দূরত্ব থেকেই যায়। পটভূমি বা অঞ্চলকে ব্যবহার করতে হবে শিল্প এবং জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, যেন ভেতরের মানুষগুলি পটভূমির ছায়ার আড়ালে না চলে যায়। এমনকি, যখন ইতিহাসই পটভূমি তখন লেখক অবশ্যই লক্ষ রাখবেন যে সময় বা ইতিহাসের বাতাবরণ চরিত্রের চেয়ে দীর্ঘতর না হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে দেখতে হবে, এই সময়ের মানচিত্রে যেন বড় কোনো ত্রুটি না থাকে। বঙ্কিম যেমন 'রাজসিংহ'-এ

ঔরংজীবের পরাজয় পর্যন্ত দেখিয়েছেন যা ইতিহাস অনুমোদিত নয়। যদিও এ উপন্যাসের চরিত্রগুলিতে ইতিহাসের স্পন্দন আমরা প্রকৃতই অনুভব করেছি। উজ্জ্বল মজুমদার ভাববার মত কথা লিখেছেন এই প্রসঙ্গে যেখানে তিনি এ সংক্রান্ত আলোচনার ধারার বিরুদ্ধে গিয়েই বলেন যে, 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' বা 'মৃণালিনী' প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়; তা না হলেও এই উপন্যাসগুলির ঐতিহাসিক অংশে ইতিহাসের পটভূমি ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক 'রাজসিংহ'-এর ঔরংজীব চরিত্রের তুলনায় অনেক বেশি ত্রুটিহীন, যে জীবনকথা আশ্রয় করে তার বিস্তার তার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাও যথেষ্ট গাঢ়।

মোট কথা, আঞ্চলিক উপন্যাস বা গল্প সাহিত্যের এই শাখায় এমন এক রূপায়ণ, যার লক্ষ্যই হল একটি বিশেষ স্থান এবং তার জনসমষ্টিকে, তার জীবনধারার বিচিত্র প্রবাহকে একান্তভাবে সেই স্থান বা পটভূমিরই অবিমিশ্র সৃষ্টি হিসেবে উপস্থাপিত করা – তার রঙ গন্ধ আর সমগ্র অস্তিত্ব সমেত। সাধারণভাবে সেই স্থান বা পরিবেশ আধুনিক নাগরিক কিছু নয়, তা একান্তভাবেই গ্রামীণ জীবন সম্পৃক্ত ব্যাপার। লেখকের নিবিড় অভিজ্ঞতা এই সৃষ্টির একরকম প্রধান শর্ত। সেই অঞ্চলকে, তার মানুষকে সেই মানুষের ভাষাকে পর্যন্ত গভীরভাবে না জানলে তাকে তিনি তৈরি করে তুলতে পারেন না। কল্পনা এবং অনুভূতির তীব্রতায় 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'গোরা' বা 'চতুরঙ্গ' -এর মত উপন্যাস রচিত হতে পারে, কিন্তু 'গণদেবতা' বা 'পঞ্চগ্রাম' রচনা করা অসম্ভব।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত স্মরণীয় সমালোচক 'পটভূমি' বা 'আঞ্চলিক' বিশেষণের সঙ্গে 'বৃত্তিজীবনমূলক' কথাটিও ব্যবহার করেছেন। 'অপরিচয়ের' রহস্য তো আছেই, আর আছে 'সুদুর' ভৌগোলিক দূরত্বে অবস্থিত কোনো একটি অঞ্চলের 'বিশিষ্ট জনপ্রকৃতি', তাদের সংস্কার-সামাজিক রীতিনীতি – সব কিছুরই খুঁটিনাটি ছবি। এতেই যে এই ধরনের উপন্যাসের পুরোটা বলা হল তা কিন্তু নয়। তবে স্থানের স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠলেও এও খেয়াল রাখতে হবে যে অনেক সময়ই তা একই সংস্কৃতির অন্তর্গত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের রাঢ়, বারেন্দ্র প্রভৃতি অঞ্চলের জীবনকথা কিছু কিছু সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক রীতিমূলক স্বাতন্ত্র্য বা বিশিষ্টতা উপন্যাসে জায়গা পেলেও এ কিন্তু 'এক অখণ্ড বাঙালী সংস্কৃতির'ই অংশ; সেইজন্য এদের মধ্যে 'সাধারণ লক্ষণ'-ও অনেকটাই অভিন্ন। তাছাড়া রয়েছে 'উগ্র', 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য'-ও। সময় যত আধুনিক হয়েছে ততই 'প্রতিহত' হয়েছে 'আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য'। ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত ঃ প্রত্যন্ত স্থানের যে সব 'ভূমিখণ্ডে' ব্যক্তিজীবনকে অধিকার করেছে গোষ্ঠীজীবন, যেখানে আদিমকালের মত সংস্কার তথা 'সমষ্টিগত জীবনাদর্শ' ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার 'কণ্ঠরোধ' করেছে অকরুণভাবে, এককথায় যেখানে ব্যক্তিপরিচয়ের চেয়ে 'কৌমশাসনই' মানুষের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে, 'আঞ্চলিক' বা পটভূমি নির্ভর সাহিত্যের যথার্থ অস্তিত্ব সেখানেই।"

পেশা বা জীবিকানির্ভর জীবনকথা বলতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' বা মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল' উপন্যাস দু'টির কথা অবশ্যই মনে পড়বে। এ জীবিকার সঙ্গে বিপদ

বা প্রতিকূলতাও জুড়ে আছে। বিশেষ করে জেলেদের মাছ ধরার বিচিত্র সব বৃত্তান্ত। হেমিংওয়ের 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সি' এইরকমই জেলেদের কাহিনী, যারা হেরে গিয়েও হারে না, মানুষ শত প্রতিকূলতাতেও যেন শেষ পর্যন্ত অপরাজিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসটিতে অবশ্য প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষের চেয়ে 'জীবনের ছোটখাট দ্বন্দ্ব-অতৃপ্তিই প্রাধান্য' পেয়েছে। এটি ততটা নদীতে মাছমারার কাহিনী নয়, যতটা নদী থেকে ঘরে ফেরা জেলেদের প্রতিদিনের 'জীবনও হৃদয় সমস্যার অশান্ত আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ।' শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অসামান্য লিখেছেন যে, "নদী এখানে তাহার বাস্তবসত্তার ঊর্ধ্বস্থিত একটি অর্থরূপক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষকে তা ঘর ভেঙে করেছে বিবাগী। এখন তার সামনে যে যাত্রাপথ তাকে নিরুদ্দেশ বললেই ঠিক হয়।

পশ্চিমের যে সাহিত্য আমাদের মোটমুটিভাবে জানা পরিধির মধ্যে পড়ে, সেই ইংরেজিতে টমাস হার্ডির বা আরো আধুনিককালের উইলিয়াম ফক্‌নারের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়বে। 'ধীর প্রবাহিনী ডন' উপন্যাসের বিখ্যাত রুশ লেখক মিখাইল শলোকভের কথাও বহুজনবিদিত। বাংলা সাহিত্যে এক্ষেত্রে তারাশংকর, সতীনাথ ভাদুড়ী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলবার মত একান্তভাবে আঞ্চলিক জীবনকথা তথা পটভূমি নির্ভর উপন্যাস বা গল্প লিখেছেন। পাত্র-পাত্রী বা নায়িকার বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের চেয়ে এসব জায়গায় বড় হয়েছে একটি মানবগোষ্ঠীর জীবনযাপন, তাদের আনন্দ, দুঃখ, – সবার ওপরে তাদের বিকাশের, অস্তিত্বরক্ষার সমস্যা ও সংকট। দেখবার যে, নাগরিক অভিজাত বা শিক্ষিত মধ্য বা নিম্নবিত্ত মানুষের কথা পটভূমি বা অঞ্চলনির্ভর উপন্যাসের বৃত্তে প্রধানভাবে আসে না। যাদের আমরা প্রান্তিক মানুষ বলি, সমাজের মূলপ্রবাহের মধ্যে থেকে যাদের দূরে রাখা হয়েছে, যারা একেবারে সেই নিচের তলায় মানুষ এই সব উপন্যাসের মধ্যমণি তারাই।

একথাও বলবার যে, আঞ্চলিক পটভূমি সম্পর্কে নিবিড় অভিজ্ঞতা থাকলেই যে লেখকের রচনার শিল্পসিদ্ধি অবারিত হবে এমন কোনো কথা নেই। শুধুমাত্র আঞ্চলিক বর্ণনাতে এটা সম্ভবও নয় যদি না তা একই সঙ্গে সর্বজনীন মানবিকতার স্পর্শে সমৃদ্ধ হয়, অঞ্চল বা পটভূমির বিবরণে লেখক যদি ক্রমশ রচনাকে ভরে তোলেন তাহলে বলতেই হবে যে আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা যথার্থ শিল্পরূপ পেল না। উজ্জ্বল মজুমদারের মনে হয়েছে তারাশংকরের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' বা 'রাধা'র মত উপন্যাসে এই গোত্রীয় অসংযত দীর্ঘ বর্ণনা পাঠককে কিছুটা ক্লান্ত করতে পারে। একথাও লিখেছেন, 'এই আঞ্চলিক মানুষগুলির আদিম নাটকীয় দ্বন্দ্ব গল্প কাহিনীর আকর্ষণ বাড়িয়ে আঞ্চলিক রসকে ক্ষুণ্ণ করেনি। ... হাঁসুলি বাঁকের উপকথা-য় আঞ্চলিক সত্তা ও মানবসত্তা একাত্ম ঠিকই, তবে মাঝে মাঝে আঞ্চলিক সত্তার দীর্ঘ ছায়া তার ভিতরকার মানুষগুলিকে লুকিয়ে ফেলে।'

'আরণ্যক' উপন্যাসের চরিত্রগুলি এরকম অঞ্চল বা পটভূমিধৃত – জীবনকে জিতবার যে প্রাণান্তক সংগ্রাম, তার বর্ণনার পরিবর্তে যে আরণ্যক সভ্যতা সময়ের তীক্ষ্ণশাসনে লুপ্ত

হতে চলেছে, বিভূতিভূষণ তারই অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। অরণ্যের গাছপালা এবং জ্যোৎস্নার মতই রাজু পাঁড়ে, মটুকেশ্বর বা কুন্তারাও এই অরণ্যজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানিকের 'পদ্মানদীর মাঝি' থেকেই উপন্যাসে পটভূমি বা অঞ্চলের দীর্ঘছায়া পাঠক প্রত্যক্ষ করেন। সতীনাথের 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ', মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল' ও সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' এইরকম অঞ্চলের পটে ফুটে ওঠা সৃষ্টি। সর্বজনীন মানবিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেই তারা একটি জায়গার ওপর রঙ্দারি করেছে। অজয়-ময়ূরাক্ষী-ধলেশ্বরীকে সত্যি রেখেই তার সঙ্গে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, কাবেরী নর্মদারও মিশে যাওয়া।

'তিতাস একটি নদীর নাম' – এর এই হল সংক্ষিপ্ত উপক্রমণিকা। এই নাম বিশেষভাবেই যেন বলে দেয় একটি নদী ও সেই নদীসংলগ্ন মানুষগুলির জীবনকথা, তাদের সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনা সমেত কোথায় আলাদা। এ সবই দৃশ্যত আঞ্চলিক প্রসঙ্গ। তারাশংকর যখন তাঁর 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' বা 'পঞ্চগ্রাম' বা 'চণ্ডীমণ্ডপ' – এর মত উপন্যাস লিখেছিলেন একটি বিশেষ পটভূমিকে ধরে, তার মানুষকে নিয়ে এক মহাভারতীয় উত্থানের স্বপ্ন অসহযোগের ভারতবর্ষকে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা-বেদনাকে তিনি এইভাবেই নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সৃষ্টির বৃত্তে।"

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' খুব শাদা ভাষায় লেখকের অভিজ্ঞতারই ফসল। তিনি যে মালো (মল্ল) সম্প্রদায়ের জীবনকথাকে নিয়ে কাহিনীর কথাশরীর গড়ে তুলতে চেয়েছেন তারা অস্পৃশ্য। তারা লক্ষ করেছে যে ওপরের তলার, ওপরের জাতের মানুষেরা তাদের সংস্পর্শ-সংস্রব সর্বতোভাবে পরিহার করে চলে। মালোরা দৃশ্যত অপরিচ্ছন্ন। তাদের গায়ে চাদর নেই, পায়ে নেই জুতো।

উঁচু জাতের (বর্ণ) মানুষদের বাড়ি গেলে তাদের সম্পর্কে তীব্র বিরাগই প্রকাশ পায় : 'তুমি মালোই থাকিবে, তারা তোমার বাড়ি আসিলে যদি সিংহাসন দাও, তুমি তাদের বাড়ি গেলে বসিতে দেবে ভাঙ্গা তক্তা। তুমি রুপার হুঁকাতে তামাক দিলেও, তোমাকে দিবে শুধু কলকে খানা।' বা, 'গ্রামের চক্রবর্তী ঠাকুর পুরোহিত দর্পণ খুলিয়া মালোদিগকে বুঝাইয়াছে বিধবার বিবাহ দিলে নরকে যাইতে হইবে, কাজেই ব্রাহ্মণ পন্ডিতের কথা শিরোধার্য করিয়া রামপ্রসাদকে তারা অগ্রাহ্য করিয়াছে।'

গল্পটি একটু বলতে হয়। সবারই জানা। তবু আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য তার প্রয়োজন আছে। জেলেদের চৌয়ারি ভাসান উৎসবকে কেন্দ্র করেই তার শুরু। এখানে নায়িকা বাসন্তী। বয়স মাত্র সাত। দুই মালো তরুণ – কিশোর এবং সুবল তার প্রতি অনুরক্ত। উপন্যাসের একেবারে প্রথম দিকে দেখি তারা মাছ ধরতে চলেছে। সে এক দূর যাত্রা। অদ্বৈত তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। মাছ ধরতে যাওয়ার পথে যেতে যেতে বড় নদীতে ঢুকে পড়া,

মানুষের ভিড়ে কর্মব্যস্ত বন্দর। নদীর দু'ধারের প্রাকৃতিক শোভা, তীরসংলগ্ন জেলেদের বলবার মত আতিথ্য, ধর্ম সাধনার সঙ্গে যুক্ত এমন গান বাজনা, বড় ঝেলে মহাজনদের কাছে আশ্রয় পাওয়া প্রচুর মাছ সেই সঙ্গে শুকদেবপুরের বসন্ত উৎসব, সে উৎসব শুধু বাইরের কোনো ব্যাপার নয়, ভেতরে বাইরে মিশিয়েই তার প্রকাশ। হঠাৎ দুই গ্রামের জেলেদের মধ্যে মারামারি। তার বাইরের ছবিও যেমন মনোরম, তেমনি জায়গা পেয়েছে জেলে সমাজের দিন যাপন, প্রতিদিনের সংস্কার সংস্কৃতি; রয়েছে তাদেব অন্তরের কথাও। এই বসন্ত উৎসবেই যেন সব পরদা উড়ে যায়, কিশোর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পৌছয় তার প্রথম প্রিয়ার কাছে। মালোদেরও কোনো আপত্তি নেই এই গোপন বিয়েতে। সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে কিশোরকে তারা গ্রামে ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দুর্বিপাক এমনই যে গ্রামে পৌছবার ঠিক আগেই দস্যুরা অপহরণ করেছে কিশোরের সর্বস্ব – তার জমানো টাকা এবং নতুন বউ সবই। এ আঘাতের জন্য তৈরি ছিল না কিশোর। সে উন্মাদ হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হচ্ছে এর প্রায় চার বছর পরে। মালোদের জীবনেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। উন্মাদ কিশোরের জন্য তার সংসারটাই হয়ে গেছে ছন্নছাড়া। তার বাবা-মা'-র জীবনের সামান্য সুখ শান্তিটুকুও হারিয়ে গেছে। বাসন্তীকে বিয়ে করার পর এক দুর্ঘটনায় সুবলও বাঁচেনি। দস্যুদেব হাতে পড়া কিশোরের নতুন বউ আশ্রয় পেয়েছে পাশের গ্রামের এক জেলে পরিবারে। তার একমাত্র সন্তান অনন্তকে সঙ্গে নিয়ে নতুন বাসা বেঁধেছে শ্বশুরের গ্রামেই। এখানে সে একেবারেই অপরিচিত। দুটি দুর্ভাগিনী মেয়ের অতঃপর একটিই পরিচয় – একজন অনন্তর মা, আর একজন সুবলেব বউ।

অদ্বৈত এঁকে চলেন অনন্তর মা'র নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রাণপণ চেষ্টার কথা, সেই সঙ্গে সঙ্গী সুবলের বউয়ের সঙ্গে তার আন্তরিক সম্পর্কের বিবরণও। জগৎ ও জীবন নিয়ে বালক অনন্তর বিচিত্র ভাবনা-কল্পনা। এই নিয়েই ভেতরে বাইরে বড় হয়ে উঠছে সে। 'স্থানগত ঐক্য' বাদ দিলে প্রথম খণ্ডের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। নিজের অস্তিত্বরক্ষার জন্য, আরও সহজ ভাষায় জীবন ও জীবিকার জন্য, অনন্তর মা'র যে লড়াই, তার বুননেই ফুটে ওঠে মালোদের কথা, তাদের নিয়ে যে গ্রামজীবন – তার ছবি। তাদের ভেতরকার ব্যবস্থা, শাসনপ্রণালী। শিশুর জন্ম, বিয়ে, কালীপুজো, পিঠে পার্বণ – সমস্ত কিছুকে অবলম্বন করে অনন্তর মা জড়িয়ে যায় নতুন বসত এই গ্রামজীবনের সঙ্গে। উন্মাদ স্বামীকে ঠিকমত চিনতে পারেনি সে। অথচ অদ্ভুত এক ব্যথাময় আকর্ষণ তার প্রতি। এই আকর্ষণই যেন দুর্বার। লোকে কী বলবে এ শোনারও যেন দায়বদ্ধতা নেই তার। একটাই তখন তার লক্ষ্য – অসুস্থ মানুষটাকে সুস্থ করে তুলতে হবে। বাসন্তী কিন্তু সখীর সঙ্গে তার ভালবাসার কিছুমাত্র হেরফের করেনি, নিজের বাবা-মা'-র আপত্তি বা বিরক্তি সত্ত্বেও। এই সহমর্মিতা উঠে এসেছে তার হৃদয়ের একেবারে ভেতর থেকে। দোলের দিন উন্মাদ কিশোরকে কুমকুমে রাঙিয়ে প্রথম প্রেমের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে যত্ন নিয়েছে – এই অনন্ত'র মা। পাগলের পাগলামি

যেন চল্‌কে উঠেছে। তারপর সেই পাগলের মতই আদর! তাতে গুরুতরভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে স্ত্রীর শরীর, নিজেও খেয়েছে বেদম মার। এক অদ্ভুত প্রতীকী মিলনের মত দুজনেরই করুণ মৃত্যু।

তৃতীয় খণ্ডে অনন্তই যেন হয়ে উঠছে কেন্দ্রবিন্দু। এসেছে আরো কিছু নতুন চাষি এবং জেলে চরিত্র। চরিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে আমিনপুরের চাষি কাদির। জেলে বনমালী, বনমালীর বোন উদয়তারা এবং সুবলের বউ। ঘটনা এগিয়ে চলেছে এদেরই সহযোগিতায়। অনন্তর মায়ের শ্রাদ্ধ সুবলের বউয়ের তৎপরতাতেই সম্ভব হয়েছে। তার বাবা-মায়ের এ ব্যাপারে তীব্র আপত্তি ছিল, তা সত্ত্বেও অনন্তর মাসী হতে তার এতটুকু সময় লাগেনি। কিন্তু ঘটনাধারার এমনই পরিহাস যে পারিবারিক নানা অশান্তিতে তিতিবিরক্ত হয়ে এই স্নেহের অনন্তকেই সে তাড়িয়ে দিয়েছে। অনন্ত উদয়তারার সঙ্গে চলে গেছে তার বাপের বাড়ি। এখন সে বনমালীর পরিবারেরই একজন। এই গ্রামেব এবং তাব মানুষগুলির দিনযাপনের ছবি অদ্বৈত এঁকেছেন পরম মমতায়। একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ছে যেখানে দেখি বনমালীর গ্রামে (যেখানে অনন্ত উদয়তারা থাকে) এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব প্রভাতী গান গাইতে গাইতে অনন্তকে বুকের মধ্যে চেপে ধরেছে, তার মনে হয়েছে সে আর কেউ নয় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং গৌরাঙ্গদেব দুই-ই। সমস্ত শ্রাবণ মাস জুড়ে এখানে মনসার গান গাওয়া হয়, পড়া হয় পদ্মাপুরাণ। বেহুলার কথা মনে রেখে মেয়েদের মধ্যে অদ্ভুত বিয়ের অনুষ্ঠান, তাদের ছোটখাট রঙ্গতামাশা, অনন্তবালার 'প্রণয়াভাস সরস পরিচয়', নৌকোর প্রতিযোগিতা, শিশু রমুর ছেলেমানুষে সাধ আহ্লাদ সবই এঁকে গেছে বিচিত্র জীবনকথার আল্‌পনা। বাইচ নৌকোয় যেতে যেতে বাউল, ভাটিয়ালি বা সারীগান আবহমানের বাংলাদেশকেই মনে পড়িয়ে দিয়েছে অদ্ভুত মমতায়। পল্লীগ্রাম তার সমস্ত সুখ-দুঃখ আনন্দবেদনা নিয়ে সরাসরি উঠে এসেছে উপন্যাসের চালচিত্রে। এই বাইচ খেলার সূত্রেই অনন্তর সঙ্গে দেখা হয়েছে বাসন্তীর, 'প্রতিহত' স্নেহ রূপ নিয়েছে 'হিংস্র' আক্রমণের। নির্দয়ভাবে সে মেরেছে অনন্তকে, অনন্তর বর্তমান দলবলও তাকে ছেড়ে দেয়নি; তার কপালেও জুটেছে অকরুণ মার। অদ্বৈত দেখিয়েছেন ভেতরে ভেতরে ইতিমধ্যে অনন্তও কতটা পরিণত চিন্তা ও কল্পনাশীল মানুষে পরিণত হয়ে উঠেছে। আকাশের ইন্দ্রধনুর সঙ্গে তার বর্ণময় কল্পনার কী বিচিত্র যোগ। পরের অংশে দেখি লেখাপড়ার জন্য তাকে শহরে পাঠানো হয়েছে। সেখানে ভেতর থেকেই নতুন জীবনের ডাক শুনতে পায় সে। আড়ালে পড়ে যায় আগেকার স্বপ্ন আর কল্পনা। অনন্তবালা সেই শাশ্বতী প্রণয়িণীর মতই তার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু নতুন জীবন তথা দেশের স্বপ্নে উদ্বেল অনন্ত আর তার ফেলে আসা সেই ছেলেবেলাকার পরিবেশে ফিরে যায় না।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'সমাজচিত্র' হিসেবেই চতুর্থ খণ্ডের গুরুত্ব বা আকর্ষণ। কীভাবে মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতি বাইরের বিজাতীয় সংস্কৃতির চটুলতায় বিপর্যস্ত হচ্ছে, অদ্বৈত মল্লবর্মণ সেই ক্ষয় আর লুপ্তির কথাও শুনিয়েছেন যথোচিত অনুপুঙ্খতায়। বৈষ্ণবধর্ম

তথা 'হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি' যে আমাদের বৃহত্তর সমাজজীবনের কতটা ভেতরে পৌঁছেছিল, তাকে করে তুলেছিল অসাধারণ 'প্রাণশক্তি' সম্পন্ন, ড. বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য উপন্যাস থেকে সে কথাও নির্যাসের মত খুঁজে পান। এ কথাও তিনি বলতে চান যে 'এই অমূল্য উত্তরাধিকারের' অবলুপ্তি ঘটেছে, 'সুলভ চটকদার আধুনিকতার মোহে'-ই, বাঙালির সমাজ-বিপর্যয়কেও তা ত্বরান্বিত করেছে। এই সংস্কৃতিকে হারিয়েছি বলেই সামাজিক সংহতি, সহযোগিতার মনোভাব, আর্থিক সচ্ছলতা, জীবনের মর্যাদাবোধ এবং বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা সবই লুপ্ত হয়েছে। প্রতীকের মতই যেন নদীকে গ্রাস করেছে চর – চোখের সামনে পাঠক দেখতে থাকেন তিতাস তীরবর্তী মানুষগুলির অর্থনৈতিক ক্ষয় কী দ্রুত করুণ থেকে করুণতর অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে। এই ক্ষয় শুধু একটি সম্প্রদায়মাত্রের পক্ষে সত্য নয়, তা প্রতীকের মতই ধরেছে সমস্ত বাঙালি জীবনকে – বিশেষকে ছুঁয়ে নির্বিশেষকে স্পর্শ করার মত।

মোট কথা, উপন্যাসে অদ্বৈতের যে অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে, সে অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্রে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনকেই গাঢ় বেদনায় শিল্পিত করে তুলেছেন তিনি। এখানে অবশ্যই আছে একটি আঞ্চলিক পটভূমি – তিতাস নদীর যেখান থেকে জন্ম হচ্ছে এবং যেখানে গিয়ে শেষ হচ্ছে – খাদকপুর থেকে নবীনগর পর্যন্ত নদীসংলগ্ন মানুষ ও জনপদের কথা এই উপন্যাসের অন্তরঙ্গ বিষয়। মেঘনা ও বিজয় নদীর তুলনাও এখানে এসেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল এইটি দেখানো যে এই দুই নদী সংলগ্ন মানুষের জীবন আর তিতাস সংলগ্ন মানুষের জীবন কতটা পৃথক .

'তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। ...

মেঘনা-পদ্মার বিরাট বিভীষিকা তার মধ্যে নাই। আবার রমু মোড়লের মরাই, যদু পণ্ডিতের পাঠশালার পাশ দিয়া বহিয়া যাওয়া শীর্ণ পল্লীতটিনীর তোরা কাঙ্গালপনাও তার নাই। তিতাস মাঝারি নদী। দুষ্ট পল্লীবালক তাতে সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে না। আবার ছোট নৌকায় ছোট বউ নিয়া মাঝি কোনদিন ওপারে যাইতে ভয় পায় না।

তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মত বক্রতা নাই, কৃপণের মত কুটিলতা নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাঁটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয়, কিন্তু কাঙ্গাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্বেল করে না।'

বা, 'তিতাসের তেরো মাইল দূরে এমনি একটি নদী আছে। নাম বিজয় নদী। তিতাসের পারের জেলেদের অনেক কুটুম বিজয় নদীর পারের পাড়াগুলিতে আছে। ... চৈত্রের খরায় নদী কত নিষ্করুণ হয়। একদিক দিয়া জল শুকায় আর একদিক দিয়া মাছেরা দমবন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় নাক জাগাইয়া হাঁপায়। মাছেদের মত জেলেদেরও তখন দম বন্ধ হইতে থাকে। ... যারা বর্ষায় ঘরের মায়া ছাড়িয়া বাহির হয় নাই তারাই পড়ে বিপদে। নদী ঠন্‌ঠনে। জাল ফেলিবে কোথায়। তিন কোনা ঠেলা-জাল কাঁধে ফেলিয়া আর-এক কাঁধে গলা-চিপা ডোলা বাঁধিয়া এ-পাড়া সে

পাড়ায় টই-টই করিয়া ঘুরিতে থাকে, কোথায় পানা পুকুর আছে মালিকহীন ছাড়া বাড়িতে। চার পাড়ে বন বাদাড়েরর ঝুপড়ি। তারই ঝরাপাতা পড়িয়া, পচিয়া ভারি হইয়া তলায় শায়িত আছে। তারই উপরে ভাসিয়া উঠিয়া ছোট মাছেরা ফুট দেয়।... মাছেদের ভাবনার অন্ত নাই।'

তুলনা করে অদ্বৈত লেখেন –

'যারা বিজয় নদীর দশা দেখে নাই, বছরের পর বছর কেবল তিতাসের তীরেই বাস করিয়াছে, তারা এমনি করিয়া ভাবে না। তারা ভাবে তিন কোনা ঠেলা জাল আবার একটা জাল। তারে হাঁটু জলে ঠেলিতে হয়, ওঠে চিংড়ির বাচ্চা। হাত তিনেক তো মোটে লম্বা। বিজয়ের বুকে তাই ডোবে না। তিতাসের জালে কত বড় বড় জাল ফেলিয়া তারা কতরকমের মাছ ধরে। এখানে যদি তিতাস নদী না থাকিত, বিজয় নদী থাকিত, তবে নাকের চারদিক থেকে বায়ুটুকু সরাইয়া রাখিলে যা অবস্থা হয়, তাদের ঠিক সেই রকম অবস্থা হইত। ওদের মত ঠেলা জাল ঘাড়ে করিয়া গ্রাম-গ্রামান্তরের খানা-ডোবা খুঁজিয়া মরিতে হইত দুই আনা আর দশ পয়সার মোরলা ধরিবার জন্য।

জেলেদের বৌ-ঝিরা ভাবে অন্যরকম কথা – বড় নদীর কথা যারা শুনিয়াছে। যেসব নদীর নাম মেঘনা আর পদ্মা। কি ভীষণ! পাড় ভাঙ্গে। নৌকা ডোবায়। কি ঢেউ। কি গহীন জল। ... তাদের পুরুষদের মাছ ধরার জীবন। রাতে বেরাতে তারা জলের উপরে থাকে। অতবড় নদীতে তারা বাহির হইত কি করিয়া। তাদের নদীতে পাঠাইয়া মেয়েরা ঘরে থাকিতই বা কেমন করিয়া! তিতাস কত শান্ত। তিতাসের বুকে ঝড়-তুফানের রাতেও স্বামী-পুত্রদের পাঠাইয়া ভয় করে না। বউরা মনে করে স্বামীরা তাদের বাহুর বাঁধনেই আছে, মায়েরা ভাবে ছেলেরা ঠিক মায়েরই বুকে মাথা এলাইয়া দিয়া শান্ত মনে মাছ-ভরা জাল গুটাইতেছে।' ... ইত্যাদি।

অদ্বৈত দেখিয়েছেন এই উপন্যাসের কুশীলবেরা তিতাসের সহজ সরল গতিধারার মতই; উন্মুক্ত আকাশ, উজ্জ্বল আলো এবং বাতাসের মতই প্রাণবন্ত, অকৃত্রিম। নদী যেন মানুষগুলির রক্তে তথা সংস্কারে,স্বপ্নে, জাগরণে এমনকি বলবার ছন্দে পর্যন্ত ওতপ্রোত মিশেছে। ছোট্ট করে একটু আলাদা মাপে যদি দৃষ্টান্তস্বরূপ বাসন্তী চরিত্রটির কথা ভাবি – তাহলে দেখব তাকে তিতাস থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তার জীবনের সঙ্গে মিশে রয়েছে (জুড়ে নয়) গোকর্ণঘাটের পরিধি। এই রকম অনন্তবালা বা আরো অনেক ছোট বড় চরিত্র। তাদের অস্তিত্ব ও চেতনা তিতাসসম্পৃক্ত। এর বাইরের যে জীবন তা যত বৃহৎ, মহৎ, জটিল বা বৈচিত্র্যময় হোক এই মানুষগুলি তার সম্পর্কে যেন অনবহিত।

এ উপন্যাসে অদ্বৈত রাজনীতিক বা সমকালীন প্রসঙ্গ সেই অর্থে আনেননি। দেশ ভাগ, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা স্বার্থান্ধ নানান রাজনীতিক মত বা দলের আবর্তে চরিত্রগুলি জড়িত হয়ে পড়েনি। যে অর্থে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' বা তারও আগের 'গণদেবতা',

'পঞ্চগ্রাম' বা 'সন্দীপন পাঠশালা'-র মত উপন্যাসে আমরা মানুষগুলির পটভূমির বিবরণের সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষের পট পরিবর্তনের সংবাদ পেয়েছি। আর্থ-সামাজিক মানচিত্রের সে এক অ-পূর্ব জলছবি। এসেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুই মহাযুদ্ধের প্রসঙ্গ, জিনিসের দামের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, কৃত্রিম অভাব তথা কালোবাজার এ-সবই। 'তিতাস একটি নদীর নাম' – কে তার তুলনায় এই সব বিচিত্র সমাজরাষ্ট্রিক আলোড়ন থেকে একেবারেই যেন বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। সমালোচকের এই মন্তব্য খুবই ভাববার যেখনে বলা হয়েছে যে তিতাসের পটভূমি বা আঞ্চলিকতার উপকরণ প্রকৃতই ভেতরকার ব্যাপার। ফলে তার মধ্যে পরিবর্তনের যে ছবি এসেছে তা অর্থনৈতিক যতটা নয় তার চেয়ে অনেক বেশি সাংস্কৃতিক। সেই সাংস্কৃতিক ভাঙনের কথাই লিখেছেন অদ্বৈত। একটু আগেই সে কথা বলেছি। সত্যিই এই মানুষগুলি তিতাসের জলে নেমে মিথ্যে কথা বলতে পারত না। তিতাসের মধ্যে তাদের সম্পর্ক বা আঙ্গিক যোগ এতই পবিত্র, এতই ভেতরের এবং অবশ্যই আন্তরিক।

নদীকে নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। 'পদ্মা নদীর মাঝি'-র কথা সকলের জানা। কোনো কোনো সমালোচকের মতে এই উপন্যাসের মানুষগুলি কেবলমাত্র মাছ ধরে জীবিকা উপার্জন বা জীবনের নিশ্চয়তা খুঁজে পায় না। যেমন হোসেন মিঞা বিড়ির ব্যবসাও করে। সে শুধু তার নিজের জায়গাটুকুতে মাত্র সীমাবদ্ধ নয়। নতুন নতুন দ্বীপে, বন্দরে তার উপনিবেশ গড়ার স্বপ্ন। মাদক দ্রব্যের কারবার করতে তার নৈতিকতায় বাধে না। বরং যারা তাকে বাধা দেয়, তাদের কঠিন শাস্তি দিতেও কোনো সঙ্কোচ হয় না তার। হোসেন তার নতুন ময়নাদ্বীপকেও মনুষ্যবসতিতে পরিপূর্ণ করে তুলতে চায়। পদ্মা নদীর জীবন থেকে এই ভাবেই সে এবং তার সহযোগী বা অনুগামীরা সরে আসে। সমালোচকদের এই উপলব্ধি এবং সিদ্ধান্তও খুব দৃঢ় যে পদ্মানদীর মাঝি-র সাংস্কৃতিক দিকটি দৃশ্যপটের মধ্যে প্রায় নেই বললেই চলে। আরও সরল ভাষায়, এই সংস্কৃতির কোনো সমগ্র রূপ নেই। হোসেনের গানে আর যাই পাই না কেন, তাকে অবিমিশ্র মাঝিদের ভাবতে অসুবিধে আছে। বরং সেখানে রয়েছে উঁচুতলার মানুষদের দৃষ্টি বা ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতির তির্যক বিশ্লেষণ। কিন্তু এ কথাও না বললে নয় যে পদ্মা নদীর মাঝিদের জীবনে পদ্মার সংস্কার তাদের চেতনা বা অস্তিত্বের সঙ্গে কতটা ওতপ্রোত। মানিকের কলমে সেই রূপায়ণও রয়েছে অবারিত। পদ্মা তাদের শেষ আশ্রয় দিতে পারল না বলেই ময়নাদ্বীপে যাত্রা। কিন্তু পদ্মাকে তারা যে ছেড়ে যেতে চায়নি এত বড় সত্যি কথাটাই বা অস্বীকার করবে কে!

এই রকমই আর একটি সৃষ্টি – সমরেশ বসু-র 'গঙ্গা'। চব্বিশ পরগণার মৎস্যজীবীদের জীবন, জীবিকা এবং পটভূমি এর অবলম্বন। ন্যাজাট, কেষ্টপুর, তেঁতলে ফোড়ন – এইসব জায়গার বর্ণনা যেমন আছে, আছে শোলার মাছ, ভাঙন, ভেটকি – এসবেরও প্রসঙ্গ। তার সঙ্গে আছে এখানকার বিশেষ ভাষানির্ভর সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। ইচ্ছামতী থেকে গঙ্গার কোলে তাদের বিচিত্র আসা যাওয়া। এক কঠিন সংগ্রামের জীবন। এই মাছ-মারাদের জীবন

নিয়ন্ত্রিত হয় দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলের গঙ্গার শাখানদী গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তর দিকে শ্রীরামপুর, চন্দননগরের গঙ্গা পর্যন্ত উজিয়ে।

তিতাস-এ অবশ্য আমরা পেয়েছি অর্থনৈতিক সঙ্কটের থেকে কী ভাবে সাংস্কৃতিক ক্ষয়কে তাদের অধঃপতনের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে তার ছবি। 'গঙ্গা'-য় এরকম কিছু দৃশ্যপটের মধ্যে আসেনি সে কথা পুনরুক্তি করেই বলতে হয়। সমরেশ যেন বলতে চান, মাছমারাদের জীবন ও মৃত্যু সবই শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হয়ে আছে মাছেই। তিতাসের মানুষগুলিও দরিদ্র। কিন্তু আর্থিক শোষণ পীড়নের চেয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্নতার মর্মযন্ত্রণাই তাদের কাছে প্রবলতম। এ সঙ্কট চেতনার। অসামান্য নির্ণয় ছিল শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যেখানে তিনি লিখেছিলেন মৎসজীবীদের নদীতে মাছ-ধরার বর্ণনা এর প্রধান অধ্যায় হলেও 'নদীপ্রবাহের' সঙ্গে তাদের 'জীবনধারার সম্পর্ক' শেষ পর্যন্ত 'নিছক প্রয়োজনাত্মক'। এই সব মানুষগুলির 'জীবনদর্শন' নদীর 'অনন্তগতিশীল' এবং 'বিচিত্ররহস্যময় সত্তার' গভীর প্রভাবচিহ্নিত কিছু নয়। বরং অদ্বৈত-র 'প্রকৃত' আকর্ষণ 'নদীতীরের গ্রাম্য সমাজের ধর্মকেন্দ্রিক ও উৎসবছন্দগ্রন্থিত জীবনযাত্রায় সরল বিশ্বাসী মালো ও কৃষকদের স্নিগ্ধ শান্ত জীবনস্পৃহায়, ধর্ম-বিশ্বাসজাত 'বদ্ধমূল সংস্কৃতি চর্চায়'। কোনো 'ব্যক্তিবিশেষের নয়', এই বিশাল 'সমষ্টি' মানবজীবনের ছবি আঁকাতেই তাঁর পরম সিদ্ধি। অদ্বৈতের এ উপন্যাসে সেই রূপটির বর্ণনা হয়েছে উল্লেখিত। উপন্যাসের মধ্যে এ সম্পর্কে পাই; "শিল্পের একটা দিক আছে। সৌম্যশান্ত করুণস্নিগ্ধ প্রসাদগুণের মাধুর্যে রঞ্জিত এ শিল্প। এ শিল্পের শিল্পী মহাকালের তাণ্ডব নৃত্য আঁকিতে পারে না। পিঙ্গল জটার বাঁধন খসিয়া পড়ার প্রচণ্ডতা এ শিল্পীর তুলিকায় ধরা দিবে না। এ শিল্পের শিল্পী মেঘনা, পদ্মা, ধলেশ্বরীর তীর ছাড়িয়া তিতাসের তীরে আঙিনা রচনা করিয়াছে।"

তিতাসের 'আঙিনা'র কথাই উপন্যাসের মূলকথা। পূর্বে বলেছি প্রবহমান তিতাসের সঙ্গে (বিজয়নদী, মেঘনা প্রভৃতি) অন্যান্য নদীর একটা নিকট যোগও আছে, আর সেই নদী-পারের জীবন সংস্কৃতির সঙ্গে তিতাসের বড় রকম কোনো পার্থক্য না থাকলেও তিতাসের নিজস্ব বৈচিত্র্য উপন্যাসের আকর্ষণীয় দিক।

তিতাসের বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসের শুরু। স্বপ্নের ছন্দে ব'য়ে যাওয়া এই নদীর কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। তিতাসের সঙ্গে মেঘনা-পদ্মা প্রভৃতি নদীর বিস্তর ফারাক তাদের স্বভাবের জন্যেই। মেঘনা কিংবা পদ্মা কখনো উদ্দাম-উত্তাল হলেও তিতাসে সে বিশৃঙ্খলার আতিশয্য নেই। তিতাসের তেরো মাইল দূরে বিজয় নদীর অবস্থা ভীষণই খারাপ। সেখানের মালো গোষ্ঠী বিজয়নদীতে তাঁদের জীবনের পূর্ণতা সবটা খুঁজে পান না আর পাবেই বা কি করে – সারা বৎসর তো নদীতে জল থাকে না। চৈত্রের খরায় নদী নিষ্করুণ হয়ে পড়ে। বিজয়নদীতে সেই প্রবহমানতা না থাকলেও আবার ঋতুচক্রের সুনির্দিষ্ট পথে

বিজয় কিন্তু প্রাণবন্ত হয়। নদী যদি তার প্রকাশকে জানান দিতে বর্ষাঋতু নির্ভর হয়ে পড়ে তবে তার দু'কুলের জনবসতির মধ্যে গভীর প্রভাব পড়বে তাই প্রত্যাশিত। শেষ পর্যন্ত তিতাসের মতো বিজয় নদীর দশা হলেও – তিতাসে একদিন বয়ে গেছে আপন বেগের প্রবহমান ধারা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন - "সমগ্র উপন্যাসের 'প্লট' নির্মাণে নদীই নিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এক কার্যকারণের নিজস্ব গতিতে নদীই লাভ করেছে সব চেয়ে সচেতন অভিনিবেশ। উপন্যাসে তিতাস নদীর সঙ্গে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপনে এর Plot গঠনের প্রতি দৃষ্টিপাত প্রয়োজন।" Plot সম্পর্কে 'Princeton Encyclopedia of poetry and poeties' এ বলা হয়েছে, '... an intellectual formualtion about the relationship existing among the incidents of drama or a narrative and that it is, therefore, guiding principle for the another and an ordering control for the reader.' তিতাসকে কেন্দ্র করেই অদ্বৈতের 'intellectual formulation'। তিতাসের দুটি রূপই উপন্যাসের মধ্যে বিধৃত। যার একদিকে আছে 'প্রাণভরা উচ্ছ্বাস' আর অন্যদিকে, জলহারা তিতাসে' নৌকা চলে না রূপ, তিতাসের বুকে চাষাদের ধান, বেগুন চাষ। মরা তিতাসের কাহিনী উপন্যাসের শেষে বিশেষভাবে ধ্বনিত হলেও ঔপন্যাসিক উপন্যাসের একেবারে শুরুতে তার আভাস দিয়েছিল। অর্থাৎ কিনা উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে 'তিতাস'ই পাঠকের শেষ পর্যন্ত 'Ordering Control' এর জায়গা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সময়াবর্তে তিতাসের পরিণতি উপন্যাসের পরিণতিকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। তিতাসপারে জীবনের যে জটিল বর্ণময়চিত্র তার সবটাই বলা চলে তিতাসেরই অকৃপণ টানে সৃষ্টি।

কীভাবে সমগ্র উপন্যাসটির লাগাম তিতাস নির্ভর তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এ আলোচনায় প্রবেশের আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অদ্বৈতের 'উপন্যাসবস্তু' উপস্থাপনায় দুটি দিক বিশেষ লক্ষণীয়। গল্প বলতে বলতে তিনি পিছনে ফিরে তাকান। অতীতের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট কিংবা কোনো কোনো চরিত্রের উপস্থাপনায় তিনি প্রায়শই এতটাই গভীরে প্রবেশ করেন যে, উপন্যাসের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে কোথাও কোথাও এবং কখনো-সখনো পাঠকের মতে হতে পারে তিতাসের বর্ণনা, তার দুপারের জীবন-বৃত্তান্ত কোথায় গেলো? পাঠক একটু ধৈর্য ধরে এগোলেই নিরাশ হবেন না ঠিকই, তবু উপন্যাসে তিতাসের বাইরের কথা কম নেই তা স্মরণীয়। শেষ পর্যন্ত যে, তিতাসের 'প্রাণ উচ্ছ্বাস' থেকে প্রাণহীনতায় পৌঁছনোর মৌলদিকটিকে তিনি সুষ্ঠুভাবে শিল্পিত সমাপ্তি করেছেন তা তাঁর অন্যতম দিক। উপন্যাসটির 'প্রাণ ভ্রমরা' জল-কল্লোলিত তিতাস। অথচ অনিবার্য আঘাতে (চর জেগে ওঠা) ভেঙে গেছে সব নির্মাণ। উপন্যাসটির চারটি অধ্যায়ে আর প্রতিটি অধ্যায় আবার দু'টি করে উপ-অধ্যায় বিভক্ত। প্রতিটি উপ-অধ্যায়েরও ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ আছে। এই তিতাসের

বুকভরা জলে মালো জীবন ছিল এক প্রবাহিত যাত্রা, অবিরাম চলাচল। মাছধরা ছিল মালোদের জীবিকা। তিতাস পারের মালোরা তিতাস নির্ভর জীবন-সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত। এই অভ্যস্তজীবনের ছাঁদ ভেঙে পড়েছে তিতাসের বুকে জলের পরিবর্তে চরের আবির্ভাবে। এই নির্মাণকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ চারটি অধ্যায়ের বিস্তৃত পরিসরে উপস্থাপন করেছেন। এটি তাঁর অন্তিম ঔপন্যাসিক উদ্দেশ্য।

কিশোর, সুবল, বাসন্তীরা তিতাসের মাটিতে বেড়ে ওঠা জীবন। একদিকে তিতাসের জলে কুমারীরা ব্রতের 'চৌয়ারি' ভাসিয়ে অরক্ষনীয়া দশা হতে যেমন মুক্তি চায়, তেমনি পুরুষেরা জলে মাছ ধরে বৎসরান্তে তিতাসের পারেই খেলে 'হোলি'। তবুও মাছের লোভে তিতাস–পারের লোকেরা অন্য গাঙে যায়। কোনো নদীর কিংবা সব নদীরই মন্দ সময় কখনো কখনো আসে। উপন্যাসের মূলকাহিনীর সূত্রপাত সেখান থেকে। তা হল, 'মাছের জো ফুরাইয়া গিয়াছে। মালোদের অফুরন্ত চাহিদা মিটাইতে গিয়া, দিতে দিতে তিতাস ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।' তিতাসের এই ক্লান্তির ভাব কিশোর-সুবলদের দেশান্তর করেছে। তিতাসের চিরাচরিত পথের মধ্যে তারা যে অন্য পথ নিয়েছে; শুকদেবপুর গ্রামের উজানিনগরের খলায় তাদের যে যাত্রা, সেই যাত্রাতেই কাহিনীর মূলবীজ রোপিত হয়েছে। একেবারে শুরুতে মারা যায় নি কিশোর, কিন্তু মারা গেছে তার স্বপ্ন-সতেজতা। অনন্তর জন্ম দিলেও (?) পিতৃত্বের তৃপ্তি সে যেমন পায় নি তেমনি অনন্তর মাও পায়নি স্ত্রীর স্বাদ। তিতাসের মোহনায় 'নয়াগাঙের মুখে তারে ডাকাইতে লইয়া গেছে।' সুতরাং নদী যাদের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য দেয়; নদীর বুকে অনন্ত দিনরাত যাপন করে, সেই নদীই যে তাদের জীবনে দুর্বিষহ বেদনা বিচ্ছেদ হাহাকারের ধ্বনিটি নিয়ে আসে।

তারপর একে একে আসে অনন্তর মা (গোকর্ণঘাটে), আসে বাসন্তী, উদয়তারারা। সময়ের সাথে সাথে চারবছরের অনন্ত পাল্লা দিয়ে বড় হয়; শৈশবেই হারিয়ে বসে মা ও বাবাকে। সে এক মালোজীবনের দরিদ্রতার কাহিনী, অশান্তির কাহিনী। ধীরে ধীরে তিতাসেরও বয়স বাড়ে। কুমারীর বুকের মতন একসময় ছিল যে তিতাসের রূপ সেই তিতাসের বুকে জেগে উঠেছে সমতল মাটি। জলের প্রবাহে যে মালোজীবন রচনা করত সুখের আস্তানা, সেই প্রবাহের গভীরে রূপান্তরিত মাটি থেকে একে একে বঞ্চিত হয় মালোরা। জল থাকলে নদী মালোদের; জল নেই নদী সম্ভ্রান্তীয় চাষাদের। বর্ষার সময় দেখা যায় তিতাস কানায় কানায় পূর্ণ। বর্ষা শেষ হলে জল সরে গিয়ে চর ভেসে ওঠে। এই চরই একদিন নদীর বুকে অন্য গান শুরু করে। মালোজীবনের গান শেষ হয় একদিন আর বাষ্পীভূত তিতাসের জলে কর্ষিত হয় মাটি।

> 'দুই তীরের উচ্চতা ডিঙ্গাইয়া একদিন দূর দুরান্তের কৃষকেরা লাঠিলাঠা লইয়া চরের মাটিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পরস্পর লাঠালাঠি করিয়া চরটিকে তারা দখল করিয়া লইল। জেলেরা তীর হইতে কেবল তামাসা দেখিল। এ জায়গা

যতদিন জলে ছিল ডোবানো, ততদিন ছিল মালোদের। যেই জল সরাইয়া চর ভাসিয়া উঠিয়াছে, তখনি হইয়া গেল চাষাদের।... যতদিন নদীতে থাকে জল, ততদিন তারা কূলের উপর ভাসে। জল শুখাইলে তারা জলের সঙ্গে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।'

ভরা তিতাসের এই পরিণতিই উপন্যাসের চূড়ান্ত অভিপ্রায়। নদীর সমান্তরালে নদীভিত্তিক জীবন সমান প্রাধান্য পেয়েছে। তিতাস শুকিয়ে গেছে কোনো এক নিয়মে আর জল-জাল-নৌকা হারা হয়ে মালোরাও একে একে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। গ্রাম ছেড়েছে অনেকে অন্য কোনো কাজের সন্ধানে। তিতাসের মাটির অধিকার নিতে মালোরা কোনো দিন সংঘবদ্ধ হয়নি। বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে যে মানুষটি লড়াই করে গেলেন বরাবর সেই রামপ্রসাদ বন্ধ্যা তিতাসের মাটির ভাগ নিতে গিয়ে লড়াই করে প্রাণ হারালেন। তিতাস যখন মালোদের দিয়েছে তখন দু'কূল ভরে কেবলই দিয়েছে, আর তার নদী রূপের অবসানে সে মালোদের কেবলই উচ্ছেদ করেছে। অন্যদিকে, এক নদীর জেলেরা বা মালোরা যে অন্য নদীতে অন্য এলাকায় গিয়ে মাছ ধরতে পারবে না সে আমরা প্রবাস খণ্ডে দেখেছি। শুকদেবপুরের উজানিনগর খলা থেকে কিশোরদের বিতাড়িত হতে হয়েছে। জমির মত নদীর জল ভাগাভাগি এবং তা নিয়ে মানুষের কর্তৃত্বের লড়াই কতটা প্রকট হতে পারে উপন্যাসটিতে সে বাণী সংগুপ্ত থাকেনি।

তিতাস যবে থেকে শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে তবে থেকে নদী নির্ভর জীবন থেকে মালোরা অন্য পথের সন্ধান করেছেন। নাবালক অনন্তর শিক্ষার শুরু ও বয়স বৃদ্ধি আর তারপরে পরেই যেন তিতাসের বিকৃতি। অনন্তর মালোজীবনের বাইরে বেরিয়ে আসা আর তিতাসের রূপান্তর যেন একই সময়ে সংগঠিত। কেবল অনন্তর পরিবর্তনই মুখ্য নয়। সমস্ত গোকর্ণঘাটের মালোদের একই পরিণতি, '... নদী শুকাইয়াছে মালোদের মাছধরাও উঠিয়াছে। ব্যবসা ছাড়িয়া তারা দলে দলে মজুরি ধরিয়াছে।' মালোরা মরা তিতাসের পার ছেড়ে চলে গেছে। তখন শূন্য গ্রাম, নেই কোথাও নৌকা। কেউ কেউ ঘর-দরজা জিনিসপত্রাদি ফেলে চলে গেছে। কেউ চলেছে ধান কাটায়, কেউ চলেছে বড় নদীতে অন্যের হয়ে মাছ ধরে দিতে। তিতাস যে এমন করে সকল কিছু শূন্য করে দেবে মালোরা আগে বোঝেনি। যে অনন্তবালা সপ্তদশে পৌঁছেও বিয়ে করেনি অনন্তর জন্যে, সেও আসামে চলে গেছে বাবা-কাকাদের সাথে। তিতাস নিজে মজেছে ও মরেছে আর মেরেছে অন্যদেরও।

তিতাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সমাজ – কৌমজীবন তিতাসেরই জটিল আবর্তে বিলীন হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত মালোগোষ্ঠিই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তিতাসের যখন আপন বেগ ছিল তখন সে সৃজন করেছিল এই মালো সমাজ। সেখানে প্রেম আছে বিবাহ আছে – সন্তান অনন্ত, অনন্তবালারা আছে। জীবনের সকল দুঃখ হয়তো তিতাসের দিকে চেয়ে জলে ভেসে ভুলে যাওয়া যায়। 'সুবলের বউ' বাসন্তীরা বাৎসল্য স্নেহে অনন্তদের

চিরদিন কাছে না পেয়ে দুঃখে-কষ্টে জীবন কাটালেও ভিতর থেকে এক গর্বিত অহংকার অনন্তদের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করত সেও সত্য, কিন্তু জল শুকালে তিতাসের একে একে 'নিবিল দেউটি' যেখানে, সেখানে মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ নিষ্করুণ হয়ে পড়েছে। সকল সার্থকতাকে 'মহাকালে'র নিজস্ব খেয়াল এমন করে চির ব্যর্থ করে দেয় যে জীবনের অতৃপ্তি-অপ্রাপ্তির মধ্যেও একটা ইন্দ্রিয়গত আস্বাদ থাকে, মননগত ব্যঞ্জনা থাকে, তাকেও উপলব্ধি করতে দেয় না। অদ্বৈত মল্ল জীবনের সেই অপ্রত্যাশিত বিভীষিকাময় মৃত্যুকে উপন্যাসে তুলে ধরতে চেয়েছেন। মাছ নির্ভর মালো জীবন আর মালো সংস্কৃতি জল না থাকলে মাছ যেমন থাকে না তেমনি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। যদি বলা হয়, 'তিতাস একটি নদীর নাম' সেই 'নদী' যে সকল সুন্দরকে নিজের হাতে সৃজন করে নিজেই তার ধ্বংসের যাবতীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, তবে আশা করি বিশেষ অমূলক হবে না। তবে কি মালোদের সমাজ ও তাদের সমাজের অন্তর্গত বিধিবিধান উপন্যাসে নদী ব্যতিরেকে কোনো স্থায়ীমূল্য নেই? কি হবে অনন্ত রমা, সুবলের বউ, নবচন্দ্রের বউদের কথা? অনন্ত-অনন্তবালা, অনন্ত-রমু কিংবা গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের প্রসঙ্গাদি কি তিতাসের সঙ্গে কোনো অংশে সংপৃক্ত নয়? জল না থাকলে নদীতে মালোজীবন বাঁচে না, মালোজীবন না থাকলে তার সংস্কৃতিও মরে, তার সম্পর্কের গভীর টানও মরে। উপন্যাসের পরিণতিতে একটি গোষ্ঠীজীবন সম্পূর্ণ অস্তিত্ব হারিয়ে বিলীন হয়ে গেছে।

তিতাসের বুকে এদের সৃষ্টি, তিতাস না থাকলে সুবলের মৃত্যু নদীতে হত কিনা বলা শক্ত। তিতাসের মোহনায় কিশোরের বউ ডাকাতি এমন কি নদীপথে বনমালীর হাট করতে এসে অনন্তর সঙ্গে দেখা সবই নদী সংশ্লিষ্ট। এমনকি উদয়তারা, গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ, বাসন্তী, রমুর সকলের মধ্য দিয়ে যে ছোট্টশিশু অনন্ত বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে দিয়েছে সেও তো নদী-জীবনের টানে বেরিয়ে আসা একখানা মানিক। সুতরাং, জীবন্ত নদীর পাশে এ চিত্র জীবনের ছবি এঁকেছে। তিতাসের নাম যখন নদী হিসাবে মুছে যেতে বসেছে তখনই দেখা দিয়েছে আরেক চিত্র। সেখানে মালোরা নেই কিন্তু যাদের দখলে ধানগাছগুলো মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কিংবা ঢেউ তুলে তিতাসের পাড়ে আছড়ে পড়ছে তারা (চাষাদের দল) তো আছে। তারা গ্রামের গণ্যমান্য লাঠিয়াল সমৃদ্ধ চাষাদের দল। তাদের সঙ্গে মালোদের সম্পর্ক তখন কৃষক-মালিক। উপন্যাসের একেবারে সমাপ্তির অধ্যায়ে এসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ এ চিত্রে আমাদেরকে পরিচ্ছন্ন করেছেন। মৃত তিতাসকে নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি, রক্তপাতের মধ্যদিয়ে শুরু হয়েছে আরেক তিতাসচরের বৃত্তান্ত। 'কালিন্দী', উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সুন্দর চিত্রে দেখিয়েছেন যে, 'চর' কে কেন্দ্র করে পরিণতি কতটা উত্তাল হতে পারে। জমি বাপের নয় দাপের আর এই দাপের প্রভাব যারা মাটিতে দেখাতে পারে তারা চাষা-জোতদার কিন্তু নদীর বুকে জলের উপর দাপের প্রভাব খাটাবে কে? মালোরাই তো। জলের যদি দেখা না মেলে তবে মল্লদের দাপেরও যে দেখা মিলবে না তিতাসে সে কথাও বর্ণিত। উপন্যাসের পরতে

পরতে ঋতু পরিবর্তনের নিয়মানুবর্তনের মতোই নদীই 'Guiding Principle'-র ভূমিকা পালন করেছে। তিতাস ঐতিহাসিক বৃত্তে মালোদের বাসস্থান হলেও কালের ক্রমানুবর্তনে সে বাসস্থান শ্মশান-এ পরিণত হয়েছে। এই শ্মশান শায়িত মালো সমাজের গত্যন্তর, দেশান্তরই উপন্যাসের শেষ পরিণতি আর তা ঔপন্যাসিকের নিজস্ব ভাষাশৈলী-রচনারীতিতে স্পষ্ট হয়েছে। সকল ঘটনার চালিকা শক্তিরূপে উপন্যাসে কর্তৃত্ব করেছে নেপথ্যের নায়ক তিতাস।

আমরা দেখেছি, চারটি পর্বের আটটি উপ-অধ্যায়ে বিন্যস্ত তিতাস নদীর প্রকাশ-বিকাশ-বিনাশেররই কথা মালো জীবনের ক্রমপরিণতির মতোই উল্লিখিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ উপন্যাসের গোড়াতেই তিতাসের 'প্রাণ ভরা উচ্ছ্বাস' তার মানবীয় রূপের যে উদ্দীপিত চিত্রণ পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেছিলেন সেখানে উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে ('ভাসমান') এসে তার ভগ্ন-বিধ্বস্ত দশায় ট্রাজিক আবেদনই মুখ্য হয়ে উঠেছে। বাহ্যত বাসন্তী, রামকেশব কিংবা গ্রামের অন্যান্য সাধারণ লোকের (বিশেষত যারা মালো সম্প্রদায়ের) এক অনিবার্য মৃত্যুচিত্র উপন্যাসের সামগ্রিক নির্মিতিতে অনুরণিত হয়ে উঠেছে মনে হলেও, উপন্যাসের সকল সকরুণ ঘটনার কেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রক তিতাস। তিতাস আর মালোজীবন সমানুপাতিক বিকশিত এবং বিনষ্ট হওয়ার বৃত্তান্ত। না, মালো জীবন সংস্কৃতির পাশাপাশি দু'একটি বিক্ষিপ্ত গোষ্ঠীর কথা উপন্যাসে আভাসিত হলেও তারা এখানে কোনো ছায়া ফেলতে পারেননি। অন্য কোনো জীবন-জগৎ (কাদির মিঞার কথা বাদে) উপন্যাসীয় বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি হয়তো এ কারণেই যে, তিতাস নদী তাদের জীবনে অপরিহার্য ও অস্তিত্ব প্রকাশে অনিবার্য হয়ে ওঠেনি বলেই। আরো স্পষ্ট করে বললে দাঁড়ায়, চাষা-জমিদার জোতদারের সঙ্গে নদীর যোগ যেভাবে তাতে তাদের জীবনযাত্রার - অস্তিত্বের প্রকাশে অনিবার্য হয়ে ওঠেনি এই নদী। কেননা, জীবন-যাত্রার আবর্তন নদী ব্যাতিরেকে। অন্যদিকে, মালোজীবন-সংস্কৃতি তিতাস-আবর্তে নদীর প্যাঁচের মতো, সুতোর মতো জড়িয়ে গেছে। তিতাস নির্ভর জীবনের 'মৃত্যু' তিতাসের সাথে সাথেই ঘটেছে। কর্মচ্যুত হওয়া কিংবা দেশান্তর হওয়া সে'ত মালোগোষ্ঠীর অনন্যোপায় পথ – মৃত্যুরই নামান্তর নাকি? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' কিংবা সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' সবই নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস হলেও নদীর আত্মবিচ্ছেদ-রূপান্তর এমন করে হতাশ-হত্যার আবাহন হয়ে আসেনি। তিতাসের বুকে জেগে ওঠা চরের অভিঘাতে ভেঙে গেছে উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা আর দু'লে দু'লে ওঠা ধানগাছের প্রলম্বিত ঢেউয়ে তিতাসের শ্মশান-সঙ্গীত সঞ্চারিত হয়ে পড়ে। তিতাস ধীরে ধীরে অতীত, স্মৃতি হয়ে মিশে গেছে। – সে এখন একটি নদীর নাম মাত্র।

অপরদিকে এই মানবজীবনের ছবির মধ্যেই লুকিয়ে আছে মালোজীবনের মহাকাব্য। ব্রাত্য জীবনের অন্যদিক। অধ্যাপক তরুণ কুমার মন্ডল লিখেছেন ...

'তিতাস একটি নদীর নাম' মালোজীবনের উপন্যাস। মালো জীবনের সামগ্রিক বিকাশ ও পরিণতি নিশ্চিত উপন্যাসের একমাত্র আধার নয়, তিতাস পারের মালোজীবন ও অন্যান্য

তিতাস সম্পৃক্ত নদী ও মানুষ উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে বিশেষ প্রাধান্যসহ বিস্তারিত গুরুত্ব লাভ করেছে। উপন্যাসটির অভিপ্রেত বিষয় ও কেন্দ্রীয় চরিত্র তিতাস। তিতাসপারের জীবন যেমন এখানে এককভাবে উপন্যাসে সম্পূর্ণ হয় নি তেমনি তিতাসের নিজস্ব বৃত্তান্তের গভীরে মিশে আছে বেশকিছু নদীর কথা আর সে নদীর কথা ব্যতিরেকে উপন্যাসের সৃজনকর্ম যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি তিতাসও পায়নি তার পূর্ণতা। উপন্যাসটির প্লট নির্মাণে তাই ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণকে সকল সময় সময়চেতনার ধারাবাহিকতার মতোই সচেতন থাকতে হয়েছে নদীচেতনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গভীরে। নদী যদি তার গতিপথ হারায় লোকজীবন যে সে পথেই চালিত হবে তাই স্বাভাবিক। অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রাকৃতিক ও দর্শন বুঝতেন বলেই তাঁর এ উপন্যাসটিও যেন নদী ভিত্তিক দর্শনের এক প্রায়োগিক বাস্তব অথচ শিল্পিত রূপ হয়ে ধরা দিয়েছে। ঔপন্যাসিকের কাহিনী কথনের অভিপ্রায়ে এক নৈর্ব্যক্তিক অথচ জীবন ও জীবনসংশ্লিষ্ট প্রকৃতির কথা পড়েছে ধরা। এ এক দার্শনিক উপলব্ধিও বটে।

> 'নদীর একটা দার্শনিক রূপ আছে। নদী বহিয়া চলে, কালও বহিয়া চলে। কালের বহার শেষ নাই। নদীরও বহার শেষ নাই। ... তিতাসও কতকাল ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তার চলার মধ্যে তার তীরে তীরে কত মরণের কান্নার রোল উঠিয়াছে। ... ভারি নিগ্রহের নিগড়ে আবদ্ধ এই অজ্ঞ শিশুগুলি জানে না, হাসির নামে কত বিষাদ, সুখের নামে কত ব্যথা, মধুর নামে কত বিষ তাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।'

জীবনের সঙ্গে তিতাসের যোগ না থাকলে হয়তো তিতাসের নাম এতো এতো করে উচ্চারিত হত না। ঋতুপরিবর্তনের সাথে-সাথে পাল্টে গেছে নদীর স্বভাব আর নদীর স্বভাব যখন পাল্টেছে তখনই পাল্টেছে মালোদের জীবন – জীবনবোধ। জীবনের সঙ্গে নদীর জোয়ার ভাটা একই তালে প্রবাহিত এক অভিন্ন প্রবহমান ধারায়। নদী মরলে মানুষও মরে – তিতাস এ যেন এক জাগতিক সত্য হয়ে উঠেছে। তিতাস নদীকে কেন্দ্র করে মৃত্যু ও দারিদ্র্যের একাধিক বর্ণময় কাহিনী নদীর প্রসঙ্গকে প্রতিটি মুহূর্তে বিশিষ্টতায় করেছে চিহ্নিত।

উপন্যাসটিতে তিতাস নদীর ভূমিকাকে আমরা দু'টি বিশেষ অবস্থার মধ্য দিয়ে পেতে পারি। ক, নদীটির যতক্ষণ পর্যন্ত আপনবেগে প্রবাহিত হওয়ার সামর্থ আছে। খ, যখন নদী তার চলার সামর্থ্য হারিয়ে মজে গিয়ে অস্তিত্ব হারিয়েছে। এ জ্ঞান নিতান্তই প্রাকৃতিক ভৌগোলিক চেতনাকে প্রকাশ করলেও অদ্বৈতের উপন্যাসে একই প্রেক্ষিতে জীবনসহ নদীর নানান টানাপোড়েনের চিত্র ভাব-কল্পনার উপর ভিত্তি করে শিল্পিত হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক বাংলার বুকে জটার মতো নদীর প্যাঁচকে এক-একটা বিশেষ রূপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নদীর এ রূপ আপনা-আপনি প্রকৃতি সৃজনে সৃজিত। তিতাস পারেও এমনি একটা রূপ বিকশিত হয়েছে মহাকালের। তিতাস নদীর নাম মাত্র হলেও ... এই উপন্যাসে নদী যে প্রধান চরিত্র তা

বুঝিয়েছেন লেখক কবি অশোক কুমার মিশ্র তার লেখা 'তিতাস একটি নদীর নাম নদীই প্রধান চরিত্র' প্রবন্ধে লিখেছেন ...

"নদীর নি:স্বতার সাথে সাথে মালোরাও হয় সর্বহারা। অধিকাংশ মালোই গিয়েছে মরে-ক্ষুধায়। অনেকে আবার জায়গা ছেড়ে গিয়েছে পালিয়ে — দু'চার জন এখনও পড়ে আছে মালো ভিটেয়, বাবুরা তাদের বাঁচাবার জন্য ভাত দেবার ব্যবস্থা করেছে। এককালে মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল যে সুবলার বৌ-এর অবস্থা —সেও নিয়ে গিয়েছে ভাত ভিক্ষা। যে অনন্ত ছিল তার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র তাকেও এই ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়াতে দেখে ভেঙ্গে পড়ে সুবলার মা। অনন্তের হাত থেকেও পড়ে যায় জলভারা নোটা।" অদ্বৈত মল্লবর্মণ সঠিক ভাবেই লিখছেন, "সে মালো পাড়া আর নাই। শূন্য ভিটাগুলিতে গাছ-গাছরা হইয়াছে। তাহাতে বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হয়।"

'তিতাস একটি নদীর নাম'—একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাসের স্রষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মণ
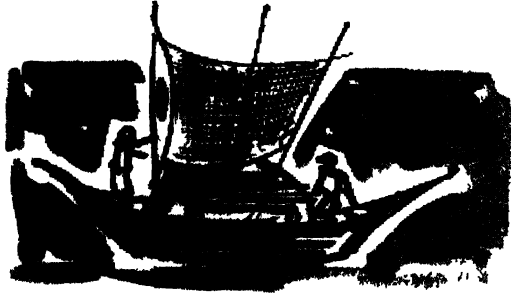
"ব্রাত্যজীবনের ব্রাত্য লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। দীর্ঘদিন তাঁকে আড়ালে রেখেছিল উপেক্ষার কালো পর্দা। কিন্তু তার কালজয়ী সৃষ্টিসম্ভার তাঁকে পুনর্জন্ম দিয়েছে। অবহেলার আড়াল থেকে এনে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার আলোক বেদীতে তাঁকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

তাঁর রচনাবলী আজ পুনর্জন্ম দিচ্ছে শতসহস্র পাঠকেরও। সমাজের প্রান্তিকতম অবস্থানে থেকে চিরলাঞ্ছিত চিরবঞ্চিত চিরনির্বাসিত মানুষের জীবনালেখ্য রচনা করেছেন এই বিরল স্রষ্টা। তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'কে অভিহিত করা হয় ব্রাত্যজীবনের মহাকাব্য বলে। বৃহত্তর ত্রিপুরার জলজীবী ব্রাত্য সমাজের সুগভীর নৃতাত্ত্বিক শেকড়ের অনুসন্ধান করেছেন এবং তাকে সংলগ্ন জীবনবোধের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সরসী লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। যন্ত্রণাবিদ্ধ ব্রাত্য মানুষের আপাত কাঠিন্যের আড়ালে লুকানো উচ্ছলতা, প্রাণ প্রাচুর্য, সততা ও সারল্যকে তিনি প্রকৃত-ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিরল সম্মানের আসনে বসিয়েছেন।"

ত্রিপুরা সরকারের তফশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মারকগ্রন্থ-২০০৭ এর মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে; ব্রাত্য মানুষের চোখের মণিতে আলোর ছোঁয়া দিয়ে, আগুনের পরশমণি দিয়ে তাদের যিনি জাগিয়ে রাখেন সেই কবি অনিল সরকার উপরের কথাগুলো লিখেছেন। এ কথা আমরা তুলে ধরলাম অদ্বৈত মল্লবর্মণ এবং তিতাসকে বুঝবার জন্য।

১৯৫৬ সালে 'তিতাস একটি নদীর নাম' পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। তিতাস প্রথম প্রকাশিত হয় 'মোহাম্মদী' সাহিত্য সাময়িকীতে। মোহাম্মদীতে তিতাসের ভাগ ছিল এরকম : 'দুই নদী', 'রামধনু' ও 'মহাবুদ্ধের সূচনা'। দুই নদী বেরিয়েছে ১৮ শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা অর্থাৎ শ্রাবণ ১৩৫২ বঙ্গাব্দে। 'মোহাম্মদী'-র তিতাস এবং গ্রন্থভুক্ত তিতাসের মধ্যে পাঠের পার্থক্য আছে। এই পাঠের পার্থক্য বিস্তৃত করেছেন অচিন্ত্য বিশ্বাস।

তিতাস এর আখ্যান চারটি খন্ডে বিন্যস্ত। প্রতিখণ্ডে আমরা পাই দুটি করে ঘটনাবৃত্ত।

(১) তিতাস একটি নদীর নাম, প্রবাস খণ্ড।।

(২) নয়া বসত, জন্ম মৃত্যু বিবাহ।।

(৩) রামধনু, রাঙা নাও।।

(৪) দুরঙা প্রজাপতি, ভাসমান।।

তিতাস একটি নদীর নাম

এখানে আছে নদীর বৈশিষ্ট্য, ঋতু পরিবর্তন এবং তার ফলাফল। আছে নদী সম্পর্কিত পারস্পরিক তুলনা। গৌরাঙ্গসুন্দর এবং নিত্যানন্দের জীবন সংগ্রাম। আছে নায়ানপুরের বোধাই মালোর কথা। জমির মিয়া জমিলার কথা। উদয়তারার কথা। বন্দালী আর কর মালীর জীবন বেদনা।

প্রবাস খণ্ড

এই খন্ডে আমরা পাই মাঘমন্ডল ব্রতের কথা, সুবল, কিশোর আর বাসন্তীর কথা। তাদের পাঠশালায় যাওয়া বন্ধের কথা—জালের জীবিকায় হাতে খড়ির কথা। এছাড়াও আছে সুবল কিশোর-তিলকের প্রবাস যাত্রার কথা। ভৈরবের মালোদের কথা। বাঁশিরাম মোড়লের কথা. দোলপূর্ণিমার উৎসব এবং কিশোরের রোমান্সের কথা।

নয়াবসত

নয়াবসতে আমরা পাই অনন্তের মা ও অনন্তের কথা। অনন্তের বিস্ময়বোধের কথা। মালোদের সমাজ বঞ্চনা ও আর্থ সামাজিক অবস্থার কথা।

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ :— এই পর্বে পাই কালোবরনের বাড়ি নতুন সন্তান জন্মের কথা। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির কথা, পিঠাপার্বণের কথা, দোল উৎসবের কথা।

রামধনু

এই পর্বে পাই কাদির—ছাদিরের রাঙা আলুর নৌকা তিতাসের জলে ডোবার কথা। অনন্তকে নিয়ে সামাজিক বিরোধের কথা। পদ্মপুরাণ পাঠের কথা। অনন্তকে পড়াশুনা করানোর পরিকল্পনার কথা। জালা বিয়ার কথা। মনসা পূজার কথা। অনন্তবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ এর মধ্য দিয়ে সহসা রাঙা নাও দেখতে পাওয়ার কথা।

রাঙা নাও

এই পর্বে পাই পাতিল বেপারিদের গান, নৌকা বানানোর কথা, বুরজের গান, নাও

দৌড়ানো দেখতে যাওয়ার কথা। বাসন্তী ও উদয়তারাদের সংঘাতের কথা। সুবলার বউ এর পরাজয়ের কথা।

দুরন্ত প্রজাপতি

এই পর্বে আমরা বেদনার্ত বাসন্তীকে পাই। যাত্রাগানের কথা পাই। মালোদের প্রতিরোধের ছবি খুঁজে পাই। অনন্তের শিক্ষালাভ ও কুমিল্লা যাত্রার কথাও এই পর্বে পাই। আর পাই যাত্রার দলের গানের প্রভাবে মালো সংস্কৃতি ভাঙ্গানের কথা। মালোদের বিজয়ের কথা, লোকসঙ্গীতের মহড়ার কথা।

ভাসমান

এই পর্বে পাই মালো সমাজের চূড়ান্ত ভাঙ্গানের কথা। মেয়েদের বিলাসিতার কথা। তিতাস শুকিয়ে যাওয়ার কথা। কৃষকদের চর দখলের কথা, লাঠালাঠির কথা, মালোদের ভাসমান জীবনের কথা।

সবগুলো পর্ব মিলে সুবল, বাসন্তী, কিশোর অনন্তের মা, অনন্ত, জমির মিয়া, জমিলা, উদয়তারা, বনমালী, রমু, ছাদির, খুশি, কাদির, গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ প্রভৃতি চরিত্রগুলো উপন্যাসের যে রসায়ন তৈরি করেছে এই রসায়ন উপন্যাসের প্রথাগত নির্মাণ চরিত্রকে ভিত্তি করে এগোয়নি তিতাসে। গোকর্ণঘাট, আমিনপুর, বিরামপুর, ভৈরববাজার, নয়াকান্দা, শুকদেবপুর, উজানী নগর, নবীনগর, সাদকপুর প্রভৃতি স্থানের আর্থ-সামাজিক চিত্রকল্প উপন্যাসকে যে উপাদান যুগিয়েছে উপন্যাসে তা ভাবাদর্শের বিকল্প বয়ান তৈরি করেছে।

আনন্দের উৎসব বাসুদেবপুরের দাঙ্গাবাজদের উপস্থিতির সামাজিক সংকটকে দূরে সরিয়ে দেয়। শুকদেবপুরের দোল উৎসব, গোকর্ণঘাটের দোল উৎসব, ছাদিরের রাঙা নাও, নাও দৌড়ানোর ঘটনা আমাদের এক অন্য জীবনের সন্ধান দেয়। নৌকা বানানোর প্রস্তুতি, অনন্তবালা, বনমালী, উদয়তারার আনন্দঘন পর্যবেক্ষণ, রাঙা নাও ভেঙ্গে যাওয়া, অনন্তকে ঘিরে সংঘর্ষের কথা, বাসন্তীর পরাজয়, বাসন্তীর বিষাদ সবকিছুই জীবনের অন্য গন্ধ বয়ে আনে। একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ লিখেছিলেন, "The methods by which a writer creates people in a story so that they seen actually to exist are called Characterization---A good writer gives us the illusion that a character is real." এই মতামতের ভিত্তিতে তিতাসের চরিত্রগুলো মৌলিক এবং মাটি থেকে উঠে আসা এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ এক্ষেত্রে সার্থক এবং প্রকৃত লেখকের শিরোপা পেতে পারে।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির উপাদান এই উপন্যাসকে উৎসবের জীবনওয়ালা উপন্যাসে পরিণত করেছে—বিধিবদ্ধ উপন্যাসে পরিণত করেনি। এই উপন্যাসের গঠনও ব্যতিক্রমী। পারসি লুবোক [Percy Lubbock] তার 'The Craft of Fiction' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছিলেন, "The best form is that which makes the most of its subject--there is no other definition of the meaning of form in fiction.' এই ভাবনার আলোকে অদ্বৈতের উপন্যাসের গঠনগত সার্থকতা চরমে পৌঁছেছে।

প্রচুর চরিত্রের রক্তমাংস 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসেরও রক্তমাংস। বাসন্তী, সুবল, কিশোর অনন্তের মা, অনন্তের মাসী, সুবলার বউ সমস্ত রক্তমাংসের চরিত্রগুলোর করোটী এক জীবন্ত উপন্যাসের বিন্যাসের ভিত্তিভূমি তৈরি করেছে।

এক বালকের দৃষ্টিকোণ থেকেও এই উপন্যাস বিস্ময়কর দর্শনে অন্যমাত্রা পেয়েছে। অনন্তের চোখের আলোয় যে ক্ষেত্র সন্ধান আমরা পাই তা বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সন্ধান-প্রক্রিয়া। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন কল্পনা বর্ধন। তিনি তার অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে উপন্যাস বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে লেখেন, "The boy's childhood, wonder-fille as it is, and his move from the minutely known dearly loved world. Poignaut as it is with conflicted pulls, do not occupy the space and emotional centrality as Apu's do in Bibhutibhusans Bandyopadhyhy's Pather Panchali Aparajita. In the last scene of pather panchali after his Sister's death and his family's move to distant varanasi, Apu in his grief for abandoned home, and the beloved locations, bags god to take him back to the village. The god of his destiny smiles at the foolish pain of the boy who does not know that he is chosen to travel the path of exploring and knowing. Titas is, to a lesser extent, about Ananta's journey through life." নদীকে রামধনু ভাবা, রামধনু দেখা, নৌকা দেখে রামধনু ভাবা, ছায়াপথ দেখে রামধনুর কথা ভাবা এক অনন্ত বিস্ময়ের উৎসভূমি সন্ধান করে এবং সন্ধানের প্রক্রিয়াজাত সন্তান হিসাবে অনন্ত বড় হয়ে উঠে।

আঞ্চলিক ও নদী-নির্ভর উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তিতাস শ্রেষ্ঠ নদী ও মানুষের যুগলবন্দী মহাকাব্য। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের শৈলী, ভাষা, কথকভঙ্গি, অন্তর্বয়ন, আর্কেটাইপ এখন ভাষা বিশেষজ্ঞদের গবেষণার বিষয়।

একারণেই অচিন্ত্য বিশ্বাস লেখেন, "গণ-ট্র্যাজেডি হিসেবে তিতাস একটি নদীর নাম শুধু মালোজীবনের কথাই বলে না—বলে নিত্যস্পন্দিত মানব জীবনের এক চিরকালের সত্য। এই হল সেই মানুষের কথা—যারা ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসে—স্বপ্নের ছন্দে বয়ে যায়, আর যাদের মাঝখানে জেগে ওঠে ভাসমান চর। সমস্যার বাধা উজান ঠেলে অনন্তের মৌণ ভেঙ্গে চলে যায় দুটি বৈঠা ওঠে আর ভাঙ্গে যে জীবন—পার্থিব দধির ভাণ্ড যাবতীয় সঞ্চয় যায় শেষ হয়ে। অথচ সেই দধির ভাণ্ডের প্রতি মায়া জাগে। মায়া জাগা আর মোহভঙ্গ হওয়া-এর মাঝখানে বয়ে চলে জীবনের সারৎসার নিয়ে—তিতাস একটি নদীর নাম। আঞ্চলিক পটভূমিতে লেখা হলেও তাই তিতাস একটি আঞ্চলিক উপন্যাস থাকে না—অনেক বড় এক পটভূমির আশ্রয় পেয়ে হয়ে ওঠে মহাকাব্যিক।" তাই নতুন সংরূপের প্রেক্ষিতে উৎপল দত্ত তিতাসকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। তিতাস নাটক হয়েছে—১৯৬৩ সালে ১০ই মার্চ। মিনার্ভা থিয়েটার হলে। প্রযোজক 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'।

ঋত্বিক ঘটকের তিতাস মুক্তি পায় জুলাই মাসের সাতাশ তারিখ, ১৯৭৩ সালে। ঋত্বিক ঘটক বলেছেন, "I am attracted by the pure whiteness of the feeling. It is a tale of intimate personal experiences intensely told. The picturesque beauty of the country is a point which has also attracted me most. Titas is also a saga of epic proportions. All the values here are magnified and deputed with Primitive Slender and Passion."

এই উপন্যাসকে নিয়ে যাত্রাপালা রচনা করেছেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শ্যামল ঘোষ। এই গ্রন্থের পরিশেষে তাঁর অনুমতিক্রমে আমরা সেই অসামান্য পালারূপটি যোগ করেছি।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ

কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না
পূজারি হাসিমুখে মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসে,
আমাকে শুধায়, 'দেখে এলে তোমার দেবতাকে?
আমি বলি, "না"।
অবাক হয়ে শুনে; বলে, "জানা নেই পথ"?
আমি বলি, "না"।
প্রশ্ন করে, কোন জাত নেই বুঝি তোমার?'
আমি বলি, "না"।

কারা ব্রাত্য? কারা মন্ত্রহীন? না, যারা ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্মের বাইরে ছিলেন বহুদিন বা এখনও রয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।" বহুর মধ্যে যারা ঐক্য উপলব্ধি করতে পারেনি, বিচিত্রের মধ্যে যারা ঐক্যস্থাপন করতে পারেনি তারাই ব্রাত্য। কেন ব্রাত্য না বর্ণগত শ্রেণিবৈষম্যের জন্য ঐ মূল অন্তর্নিহিত সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। অথচ

বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার। যে কর্মভারের উপর ভর দিয়ে সমস্ত সমাজ-জগৎ চলছে। ব্রাত্যজনেরা খেতে হাল চালায়, তাঁত বোনে, জাল ফেলে—সবই করে। কিন্তু ফলাফল হিসাবে পায় এক উপেক্ষিত ছবি। তারা সমাজের মূল বিদ্বৎসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মূঢ়তায় ভোগে। তাদের মুখ হয়ে যায় ম্লান এবং মূক। তাদের বুক হয়ে যায় শ্রান্ত, শুষ্ক, এবং ভগ্ন।

ঐ সব ব্রাত্য মানুষজনের আছে এক গাঢ় প্রতিবাদচেতনা। তারা চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচারকে, শুচিত্বকে কেবলই ঘৃণা করে যায়। সমাজ ব্রাত্য মানুষজনকে সবার অধম, দীনের হতে দীন হয়ে বাঁচতে শেখায় এক সংস্কারের বৃত্তে আবদ্ধ রেখে। তাদের অবস্থান হয় সবার পিছে, সবার নীচে—সর্বহারাদের মাঝে। আর যাদের চরণে দলিত হয়ে ধূলায় বয়ে যায় ব্রাত্যজনেরা; তাদের নাম বর্ণগতভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। তাদের উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছিলেন,

"এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত করো অপনীত
সব অপমান ভার।"

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন ব্রাত্য লেখক। ব্রাত্য সমাজের লেখক। তিনি দলিত লেখক। তাঁর সৃষ্টিগুলো দলিত সাহিত্য। দলিত সাহিত্য কী?—অচিন্ত্য বিশ্বাসের ভাষায়— "দলিত সাহিত্যের নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে। ব্ল্যাক লিটারেচারের যেমন নিজস্বতা আছে, তারও আছে আলাদা করে চিনে নেবার উপকরণ। উপকরণগুলি হল (১) Demand of Situation —সময়ের ডাক বা যুগের ডাক। সৃষ্টির দায়বদ্ধতা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। (২) Identity of Ethnicity — নিজস্ব পরিচয় পুরাণ বা শিকড়ের সন্ধান। প্রথাগত সাহিত্যে এই পরিচয়-মাত্রিকতা নেই। (৩) Naturality of Experience — এই সাহিত্য সরাসরি হাত পাতে জীবনের কাছে অর্থাৎ বাস্তব অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক এই সৃষ্টি আপন সরসতায় মাধুর্যপূর্ণ হয়।" উপরের সবগুলো বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ অদ্বৈত মল্লবর্মণের সাহিত্য। নদী, লোকায়ত সংস্কৃতি এবং দলিত বা ব্রাত্য জীবনের যুগলবন্দি হল অদ্বৈত মল্লবর্মণের সাহিত্য। জেলেরা যদি ব্রাত্য মানুষ হন, মালোরা বা গাবররা যদি ব্রাত্য মানুষ হন তাহলে অদ্বৈত মল্লবর্মণের মূল সৃষ্টি তিতাস ব্রাত্য জীবনের মহাকাব্য। তাঁর লেখার সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে এক ভাসমান সমাজের ছবি আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কৃত হয় এক চতুর্থ দুনিয়া। তাই কবি অনিল সরকার লেখেন :— "ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। দীর্ঘদিন তাকে আড়ালে রেখেছিল উপেক্ষার কালো পর্দা। কিন্তু তার কালজয়ী সৃষ্টিসম্ভার তাঁকে পুনর্জন্ম দিয়েছে। অবহেলার আড়াল থেকে এনে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার আলোক বেদীতে তাঁকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।"

অদ্বৈত মল্লবর্মণের ব্রাত্য চেতনা প্রখর ছিল বলেই তিনি লোকসাংস্কৃতিক উপাদানের ভাণ্ডারি ছিলেন। তার প্রধানতম রচনা, তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে কুমিল্লা—শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা অঞ্চলের এবং মালোপাড়ার কৌমজীবনের বিভিন্ন যাপিত—কথন।

বঙ্গাসাহিত্যে উপন্যাসের যে ধারা, তার আলোকে অদ্বৈত মল্লবর্মণের কথাসাহিত্যে যেভাবে ব্রাত্য সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে, অন্ত্যজ জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে তা আর কোন লেখকের কথাসাহিত্যে সেরকম করে পাওয়া যায় না। ব্রাত্যজীবনের যাপনচিত্র কীরকম? না, "ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়; রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়ে ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না।" ব্রাত্যমানুষেরা তিতাসের মতোই শাহী মেজাজে চলে। তাদের সাপের মতো বক্রতা থাকে না। কৃপণের মতো কুটিলতা থাকে না। তারা শোষিত হলেও কাঙাল হয় না।

ব্রাত্য জীবনের দরিদ্রতা বর্ণনা করতে গিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ লিখছেন : "উঠানের একদিকে একটা ডালিম গাছ। পাতা শুখাইয়া গিয়াছে। গৌরাঙ্গা সুন্দরের বউ লাগাইয়াছিল। বউ যৌবন থাকিতে শুখাইয়া গিয়াছিল। বুকের স্তন দুটি বুকেই বসিয়া গিয়াছিল তার। তারপর একদিন সে মরিয়া গিয়াছিল। সে মরিয়া গিয়া গৌরাঙ্গাকে বাঁচাইয়াছে। তার কথা গৌরাঙ্গা সুন্দরের আর মনে পড়ে না। তারই মত শুখাইয়া যাওয়া তারই হাতের ডালিম গাছটা চোখে পড়িতে আজ মনে পড়িয়া গেল। উঃ বউটা মবিয়া কি ভালই না করিয়াছে! থাকিলে আজ তার অবস্থা হইত ঠিক নিত্যানন্দ দাদার মত।

নিত্যানন্দ থাকে উত্তরের ঘরে। তাব বউ আছে। আর আছে একটি ছেলে, একটি মেয়ে। নিত্যানন্দ-পরিবারের দিকে চাহিয়া গৌরাঙ্গা শিহরিয়া উঠে! এক পেটের ভাবনা নিয়াই বাঁচি না, দাদা চারিটা পেটের ভাবনা মাথায় করিয়া কেমন তামাক খাইতেছে। তার যেন কোন ভাবনা নাই। সত্যি নিত্যানন্দের আর কোন ভাবনা নাই। যতই ভাবিয়াছে, দেখিয়াছে কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। বউ ঝিমাইতেছে। ছেলেমেয়ে দুইটা নেতাইয়া পড়িয়া কিসের নির্ভরতায় অক্ষম নিত্যানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। আর নিত্যানন্দ কোন উপায় না দেখিয়া কেবল তামাক টানিতেছে।"

মাঘমণ্ডলের ব্রত ব্রাত্য জীবনের উৎসব। অদ্বৈত এই লোকায়ত ব্রত কথাকে ব্রাত্য চেতনা থেকে উপন্যাসে উঠিয়ে এনেছেন। রাধা-কৃষ্ণের গানের মধ্যে যে সব কথা আছে, কথাতে যেসব সামাজিক চিত্রকল্প ফুঁটে উঠেছে তাও ব্রাত্য চেতনারই পরিচয় বহন করে। মানসগত লোকসংস্কৃতিকে সম্প্রসারিত করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ তার নিজস্ব চেতনা থেকে। তিনি লোকসাহিত্যের ব্রাত্য লোকায়ত চেতনাকে গ্রহণ করেছেন। তিনি ব্যবহার করেছেন লোকগীতিকা। পরিবেশনাগত লোকসংস্কৃতিকে তিনি ব্রাত্য চেতনা থেকে তার সাহিত্যে সংস্থাপিত করেছেন। প্রেমও বিনোদনকে তিনি মাটির গন্ধ সহ উঠিয়ে এনেছেন। পেশা ও বৃত্তিকে তিনি অকৃত্রিমভাবে চিত্রায়িত করেছেন। হাস্য কৌতুককে তিনি জীবনের গন্ধসহ

পরিবেশন করেছেন। লোকাচার ও লোক প্রথাকে তিনি তুলে এনেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা। তাই অদ্বৈত মল্লবর্মণের কথাসাহিত্য মানেই ব্রাত্যসমাজের প্রতিবাদী চরিত্র ও তাদের জীবন সংস্কৃতি। তার গল্প দল বেঁধে, স্পর্শদোষ, সন্তানিকা কান্না, বন্দী বিহঙ্গাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এখানে কোন বিদ্বৎজন নেই। বিদ্বৎজন নেই তিতাসে। শাদা হাওয়া কিংবা রাঙামাটিতেও। তার প্রবন্ধ নিবন্ধের বিষয় ছিল পুতুল বিয়ের ছড়া, ভিখারী সম্প্রদায়, ত্রিপুরায় বারমাসী গান, নাইওরের গান, পরিহায় সংগীত, মাঘমন্ডল, শেওলার পালা ইত্যাদি। বিষয়গুলোর মধ্যেই নিম্নবর্গীয় চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মধ্য থেকে তার চেতনার বৃত্ত প্রসারিত হয়েছিল।

গঙ্গা'র স্রষ্টা সমরেশ বসু

সাগরময় ঘোষ

অদ্বৈতের প্রিয় কবি টি এস এলিয়ট

পদ্মা নদীর মাঝি'র স্রষ্টা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাগরময় ঘোষ এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ

অচিন্ত্য বিশ্বাস দেজ পাবলিশিং থেকে অদ্বৈত মল্লবর্মণের যে রচনাসমগ্র প্রকাশ করেছেন তার উৎসর্গ পাতায় লিখেছেন "'নবশক্তি' সম্পাদক অদ্বৈতের সহকারী হিসাবে যিনি কলকাতায় সাহিত্যসেবা শুরু করেন, 'মোহাম্মদী' থেকে কর্মচ্যুত অদ্বৈতকে যিনি নিয়ে যান 'দেশ' পত্রিকায়, অদ্বৈতের রোগ নিরাময়ে যাঁর চেষ্টা ছিল আন্তরিক, যাঁর উদ্যোগে অদ্বৈতের সংগৃহীত বইপত্র রামমোহন গ্রন্থাগারে জমা পড়ে, যিনি এ-বই দেখলে খুশি হতেন—অদ্বৈত মল্লবর্মণের সেই অকৃত্রিম সুহৃদয 'দেশ' পত্রিকার কিংবদন্তী সম্পাদক প্রয়াত সাগরময় ঘোষের স্মৃতিতে।"

সাগরময় ঘোষ ছিলেন 'দেশ' পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক। প্রথমে কিছুদিন তিনি যুগান্তর পত্রিকায় কাজ করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি 'দেশ' পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে তিনি 'দেশ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হয়েছিলেন। তারপর সত্তরের দশকে পুরোপুরি সম্পাদক হন। ছয়দশক ধরে তিনি 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একজন সম্পাদক যিনি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কোনদিন লেখক হবেন না এবং তার সম্পাদিত কাগজে কিছু লিখবেন না। এ-এক বিরল ঘটনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, সম্পাদনার ইতিহাসে তো বটেই।

১৯১২ সালে সাগরময় ঘোষ তৎকালীন পূর্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর তাই কলকাতায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের অনিশ্চিত জীবনপর্বের অসাধারণ বন্ধু ছিলেন। আমরা পূর্বেই

বলেছি সাগরময় ঘোষ ১৯৩৯ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজে যোগদান করেছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম মালিক অশোককুমার সরকার তাঁর কারা সঙ্গী ছিলেন। অশোককুমার সরকারের আহ্বানে 'যুগান্তর' পত্রিকা থেকে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় এসে ২রা ডিসেম্বর তারিখে প্রফুল্লকুমার সরকারের নির্দেশে 'দেশ' পত্রিকার সুসম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ১৯৪৫ সাল। সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে সাগরময় ঘোষ তাঁর সহকারী হিসাবে নেবার জন্য অদ্বৈত মল্লবর্মণের নাম প্রস্তাব করেন পত্রিকা গোষ্ঠীর কাছে। ১৯৯৪ সালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাগরময় ঘোষ বলেন—অদ্বৈত মল্লবর্মণের "লেখার হাত খুব ভাল, খুব efficient —সেই জন্যই অদ্বৈত মল্লবর্মণকে নিতে চান তিনি।" অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখছেন— "১৯৩৬-৩৭ সালে নবশক্তির সহকারী সম্পাদক অদ্বৈত মল্লবর্মণের সাগরময়—১৯৪৫ সালে 'দেশ' এর সহকারী সম্পাদক। সাগরময়-এর সহকারী হয়ে যোগ দিলেন তিনি। দূর হল অনিশ্চয়তা।"

অত্যন্ত অনুধ্যানের সঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণ দেশ পত্রিকায় দক্ষতাও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করতেন। তার সহকর্মী জ্যোতিষ দাশগুপ্ত পরবর্তী সময়ে স্মৃতিচারণ কবতে গিয়ে লিখছেন— "মানুষটি খুব অন্তর্মুখী স্বভাবের আলাপচারিতায় অনভ্যস্ত ছিলেন। চুপচাপ থাকতেন। কাজকর্ম করতেন একমনে—নির্দিষ্টচিত্তে। কাজের কথা ছাড়া অন্য কথা প্রায় বলতেন না। .... নিজের কষ্টের কথা কাউকে বলতেন না।" সাগরময় ঘোষের অনুরোধে অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'দেশ' পত্রিকার পক্ষ থেকে একবার গঙ্গাসাগর মেলায় গিয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে। গঙ্গাসাগর মেলার উপর প্রতিবেদন লেখার জন্য। অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'দেশ' এর দুইটি সংখ্যায় সাগরমেলার উপর প্রতিবেদন লিখেছিলেন। প্রতিবেদনগুলোর শিরোনাম ছিল 'লাইট হাউস' 'পথে ও পথের প্রান্তে' এবং 'মেলায়'। লিখছেন প্রতিবেদন কিন্তু শক্তিশালী সাহিত্যসত্তার কারণে হয়ে উঠছে সৃষ্টি। 'সাগরতীর্থ' নামের প্রতিবেদন প্রকৃতপক্ষেই সাহিত্যসৃষ্টি। "জাহাজ ধীরে ধীরে সাগরে গিয়ে পড়ল। টের পেলুম না, কখন, কি করে সাগরে এসে গেছি। তীরের উপর চোখ রেখে চলছিলুম— সেই তটরেখা এক সময় চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল—স্বপ্ন যেভাবে মিলিয়ে যায়—তেমনি ধীরে ধীরে।

যাত্রীদের দিকে তাকালে করুণা জাগে—এত বড় একটা সাগর, যার সঙ্গে মিলেছে মহাসাগর—দুনিয়ার সকল মহাসাগরের সঙ্গে যার যোগাযোগ—তার সম্বন্ধে তারা একান্তই উদাসীন। চোখ তুলে তাকাবারও যেন গরজ নেই কারো। বিরাট একখানা উপন্যাসের মত জাহাজটা সাঁতার কেটে চলেছে। তার ভেতরে অনেক চরিত্র অনেক চঞ্চলতা, অনেক উপাখ্যান—আপনাতে আপনি মশগুল তারা, বাইরের দিকে বড় একটা কেউ তাকায় না—তাকালেই যেন তাদের জীবনের ছন্দপতন হয়ে যাবে। উপন্যাস এগিয়ে চলেছে নিজের জোরে। ততোধিক এক বিরাট পুরুষ যেন ধ্যানস্তিমিত চোখে সেখানা পড়ে চলেছেন। তাঁরই

মনের চৌম্বক আকর্ষণে সব কয়টি চরিত্র একটি দ্বীপের লবনাক্ত জলে ধুয়ে মুছে নিত্য পরিষ্কার করা একটি ক্ষুদ্র বালুচরের দিকে নিবিষ্ট চিত্তে এগিয়ে চলেছে। সে পাঠকের যে কোন নাম হতে পারে। তা পুরাণ রচয়িতা তাঁর নাম দিয়েছেন কপিল মুনি।" 'পথে ও পথের প্রান্তে' এই শিরোনামের যে প্রতিবেদন সেখানে লিখছেন, "কয়েকঘণ্টা পরেই এখানে যে এক শোচনীয় ট্রাজেডি ঘটে যাবে তারা কি তা জানতো? জানতো কি, যে শিশুর মুখে রোদ লাগছে বলে মা আঁচলের আড়াল দিচ্ছে, সে শিশু শত শত মানুষের সঙ্গে, মার সঙ্গে, মার প্রতিবেশীদের সঙ্গে জেটির তলায় পড়ে মিশে যাবে?" অথবা 'মেলায়' এই শিরোনাম পর্বে লেখক লিখছেন "ছোট ছোট ঢেউ এসে তীরের বালিতে গা এলিয়ে আবার সরে যাচ্ছে। সেই বালিতে দেখলাম কয়েকজন আঙ্গুলের ডগায় নাম লিখছে। এ লেখা কতক্ষণ থাকবে, কে পড়বে? তবু তাদের দেখাদেখি আমিও আমার নাম লিখে ফেললুম। সন্ধ্যায় মহিলারা সাগরকে বাতি দেখাচ্ছে গান গেয়ে গেয়ে। এতে বেশি উৎসাহ দেখলুম মারোয়াড়ি মেয়েদের। সাগরের উপর চাঁদ উঠেছে। জাহাজ চলেছে নিস্তরঙ্গ সাগরজলে আলোড়ন তুলে। যতক্ষণ দেখা গেল মহামুনি কপিলের তপস্যাভূমি চোখ ভরে দেখে নিলুম, তারপর এক সময় চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল।"

১৯৪৮ সাল। টি. এস. এলিয়ট নোবেল পুরস্কার পেলেন। সাগরময় ঘোষ এলিয়টের সাহিত্যকৃতী বিষয়ে প্রতিবেদন লেখার জন্য নির্বাচন করলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণকে। ১৩ই নভেম্বর দেশ পত্রিকার সংখ্যায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ টি.এস. এলিয়ট বিষয়ে তথ্যমূলক নিবন্ধ লিখছেন এবং এলিয়ট সম্বন্ধে শেষ কথা বললেন— "কাব্যশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ। সর্বযুগের কবিতা সম্বন্ধেই তাঁর অগাধ বুৎপত্তি। তাঁর ছন্দ ও ব্যঞ্জনা স্বভাবসিদ্ধ স্বত:স্ফূর্তিতে প্রবাহিত। যেন মনের ঐকান্তিকতা থেকে বিনা চেষ্টায় এগুলি বেরিয়ে আসে। তাঁর রচনা ও জীবন দর্শন ভাষার দিক বিবেচনায় ইংরাজী ও আমেরিকান সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে বিশ্ব সাহিত্যকে।

.... বর্তমান সভ্যতা কিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত তার বিশ্লেষণ করে দেখলে, এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার যৌক্তিকতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হবে। এই সভ্যতা যেন নিজে যা নয়, তার চাইতেও বেশি বলে নিজেকে জাহির করতে ব্যস্ত। এলিয়ট এর বিরুদ্ধে বজ্রসম, তীব্রতম অভিযোগ এনেছেন।"

এছাড়া আমরা জানি সাগরময় ঘোষের ইচ্ছায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ চেক নাট্য-প্রতিভা কারেল চাপেকের মজাদার নাটক 'How a Play is produced' এর অনুবাদ করেন। অনুবাদ সাহিত্যের শিরোনাম ছিল— 'নাটকীয় কাহিনী'। 'জীবনতৃষা'-র অনুবাদ সম্পর্কে অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখছেন, " 'দেশ'—এ প্রকাশিত অদ্বৈত মল্লবর্মণের সর্বোৎকৃষ্ট রচনা 'জীবনতৃষা'। ১৯ মার্চ ১৯৪৯ থেকে ২০ মে ১৯৫১ এই সুদীর্ঘ সময় ধরে এই লেখা প্রকাশ

পায়। আরভিং স্টোনের লেখা চিত্রশিল্পী ভ্যান গখের অসাধারণ জীবনোপন্যাস 'Lust for life' এর অনুবাদ। বইটি তাঁকে দিয়ে অনুবাদ করান সাগরময় ঘোষ। সফল এই অনুবাদ-উপন্যাসটি পড়ে তাঁর ভার বহন ক্ষমতা, ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা, শব্দ ও শৈলী লক্ষ্য করে সাগরবাবুর ইচ্ছা হয় তাঁকে দিয়ে একটি মৌলিক উপন্যাস লেখাবেন। তা সম্ভব হয় নি— ক্ষয়রোগ এসে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবন সংক্ষিপ্ত করে দেয়।"

সাগরময় ঘোষ এবং অন্যান্য সহকর্মীদের প্রচেস্টাতে কানাইলাল সরকারের সহযোগিতায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগে পার্টটাইম কাজ পেয়েছিলেন। পরবর্তী সময় সুশীল রায় লিখছেন, "অদ্বৈত মল্লবর্মণ একটি অদ্ভুত চরিত্র। তিনি 'দেশ' পত্রিকায় চাকরি করতেন, এবং পার্টটাইম কাজ করতেন 'বিশ্বভারতী'-তে। এই সূত্রে তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়, ও তাঁকে নিবিড়ভাবে জানতে পারা যায়। ... তিনি নিজেকে বঞ্চিত করেই আনন্দ পেতেন। তিনি দুই জায়গায় কাজ করতেন। মানুষের হেসে-খেলে চলে যাবার কথা। কিন্তু তার বাই ছিল দুটি—এক, স্বজন বাৎসল্য; দুই, বই কেনা।" যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার জন্য তাকে কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি করতে উদ্যোগ নেন সাগরময় ঘোষ। সুনীল দাস স্মৃতিচারণায় লিখছেন, "১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে ভর্তি হন। 'দেশ' পত্রিকার অর্থ সাহায্যে এবং অন্যান্য বন্ধুদের সহযোগিতায় অদ্বৈত রোগমুক্ত হয়ে ফিরে এলেন ষষ্ঠীতলার বাড়িতে। আবার হঠাৎ বেড়ে যায় পুরনো রোগ। সাগরময় ঘোষ, কানাইলাল সরকার প্রমুখ শুভানুধ্যায়ীরা আবার তাঁকে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এলেন কাঁচড়াপাড়ায়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস একদিন কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে এলেন হাসপাতাল থেকে। আর হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় হল না। অবশেষে ১৬ এপ্রিল ১৯৫১ ষষ্ঠীতলার বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ।"

সাগরময় ঘোষ এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণের মধ্যে ছিল এক অসাধারণ মানবিকতার রসায়ন। এমনই মানবিকতার রসায়ন তিতাস খুঁড়ে বের করেছিলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ

প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সৃষ্টিশীল নির্মাণশিল্পী হিসাবে একটা বিরাট সময় প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯০৪ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্র চব্বিশ পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কবিতার জগতে একটা ঘরানা তৈরি করেছিলেন। কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি অন্যতম নির্মাণ পুরুষ। সাহিত্যে সামাজিক বাস্তবতা আনয়নের ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় ভূমিকা রয়েছে। 'ঘনাদা' চরিত্র বাংলা সাহিত্যে চিরায়ত চরিত্র। তিনি চলচ্চিত্রকার হিসাবেও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রায় ১৪ টির মতো চলচ্চিত্র তিনি পরিচালনা করেছিলেন। প্রায় ৭০ টির মতো চিত্রনাট্য তিনি রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্র পুরস্কার, একাডেমি পুরস্কার, পদ্মশ্রী এবং দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত কালজয়ী কবি ও কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণের একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সাগরময় ঘোষ অচিন্ত্য বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানান, "বেঙ্গাল ইমিউনিটির পাবলিসিটি-ইনচার্জ ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তিনিই হলেন নবশক্তির সম্পাদক। তাঁর দায়িত্ব ছিল সম্পাদকীয় আর একটি বিজ্ঞাপন গল্প লেখা। 'বিজ্ঞাপন গল্প' অর্থাৎ 'বেঙ্গাল ইমিউনিটির' কোন ঔষুধের গুনগান করার গল্প।" এক্ষেত্রে অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিযুক্ত হয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগী হিসাবে। অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখছেন, নবশক্তিতে "স্বনামে বেনামে প্রচুর লেখার দায়িত্ব, পাতা ভরানোর দায়, পত্রিকায় ডাকে আসা লেখাপত্র নির্বাচন, পত্রিকার মুদ্রণের তত্ত্বাবধান এমনকি প্রচারের দায়িত্বও বহন করতে হয় তাঁকে।" বর্তমানে 'গণশক্তি' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত প্রবীণ সাংবাদিক বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

জানিয়েছেন, "অদ্বৈত মল্লবর্মণদের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল।" সুশীল রায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছেন, "১৯৩৬ সালের কথা। 'নবশক্তি' পত্রিকা তখন পার্কসার্কাস থেকে বেরোয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র নামে মাত্র সম্পাদক। পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব একা অদ্বৈত মল্লবর্মণের ঘাড়ে। যখনই গিয়েছি, দেখেছি কাজের চাপে অত্যন্ত বিব্রত। এক হাতে তাঁকে সবকিছুই করতে হয়। সাগরময় ঘোষ একসময় অদ্বৈত মল্লবর্মণকে সাহায্য করার জন্য ১৯৩৬ সাল নাগাদ 'নবশক্তি' পত্রিকায় যুক্ত হয়েছিলেন। ছয়মাস তাঁরা একসঙ্গে কাজও করেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে বলা যায় সাগরময় ঘোষ ছিলেন— ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাইপো, কামিনী কুমার দত্তের ছেলে অজিত কুমার দত্তের সহযোদ্ধা এবং কারাসঙ্গী। আমরা জানি, ১৯৩৭ সালে সাগরময় ঘোষ যুগান্তর পত্রিকায় কাজ নিয়ে চলে যান। কারণ নবশক্তিতে অদ্বৈত মল্লবর্মণ এবং সাগরময় ঘোষ দুজনেই তিরিশ টাকা মাত্র বেতন পেতেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ বেশি লিখে একটু বেশি রোজগারের চেষ্টা করতেন। পারিবারিক সংকটের জন্য। সাগরময় 'দেশ' পত্রিকাতে যোগ দিয়ে প্রথম থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে চলতেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'দলবেঁধে' গল্পসংকলনের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প ছিল।

ষষ্ঠীতলা লেনের বাড়িতে তার সহযোদ্ধা হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র নিয়মিত যেতেন। ১৯৫২ সালের ২৬ শে এপ্রিল মূলত প্রেমেন্দ্র মিত্রের উদ্যোগে অদ্বৈত মল্লবর্মণের সংগৃহীত পুস্তকগুলো সংগ্রহের জন্য রামমোহন লাইব্রেরিতে রাখা হয়।

রামমোহন লাইব্রেরিতে অদ্বৈত মল্লবর্মণের স্মরণসভাও হয়। অন্যতম বক্তা ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। অকৃতদার নিঃসঙ্গ অদ্বৈত মল্লবর্মণের শেষপর্যন্ত যে দু'জন সহযোদ্ধা ছিলেন তারা হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সাগরময় ঘোষ। আড়ালে থাকা অদ্বৈতকে বরাবর পর্দার বাইরে আনার চেষ্টা করতেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

'ত্রিপুরা' পত্রিকায় কাজ করার সময়ই দুজনের সম্পর্কের সূচনা হয়। সূচনার সম্পর্ক যে মতাদর্শের ভিত্তিতে হয়েছিলো সেই সমাজবাস্তবতার সাহিত্য মতাদর্শই তাঁদের সম্পর্ককে নিবিড়তম করে।

ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত — যাঁর অভিভাবকত্বে বড় হয়েছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ

প্রেমেন্দ্র মিত্র, নবশক্তি পত্রিকার সহযোদ্ধা
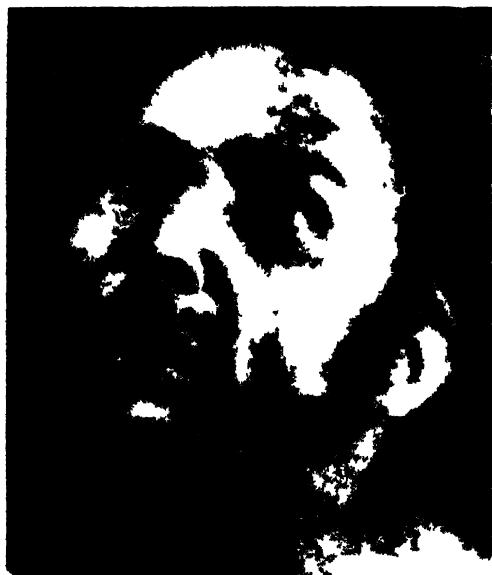
তিতাস একটি নদীব নাম ঃ উৎপল দত্ত পবিচালিত নাটকেব অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য

যে কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন অদ্বৈত

উৎপল দত্তের নাটক 'তিতাস একটি নদীর নাম'
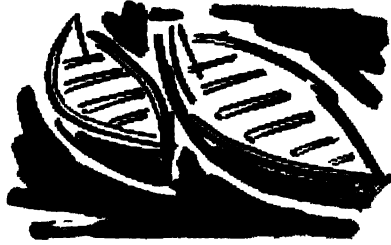
প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা উৎপল দত্ত জন্মসূত্রে পূর্ব বাংলার মানুষ ছিলেন। তিনি ১৯২৯ সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সারা জীবনই থিয়েটার, যাত্রা ও চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি মতাদর্শগতভাবে খুবই সমাজমনস্ক এবং বিপ্লবী মানুষ ছিলেন। শেকড়ের সংস্কৃতি, লোকায়ত চেতনার উপাদান তাঁর কাছে ছিল সচেতনভাবে প্রিয় এবং দরকারি।

বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল চরিত্র অদ্বৈত মল্লবর্মণ কে উৎপল দত্ত জানতেন। তার পাঠবিস্তার এবং স্বজনবৎসলতা উৎপল দত্তকে মুগ্ধ করেছিল। তিতাসে ব্যবহৃত কুমিল্লা-শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা অঞ্চলের এবং মালো সমাজের কৌম জীবনের বিভিন্ন যাপিত-কথন উৎপল দত্তকে প্রাণিত করেছিল।

খ্যাতকীর্তি নাট্যকার নাট্য পরিচালক উৎপল দত্ত 'তিতাস একটি নদীর নাম' —এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে উৎপল দত্ত নাট্যরূপদানের কাজটি সমাপ্তি করেছিলেন। উৎপল দত্তের বিখ্যাত নাট্যদল 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' মিনার্ভা থিয়েটারে নাটকটি মঞ্চস্থ হবার পর বিভিন্ন মহলে সাড়া পড়ে যায়। ১৯৬৩ সালের ১০ই মার্চ থেকে টানা ৭দিন নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল।

তখন দেশ বিভাগোত্তর পরিস্থিতি। বাংলার নানা স্থানে ছিন্নমূল হয়ে এসেছেন পূর্ববঙ্গের মানুষ। তাদের একটি বড় অংশের স্মৃতি জেগে ওঠে এই নাটকের মারফৎ।

উৎপল দত্ত মনে করেছিলেন তিতাসের হাওয়া বৈচিত্রের হাওয়া। অনেকেই মনে করেন, উৎপল দত্তের নাট্য প্রযোজনা ব্যতিত তিতাস হারিয়ে যেত। মহান সামাজিক মানব দলিল—'তিতাস একটি নদীর নাম'কে উৎপল দত্ত জনগণের কাছে অমর করে দিলেন। উৎপল দত্ত নাট্যরূপ দেওয়ার সময় মনে রেখেছিলেন, নদী বয়ে যায়—সভ্যতা গড়ে কখনো, ভাঙ্গে কখনো। তিতাসের বহমানতা ও অমরতাকে উৎপল দত্ত কল্লোলের মতো মঞ্চে এনেছিলেন। শিল্প মানেই লড়াই, এ চেতনা থেকে উৎপল দত্ত তিতাসকে মঞ্চস্থ করেছিলেন। বামপন্থী নাট্যকার উৎপল দত্ত যে মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে তিতাসকে মঞ্চস্থ করেছিলেন সেই কারণেই এখনো 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

এক ভীষণ দায়বোধ থেকে উৎপল দত্ত একাজ করেছিলেন। পারিবারিক উত্তরাধিকারের ক্রোমোজোমের সুতোয় জড়িয়ে ছিল কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঐতিহ্য। আমরা জানি উৎপল দত্তের পারিবারিক আদিনিবাস ছিল কুমিল্লা জেলা। অবিভক্ত কুমিল্লা জেলা। শেকড়ের টানের সঙ্গো যুক্ত হয়েছিল দুর্মর সমাজবীক্ষা।
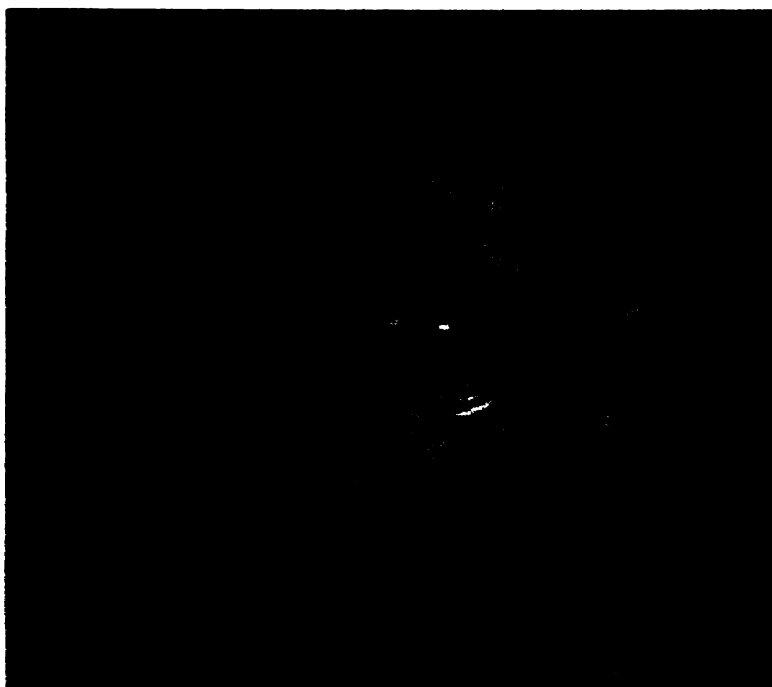
তিতাসের নাট্য রূপায়ক উৎপল দত্ত
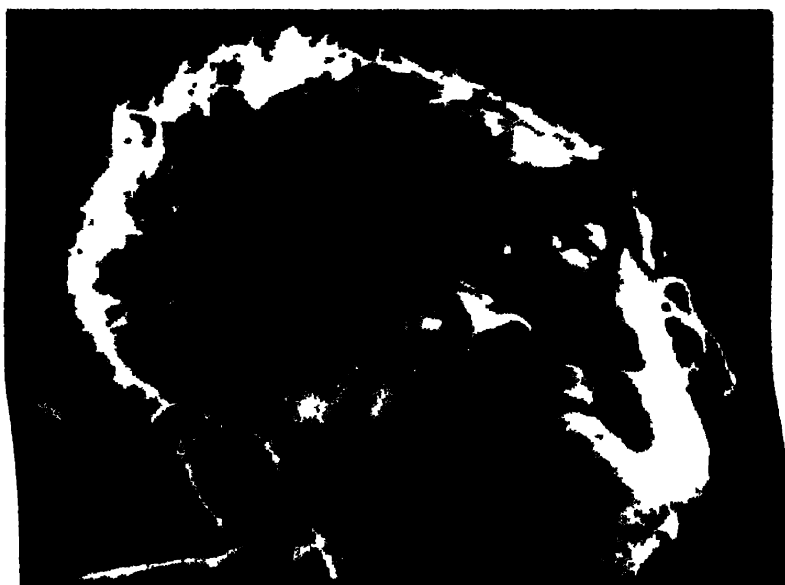
ঋত্বিক ঘটক ঃ তিতাসের চলচ্চিত্র নির্মাতা

লাস্ট ফর লাইফ-এর লেখক আরভিং স্টোন

পার্ল এস বাক্‌ — যাঁকে ভারতের চিঠি লিখেছিলেন অদ্বৈত

তিতাস একটি নদীর নাম

ঋত্বিক ঘটক এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ

ঘুমের মতন নীরবে নদী
যায়, বয়ে যায়।।
দু'কুলে তার বৃক্ষেরা সব
জেগে আছে;
গৃহস্থের ঘর-বাড়ি
ঘুমিয়ে গেছে,—
শুধু পরাণ মাঝি বসে আছে
শেষ খেয়ার আশায়।
যায়, বয়ে যায়।
কে জানে কবে কে নাম রেখেছে
তিতাস তোমার;
যে নামেই ডাকি তোমায়
তুমি কন্যা মেঘনার
মোষের মতন কালো সাঁজ
নামে তীরে;
আবহমান উলুধ্বনি

বাজে ঘরে ঘরে,—
পোহালে রাত ফর্সা ভোর
আসে নদীর নামায়
যায়, বয়ে যায়।

- আল মাহমুদ

তিতাসে জীবনের এক আবহমান উলুধ্বনি শোনা যায়। এই ধ্বনিতেই জেগে উঠেছিলেন আবহমান বাংলার দুই কৃতী শিল্পী। ঋত্বিক ঘটক এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ। ঋত্বিক বিশেষজ্ঞ সাজেদুল আউয়াল এক গ্রন্থমুখে লিখছেন; ঋত্বিক ঘটক বাংলার নবজাগৃতির বর পুত্র। বাংলা ভাগের গভীর ফাটল থেকে উঠে আসা এক কালচিহ্ন তিনি। তাঁর কালের কথক তিনি— বাঙালীর এপিকধর্মী সাহিত্যধারায় যে কথকরা ছিলেন, ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাঁদেরই একজন হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। প্রথম দিকের কাজে তাঁর চরিত্ররা তাঁর হয়ে কথা বলেছে, শেষে এসে তিনি নিজেই কথক। তাঁর কথা-বক্তব্য তিনি নিজেই কাহিনীর ছলে বলে গেছেন তার শেষ সৃষ্টি 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'-তে। তাঁর চিন্তন-প্রক্রিয়া তাঁর একান্ত নিজস্ব মার্ক্সীর বীক্ষা ও লোকপ্রিয় জ্ঞানকে একত্রে বাহিত করেছেন তিনি। সেখানে ঔপনিবেশিক জ্ঞানচর্চার বা সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য শিল্পতত্ত্বের কোন উপস্থিতি নেই।

তাঁর কাজে দলিত মানুষের উপস্থিতি প্রবল। নিজ দেশত্যাগী, বাস্তুচ্যুত, ছিন্নমূল, দলছুট, নির্বাসিত, নিঃস্ব-নিম্নমান মানুষ তাঁর মনোযাগ কেড়ে নিয়েছে সর্বাগ্রে। তিনি নিজেও ছিলেন তাদেরই একজন। ২১ বছর বয়সে দেশভাগের কারণে পরিবারের সাথে তিনিও পূর্ব বাংলা ছাড়তে বাধ্য হন। দাঙ্গা, মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশভাগ তাঁকে বিপর্যস্ত করেছে।

ঋত্বিক ঘটক ইমপিরিক্যাল কোয়েরির ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তৈরি হয়েছে তাঁর মনন। মানুষ, জীবন ও পরিপার্শ্বকে এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই বুঝতে চেয়েছেন তিনি। মানুষের মঙ্গল চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনও ভাবনা তাঁকে তাড়িত করেনি।

সকল পরাজয়, ব্যর্থতা ও ধ্বংসের পরেও প্রাণ ও সভ্যতার প্রবহমান ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন সকল সৃষ্টিতে, সকল সমাপ্তির শেষে। আর অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন বাংলার এক বিরল কথাসাহিত্যিক। অচিন্ত্য বিশ্বাসের ভাষায় "অদ্বৈত মল্লবর্মণ এমন একধরনের লেখক যার লোকপ্রিয় হবার সম্ভাবনা খুব বেশি হবার কথা নয়।' অথচ সময়ের জলছাপে তিনি হারিয়ে যান নি। কেউ তাঁকে তুলে আনেননি, কেউ তাঁকে খুব আড়াল করেছেন এমনও হয়তো নয়। কিন্তু তিনি যে ধরনের সমাজ থেকে উঠে এসেছেন, তাতে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা খুবই আকস্মিক।"

আমাদের সাহিত্যে মানব-সত্য সন্ধানে নতুন মাত্রা এসেছিল প্রগতি-সাহিত্য আন্দোলনে। তখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ভাবাদর্শের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ফলে ঐতিহ্য ও আধুনিকতাকে পাওয়া যায় একসঙ্গে। অবশ্য এই প্রক্রিয়ায় ঐতিহ্য-সন্ধান একই সঙ্গে সমগ্র ও অংশকে স্পর্শ করতে চেয়েছে।

অপরদিকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলা সাহিত্যে তো বটেই বিশ্বের সাহিত্যেও ব্রাত্যজীবনের অন্যতম ব্রাত্য লেখক। কথাসাহিত্যিক বিমল মিত্রের ভাষায় "এক একজন মানুষ থাকে যারা সব সময়েই নিজেকে আড়াল করতে ব্যস্ত। অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন সেই জাতীয় মানুষ।" সাহিত্যের সব ক্ষেত্রে তিনি তার ব্রাত্য চেতনার স্পর্শে সাহিত্যের অন্য এক ভুবনকে আলোকিত করেছেন। তিনি উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ লিখেছেন। লিখেছেন লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির অনালোকিত বিষয়গুলোর উপর নিবন্ধ। প্রথাগতভাবে লোকসংস্কৃতির চর্চা না করলেও নিজের স্বল্পস্থায়ী জীবনে অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন যথার্থই একজন লোকসংস্কৃতিক উপাদানের ভাণ্ডারি। তাঁর প্রধানতম রচনা 'তিতাস একটি নদীর নাম' কথাসাহিত্যে সংহত হয়েছে কুমিল্লা-শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা অঞ্চলের দলিত কৌমজীবনের বিভিন্ন যাপিত-জীবন কথন।

কৌমজীবনের, ব্রাত্যজীবনের যাপিত জীবন-কথনকে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক। যিনি দেশভাগ, দেশত্যাগ, নির্বাসন, ছিন্নমূলতার তীর ছুঁয়ে বড় হয়েছিলেন। বড় হয়েছিলেন ধ্বংস, পরাজয়, সৃষ্টির কোল ঘেঁষে। তিনি আস্থাবান ছিলেন মানুষের সম্মিলিত যাত্রায়। সভ্যতার প্রবহমানতার প্রতি ছিল তার তীব্র আস্থা।

ঋত্বিক ঘটক 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির স্যুটিং শুরু করেছিলেন, ১৬ জুলাই ১৯৭২ সালে। প্রেস শো করেছিলেন ২৬শে জুলাই ১৯৭৩-এ। মধুমিতা সিনেমা হলে। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিলো ১৯৭৩ সালের ২৭শে জুলাই। ১৫৯ মিনিটের ছবি। সাদা কালো ছবি ছিলো।

ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন, "শিল্প মানেই লড়াই"। 'তিতাস একটি নদীর নাম' কথাসাহিত্যের অন্তর্গত রক্তের ভেতর একটা লড়াই ছিল বলেই ঋত্বিক ঘটক তিতাসকে ছবি করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, আই.পি.টি.এ. এর সেন্ট্রাল স্কোয়াড এর নেতৃত্ব হিসাবে ঋত্বিক ঘটক 'তিতাস একটি নদীর নাম' কাহিনিকে মঞ্চস্থ করেছিলেন। 'চিত্রবীক্ষণ' এর প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন, কৈশোর ও যৌবনের তাঁর "সেই জীবন, সেই স্মৃতি, সেই নষ্টালজিয়া উন্মাদের মতো টেনে নিয়ে যায় তিতাসে, তিতাস নিয়ে ছবি করতে।"

তিতাস ছবির কাজ করতে গিয়ে ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন, "বক্তব্য বলার চেষ্টা বা পৃথিবী সম্বন্ধে জানা, মানুষের জীবযাত্রার প্রতি মমত্ববোধের প্রশ্নটাই প্রথম কথা। সিনেমার প্রতি মমত্ববোধ কোন কাজের কথা না। 'ও সমস্ত যারা Aesthets তারা করুন গিয়ে। এজন্যেই কালকে যদি একটা বেটার মিডিয়াম পাই তাহলে আমি সিনেমা ছেড়ে চলে যাব।' এখানেই অদ্বৈত মল্লবর্মণের সৃষ্টি দর্শনের সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের সৃষ্টি দর্শনের মিল। 'তিতাস'কে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গিয়ে মসিহউদ্দিন শাকের লিখছেন :

মূল চরিত্র তিতাস ও বাসন্তী। কিন্তু ছবিটা কি শুধুই নদী ও নারীর রোমান্টিক উপমাচ্ছন্ন? নাকি এর অন্য কোন তাৎপর্য আছে? তিতাস কী? বাসন্তী কে? দেখা যাক।

পৃথিবী মনুষ্যভোগ্যা। মানুষ প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হলেও জীবন ধারণের জন্যে সে প্রকৃতির ওপর লাঙল চালায়, জাল ফেলে, কুড়াল মারে, দাঁড় বায়। আর এসব করার মধ্য দিয়ে সে বেঁচে থাকতে পারলে কিংবা না পারলে সমাজে আইন বানায়, আইন ভাঙে, নামাজ পড়ে, গান গায়। এই সত্যটিকে তুলে ধরার সুবিধার্থে প্রকৃতির এমন একটা অঙ্গকে বেছে নেয়া হয়েছে যা কোন একটি জনবসতির মধ্যে ধমনীর ন্যায় প্রবাহিত, যার নীরে মাছেরা সাঁতার কাটে, তীরে গাছেরা দাঁড়িয়ে থাকে, লোকজন যার জল পান থেকে প্রক্ষালণ এমনকি নৌযানে চড়ে আক্রমণের জন্যে ব্যবহার করে থাকে। 'তিতাস' সেই নদীর নাম।

প্রথম দৃশ্যে দেখা গেল চক্রাকারে কিছু একটা ঘুরছে। খানিক পরে বোঝা যায় ওপর থেকে নেয়া শটে এটা একটা ছাতা। কাহিনীর শুরুতেই যে এটাকে ঘূর্ণায়মান বিমূর্ত বৃত্ত হিসেবে দেখানো হল এর একটা গভীর অর্থ হয়তো আছে। যেমন চক্রাকারে জীবনের যাত্রা। শেষ দৃশ্যে ঋত্বিক দেখিয়েছেন মৃত্যুর পাশাপাশি উপস্থিত নতুন জীবন। 'তিতাস' -এর জীবনের এই চক্রগতি নির্মাতার দোষে গুণে মিলে প্রতিভাত। কারণ ছবিটি দেখে অতৃপ্ত হওয়ার অনেক যুক্তি থাকে। প্রধানত সেগুলো বিষয়বস্তুর দুবর্লতা; আর কিছু আঙ্গিকের যা ঋত্বিকের অসংযমের ফল। শিল্পকলা জীবনের নির্যাস, যেমন আতর, ফুলের। এতে অসংযম আকাঙ্ক্ষিত স্বাদকে পানসে করে দেয়।

'তিতাস'-এ বিভিন্ন দৃশ্যে নাটকের ন্যায় প্রকাশ ভঙ্গি (ঋত্বিক একদা ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম সংগঠক ছিলেন), কাহিনীর সামাজিক বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যায় এমন ঘটনার চেয়ে প্রায়ই ব্যক্তির অকিঞ্চিৎ আবেগের ওপর দর্শকের মূল্যবান মনোযোগকে বেশিক্ষণ ধরে রাখা, আলোর অবিন্যস্ত ব্যবহার ও সঙ্গীতের কিছু অতিপ্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে ঋত্বিক শিল্পের পরিমিতি লঙ্ঘন করেছেন। অবশ্য কাহিনীর ব্যাপক পরিসরকে উপন্যাসের চেয়ে চলচ্চিত্রে সাজানো এমনিতেই কঠিন, যেহেতু চলচ্চিত্রে দৃশ্যবহির্ভূত বর্ণনা পরিহার্য। তথাপি ঋত্বিক সাহসের সাথে তিতাস পারের মানবগোষ্ঠির জীবনের জটিলতাকে রূপ দিতে চেয়েছেন এটাই বড় কথা। এই জটিল প্রক্রিয়ায় প্রধানত কী কী উপাদান আছে সরলভাবে দেখার চেষ্টা করা যাক।

১। জীবিকার জন্যে কাজ : মাছ ধরা, আলুর ব্যবসা, সুতো কাটা, চাষাবাদ।

২। উৎপাদনের উপকরণ : বৈঠাচালিত পালখাটানো গুনটানা কাঠের নৌকো, চরকা কিংবা তকলিতে কাটা সুতো, ঘরে বানানো জাল, কৃষিকাজে চিরাচরিত কাঠের লাঙল-ঢেঁকি, দুধের জন্যে গৃহপালিত পশু ও সবজীর জন্যে উঠোনে পোঁতা লাউ-কুমড়ো, যাতায়াতে নৌকো ও ঘোড়ায় টানা গাড়ির ব্যবহার – এক কথায় অনুন্নত সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন বৈশিষ্ট্য।

৩। জৈব উপাদান : রাজার ঝি (কবরী) ও কিশোরের (প্রবীর মিত্র) মধ্যে বিয়ের লগ্ন থেকে শুরু হওয়া নানা আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত জৈব আকর্ষণ, বিধবা তরুণী বাসন্তীর

(রোজী) অনন্তকে ঘিরে মাতৃক্ষুধা, বাসন্তীকে কেন্দ্র করে জমিদার (হায়াত) ও তার যুবা সঙ্গীর (ফখরুল) কামলিপ্সা।

৪। অর্থনৈতিক সম্পর্ক : রাজার ঝি'কে চাল ডাল দিয়ে বাসন্তীর সাহায্য (অর্থনৈতিকভাবে বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ) থেকে শুরু করে জমিদার কর্তৃক মালোপাড়ার ঘরে ঘরে অগ্নিসংযোগ –এ সবই এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচায়ক। যদিও শেষোক্ত কাজের জন্যে অচরিতার্থ লিপ্সাকেই প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, তবু বল প্রয়োগের পশ্চাতে যে অর্থশক্তি কাজ করেছে তা বোঝা যায়।

বাসন্তীর যৌবন সমাজের বেদবাক্যের কাছে ব্যর্থ হয়ে যায় বলে সমাজের সাথে তার দ্বন্দ্ব। কিন্তু এ সমাজের মূলে রয়েছে শ্রেণিবিভেদ ও তজ্জনিত অনুন্নত উৎপাদন প্রণালীর ওপর নির্ভরশীল এমন এক অর্থনীতি যাতে নারীর ভূমিকা গৌণ অথবা নেই। বাসন্তীর মুক্তি তথা সম্মানের সাথে বাঁচার একমাত্র পূর্বশর্ত হচ্ছে এই রকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুরোপুরি ধ্বংসসাধন – ঋত্বিকের অভীষ্ঠ বক্তব্য যদি এটাই হয় তাহলে তা বলতে পারায় তিনি দ্বান্দ্বিক (dialectic) বিচারে যতটা সফল হয়েছেন – 'তিতাস' -এর সাফল্য ততটাই।

'তিতাস' দেখলে মনে হয় ঋত্বিক এ বিষয়ে মোটামুটি সচেতন ছিলেন। 'মোটামুটি' এ কারণে যে লেনদেনের ব্যাপারটা তিনি অনেক জায়গায় আনলেও ব্যক্তির জীবনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখালেও সে সব প্রতিক্রিয়া বাস্তবে রূপান্তরের জন্যে খুব একটা অর্থবহ তো হয়ে ওঠেই না, উল্টো চরিত্রগুলোর মনে বিষয়ীগত (subjective) আবেগের জন্ম দেয়। যেমন, অনন্তর মা মরে গেলে সে যখন বস্তুত তার জীবনধারণের লড়াইয়ে ছিন্নমূল তখন সে চোখের সামনে তার মৃত মাকে পুজোর দেবীর ন্যায় দেখতে পায়। একে archetypal image কিংবা যাই বলা হোক এতে অনন্ত এবং দর্শক – উভয়েরই একটা ভাববাদী জগতে স্থানান্তর ঘটে। বাস্তব তলিয়ে যায় অবাস্তব রূপকল্পের নীচে।

"I do not in the least justify reality, but on the contrary, indicate in this reality itself the deepest sources (*though they are invisible at first sight)* and the forces that can transform it". (Lenin Coll. Works, Vol. 18. p. 330) বিশেষ জোর প্রদানটি লক্ষণীয়।

লেনিন তাঁর তাত্ত্বিক কার্যোপলক্ষে উক্তিটি করেছিলেন। মনে হয় আজকের চলচ্চিত্রশিল্পীরও দায়িত্ব এরকম। কিংবা আরও বেশি। কারণ চলচ্চিত্র আপাত অদৃশ্য বিষয়কেও দৃশ্যগোচর করার ক্ষমতা রাখে।

শিল্পীর দায়িত্ব প্রসঙ্গে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা উল্লেখ করা উচিত। ইতিপূর্বে ঋত্বিকের বিষয়ীগত চিন্তায় ত্রুটির নজির দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ীগত চিন্তা পরিহার করাও ভুল হবে। কেননা বিষয়গত (objective) জগৎ যেমন চেতনার জন্ম দেয় তেমনি চেতনা আবার বিষয়গত পরিস্থিতির ওপর প্রভাব ফেলে। মানুষের অবস্থা এ দু'য়েরই

বিভিন্ন মাত্রায় সংমিশ্রণের ফল। চেতনার ভূমিকাকে গৌণ করে দেখলেই বরং অন্য ধরনের ত্রুটি সংঘটিত হয়, যা fatalism.

Fatalist -এর যান্ত্রিক দৃষ্টিতে সমাজ সচেতন হওয়া বলতে কী বোঝায়? গর্কীর 'ওকুরভ শহর' উপন্যাসে ডা. রিয়াখিন এক যুবককে বলছেন, 'দর্শনের আলোতে দেখলে বুঝবে একটা মানুষ কোন সময় তার চারপাশের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যেমন পারে না সে পৃথিবীর ঘোরাটাকে বন্ধ করতে কিংবা পক্ষাঘাত রোগের লক্ষণ দেখার পর সেটাকে রোধ করতে। বা ধর এখন এই যে বিচ্ছিরি বৃষ্টিটা পড়ছে এটাকে পর্যন্ত সে থামিয়ে দিতে পারে না। কাজেই যা হবার তা হবেই, যা না হবার তা হবে না। তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন। এটা হল গিয়ে মার্কসের কথা, মাই ফ্রেন্ড, এর ওপর আর কথা চলে না।" তারপর যুবকটি যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু আলেক্সেই স্তেপানোভিচ ... মানুষকে তো কিছু একটা করতে হবে, না কি হবে না?" তখন ডা. রিয়াখিন জবাব দেন, "তাকে তো বলাই হয়েছে, ছেলেমেয়ের সংখ্যা বাড়াও, নিজেদের পথ ওরা নিজেরাই করে নেবে।" (M. Gorky Coll, Wks. Vol. 9. p. 67)

এখানে দেখা যাচ্ছে ডা. রিয়াখিন, যিনি 'দর্শনের আলোয়' জগতকে দেখার ব্যাপারে উৎসাহী, তিনি বড়জোর স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবের (!) একজন প্রবক্তা হতে পারেন, তার বেশি নয়। কারণ তিনি চেতনার ভূমিকায় বিশ্বাসী নন। তাঁর কোন কল্পনা নেই যা বাস্তবে রূপ দিতে যেয়ে তিনি পরিকল্পনায় হাত দেবেন।

সুতরাং সঠিক কল্পনা বা বিষয়ীগত উপাদান গভীর শিল্পবোধের বরং সহায়ক। এমনকি তা ফুটিয়ে তুলতে যদি শিল্পে বাস্তবের অতিরঞ্জন করতে হয় তাও দোষণীয় নয়। "... an artist whose imagination is properly directed and relies on a broad knowledge of reality and an intuitive wish to give his material the most perfect possible form and supplement data with what is possible and desirable, is also able to "foresec"; in other words, Socialist realist art has the right to exaggerate, to "fill out". "Intuitive" should not be understood as meaning something ahead of knowledge, something "prophetic" (M. Gorky from a letter to A. S. Shcherbakov, 1935).

ঋত্বিক তিতাসপারের বাস্তবের সাথে সাথে তার দুঃসহ উপাদানগুলো দূর করার জন্যে সেখানকার মানুষের চেতনা কিংবা কর্মের কোন অভিব্যক্তি কি তুলে ধরেছেন? কিছু কিছু জায়গায় ধরেছেন বই কি। যেমন জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর সামনে জনগণের প্রতিরোধ – যদিও তা দ্বিধাবিভক্তির জন্যে ব্যর্থ হয়ে যায়; কিংবা জমিদার ও তার লম্পট স্যাঙাতের অপদস্থ হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এসব ঘটনার তাৎপর্য লঘুতর অনেক দৃশ্যের ভীড়ে হারিয়ে যেতে চায়। যেমন উন্মাদ কিশোর মালোর নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রণয়ভঙ্গী ও বালুচরে

হরপার্বতীর কায়দায় রাজার ঝি'র সাথে মিলন প্রহারপর্বের পর পর্বতে প্রযোজ্য ঢঙে রাজার ঝি'র বালিতে গড়াগড়ির দৃশ্য।

ঋত্বিক তিতাসপারের মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তিও দেখিয়েছেন। কিন্তু তা যেন কেবল জুম লেন্সের মাধ্যমে নৌকা বাইচের ন্যায় উত্তেজনক দৃশ্যের অবতারণা করার জন্যে। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ঋত্বিক শট কম্পোজ করতে পারতেন চমৎকার। অথচ অর্থহীনভাবে অনেক সুন্দর শটের আমদানী অথবা দীর্ঘস্থায়িত্ব অলঙ্কারের পর্যায়ে গিয়ে ছবি ঘোলাটে করেছে বলে মনে হয়। প্রশস্ত কোন লেন্সের ব্যবহারও যত্রতত্র হওয়ায় এর বিশেষ আবেদন কমে গেছে।

শেষ দৃশ্যে আসা যাক। বাসন্তী এখানে তার সমস্ত দুঃসহ ব্যঞ্জনায় উপস্থিত। বাসন্তী যেন তিতাসের লাঞ্ছিত মানবগোষ্ঠির মূর্ত রূপ। কিংবা তার চেয়ে বেশি। কেননা শোষিত সমাজে নারী যে 'দ্বিগুণ শোষিত' (লেনিন) তার প্রমাণ এখানে মেলে। সমগ্র সমাজে যে অর্থনৈতিক শোষণ চালু আছে বাসন্তী তারই ফলে অবমাননাকর যৌনপ্রস্তাবের শিকার। পাইকারী গৃহদাহে তার সমাপ্তি। সরকারী পরিকল্পনায় অবহেলিত থেকে তিতাস শুকিয়ে গেছে। বাসন্তী এই খাঁ খাঁ করা প্রকৃতিরও প্রতীক। মৃত্যুপথযাত্রিনী বাসন্তীকে আপাতত কেউ বাঁচাতে পারে না। কাদের মিয়ার নিরস্ত্র মমত্ব এক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎ। বাসন্তী মরে যায়। তার মৃত্যুর মুহূর্তে ফসলের খেতে ভেঁপু বাজিয়ে দুরন্ত শিশুর পদচারণা এক নিঃসন্তান রমণীর আযৌবন স্বপ্নই শুধু নয়, চর পড়ে যাওয়া সমাজগর্ভে লুক্কায়িত সম্ভাবনাও বটে। দৃশ্যটি কাব্যিক দিক থেকে Cranes Are Flying -এ বরিসের মৃত্যুদৃশ্যের সাথে কিংবা Shop On The Main Street -এর শেষ দৃশ্যের সাথে তুলনীয়। আঙ্গিকের দিক থেকে তিতাস -এর এ দৃশ্যটি মনে হয়েছে বিষয়বস্তুর সাথে সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ঋত্বিকের শৈল্পিক ধারণার পরিণততম রূপ।

শৈল্পিক ধারণার এই পরিণততম রূপের প্রকাশই ঘটাতে চেয়েছিলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। সেই এক নদীর কাছে অদ্বৈত এবং ঋত্বিক দুজনেই গিয়েছিলেন মানুষ ছুঁতে যাবার প্রচেষ্টা থেকে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস ও চলচ্চিত্র দুই শিল্পকর্মেই একটা প্রচেষ্টার সন্ধান পাওয়া যায়। সেই প্রচেষ্টার নাম হল জীবন যে-রকম সেই জীবনকে সংস্থাপন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' দেখলে পর বোঝা যায়—নদী বয়ে যায়। সভ্যতা কখনো ভাঙ্গে। কখনো গড়ে। শেখ নিয়ামত আলি লিখছেন— "মানবিক মূল্যবোধের একটা চরম দলিল— 'তিতাস একটি নদীর নাম'। অমর সাহিত্যিক শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর উপন্যাসে তিতাস নদীর তীরে অবস্থিত একটা ছোট গ্রামের বাসিন্দা—মল্লদের জীবন আলেখ্য এঁকেছেন। রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-তুফানের ভয়—ডর নেই এদের। মাছ ধরা ও জাল বোনা এদের একান্ত জীবিকা। তিতাস নদীটি যেন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখের ভাগী। তিতাসের জলে এদের জীবন জুড়ায়। এহেন মল্লদের সমাজ ব্যবস্থায় যারা অবহেলিত, অপাংক্তেয়—মানবিক দৃষ্টিকোণ

থেকে তাদের মূল্যায়ন করা কি কঠিন নয়? "সত্যিই কঠিন। একারণেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও ঋত্বিক ঘটক দুজনেই আমাদের কাছে এখনও স্মরণীয়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদের কর্মী চিত্র সমালোচক মাহবুব আলম লিখছেন :

বিশুদ্ধ কবি না হতে পারলেও তিতাস একটি নদীর নাম হল একটি মহান সামাজিক দলিল। হীরেন্দ্রনাথ দে'র ভাষায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' বাংলা সাহিত্যের আশ্চর্য-সম্ভার। লোক জীবনবৃত্তের উপাখ্যান – ঋত্বিক ঘটকের চিত্রনাট্যে যে জীবনবৃত্ত বিভিন্ন বৃত্তাংশে অঙ্গাঙ্গী জড়িত এবং সহজে বিশ্লিষ্ট। ক্যামেরা কাছাকাছি থেকে আহরণ করেছে জীবনের বিচিত্র প্রকাশ, স্পর্শ করতে পেরেছে লোক-জীবনের মানসিকতা এবং আবেগের সীমানা। চিত্রনাট্যে ঘটনাবিন্যাস সেনট্রিপিট্‌ল্ রীতি আশ্রয়ী। জাম্পকাটের সাহায্যে একেকটি বৃত্তের ঘটনা অগ্রসর হয়েছে, দৃশ্যকল্প এবং সংলাপে গল্পের নির্মিতি।

একক কাহিনীনির্ভর গল্প নয়, জীবনের এক তাৎপর্যময় অনুভবের প্রকাশ ঘটেছে গল্প-বৃত্তের সমন্বয়ে, জীবনবোধের ও ইতিহাস চেতনার গভীরতায়। গল্পাংশে নাটকীয়তা আছে, তবে নিছক নাট্যরস সৃষ্টির উপায়স্বরূপ নয়, জীবনের নাটকের প্রকাশের জন্য এবং গতির অনিবার্য বাহন হিসেবে।

কিশোর-রাজলক্ষ্মীর অচরিতার্থ জীবন; তাদের ছেলে অনন্তর কচুরিপানার মত ভাসমান জীবন ; বাসন্তীর ব্যর্থ যৌবন, অপূর্ণ জীবনের হাহাকার; বাসন্তীর সইয়ের সংসার জীবন; বনমালীর বোনের মাতৃত্বের তৃষ্ণা; রামপ্রসাদের একলা জীবন; কাদের আলী এবং গৃহস্থ কৃষক পরিবারের কথা ... প্রত্যেকটি গল্পাংশেই জীবনের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র অল্প পরিসরে স্পষ্টতা পেয়েছে। চিত্রনাট্যের গ্রন্থনার সমন্বয়ের প্রয়াস প্রশংসনীয় (তবে মাঝে মাঝে কোথাও শিথিলতা দেখা গেছে)। অবশ্য সে জীবন নগণ্যসংখ্যক নাগরের (?) জীবন নয়; হাজার বছর ধরে বাংলার প্রকৃত মানুষের সমাজ জীবনচিত্র-যারা মাছ ধরে, ফসল ফলায়, উৎপাদনের চাকা ঘুরিয়ে যায়।

উভয় বাংলায় এযাবৎ নির্মিত কোন ছবিতেই বাংলার প্রাকৃত জনের জীবন-সমাজ এতো আন্তরিকভাবে চলচ্চিত্রের পর্দায় উঠে আসেনি। ঋত্বিক এ বিষয়ে দুঃসাহসী পথিকৃৎ। তিতাস নদী-পারের একটি জেলে গ্রামের কয়েক ঘর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে নদীমাতৃক বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকসমষ্টির ইতিহাসনিষ্ঠ সমাজ-জীবনের পরিচয় বিধৃত হয়েছে এক অনন্য জীবনদর্শনের সত্যস্পর্শে। উপমহাদেশীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে 'তিতাস একটি নদীর নাম' এক স্মরণীয় মহান সামাজিক মানব-দলিল চিত্রের সম্মান পাবেই।

নদী এদেশের সভ্যতার উৎস আবার ধ্বংসেরও কারণ। নদীগর্ভে দেশীয় সমাজ সভ্যতার বহু কিছু বিলীন হয়ে গেছে। নদীপথ পরিবর্তনে সমৃদ্ধশালী বন্দর-শহর জনশূন্য প্রান্তর হয়ে গেছে। নদীর ভাঙ্গা-গড়ার সাথে মানুষের ভাগ্যের ভাঙ্গা-গড়া অবিচ্ছেদ্য। বাংলার ইতিহাসে

চক্রাকারে এই নদীর খেলাই চলে এসেছে। একদিকে চর পড়েছে, অন্য দিকে নতুন মাটি জেগেছে। স্বশাসিত গ্রাম ও সমাজ উজাড় হয়ে গেছে, অন্যদিকে নতুন বসন্ত এবং নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে। এইতো বাংলার প্রাণ ও জীবনের ইতিহাস। কিছু মানুষের জীবনচিত্রের রূপকে এই ইতিহাস চেতনাকেই ব্যপ্ত করতে চেয়েছেন ঋত্বিক ঘটক। যে কারণে এই ছবি একান্তই বাংলার ও বাঙালির জীবনকাব্য।

তিতাসের ধারা শুকিয়ে গেলে বিপর্যয় নেমে আসে তিতাস পারের গ্রামে। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা দুর্বহ হয়ে উঠল। চতুর্দিক থেকে বিপদের সূত্রপাত ঘটল। মহাজনের হামলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অভাব-অনটন একতাবদ্ধ সমাজের ভিত্তিভূমিতেই পচন ধরিয়ে দিল। একটি সম্পন্ন গ্রামের কপাল ভাঙল। খেটে খাওয়া স্বনির্ভর মানুষ উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে ভিক্ষাজীবী, মজুরে পরিণত হল। এই কারণেই কনফিডেন্টাল ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন "আমি ছাড়া তিতাস সৃষ্টি হতো না। তিতাস ছিল আমার স্বপ্ন। আমার মমতা দিয়ে এ কাহিনীকে কেউ তুলে ধরতে আগ্রহী হতেন না।"

'ভারতের চিঠি — পার্লবাক কে' এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ

পার্ল এস বাক একজন মার্কিন ঔপন্যাসিক। ১৮৯২ সাল থেকে ১৯৭৩ সালের সময়রেখার জীবন ছিল তাঁর। চীন সম্পর্কিত তার বিখ্যাত উপন্যাস 'দি গুড আর্থ'। তিনি ১৯৩১ সালে এই উপন্যাস লিখেছিলেন। এই উপন্যাসের জন্যই পার্ল বাক মূলত নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে তিনি রচনা করেছিলেন, 'সনস্'। ১৯৩৫ সালে তিনি রচনা করেছিলেন 'এ হাউস ডিভাইডেড'। 'দি গুড আর্থ', 'সন্স' এবং 'এ হাউস ডিভাইডেড' তিনটি তাঁর উপন্যাস হিসাবে বিখ্যাত। সমালোচনা সাহিত্যের বিশ্লেষণ অনুযায়ী তাকে বলা হয় বাস্তববাদী বিশ্লেষণমুখী লেখিকা। তাঁর সময়ের সৃষ্ট প্রকৃতিবাদী লেখালেখি থেকে তাঁর লেখার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্নগোত্রের। অদ্বৈত মল্লবর্মণ লেখিকার বাস্তবতাকে খন্ডন করেছিলেন এবং তুলে ধরেছিলেন ভারতে নির্মম চিত্রকল্প। তিনি মনে করেছিলেন, 'গুড আর্থ' এর জনপ্রিয়তার আলোকে বোধওয়ালা মানুষেরা নিজের বাস্তব সামাজিক অবস্থান ভুলে যেতে বসেছেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ ঘোষ তার 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ এক ভিন্ন প্রতিস্রোত' গ্রন্থে লিখছেন, "বিশ্বযুদ্ধ মানুষের স্বাভাবিক চেতনাকে পরিবর্তিত করে। যুদ্ধ শব্দটার মধ্যে রয়ে গেছে হিংসার উন্মাদনা। আর যুদ্ধের বিরুদ্ধে যাওয়া মানবজাতির বিকাশের অন্যতম উপাদান। হ্যাঁ-যুদ্ধ ও না-যুদ্ধের মাঝখানে থেকে যায় কিছু স্থবিরতার সময়। তবুও যুদ্ধ আসে। সেই পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত সমস্যাও আমাদের মথিত করে দেয় নানা দিকে। সম্পর্ক কখনও মধুর হয় না। এই ঘেরাটোপ থেকে নিজেকে উজাড় করে বঙ্গ দেশে একজন

কথাসাহিত্যিক কীভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন সেটারই রূপরেখা এই আলোচনায় স্থান পাবে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। জীবিতকালে এটি তাঁর একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ। এই রচনার উদ্দেশ্য ও বিধেয় এতটাই সমাপাতনিক যে, ভিন্ন ভাষায় আর একজন লেখিকা দেশের বাইরে বহু দূরে অবস্থান করেও সেটার নাগাল বা হদিশ পাবেন না। এটা কম বেশি প্রত্যেকেরই জানা। অদ্বৈত এই গ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন 'ভারতের চিঠি : পার্ল বাক-কে।' --- বাংলা ভাষায় লেখা রচনা পার্ল এস. বাকের কাছে পৌঁছবে না, সেটা তিনি জানতেন। দেশবাসীকে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতে কোনও ভাবেই অন্য আশ্রয় গ্রহণ করেননি। আমরা গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ হাতে পাইনি। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বিশ্ববাণী (কলকাতা) সংস্করণ এই আলোচনার আধার হিসাবে গণ্য হবে।

এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখে আলোচনার পরিধি বাড়ালে প্রথমত যে বিষয়টি গোচরে আসে সেটি হল— 'ভারতের চিঠি' জাতীয় রচনা। খোলা চিঠির আকারে কেন লিখতে চাইলেন? আশ্চর্য এই, তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই, থাকলে এবংবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতেন কিনা সন্দেহ থেকেই যায়। কেন? তাঁর চরিত্রের যে স্বভাবটি আমরা জেনেছি, একটা অন্তর্মুখীনতা তাঁর ছিল। ফলে আজ কোনওটাই সম্ভব নয়। তাই রচনা ও চরিত্রের দিকগুলো থেকে অদ্বৈতকে ধরতে চাই। এই ধরার মধ্যে আংশিক বিপর্যয় থাকার প্রবণতা হতে পারে যদি না তাঁর আদর্শগত দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন হই। একটি বিষয় যথেষ্ঠ বড় প্রশ্নের দাবি তোলে। অদ্বৈত সুদূর গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে এসেছিলেন রুটিরুজির জন্য ত্রিশ দশকের গোড়াতেই। আমৃত্যু প্রায় কুড়ি বছর তিনি পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা কর্মে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই সময়ে ত্রিশ ও চল্লিশ দশক জুড়ে কলকাতা শহর একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আলোড়িত হচ্ছিল, তেমনি এর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সাম্যবাদী আন্দোলন। মূলত বামপন্থীদের আন্দোলন। পাল ছেঁড়া এই সময়ে দাঁড়িয়েও বলা যায়, ওই দশক জুড়ে সাম্যবাদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছিল। যদিও তাঁরা সংখ্যায় বেশি ছিলেন না, অথচ গুণগত মান ছিল বেশি। যাঁরা ছিলেন তাঁরা অবশ্যই 'সচেতন মানুষ'। আমরা অদ্বৈতকে 'সচেতন মানুষ' হিসাবে চিহ্নিত করতে চাই। এমন প্রশ্ন অবশ্যই জানাতে পারি—কেন চিহ্নিত কবব? নিবন্ধের মাঝপথে এর সূত্র পাওয়া যাবে। সচেতন হয়েও অদ্বৈত সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেন না। 'সক্রিয়' শব্দের বহু অভিধা যোগ করা যায়। সচেতন মানুষেরা যখন জাতির পরাধীন দিনগুলোতে দেশের ও দশের হয়ে কলম ধরেন তখন কি তাঁকে নিস্ক্রিয় বলা যেতে পারে! তর্কের অবসান ঘটিয়ে চলতি মুদ্রায় সক্রিয় বলতে আপত্তিই বা কোথায়। যদিও তিনি সক্রিয় বামপন্থী আন্দোলনে নিজেকে জড়ালেন না। আগ্রহও প্রকাশ করেননি। বস্তুত অদ্বৈত এদের প্রতি বিমুখ রইলেন। আদর্শের তীব্র আকর্ষণী ক্ষমতা তাঁকে টেনে আনতে পারল না। স্রোতের ধারায় তিনি খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়েই রইলেন। অদ্বৈতের আপাত উদাসীন আচরণ আমাদের খানিকটা বিস্মিত করেছে।

'তিতাস' ব্যতিরেকেই এ কথা বলতে পারি 'শাদা হাওয়া' উপন্যাস ও 'ভারতের চিঠি' আমাদের অন্যরকমের সাক্ষ্য দেয়। একটির মধ্যে রয়েছে চল্লিশ দশকের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ উত্তাল কলকাতা শহর, অন্যটিতে রয়েছে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থান ও দর্শনগত সমস্যার আঞ্চলিক ভিত্তিভূমি। অদ্বৈতের লেখার পরিমাণ বেশি না হলেও 'ভারতের চিঠি'ই ছিল তাঁর প্রথম গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশের সোঁদা গন্ধ যেভাবে একজন নবীন যুবক ঘ্রাণ নিয়ে থাকে—এই লেখায় তার কিছু আভাষ আছে। আবেগের ফল্গুধারা বেগবান হয়েছে, কখনও বিপথগামী হয়নি। বহু আলোচনার পাশাপাশি 'ভারতের চিঠি' কেন আলোচিত হল না সেটাও আর এক বিস্ময়ের কারণ। এই একটি লেখার মধ্যে অদ্বৈত সম্ভবত নিজেকে মেলে ধরেছেন আদর্শগত দিক থেকে, দর্শনগত দিক থেকে। 'তিতাস' এর ইতিহাসবোধ যেভাবে পরোক্ষ কাজ করে, ভারতের চিঠি ততটাই প্রত্যক্ষ। কেননা পার্ল এস বাক-কে মসীযুদ্ধে আহ্বান জানাতে গেলে যতটুকু পারদর্শিতা থাকা প্রয়োজন অদ্বৈত ঠিক ততটাই অর্জন করেছিলেন। বঙ্গ সাহিত্যে এই জাতীয় দৃষ্টান্ত এতকাল গরমিল ছিল।

এই গ্রন্থের প্রাক্-প্রস্তুতি হিসেবে খুব বেশি সময় তিনি পাননি। পার্ল এস বাক সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৩৮ সালে। অনুমান করা যেতে পারে এর পরবর্তী সময়ে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। সংবাদ সাময়িক পত্র পত্রিকায় কাজের সুবাদে বিশ্বের সামগ্রিক চেহারা তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল। কিন্তু যে সাহস ও প্রেরণা এ জাতীয় কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে তার চালিকাশক্তি অদ্বৈতের প্রাণশক্তিতে কীভাবে নিহিত ছিল, তার অনুসন্ধান কী আমাদের প্রয়োজন নেই? এই বইয়ের উৎসর্গে তিনি লিখছেন—

"ছায়াঘেরা পল্লীর সজলতা মাড়িয়ে এসে ক্ষমাহীন নাগরিক রুক্ষতার ধূসর রূপের আগুনে জ্বলেই যেতুম—যদি আপনার প্রীতি-আর্ত প্রাণ পাখা মেলে না ধরতো।"

এটা শুধু সাহিত্যেরই ভাষা। এই শব্দ ব্যঞ্জনার মধ্যে অনুরণিত হয় স্ফটিক স্বচ্ছ একজন মানুষের আর্তী। অদ্বৈত জানতেন, তিনি তাঁর জন্মভিটার অংশে কী ফেলে যাচ্ছেন। এই বোধ তাঁকে তাড়িত করেছিল তিতাস লিখতে।

আবেগ উৎসারিত মানবতার প্রকাশ কখনোই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়না যদি না মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে। এই দায়বদ্ধতা থেকেই পার্ল-বাক-কে খোলা চিঠি লিখতে গিয়ে তিনি লেখেন : "সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অনেক নারীই তোমার মতো পেয়েছে। তাদেরকে জানি; পড়েছি ভালো লেগেছে। গুণগ্রাহিতা দেখিয়ে তাদের উপর বা তাদের বইয়ের উপর প্রবন্ধ লিখতেও পারি। তবু বলবো তোমাকে যত ভালবাসি, তাদেরকে তত বাসি না। তাদেরকে যে প্রেম-সিক্ত শ্রদ্ধা দেবার কথা কখনো ভাবি না, তোমাকে তাই দিতে পারি অ-ক্লেশে।

এর কারণ জানো? তারা কথা-সাহিত্য সৃষ্টি করেছে : সে সৃষ্টি করেছ তুমিও। তবুও তোমাদের মধ্যে তফাৎ অনেক।

সমালোচকরা বলবে; তারা মানুষ সৃষ্টি করেছে। প্রজ্ঞার উত্তাপে তাদের ফুটিয়ে তুলেছে। চিহ্নিত করেছে মানুষকে; মানুষের মনকে। সে-মানুষ নিজের পরিবারে বা কাহিনী-সংশ্লিষ্ট মহলে পরিচিত। সে মানুষ শুধুই মানুষ। তার নাড়ি টিপলে তার একক বিকাশের স্পন্দনই উপলব্ধ হবে। জাতির মর্মজড়ানো মন এদিকে যায়নি। তার জাতির প্রতিনিধি সে নয়। তুমি যাদের সৃষ্টি করেছ, তারা একটা মহাজাতির এক-একজন প্রতিনিধি। তাদের সৃষ্টি যদি মহৎ হতো তোমার সৃষ্টি মহত্তর। তাদের সৃষ্টি মনন-কেন্দ্রিক—ব্যক্তি বা সমাজকেন্দ্রিকও বলতে পারো, আর, তোমার সৃষ্টি একটা মহাজাতির আত্মকেন্দ্রিক। তুমি তাদের থেকে পৃথক।

--- এদেশের যারা তোমার গুণমুগ্ধ তাদের কেউ কেউ বলতে পার : তোমার ঘরের চারপাশে সৃজনের এত সব উপাদান পড়ে থাকতে, একটা অবজ্ঞাত, অপরিচ্ছন্ন অতিকায় জাতির রূপায়নের সংকল্প নিয়ে তুমি লেখনী ধরেছিলে। শাদা egoist দের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করায় যে স্বজাতিক স্পিরিট, তার মত্ততা তোমাকে প্রমত্ত করার অবকাশ পায়নি। নিঃস্ব, অমার্জিত চৈনিক জীবন যেমন তোমাকে নাড়া দিয়েছিল। — তুমি কথাশিল্পী হয়েও যুগের রাজনীতির সঙ্গে তাল রেখে চলেছ। ব্যক্তি ও সমাজকে রূপবান করে দিয়ে তারা মুছে না গেলেও নিত্য বর্তমানের টপিক্স এর বিষয়-বস্তু তারা ঠিক নয়। তাদের সৃষ্টিও তা নয়। তাদের সৃষ্টি বিশ্ব-সাহিত্যের বুকে একটা স্থান চিহ্নিত করে রেখেছে। কিন্তু তোমার সৃষ্টি এমন একটা উৎসের মুখ খুলে দিয়েছে, যার থেকে একটা মহাজাগতিক প্রাণধারা উৎসারিত হচ্ছে, আজও। আগামীকালের জন্যও।"

অসাধারণ মানবিকতার দলিল 'ভারতের চিঠি'। 'ভারতের চিঠি' সম্পর্কে তথ্য দিতে গিয়ে অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখছেন, "অদ্বৈত মল্লবর্মণের অন্য একটি রিপোর্টাজ জাতীয় রচনা— 'ভারতের চিঠি'-পার্ল বার্ককে; তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত একমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থ। এটি প্রকাশিত হয় সম্ভবত ১৯৪৩ সালে। চয়নিকা সংস্করণে কোন মুদ্রণকাল দেওয়া নেই— রচনার অভ্যন্তরীণ ও আনুষঙ্গিক পরোক্ষ প্রমাণের দ্বারা এই কাল চিহ্ন নির্ণয় করেছি। 'সনৎ স্মৃতি সিরিজ' এর প্রথম বই, সম্ভবত চয়নিকা প্রকাশনীরও একমাত্র বই এটি। 'দলবেঁধে' নামক একটি বই সম্পাদনা করেছিলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রীতিভাজন নাগ ভ্রাতারা। মুখ্য সম্পাদক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। সতী নাগ ও সনৎ নাগ ছিলেন সহযোগী। সে বই বের হয় ১৯৪১ সালের জুন মাসে। রথ যাত্রার দিন। এর কিছু পরে সনৎকুমার নাগ প্রয়াত হন। অদ্বৈতেরও 'নবশক্তি' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। আসলে 'নবশক্তি' পত্রিকাটি বন্ধই হয়ে যায়। মাসিক মোহাম্মদীতে যোগ দেবার আগে অদ্বৈত মল্লবর্মণ সতী নাগের সঙ্গে চয়নিকা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। 'ভারতের চিঠি—পার্ল বার্ককে' সেই সময়কার রচনা। মুদ্রক অবিনাশচন্দ্র সরকার,

পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা। চটি বই—স্মল পাইকায় ছাপা। তিন ফর্মা—৪৭ পাতার বই। পরে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট থেকে বিশ্ববাণী বইখানির একটি সংস্করণ করেছিলেন। সে বইও ৪৭ পৃষ্ঠায় শেষ। প্রথম সংস্করণের দাম ছিল বারো আনা, পরের সংস্করণের দাম একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

'ভারতের চিঠি—পার্ল বার্ককে' উৎসর্গ করা হয় ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র রঞ্জিৎ দত্ত তথা রাণু বাবুকে। রঞ্জিৎবাবু ছিলেন বেঙ্গল ইমিউনিটির অধ্যক্ষ। — মনস্বী লেখিকা পার্ল এস বাক, অদ্বৈত মল্লবর্মণের খুব প্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁর 'The Good Earth' ছাড়াও অন্যান্য কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'দি গুড আর্থ'—এর পটভূমি চীন—চীনের দরিদ্র কৃষক সাধারণ, শ্রমশীল মানুষ। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাই এই বইতে পার্ল বার্ককে সামনে রেখে চেয়েছেন ভারত সম্পর্কে তেমনি কোন লেখা তিনি কেন লিখছেন না তা জানতে। বস্তুতপক্ষে মানবতাবাদী, স্বাধীনতার আদর্শের ঘোষক মার্কিন বুদ্ধজীবীতার প্রতি অদ্বৈত মল্লবর্মণ এই পর্যায়ে বিশেষ নির্ভরশীল ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন চলছে। রাশিয়া যুক্ত হয়েছে যুদ্ধে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নানা মুখী টান এসেছে। 'ভারতবর্ষ' আসন্ন দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত। অদ্বৈত মল্লবর্মণ চেয়েছেন এই পরিস্থিতিতে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে দেশ চেতনা প্রকাশ করতে।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রবল, কিন্তু লক্ষ্য করেছেন তিনি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এমন যে বিচ্ছিন্নভাবে কোন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সফল হওয়া অত্যন্ত কঠিন; চাই বিশ্ব জনমতের সমর্থন। বিশ্বে তেমন জনমত গঠিত হওয়া প্রয়োজন। তা কখনই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন পাবে না। 'আন্তর্জাতিক জগতে' মনন বিশ্বে, পার্ল বাকের একক ভূমিকা পেয়েছিল 'বলিষ্ঠ' বীর্যবোধ। আন্তর্জাতিক সমর্থনের কণ্ঠস্বর (অদ্বৈত তাকে বলেছেন Voice) প্রবল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতেই এই চিঠি। পত্রাকারে দেশীয় রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ভাষ্য।

'একটা অজ্ঞাত, অনগ্রসর, অপরিচ্ছন্ন অতিশয় জাতি' অর্থাৎ মহাচীনকে তিনি উপন্যাসের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে এনেছেন। সাদা egoist দের দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেননি। তাই তাঁর সৃষ্টি এমন একটা উৎসের মুখ খুলে দিয়েছে। যার থেকে একটা মহাজাতির প্রাণধারা উৎসারিত হচ্ছে। এই মহৎ সাহিত্যকর্ম যাঁর সৃষ্টি তাঁকে 'দিদি' সম্বোধন করে ভারতের পক্ষে সওয়াল করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

জাতীয়তাবাদী চেতনায় ঋদ্ধ এই রচনা। ছোট কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এর ছত্রে ছত্রে উপস্থিত। এক জায়গায় লিখছেন তিনি : "তুমি মার্কিন একথা তোমায় ভুলে গেলে চলে না। তেমনি আমরা ভারতীয়রা ভারতবাসী, চীনারা চীনাবাসী একথাও ভুলে যাওয়া সম্ভব কি?"

বিশ্ব পরিস্থিতির নিপুণ বিশ্লেষণ; স্বদেশবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্খা এই রচনার প্রাণ। রচনাটি রাজনৈতিক প্রতিবেদন হিসাবে উচ্চস্তরের।

তপোধীর ভট্টাচার্য লিখছেন, "অভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারি, পঞ্চাশের মন্বন্তর যখন আগ্রাসী রূপ নিয়েছে—অদ্বৈত তখনই বইটি লিখেছিলেন। এতে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ, ভয়াবহ মন্বন্তরের বিস্তৃত ছবি, ভারতের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার প্রতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের তাচ্ছিল্যতার প্রতিক্রিয়া, চিয়াং-কাই শেকের ভারত সরকারের প্রসঙ্গ, জাপানের কুখ্যাত চিঠির কথা। মোটামুটিভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে পরাধীন দেশের বিপন্নতা ও দুর্বিষহ বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল অদ্বৈত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনার যুগলবন্দি প্রেরণায় এই বইটি লিখেছিলেন। ১৯৪৪ সালের কাছাকাছি সময়ে। তাঁর প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশে জাগ্রত চিত্তবৃত্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে। সব মিলিয়ে একে বলা যেতে পারে বহমান সময়ের উজ্জ্বল পাঠকৃতি পেল যাকে মনে রেখে নিজের বয়াণ তৈরি করার সময় অদ্বৈত মনে রেখেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপত জাতীয়তাবাদী পুনর্গঠনের আকাঙ্ক্ষা।" —তাই লেখা শেষ করছেন এক অদ্ভুত প্রশ্ন তুলে। যে প্রশ্ন এখনও প্রাসঙ্গিক। "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা কথা তিনটি মানুষের জপমালার মতো হয়ে আছে। কিন্তু এই তিনটিকেই পদে পদে অবমানিত করা হয় এবং এর একটিও কোন দাম দেওয়া হয় না, তিনটিকেই নির্মমভাবে বলি দেওয়া হয় দেবতারূপী দানবের পদমূলে, কোন্ অভীষ্ঠ লাভের জন্য? বিশ্লেষণের প্রয়োজন কি আজো আসেনি? এই বস্তুত্রয়কে মানবকল্যাণে প্রয়োগ করার সৎসাহসে রাষ্ট্রপ্রধানদের উদ্বুদ্ধ করার আশু প্রয়োজনবোধ কি আজও চিন্তানিয়ন্ত্রণকারীদের লেখনী মুক্ত কণ্ঠে প্রচার গৌরব থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে?

ত্রিপুরায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব
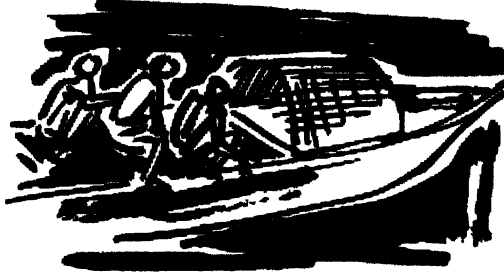
'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সবহারাদের মাঝে।'

সবার পিছে থাকা, সবার নীচে থাকা, সর্বহারা গণমানুষের জন্যে-সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে এবং জীবনের উৎসবকে সম্প্রসারিত করার সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার নাম হল 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব'। ২০১২ সালে অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব এর বয়স হল ১৫ বৎসর। শৈশব থেকে কৈশোরে পা দিল অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব এবং ত্রিপুরায় অদ্বৈত চর্চা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসবের স্থায়ী কেন্দ্রভূমি মেলাঘর ব্লকের কেমতলী গ্রামপঞ্চায়েত আজ একটি সর্বজনপ্রিয় সর্বজন পরিচিত নাম। এই চর্চাভূমির নাম আমাদের রাজ্যের এবং দেশের বাইরের মানুষও জানেন। কেমতলীতে এখন প্রতিবছর ১লা জানুয়ারি এলেই হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে উচ্চারণ করেন— 'চরণে দলিত হয়ে ধূলায় সে যায় বয়ে/সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।' অথবা "এসো বামন, শুচি করি মন/ধরো হাত সবাকার,/এসো হে পতিত করো অপনীত। সব অপমান ভার।" কিশোর কিশোরীরা জীবনদেবতাকে স্তুতি করার জন্যে গেয়ে উঠেন "তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে করছে চাষা চাষ—/ পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ,। খাটছে বারো মাস/ রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে/ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই

হাতে,/তাঁরই মতন শুচি বসন ছাড়ি/আয়রে ধূলার পরে।" ব্রাত্যজীবনের বিকাশ ও পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রভূমি যেন হয়ে উঠছে কেমতলি। কেমতলির অদ্বৈত উৎসব ঘোষণা দেয় শুচিত্ব কেবল চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার এক। ব্রাত্যজীবনের উন্মেষের যে ভাষা ও চিত্রকল্প অদ্বৈত মল্লবর্মণ তৈরি করেছিলেন তার সম্প্রসারিত পাটাতন হিসাবে কেমতলি মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। দেবতার বন্দীশালায় যাদের নৈবেদ্য পৌঁছায়নি, সামাজিক বর্ণপ্রথার জন্য; ঐ সমস্ত মন্ত্রহীন, ব্রাত্য মানুষরা অক্সিজেন খুঁজে পায় কেমতলিতে। যারা টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল— মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে তাদের উৎসবভূমি হয়ে উঠে অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসবের ভূমি কেমতলি গ্রাম। এই ভূমি খুঁজে বের করে ব্রাত্যসমাজের প্রতিবাদী চরিত্র ও চরিত্রের শ্রেণীরূপ। সকলের সঙ্গে এই উৎসবে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষজন, লেখক/কবি/সাহিত্যিক এবং ছাত্র ও শিক্ষানবিশরাও অংশগ্রহণ করেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, বিজ্ঞ—বয়োজ্যেষ্ঠ এবং গুরু গোঁসাই মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় কেমতলী অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসবের সময়কালে। বর্ণগত শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে এই উৎসব সংঘটিত কর্মসূচীর সূচক। 'দূর হ! দূর হ তুই অনার্যা অশুচি! কী সাহসে এসেছিস মন্দিরের মাঝে।' এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব। এ উৎসব ঘোষণা দেয় বৃথা আচার-বিচার। সমাজের চেয়ে হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন। যবন ব্রাহ্মন ভেদ মানুষের তৈরি এ কথা বুঝে গিয়ে সমস্ত মানুষ ফেলে দেয় কীটে কাটা ধর্ম। অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধেও এ উৎসব সংঘটিত উৎসব। নোয়াছড়া ও বুদিজলার জল ছুঁয়ে থাকা ১০ বর্গ কিলোমিটারের ভূমি কেমতলি আজ তাই প্রতিদিন পথ চেয়ে থাকে কবে আসবে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্মদিন ১লা জানুয়ারি? বৈদ্যেরমুড়া, ববাকমুড়া, লেটামুড়া এবং রাজেন্দ্রনগর ও কেমতলি, সমস্ত জনপদ এক রাস্তায় এসে মিলিত হয় ১লা জানুয়ারি।

প্রতিক্রিয়ার সাহিত্যতত্ত্ব ও মতাদর্শকে ভেঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে যারা প্রগতি ও লোকায়ত চেতনার তত্ত্বে মাটির কাছাকাছি, মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়েছেন— শিকড়ের চেতনাসহ তার মধ্যে অন্যতম অদ্বৈত মল্লবর্মণ। বিশ্বের নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের প্রসঙ্গ এলেই অদ্বৈত মল্লবর্মণের নাম উচ্চারিত হয়। ব্রাত্যজীবনের কথা এলেই অদ্বৈত মল্লবর্মণের নাম উচ্চারিত হয়। তাঁকে সাহিত্যের প্রতিস্রোত বলা হয়। পূর্ববাংলার সুপরিচিত নদী, অনেকেরই প্রিয় নদী তিতাসের প্রসঙ্গ এলেই অদ্বৈত মল্লবর্মণের নাম উচ্চারিত হয়। বলা হয় সাহিত্যে তিনি নদী ও মানুষের যুগলবন্দী তৈরি করেছিলেন। বলা হয় উপন্যাসের শিল্পকর্মকে তিনি কবির ছন্দবাণীতে রূপান্তরিত করেছেন। বলা হয় তিনি শেকড়ের সন্ধান করেছেন। লোকায়ত পুরান প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। লোক উপাদানকে সাহিত্যের শৈলিতে যুক্ত করেছেন। মালোগোষ্ঠীর জীবন সংস্কৃতি ও লোকপ্রযুক্তিকে চিত্রকল্পে রূপান্তরিত করেছেন। জলজ সত্তাকে সাহিত্যে উপস্থাপিত করেছেন। ব্রাত্য এবং মন্ত্রহারা মানুষের মহাকাব্য তৈরি করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের নামকে, তার সাহিত্য সৃষ্টিকে বেশি বেশি করে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে দুজন মহৎ মানুষের নাম আমাদের চিরজীবন মনে রাখতে হবে। এরা হলেন ঋত্বিক ঘটক এবং উৎপল দত্ত। উৎপল দত্ত তিতাসকে নাটকে বৃপান্তরিত করেছিলেন। ঋত্বিক ঘটক তিতাসকে চলচ্চিত্রে বৃপান্তরিত করেছিলেন। এর ফলে অদ্বৈতের নাম গণমানুষ ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। আমাদের রাজ্য ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশে তাঁর জীবন ও কাজকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সূচনা কাজটি করেছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট কবি ও চিন্তাবিদ অনিল সরকার। যিনি ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রী হিসাবেও বহুদিন ধরে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা থেকে। ১৯৮৭ সাল থেকে তিনি বুদিজলার চারপারের মানুষজনদের—জলজীবীদের সংঘটিত করার মতাদর্শ হিসাবে অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসবের সূচনার কথা ভাবতে থাকেন। এই কাজটির বৃপায়িতকরণ শুবু হয় ১৯৯৬ সাল থেকে। ঐ বছর নীরমহলে অদ্বৈত মল্লবর্মণের সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। কালিবাড়ি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় দুদিনের উৎসব। ১৯৯৬ সালের ১লা জানুয়ারি অদ্বৈত মল্লবর্মণের ৮২ তম জন্মদিনে কেমতলীতে 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্র ও পাঠাগার' স্থাপিত হয়। কেমতলী বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় অদ্বৈত মল্লবর্মণের নামে। ১৯৯৭ সালে কেমতলীতে প্রথম অদ্বৈত উৎসব সংঘটিত হয়। ঐ বছর আগরতলা বইমেলায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ দিবস পালিত হয়। 'যে লেখক মাটির কাছাকাছি' এই শিরোনামে আলোচনা চক্র সংঘটিত হয়। ১৯৯৮ সালে কেমতলিতে অদ্বৈত উৎসব সংঘটিত হয়। ১৯৯৯ সালে সংঘটিত হয় চন্দনমুড়ায়। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত হয় চৌমুহনী গ্রামে। ২০০১ সালে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নলছড়ে। ২০০২ সালে পূর্ব দুর্লভনারায়ণে। ২০০৩ সালে বুদিজলায়।

তারপর ২০০৪ সাল থেকে, ত্রিপুরা সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেমতলীতেই স্থায়ীভাবে অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব সংঘটিত হয়ে আসছে। এই উৎসব এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ চর্চার অঙ্গ হিসাবে—ইতিমধ্যেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, ড: কমলকুমার সিংহ, কবি দিলীপ দাস, সাহিত্যিক অনিলরঞ্জন বিশ্বাস, শান্তনু কায়সার, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, সুবলদাস বৈষ্ণব, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর। আমাদের রাজ্যের প্রবাদপ্রতিম জননেতা দশরথ দেব, ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের চিরায়ত ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও চতুর্থ দুনিয়া পত্রিকা, ঐকতান গবেষণা পত্র, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশানেল অ্যাণ্ড কালচারাল সোসাইটি, ভারতীয় দলিত সাহিত্য একাডেমি, ত্রিপুরার রাজ্য কমিটি এই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি সম্মানে ভূষিত হয়েছেন জয়দুল হুসেন, অনিলধন ভট্টাচার্য এবং হেমন্ত জমাতিয়ার মতো ব্যক্তিত্বরা।

মেলা ও উৎসব এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব

মেলা বাঙালির, লোকায়ত গণমানুষের প্রাচীন ঐতিহ্য। লোকসংস্কৃতির সঙ্গে রয়েছে মেলা ও উৎসবের নিবিড় সখ্য। শুধুমাত্র পণ্য কেনাবেচা নয়, মেলাতে জীবনও কেনা বেচা হয়। মেলায় সামাজিক বন্ধন স্থাপিত হয় এবং দৃঢ় হয়। আনন্দ তার অন্যতম উপকরণ। এদিক থেকে 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ' উৎসব একটি মেলা-উৎসব। এই মেলাটির একটি মতাদর্শগত ভিত্তি আছে। উদ্দেশ্যগত ভিত্তি আছে। এটি একটি পবিকল্পিত মেলা। এই মেলার স্থান নির্বাচনেরও একটি উদ্দেশ্যগত ভিত্তি আছে। সময় ও উপলক্ষও চিহ্নিত হয়েছে নির্দিষ্টভাবে। এই মেলা উৎসবের সময়সীমা ৩ দিন। এটি বেড়ে সাত দিনের হলেও এখন কোন অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। এই মেলা-উৎসব কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি কর্মকান্ডও এখন অনেক সংহত ও পরিকল্পিত রূপরেখা পেয়েছে। এই উৎসব একদিন ঐতিহাসিক উৎসবে পরিণত হবে। অদ্বৈত মেলার পণ্য সামগ্রী আমাদের লোকায়ত পণ্যকে দীর্ঘজীবী করছে। লোকায়ত চেতনায় বহমান ধারা ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে আলোকিত করছে। এই উৎসব — মেলা মহান সামাজিক মানব দলিলকে সংস্থাপিত করছে। নদীর বয়ে যাওয়া সংস্কৃতির সভ্যতার ভাঙ্গা গড়ার সরলবৈখিক সম্পর্কের বিনির্মাণ ঘটে। তিতাস একটি নদীর নাম ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনকে ভিত্তি করে মেলা ও উৎসব ঘোষণা দিচ্ছে একথাটি — 'The great art shall not past'। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ইংলন্ডের একজন মহিলা শ্রমিক বলেছিলেন . It is sad to die when one is loved by so many people. বেশি মানুষ ভালবাসলে মৃত্যু যেমন দুঃখজনক, বেশি মানুষ ভালবাসলে কোন জিনিসের প্রকৃত মৃত্যুও আসলে কোন দিন হয় না। অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব এভাবনাকেই প্রসারিত করে। ব্রাত্য চেতনাই এ উৎসবকে বহুদিন বাঁচিয়ে রাখবে।

গণমানুষের সংস্কৃতিকে অদ্বৈত উৎসব প্রতিষ্ঠিত করছে। জনপ্রিয় সংস্কৃতি হিসাবে লোকসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। গণতন্ত্রের কথন হিসাবে জনমানুষের সংস্কৃতি পরিশিলিত হচ্ছে। ৮০৫ পরিবারের তপশিলী জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা আজ আত্মপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন— মনের ক্ষুধা ও পেটের ক্ষুধা মেটানোর ক্ষেত্রে কেমতলীতে অদ্বৈত উৎসবকে কেন্দ্র করে। এই উৎসবের বস্তুগত ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ঐ অঞ্চলের শিল্পকলা বিকশিত হচ্ছে। সামাজিক জীবন ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের রূপান্তর ঘটছে মতাদর্শের আলোকে।

ত্রিপুরায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব — কিছু মূহূর্ত
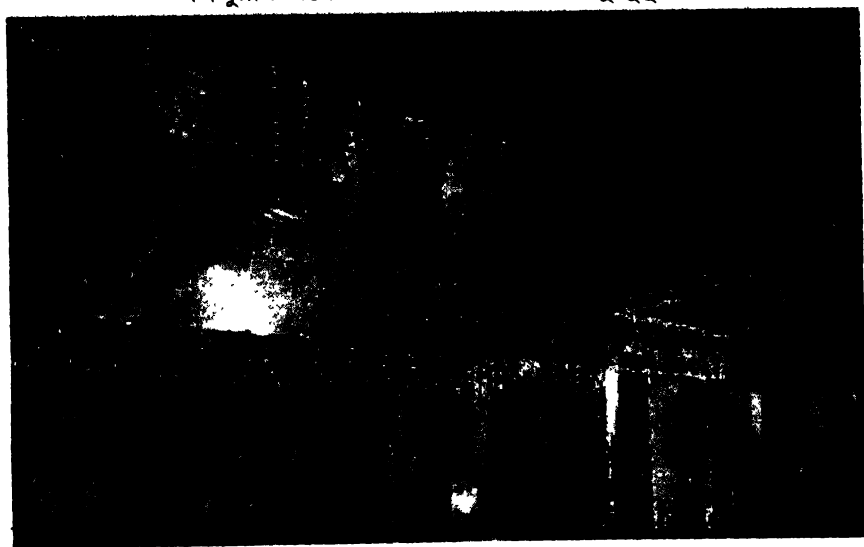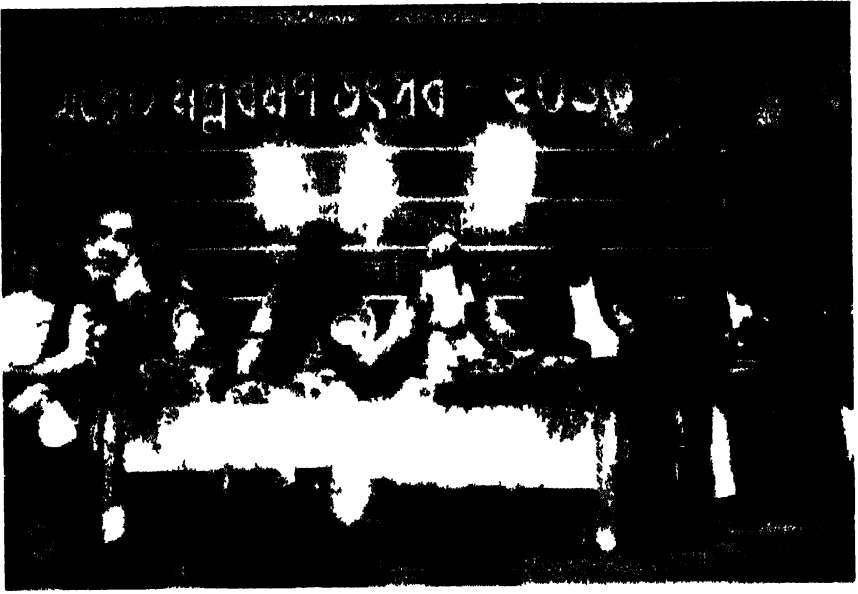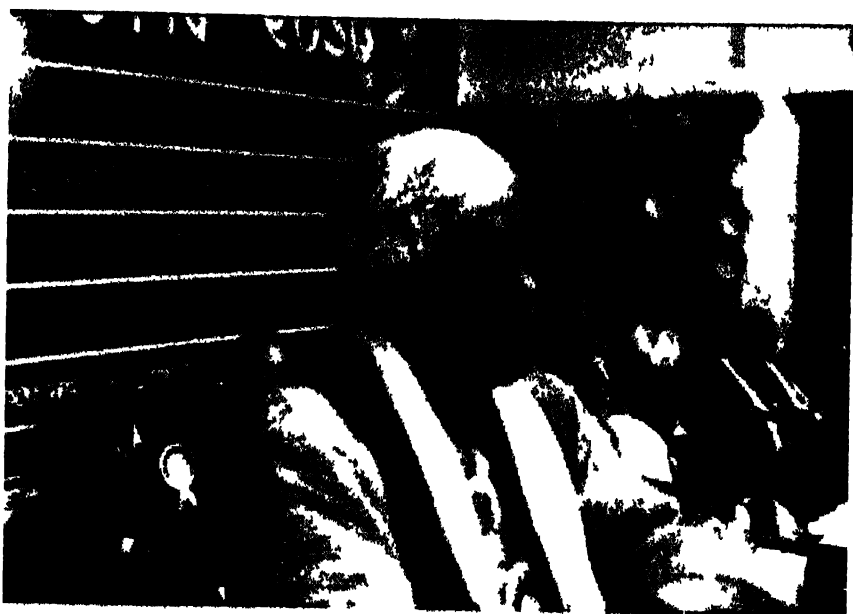
ত্রিপুরায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব — কিছু মুহূর্ত

ত্রিপুবায অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব — কিছু মুহূর্ত
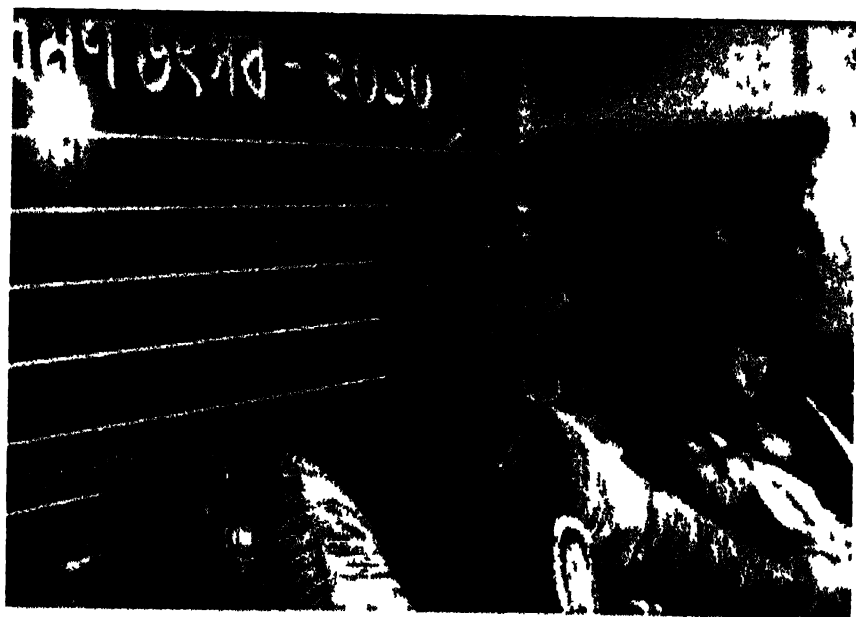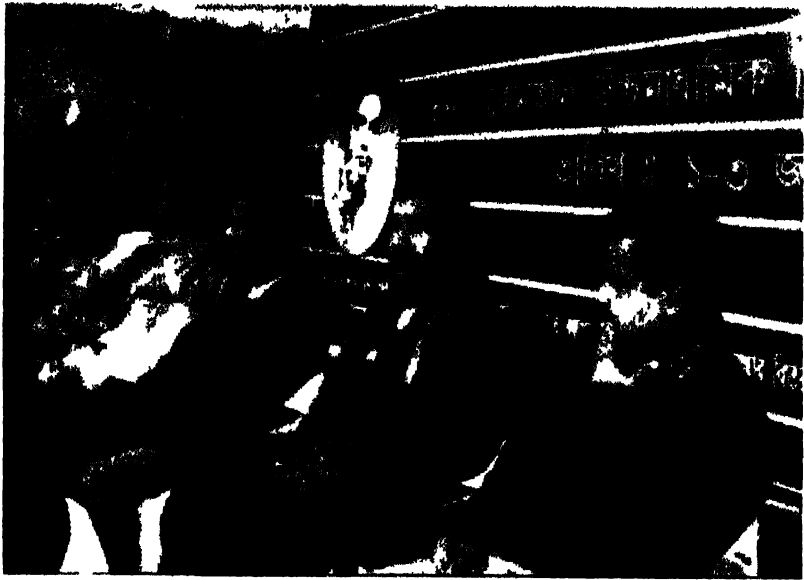
ত্রিপুরায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব — কিছু মুহূর্ত

ত্রিপুরায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব — কিছু মুহূর্ত

ত্রিপুরায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব — কিছু মূহূর্ত

স্মরণ : অদ্বৈত মল্লবর্মণ

'খাঁটি সোনা তাই ভেঙ্গে গেল'
সুবোধ চৌধুরী

গত ১৮.১০.৯৮ আমরা 'চতুর্থ দুনিয়া' - পত্রিকার পক্ষ থেকে অধ্যাপক সুবোধ চৌধুরীর সঙ্গে সন্ধ্যাটি কাটাই অদ্বৈত মল্লবর্মণের স্মৃতিতে। একদা স্বাধীনতা আন্দোলনে যিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেট বহরমপুর থেকে কলকাতায় ছড়িয়ে ছিল যাঁর কর্মপ্রেরণা আজ তিনি বয়সের ভারে সামান্য ন্যুব্জ। অদ্বৈত মল্লবর্মণ বেঁচে থাকলে আজ এমনি বয়সেই পৌঁছতেন! অধ্যাপক চৌধুরীর স্মৃতিশক্তি আজও চমৎকার। আমরা বিস্মিত হয়েছি আজও তাঁর মনে আছে অদ্বৈতের বাল্যরচনার স্তবক মালা! বর্তমান সাক্ষাৎকারটি থেকে অদ্বৈতের ব্যক্তি পরিচয় আর তিতাস সহ বিভিন্ন সৃজনশীল কার্যকলাপের অন্তর্ভেদী সংবাদগুলি উঠে এসেছে। 'চতুর্থ দুনিয়া'র প্রকাশক উষারঞ্জন মজুমদার সম্পাদকদ্বয় অচিন্ত্য বিশ্বাস, মনোহরমৌলি বিশ্বাসের সঙ্গে অধ্যাপক চৌধুরীর সাক্ষাৎকারটি একটি সুন্দর স্মৃতি চিহ্নিত সন্ধ্যা হয়ে রইল। অতি ব্যক্তিগত কিছু কথা বাদ দিয়ে আমরা সেই সন্ধ্যার কথোপকথন 'চতুর্থ দুনিয়া'র পাঠকদের উপহার দিচ্ছি।

সম্পাদক

আমরা : আপনার সঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণের পরিচয়ের কথা বলুন।

সুবোধ চৌধুরী : অদ্বৈত মল্লবর্মণ পড়তেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এম.ই.স্কুলে। ১৯২৭ সালে সেখান থেকে স্কলারশিপ পেয়ে গ্রামের ছেলে অদ্বৈত আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা হাইস্কুলে ভর্তি হন, আমি তাঁর চেয়ে এক-ক্লাশ উপরে পড়তাম। অদ্বৈতের সঙ্গে আমার পরিচয় সম্পর্ক তখন থেকে। একটানা নয়, কারণ মাঝখানে আমরা জুড়ে গেলাম বৈপ্লবিক রাজনীতিতে, টানা ছ'বছর বিনাবিচারে বহরমপুরসহ বিভিন্ন বন্দীশালায় থাকতে হল - তারপর আমাদের জীবনের বাঁক ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল কলকাতা মহানগরীতে। সে চল্লিশের দশক। আমরা রাজনীতির মানুষ – অদ্বৈত সাংবাদিক। প্রথমে 'নবশক্তি', তারপর 'আজাদ' আর 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সম্পাদনায় সাহায্য করেছেন আমাদের মেধাবী অনুজ সহপাঠী অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

আমরা : কলকাতায় অদ্বৈতবাবু এলেন কিভাবে?

সুবোধ বাবু : কামিনী দত্ত, ক্যাপটেন নরেন দত্তদের পরিবার ছিল শ্রীকাইল গ্রামের বনেদী জাতীয়তাবাদী ধনাঢ্য শিক্ষানুরাগী। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাছেই শ্রীকাইল গ্রাম, এই গ্রামের স্কুলটি হয়ে উঠেছিলো পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র। ক্যাপটেন নরেন দত্ত তিরিশের দশকে

কলকাতা থেকে প্রকাশ করতে থাকেন 'নবশক্তি'। সম্পাদক নিযুক্ত হন প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্র মশাই ছাড়া সহযোগী হিসাবে ঐ পত্রিকায় যোগ দেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও সাগরময় ঘোষ। যতদূর জানি, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে আই.এ. পড়তে পড়তে, পড়াশুনো অসম্পূর্ণ রেখেই - ক্যাপটেন নরেন দত্তের অনুরোধে অদ্বৈত কলকাতায় চলে আসেন।

আমরা : অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রথমদিকের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে কিছু কথা যদি বলেন।

সুবোধ বাবু : তের-চোদ্দ বৎসর বয়স থেকেই অদ্বৈতের কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ভালো ছাত্র হিসাবে তাঁর নাম ছিল, কবি হিসাবেও অদ্বৈত রীতিমতো খ্যাতি পেয়েছিলেন। তখন 'সন্দেশ' বন্ধ। কুমিল্লা অঞ্চলে শিশু কিশোর পত্রিকা যেত কিছু কিছু। পত্রিকাগুলোর মধ্যে 'মাসপয়লা', 'খোকা খুকু' বা 'শিশুসাথী'-র কথা মনে পড়ছে। অদ্বৈত তখন এইসব পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ থেকে একটি পত্রিকা, পূর্ববঙ্গে বেশ পরিচিতি ছিল, এখনই নাম মনে পড়ছে না, সেখানেও অদ্বৈতের কবিতা প্রকাশিত হত। এসময় তিনি কয়েকবার পুরস্কারও পেয়েছেন, কবিতা লিখে। তেমন একটি কবিতার একাংশ আমার মনে পড়ছে :

পুব গগনের রক্ত অরুণ আমরা তরুণ শক্তিমান
বিশ্বহিতে রক্তকিরণ করবো মোরা করবো দান।
মোদের চরণ স্পর্শে রে
জাগবে ধরা হর্ষে রে
বিশ্বহিতে করবো মোরা তপ্ত বুকের রক্তদান।

যতদূর স্মরণ হয় এই ছিল কবিতাটির একটি স্তবক। কবিতার প্রথম অংশ ঠিকই আছে তবে এই দুবার 'দান' শব্দ দিয়ে অন্ত্যমিলের অংশটাতে সন্দেহ হচ্ছে আমার। অদ্বৈত সেই ছাত্র বয়সেও শব্দ চয়নে এত দীন ছিলেন না। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা তখনও প্রকাশ পায় নি। নজরুল ইসলাম তখন প্রবল জনপ্রিয়। পূর্ববঙ্গের ঐসব অঞ্চলে তখন নজরুলের গানের আবহাওয়া ছিল যথেস্ট। অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রথম জীবনের কবিতায় নজরুল ইসলামের স্বাদেশিকতা ও উদার মানবিকতার প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয়। এছাড়া কামিনী ভট্টাচার্য ও অজয় ভট্টাচার্যের স্বদেশী গান ও কবিতার দ্বারাও অদ্বৈত প্রভাবিত হয়ে থাকবেন।

'পুব গগনের রক্ত অরুণ' কবিতাটির জন্য তিনি প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন।

প্রকৃতি বিষয়ক একটি কবিতার কথা একটু একটু স্মরণে আসছে। শীত শেষ, বসন্ত আসছে এমন পরিবেশ। ফুল ফুটছে, পাখি ডাকছে, ভ্রমর গুন গুন করছে – শীত শেষ পর্যন্ত চলে যাবার কথাই বলছে:

'লজ্জা নমিত মাথা নোয়াইয়া
শীত বলে আমি যেতেছি'। -- কবিতাটি আগে বলা কোন একটি পত্রিকায় বেরিয়েছিল।

তবে একটা কথা কি জানেন – অদ্বৈতের সেই সময়কার একটি কবিতার খাতা, তাতে পঞ্চাশ-ষাটটি কবিতা ছিল, হারিয়ে যায়।

আমরা : সেকি!

সুবোধ বাবু : তিতাসের পান্ডুলিপিও প্রথমে হারিয়ে যায়, সেকথা বলবেন তো? হারিয়ে যাওয়াই বোধ হয় অদ্বৈতের সাহিত্যজীবনের সঙ্গে নির্ধারিত হয়ে আছে। যাইহোক, আমার ধারণা আমাদের কোন বন্ধুই সেই কবিতার খাতাটি সরিয়ে ফেলেন!

আমরা : তাঁর নামটা–

সুবোধ বাবু : বলা উচিত হবে না।

আমরা : ছাত্র বয়সের আর কোন কথা যদি মনে পড়ে।

সুবোধ বাবু : অসম্ভব মেধাবী ছিলেন। আমরা উঁচু ক্লাশে, কিন্তু তাঁর পড়াশুনোর সীমা ছিল তুলনায় বেশি। সপ্তম শ্রেণীতে পড়তেন যখন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া আনন্দময়ী কালীবাড়ীর সামনের হলঘরে একটি বিতর্ক সভায় অদ্বৈত বলেছিলেন, আমাদের দেশে এখন ইন্দ্রনাথের মতো ছেলে দরকার। বলতে দ্বিধা নেই শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' আমরা তখনও পড়িনি – তখনকার দিনের দেশানুরাগী মানবতাবাদী যুবকদের আদর্শ হিসাবে ইন্দ্রনাথের কথা সেই প্রথম শুনলাম। একবার একটি হাতে লেখা পত্রিকার 'বিজ্ঞাপন' লিখতে বললে অদ্বৈত লেখেন 'বিজ্ঞপ্তি'। সেই দিনের পক্ষে 'বিজ্ঞপ্তি' শব্দটিও ছিল যথেষ্ট আধুনিক। তাঁর পাঠাভ্যাসটা যে আমাদের তুলনায় বেশিই ছিল, সেটা এসব থেকে বোঝা যাবে।

অসম্ভব সৎ ছিলেন, বিশাল হৃদয় ছিল তাঁর। ১৯২৮ - ২৯ নাগাদ আমাদের স্কুলে ধর্মঘট হয়। সেই প্রথম ছাত্র ধর্মঘট। স্কাউট ট্রেনিং শেষ করার পর পদক প্রদান অনুষ্ঠানে কুমিল্লার এস.পি. এসেছেন। আর ছাত্ররা ঠিক করেছে তারা কিছুতেই 'ইউনিয়ন জ্যাক'-কে অভিবাদন জানাবে না। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মঘট। স্কুল প্রায় জনমানবশূন্য। সামান্য উত্তেজনাও আছে। ফাঁকা স্কুল-ঘরের কোথাও কেউ আছে কিনা দেখতে গিয়ে পড়ে হল ঘরের এক কোণায় দেখতে পেলাম অদ্বৈতকেও! কাঁদছে। কারণ তাঁর ধারণা ধর্মঘটে যোগ দিলে তাঁর স্কলারশিপ চলে যাবে। তাহলে তো পড়তেই পারবেন না। আর ধর্মঘটে যোগ না দেওয়াও তো মানতে পারেন না!

১৯৩২ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। প্রথম বিভাগ পান।

কুমিল্লায় কলেজে পড়তেন কোন একটি কায়স্থ পরিবারে পড়াশুনোয় সাহায্য করে– পারিশ্রমিক না নিয়ে।

আমরা : তখনকার ভাষায় যাকে বলত 'লজিং' নেওয়া!

সুবোধ বাবু : ঠিক তাই।

আমরা : আচ্ছা আমরা শুনেছি ঐ বাড়িতে কোন মহিলার প্রতি অদ্বৈতের রোমান্টিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে– আর .....

সুবোধ বাবু : 'তিতাস সন্ধ্যা'য় অদ্বৈতের সহপাঠী কোন বন্ধু বলেছিলেন প্রেমের গল্প যে কোন সময় যে কেউ বানাতে পারেন। এসব কিংবদন্তীর সম্ভব কোন ভিত্তি নেই।

আমরা : যাইহোক এরপর তিনি পড়াশুনো অসমাপ্ত রেখেই কলকাতায় চলে এলেন? 'নবশক্তি'র সঙ্গে সাংবাদিক হিসাবে যোগ দিলেন?

সুবোধ বাবু : সম্ভবত, তখন আমি ১৯৩২ এর মাঝামাঝি থেকে বন্দীশালায় আছি।

আমরা : আমরা শুনেছি উনি কিছু গল্প লিখেছিলেন। সে সম্বন্ধে কিছু মনে পড়েছে আপনার?

সুবোধ বাবু : আমরা যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছাত্র তখন দুজনের সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। বড়লোক উকিলের বাড়ির জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আর দরিদ্র মালোর সন্তান অদ্বৈত মল্লবর্মণের। দুজনই বেশ খ্যাতি পাচ্ছেন। জ্যোতিরিন্দ্র ছিলেন আমার চেয়ে এক বছরের উঁচু ক্লাসে পড়া ছাত্র। অদ্বৈত এক বছর পরের। অদ্বৈত লিখতেন কবিতা, জ্যোতিরিন্দ্র কখনও কবিতা লেখেন নি। পরে অদ্বৈত হলেন সার্থক ঔপন্যাসিক। বুদ্ধদেব বসু 'এক পয়সার একটি গল্প' সিরিজে তাঁর একটি গল্প ছেপেছিলেন। গল্পটি তখন বেশ খ্যাতি পায়। আরো কিছু গল্প তিনি লিখে থাকবেন।

আমরা : 'ভারতের চিঠি-পার্ল বাক্‌কে' বইটা পড়েছেন?

সুবোধ বাবু · আপনারা বইটা পেয়েছেন? আমরা বইটা পড়েছি। বারো আনা দাম ছিল। চটি বই। কলেজ রো থেকে কোন একটি প্রকাশনী থেকে বের হয়। সেটি পরিমল গোস্বামীর পুত্র বোধহয় চালাতেন। পার্ল বাককে 'দিদি' বলে সম্বোধন করা বই। এশীয় জাতিগুলির উত্থানে অদ্বৈত খুব প্রাণিত বোধ করছেন– এরকম একটি ভাব ছিল। বেশ উদ্দীপক রচনা।

আমরা : উনি 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় কি ধরনের কাজ করতেন?

সুবোধ বাবু : প্রেস এডিটরের কাজ- মূলত প্রুফ রিডিং-এর কাজ। দেশ বিভাগের পর 'আজাদ' পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়, আর 'মোহাম্মদী' আরও কিছুদিন চলে। ঠিক বন্ধ হয়েছিল কিনা জানি না, তবে অদ্বৈতের যোগাযোগ শিথিল হয়ে পড়ে। উনি 'বিশ্বভারতী'তে যোগ দেন। এসময় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগে একটি পদ খালি থাকার সংবাদ দিয়েছিলেন আমাকে মনে পড়ছে। 'পুথিঘরে' এসে।

আমরা : পুথিঘরে কি আপনারা নিয়মিত আড্ডা দিতেন?

সুবোধ বাবু : ১৯৪০-৫০ সালে সেটাই ছিল বামপন্থীদের বিশিষ্ট প্রকাশন সংস্থা। অনেক লেখকই আড্ডা দিতেন।

আমরা : 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি নিয়ে কিছু বলুন।

সুবোধ বাবু : আমিও তিতাস দেখেছি। আমি সমুদ্র দেখেছি পাহাড় দেখেছি। অনেক বিচিত্রতার মানুষের সঙ্গে মিশেছি। কিন্তু অদ্বৈত মল্লবর্মণের ছিল মানুষ আর প্রকৃতি সম্পর্কে সুগভীর insight. এমনটি আমাদের ছিল না। আমরা দেখেছি দর্শকের মতো, ভালো হয়ত লেগেছে। তবে অদ্বৈত দেখেছেন শিল্পীর চোখে। তাঁর সত্তার সঙ্গে তিতাস ছিল

মিশে। এটা পৃথক করতে পারেন নি তিনি, চানও নি। তার উপর ছিল তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি।

মনুষ্যত্বের অপরাভবে তিনি বিশ্বাস করতেন। বাসন্তীকে করেছিলেন তিতাসের প্রতীক— তাকে কেউ বলাৎকার করতে পারে নি।

প্রথম যখন পান্ডুলিপি জমা দিয়েছিলেন, আমি বলেছিলাম - "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'পদ্মানদীর মাঝি' আর কি তোমার বই মানুষ নেবে"? বলছিলেন অদ্বৈত : "সুবোধদা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় artist, master artist, কিন্তু বাওনের পোলা— রোমান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা" আর কিছু বলেন নি। পরিচয়ের এই প্রত্যক্ষতাই ছিল তাঁর গৌরবের ভিত।

আমরা : 'মোহাম্মদী'র প্রকাশিত অংশ আর হাতে লেখা পান্ডুলিপির মধ্য দিয়ে তিতাসের বর্তমান পাঠ গড়ে ওঠার ব্যাপারটি যদি একটু বলেন।

সুবোধ বাবু : 'মোহাম্মদী'র পাঠ অনেকটাই বদলে দিয়েছিলেন। বেশিরভাগটাই ছিল হাতে লেখা পাঠ। কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে যাবার আগে পান্ডুলিপিটি একবার খুব দ্রুত পরিমার্জন করেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল জীবিত অবস্থায় বইটির প্রকাশ দেখে যেতে পারবেন না। ফলে পান্ডুলিপি নির্দয়ভাবে কমিয়ে ফেলেন। আমরা দেখি অনেক শিল্পগুণান্বিত গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ গেছে! সেগুলো আমরা রেখে দিয়েছি।

আমরা : উনি কি স্বজাতি অর্থাৎ মালোদের অতিরিক্ত ভালোবাসতেন? বিপরীত ক্রমে উচ্চবর্ণের মানুষদের.....?

সুবোধ বাবু : উনি খুব বড় মানুষ ছিলেন। মানুষকে ভালোবাসতেন। মানুষকে ভালো না বাসলে নিজের জাতকেও ভালোবাসা যায় না।

আমরা : তাঁর বইগুলো আপনারা 'রামমোহন লাইব্রেরী'কে দিয়েছিলেন, আমরা জানতে পারলাম ওরা সেই সংগ্রহ পৃথকভাবে রাখেন নি।

সুবোধ বাবু : ঠিক তাই। অথচ আমাদের সঙ্গে তেমনি শর্ত হবার পরই বইগুলো ওখানে দান করা হয়।

আমরা : বইগুলো কি ধরনের, একটু ধারণা....।

সুবোধ বাবু : ঠিক মনে নেই।

আমরা : তিতাস তো নাটক, যাত্রা, সিনেমা- বহু মাধ্যমেই হল, সেসব সম্পর্কে আপনার মতামত?

সুবোধ বাবু : অন্য মাধ্যমগুলি তিতাসের উচ্চতাকে স্পর্শ করে নি। তবে সিনেমার ঋত্বিক অন্যরকম সাফল্য পেয়েছেন।

মঞ্চায়নের সময় উৎপল দত্ত তিতাসের কাহিনী উপাদানকে ব্যবহার করে একরকম সাফল্য পেয়েছিলেন— সেকথা বলেছিলেন প্রথম দিনের অভিনয়-এর দর্শকদের; আমাকে তাঁরা বক্তা হিসাবে ডাকেন। ঐদিন দর্শক হিসাবে হাজির ছিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

উৎপলবাবু নাটকের মহড়া চলাকালীন একটা বিচিত্র বিষয় ভেবেছিলেন। রামকেশব তার পাগল পুত্র কিশোরকে নিজে হত্যা করছে— উৎপলবাবু এরকম দৃশ্য ভাবলেন।

আমরা : উপন্যাসে এরকম নেই। আছে ক্রুদ্ধ জনতার হাতে কিশোর মারা যাচ্ছে।

সুবোধ বাবু : আমি প্রতিবাদ করি, এরকম নাটকীয় ঘটনা সংস্থান তিতাসের যোগ্য নয়। উৎপলবাবু অবশ্য রামকেশবের মুখে ঐ পরিণতির কথা ভেবে কিছু সংলাপ ভরে দিচ্ছিলেন। রামকেশবের অভিনয় করছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। আমাকে বলেন, 'আপনিই ঠিক, আমরা ডিরেক্টারের অধীন....।' হয়ত উৎপলবাবুর তখনকার অভিনয় ওথেলোর প্রভাব পড়েছিল এই দৃশ্য ভাবনায়। পরে, আমার প্রতিবাদের পর, অনেক ভেবে চিন্তে উৎপলবাবু মত বদলান।

অজয় হোম-দের পরিবারের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সূত্রে সত্যজিৎ রায়-দের যোগাযোগ ছিল। অজয় হোম কথায় কথায় বলেছিলেন, ফিল্ম করলে আমরা যেন সত্যজিতের কথা ভাবি। আমরা উৎসাহ দেখাই নি। কিশোরগঞ্জে আদিবাড়ি হলেও কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে মানুষ সত্যজিৎবাবু, তেমন নদী কি দেখেছেন? নদীর দেশের মানুষ কি দেখেছেন? তাছাড়া বিশালত্বকে ধরার ব্যাপারে সত্যজিৎবাবুর একরকম কুণ্ঠা লক্ষ করেছি। তাই নারায়ণগঞ্জের 'পূর্বপ্রাণ কথাচিত্র' যখন আমাদের কাছে 'তিতাস একটি নদীর নাম' এর প্রস্তাব নিয়ে এল, বললাম— এই ছবি একমাত্র ঋত্বিক করতে পারেন। ঋত্বিকবাবু জীবনের একটি পর্বে তিতাসের কাছাকাছি ছিলেন। যাইহোক তিনি তিতাসের বিশালত্বের ব্যাপারটি ভালই ধরছেন।

যাত্রায় একটি গোলমাল করে ফেলেন ওরা। কালোবরণ বাসন্তীকে ধর্ষণ করছেন এরকম একটা দৃশ্য উপস্থাপন করেন। এটা হয় না। বাসন্তীর মধ্য দিয়ে জীবনের অপরাভবকে দেখাতে চান অদ্বৈত। তাকে ধর্ষণ করলে শিল্পগুণের হানি। আমার কথা মেনে নেন তারা। এই যাত্রায় সুর করেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। চিঠি লিখে আমাকে জানিয়েছিলেন অভিনন্দন। আমি তিতাসকে ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচিয়েছি বলে!

আমরা : অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পর্কে আপনার শেষ কথা একটু বলুন।

সুবোধ বাবু : রামমোহন লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত অদ্বৈত প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে বলা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা স্মরণ করবো : খাঁটি সোনা ছিলেন অদ্বৈত। খাদ মেশাতে পারেন নি বলে ভেঙে গেছেন! খাঁটি সোনায় যেমন গয়না হয় না খাদ মেশাতে হয়, অদ্বৈত জীবনের বাস্তবের সঙ্গে মিশে এই রকম কিছু উপাদান হয়ত মেশাতে পারেন নি।

আমরা : আমাদের পত্রিকার পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানালাম।

সুবোধ বাবু : নমস্কার।

‘ভেবেছিলাম একটি মৌলিক উপন্যাস লেখাব — হল না’

সাগরময় ঘোষ

১৮.১১.৯৪ তারিখে দুপুরে ‘দেশ’-দপ্তরে শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ-এর সঙ্গে আমরা অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিষয়ে কথাবার্তা বলি। শ্রী ঘোষ ১৯৩৭ সাল থেকে শহর কলকাতায় সক্রিয়ভাবে সাহিত্য সাধনা করছেন। কাছ থেকে দেখেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণকে—সহকর্মী হিসেবে। তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতার কথা আমরা ‘চতুর্থ দুনিয়া’-র পক্ষে অচিন্ত্য বিশ্বাস ও মনোহরমৌলি বিশ্বাস যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করেছি। ‘চতুর্থ দুনিয়ার’-র পাঠক এই সাক্ষাৎকার থেকে অদ্বৈত মল্লবর্মণের শেষ জীবনের অনুপুঙ্খ বিবরণ পাবেন। পাবেন তৎকালীন পত্রপত্রিকা সাহিত্য সাহিত্যিক সম্পর্কে গূঢ়তর বহুবিধ ইঙ্গিত।

সম্পাদক : ভাসমান

আমরা ☐ আচ্ছা সাগরবাবু, প্রথমেই আপনাকে অভিনন্দন জানাই আপনার মূল্যবান সময় থেকে কিছুটা আমাদের দেওয়ার জন্য। আপনি তো শান্তিনিকেতনে মানুষ। আপনার সঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণের যোগাযোগ তো ‘নবশক্তি’ পত্রিকার মারফৎ, এই যোগসূত্রটি একটু বিশদ করুন।

সাগরময় ঘোষ ☐ শান্তিনিকেতনে যখন আমি আই.এ.পরীক্ষার্থী, তখন ১৯৩২ সালে আইন অমান্য করায় আমার কারাদণ্ড হয়। আলিপুর জেল থেকে আমাকে চালান দেওয়া হয় দমদম স্পেশাল জেলে। বেশ কিছু রাজবন্দী তখন দমদম স্পেশাল জেলে। সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় হতে থাকে—শান্তিনিকেতন থেকে আসা বলে একটা বিশেষ পরিচিতিও হয়ে গেল। রাত্রে রবীন্দ্র গান শোনানোটা হল আমার অতিরিক্ত দায়িত্ব। এই অবকাশে অশোক কুমার সরকার আর অজিত কুমার দত্ত (পরে যিনি অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন) এই দুজনের সঙ্গে হল বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্বই আমার সঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণকে যুক্ত করে দিয়েছে।

সিটি কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর বাবা বললেন আর পড়াবার খরচ যোগাতে পারবেন না। বাবা অনুশীলন সমিতির লোক। নানারকম কাজের সন্ধান করছি তখন। কিছুদিন রাইটার্সেও কাজের ফিকিরে গিয়েছি। এরকম সময় বাবা নিয়ে গেলেন ক্যাপটেন নরেন দত্তের কাছে। কুমিল্লায় বাড়ি হওয়ায় সূত্রে, রাজনৈতিক কারণেও, বাবার সঙ্গে ক্যাপটেন দত্তের পরিচয় ছিল।

আমরা ☐ ক্যাপটেন নরেন দত্তের সঙ্গে ‘নবশক্তি’ আর ‘নবশক্তি’র সঙ্গে অদ্বৈতের সম্পর্ক শুনতে পাচ্ছি আমরা। একটু যদি বিস্তৃতভাবে জানান।

সাগরবাবু □ কামিনী কুমার দত্ত, ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত-রা ছিলেন কুমিল্লার বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী পরিবার। কলকাতায় ক্যাপটেন দত্ত প্রতিষ্ঠা করেন 'বেঙ্গল ইমিউনিটি'। বরাহনগরে ছিল তাঁদের ওষুধের কারখানা। 'বেঙ্গল ইমিউনিটি'তে প্রেমেন্দ্র ছিলেন পাবলিসিটি ইনচার্জ। এসময় ওষুধ কোম্পানীর প্রচার, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির কথা ভেবে ক্যাপটেন দত্ত 'নবশক্তি' পত্রিকাটি কিনে নেন। এর আগে যারা পত্রিকাটি চালাচ্ছিলেন, তারা পেরে উঠছিলেন না। ক্যাপটেন নরেন দত্ত তখন নতুন উদ্যোগপতি, পত্রিকাটি কিনে নিলেন। এর দপ্তর আর প্রেস ছিল পার্ক স্ট্রীট কবরখানার পিছনের দিকে। প্রেসটিতে 'নবশক্তি' ছাড়া বাকি সময় কোম্পানির ওষুধের লেবেল ইত্যাদি ছাপা হত। দোতলায় ছিল দপ্তর।

প্রেমেন্দ্র মিত্র হলেন 'নবশক্তি'র সম্পাদক।

আমরা □ আর আপনি?

সাগরবাবু □ সে এক মজার ঘটনা। বাবা তো ক্যাপটেন দত্তের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। উনি বিরাহনগরের ওষুধ কারখানায় হিসাব লেখার কাজে যোগ দিতে বললেন। মাইনে মাসে তিরিশ টাকা!

এদিকে 'নবশক্তি' পত্রিকার উদ্যোগ শুরু হবার কথা শুনে আমার কারাসঙ্গী অজিত কুমার দত্ত (যাঁর কথা আগে বলেছি, তিনি ছিলেন কামিনীকুমার দত্তের ছেলে) তাঁর কাকাকে বললেন, আমি যাতে ঐ পত্রিকার সম্পাদকতার সঙ্গে যুক্ত হতে পারি তার ব্যবস্থা করতে। অজিত কুমার আমার সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

আমরা □ 'নবশক্তি'তে আপনি তাহলে অদ্বৈত মল্লবর্মণের সঙ্গে পরিচিত হলেন।

সাগরবাবু □ ঠিক তাই। অজিত দত্তের পরামর্শে ক্যাপটেন নরেন দত্ত 'নবশক্তি' নর্থ রেঞ্জে আমাকে চিঠি লিখে পাঠালেন-অদ্বৈত মল্লবর্মণ একা সামলাতে পারছেন না; আমাকেও যেন সহযোগী হিসাবে নেওয়া হয়। গেলাম। সেটা ১৯৩৫-৩৬ হবে। এখানে অদ্বৈতের সঙ্গে পরিচয়। ছমাস আমরা একসঙ্গে কাজ করি।

অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। তবে খুব রোগা—শরীরে কেমন একটা অসুস্থতার ভাবও ছিল। অদ্বৈত নিজে ছিলেন অবিবাহিত। তবে তাঁর দায় দায়িত্ব ছিল প্রচুর। বিধবা দিদির পরিবার সম্পূর্ণভাবে তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁর ছিল ছোট ছোট দুই ভাগ্নে। কায়ক্লেশে তাদের দিন কাটত। বস্তুত তাদের ভরণ পোষণের জন্যই অদ্বৈত অসম্ভব খাটতেন।

'নবশক্তি' ছাড়াও 'মোহাম্মদী', 'আজাদ' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি অসম্ভব খাটতেন—রাত্রি জেগে কাজ করতে হত।

আমরা □ 'নবশক্তি'তে অদ্বৈত কি ধরনের কাজ করতেন?

সাগরবাবু □ 'নবশক্তি'তে তিনি স্বনামে-বেনামে প্রচুর লিখেছেন। সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতা ভরানোর দায় বহন করতে হত তাঁকে। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখতেন সম্পাদকীয় আর একটি বিজ্ঞাপন-গল্প 'বেঙ্গল ইমিউনিটি'র কোন ওষুধের গুণগান করে গল্প; অনেকটা কুন্তলীন গল্পের মতো।

বাকি সব দায়িত্ব পড়ে অদ্বৈতের উপর।

আমরা □ বললেন, আপনি সামান্য কিছুদিন 'নবশক্তি'তে কাজ করেছিলেন, তারপর কি হল?

সাগরবাবু □ ডালহৌসি স্কোয়ারের ভ্যানসিটার্ট রো-তে ১৯৩৭ থেকে 'যুগান্তর'-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকার মালিক যদিও তুষারকান্তি ঘোষ, ক্যাপটেন নরেন দত্ত সম্ভবত শতকরা কুড়ি ভাগ অংশীদারিত্ব খরিদ করেন। উনিই একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাকে 'যুগান্তরে' যোগ দিতে বলেন। আসলে 'যুগান্তরে' তখন একটা ধর্মঘট চলছিল। সংকট-মোচনের জন্য আমাকে নরেনবাবু চিঠি লিখে পাঠালেন দিনের বেলাকার নিউজ এডিটর সুধীর রাহা মশাইয়ের কাছে। সুধীরবাবুর কাছে যখন গেছি তখন ভ্যানসিটার্ট রো-এর 'যুগান্তর' দপ্তরে লোকজন খুব কম। অধিকাংশ চেয়ারই শূন্য। বেলা বারোটা হবে। সুধীর রাহা মশাই কুমিল্লার উচ্চারণে আমাকে বললেন ঃ 'বইয়্যা পড়েন।' অর্থাৎ যে কোন চেয়ারেই বসতে পারি!

ক্যাপটেন নরেন দত্ত আমাকে 'বেঙ্গল ইমিউনিটি'তে তিরিশ টাকা মাইনেতে নিয়োগ করেন—সেটার কথা বলেছি। 'নবশক্তি'র বেতনও তাই তিরিশ টাকা—'যুগান্তরে'ও তিরিশ টাকা।

আমরা □ তার মানে দিনে এক টাকা করে!

সাগরবাবু □ এরপর ১৯৩৭ সালেরই 'যুগান্তর' উঠে গেল বাগবাজারে, আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে। ওখানে কাজ করলাম ১৯৩৯ পর্যন্ত। জেলের বন্ধু অশোক সরকার চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট হবার পর 'আনন্দবাজারে' যোগ দিলেন। আনন্দবাজার দপ্তরে তখন কাজ করতেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার আর মাখন সেন। মাখন সেন একটি বড় গোষ্ঠী সঙ্গে নিয়ে কোন কারণে আনন্দবাজার ত্যাগ করে 'ভারত' (?) নামে একটি নতুন দৈনিক চালাতে থাকেন। ফলে আনন্দবাজারে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। আমাকে অশোক কুমার সরকার অনুরোধ করেন আর আমি চল্লিশ টাকা মাস মাইনেতে আনন্দবাজারে যুক্ত হই। সেটা ১৯৩৯ সালের ১ ডিসেম্বর।

একদিন পর ১৯৩৯ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে প্রফুল্লবাবু (প্রফুল্লকুমার সরকার) আমাকে 'দেশে'-র দায়িত্ব নিতে বললেন। ১৯৪০ সালে সহকারী সম্পাদক হলাম। ১৯৪৪ সাল থেকে সম্পাদক বঙ্কিম সেনের পাশে আমার নামও 'দেশে'র পৃষ্ঠায় সহকারী হিসাবে মুদ্রিত হতে থাকে।

১৯৪৫ নাগাদ সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে বললাম আমার একজন সহকারী প্রয়োজন, উনি রাজি হলেন। তাঁকে অদ্বৈত মল্লবর্মণের কথা বললাম, লেখার হাত ভাল, খুব efficient, সেকথাও বললাম। তখন অদ্বৈত সম্ভবত 'মোহাম্মদী'র কাজ আর করছেন না।

আমরা □ শুনেছি তাঁর কয়েকটি স্বদেশী কবিতা ছাপার জন্য 'মোহাম্মদী' কর্তৃপক্ষ বৃটিশ শাসকদের দ্বারা বিব্রত হন, তাই তাঁকে বাদ দেওয়া হয়।

সাগরবাবু □ হতে পারে। 'দেশে' যোগ দেবার পর অদ্বৈত মল্লবর্মণ খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সব দায়িত্ব পালন করতেন। তখন যে মাইনে উনি মুখ ফুটে না বললেও মনে হত, তাতে কুলোচ্ছে না। না কুলোবার কারণ অবশ্য দুটো—তাঁর সেই বিধবা দিদির পরিবারের সব দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়। আর ছিল তাঁর অসম্ভব গ্রন্থপ্রীতি। কলেজ স্ট্রীটে প্রেসিডেন্সি কলেজের দেওয়ালের পাশে ফুটপাত জোড়া পুরোন বইয়ের দোকান থেকে বহু সময় দিয়ে নানারকম বই কিনতেন তিনি। বস্তুত এই দুটি কারণে অভাব ছিল তাঁর নিত্য-সঙ্গী।

থাকতেন একা—বেলেঘাটার কাছে বাসা বাড়িতে। নিজে রান্না করে খেতেন। স্টোভ জ্বালিয়ে।

এসময় 'আনন্দবাজারে'র বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থাপক (অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ম্যানেজার) কানাইলাল সরকার মশাইকে আমরা বললাম। উনি বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগে একটি কাজ জুটিয়ে দিলেন, পার্টটাইম কাজ। সকালে দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত সেখানে কাজ করে আমাদের দপ্তরে আসতেন। রাত্রি সাতটা-আটটা অবধি কাজ করতেন—একটানা।

আমরা □ 'দেশ' পত্রিকায় তিনি কি ধরনের লেখালেখির কাজ করতেন?

সাগরবাবু □ আরভিং স্টোনের 'লাস্ট ফর লাইফ' বইটি পড়ার পর আমি তাঁকে অনুবাদ করতে বলি। সেই বই-এর অনুবাদ 'দেশে' প্রকাশিত হয় ধারাবাহিকভাবে, নাম হয় 'জীবন তৃষা'। এছাড়া তিনি লিখেছিলেন কিছু ছোট ছোট লেখা। বিশেষ করে মনে পড়ছে তাঁর 'সাগরতীর্থে' বলে একটি রিপোর্টধর্মী লেখা। 'সাগরতীর্থে' পড়ার পর ভেবেছিলাম তাঁকে দিয়ে একটি মৌলিক উপন্যাস লেখাব। সে পরিকল্পনা সার্থক হল না। ক্ষয় রোগ নিয়ে গেল তাঁকে।

আমরা □ রোগটি কিভাবে ধরা পড়ল?

সাগরবাবু □ ভিতরে ভিতরে অদ্বৈতবাবু বোধহয় ক্ষয়িত হচ্ছিলেন আগে থেকেই। তিনি বোধহয় বুঝতেও পেরেছিলেন কিছুটা। সে সময় খুবই সঙ্কুচিত থাকতেন। দূরে দূরে সরে যেতেন। নিজের জলের গ্লাসটি রাখতেন সরিয়ে। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কাশি চাপার চেষ্টা করতেন। 'দেশে' তখন ডাঃ সতীশ (?) গঙ্গোপাধ্যায় আসতেন আড্ডা দিতে। তাঁকে আমরা অনুরোধ করি অদ্বৈতের শরীর পরীক্ষা করতে। রোগ নির্ণয় করে উনি যথাসত্বর হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি করা হল। 'দেশ' কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে কানাইলাল সরকার মশাইয়ের চেষ্টায় তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত হল। ধীরে ধীরে সেরেও আসছিলেন। তবে একসময় কাউকে কিছু না জানিয়ে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসেন।

আমরা □ তখন বোধহয় 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর পাণ্ডুলিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

সাগরবাবু □ আমি সেকথা পরে শুনেছি। শুনেছি তাঁর প্রথম পাণ্ডুলিপি কোনভাবে খোয়া যায়।

আমরা □ তারপর ?

সাগরবাবু □ শেষের দিকে একটি ছেলে তাঁকে রান্না-বান্না করে দিত। এসময় অদ্বৈতবাবু ঘন ঘন ভুগতেন। একদিন ছেলেটি এসে খবর দিল গতকাল রাত্রে অদ্বৈত মল্লবর্মণ মারা গেছেন! একা একা বাসা বাড়ির চিলেকোঠায়। সেটা বোধহয় ১৯৫১।

আমরা □ ১৬ এপ্রিল।

সাগরবাবু □ অত্যন্ত চাপা স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কিছু বলতেন না। আমাদের আন্দাজ করে নিতে হত।

আমরা □ তাঁর গ্রন্থপ্রীতি সম্পর্কে সকলেই বলছেন। কি ধরনের বই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ? পরিমাণ ?

সাগরবাবু □ আগেই একথা বলেছি। অধিকাংশই ইংরেজি বই ছিল। অদ্বৈতবাবুর ঝোঁক ছিল ক্লাসিকের প্রতি। আমার মনে পড়ছে মৃত্যুর পর তাঁর বইগুলোর গতি করার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম সেই বাসা বাড়িতে। দু-আলমারি ঠাসা বই ছিল। সেসব নিয়ে রামমোহন গ্রন্থাগারে জমা দিই। ওরা প্রতিশ্রুতি দেন এগুলি সযত্নে অদ্বৈতের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা হবে। এব্যাপারে তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। ঐ গ্রন্থাগারে সেদিন বইগুলি দান করা হয়। পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় বিস্তৃত খবর ছাপা হয়েছিল বলে মনে পড়ছে।

আমরা □ অদ্বৈত সাংবাদিক হিসাবে - বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে কেমন উৎসাহবোধ করতেন ?

সাগর বাবু □ খুব মনোযোগ দিয়ে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি নিয়ে ভাবতেন। এ সময় যুদ্ধ নিয়ে তিনি কি একটা 'চিঠি' না কি যেন...

আমরা □ 'ভারতের চিঠি—পার্ল বাক্‌কে' নাম দিয়ে একটি পুস্তিকা লেখেন তিনি। জীবিতাবস্থায় সেই বোধ হয় তাঁর একমাত্র বই।

সাগরবাবু □ সম্ভবত।

আমরা □ 'গুড আর্থে'র মতো বইতো তিনি ভারত নিয়েও লিখতে পারতেন, একথা জানিয়ে পার্ল বাক্‌কে 'দিদি' সম্বোধন করে চিঠির আকারে এখানকার নিম্নবর্গের মানুষের কথা লেখেন তিনি। আমাদের ধারণা 'গুড আর্থ' পড়েই অদ্বৈত তিতাস লেখার প্রেরণা পান।

সাগরবাবু □ বেশ ভেবেছেন আপনারা।

আমরা □ আচ্ছা, উনি কি কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের প্রতি ঝুঁকেছিলেন?

সাগরবাবু □ না; বরং তিনি কমিনিস্টদের তৎকালীন ভূমিকা দেখতেন সমালোচনার চোখে।

আমরা □ এমনিতে আড্ডা দিতেন?

সাগরবাবু □ রসিক মানুষ ছিলেন। সাধারণত কারো সঙ্গে মিশতেন না। তবে কখনও কখনও আসর জমিয়ে দিতেন। তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিল সাহিত্য। বিশ্বসাহিত্য বিষয়ে যথেষ্ট খবর রাখতেন।

আমরা □ আপনার বহুমূল্যবান সময় থেকে এতক্ষণ বরাদ্ধ করলেন—আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সাগরবাবু □ নমস্কার।

'সারা শরীরে অপুষ্টির ছাপ ছিল'

জ্যোতিষ দাশগুপ্ত

শ্রী জ্যোতিষ দাশগুপ্ত আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ১৯৩৯ সাল থেকে। অদ্বৈত মল্লবর্মণকে দেখেছেন ঘনিষ্ঠভাবে। পাশের-টেবিলে কাজ করতেন। বৃদ্ধ মানুষ। ১৮.১১.৯৪ তারিখ বেলা দেড়টা নাগাদ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে গেলেন আনন্দবাজার পুরোন আমলে। 'চতুর্থ দুনিয়া'র পক্ষে অচিন্ত্য বিশ্বাস এবং মনোহর মৌলি বিশ্বাস শ্রী দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা বলেছেন।

সম্পাদক

আমরা □ অদ্বৈত মল্লবর্মণের সঙ্গে আপনার যোগসূত্রটি একটু বলুন।

জ্যোতিষ দাশগুপ্ত □ আমি ১৯৩৯ সাল থেকে আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানে আছি। উনি কয়েকবছর পর ১৯৪৫ নাগাদ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তখন আমাদের প্রতিষ্ঠানে এখনকার মতো সমৃদ্ধি আসে নি। 'দেশে'-র কাজ 'আনন্দবাজারে'-র কাজে তেমন কোন কড়াকড়ি ভাগাভাগিও ছিল না। মদনমোহন বর্মণের বাড়িটিতে আমাদের অফিস করতে হত। সেই বাড়িটি আগে ছিল বড়বাজার ডাকঘর। মদনমোহন বর্মণ ছিলেন স্বাধীনতা-যোদ্ধা, কংগ্রেস করতেন; সুরেশচন্দ্র মজুমদারও তাই—তখন উত্তর কলকাতা কংগ্রেস কমিটির কোষাধ্যক্ষ। সম্ভবত এই সূত্রেই বাড়িটিতে আমাদের দপ্তর চালু হয়। ১ নম্বর বর্মণ স্ট্রীট—চিৎপুর রোড আর হ্যারিসন রোডের সংযোগ স্থলে মেছুয়া বাজার পার হয়ে দপ্তরে যেতে হত। অ্যাসবেস্টসের চালা দেওয়া দরমার সিলিং দেওয়া ঘর। সেইখানে পাশাপাশি টেবিলে আমরা কাজ করতাম। পাঁচ-ছ-বছর একসঙ্গে ছিলাম।

আমরা □ এই সময়কার কিছু কথা, যা অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক একটু বলুন না।

জ্যোতিষ বাবু □ দেখুন, আমি সাহিত্যিক নই। অন্যভাবে অদ্বৈতের পরিচয় পাবার সুযোগ ঘটে নি। তবে সহকর্মী হিসাবে যেটুকু দেখেছি, মনে হয়েছে মানুষটি খুব অন্তর্মুখী স্বভাবের। আলাপচারিতায় অনভ্যস্ত ছিলেন। চুপচাপ থাকতেন। কাজকর্ম করতেন একমনে—নিবিষ্ট চিত্তে। কাজের কথা ছাড়া অন্য কথা প্রায় বলতেন না।

আমরা □ কখনও তাঁর বাসায় গিয়েছেন?

জ্যোতিষ বাবু □ গিয়েছিলাম। বেলেঘাটার ওখানে ষষ্ঠীতলায় তিনতলার চিলেকোঠায় ছিল তাঁর বাসা। তখন উনি অসুস্থ। বাসাভর্তি বই। বহু বই কিনতেন।

আমরা □ তাঁকে যে ক্ষয় রোগ ধরেছে-সেটা বুঝতে পারতেন?

জ্যোতিষ বাবু □ তেমন মনে পড়ছে না, তবে খুবই অন্তর্মুখী স্বভাবের মানুষ তো, নিজের কষ্টের কথা কাউকে বলতেন না। অসুস্থতা ধরাপড়ার পর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা বা অন্য ব্যাপারে আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ যথেস্ট সাহায্য করেন। বিশেষত মনে পড়ছে কানাইলাল সরকারের কথা।

আমরা □ কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতাল থেকে উনি কাউকে না বলে চলে আসেন। তারপর কি প্রতিষ্ঠানের কাজে যোগ দিয়েছিলেন?

জ্যোতিষ বাবু □ না, উনি আর 'দেশে'-র কাজে যোগ দেন নি। আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম।

আমরা □ 'দেশ'-এর সাহিত্যিকদের যে শনিবার আড্ডা দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয় তাতে অদ্বৈতবাবুকে দেখেছেন? সাহিত্যিক বিমল মিত্র এই সময় অদ্বৈতবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের কথা কোথাও লিখেছেন। তাঁরা কি আড্ডা দিতেন?

জ্যোতিষ বাবু □ মনে হয় না। সুশীল রায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত দেব সরকার বা বিমল মিত্র-রা শনিবারের আড্ডা গড়ে তোলেন ঠিকই। আনন্দবাজার দপ্তরেই চা তৈরি করে মুড়ি সহযোগে আড্ডা বেশ জমে ওঠে। তবে সেটা বোধহয় ১৯৫১-৫২ সাল। তখন অদ্বৈতবাবু অসুস্থ। বিমল মিত্র মশাই রেলওয়ে ভিজিলেন্স বিভাগে কাজ করতেন—পূর্ব রেলে। তাঁর লেখা প্রথম দিকে ডাক যোগে আসত। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী বলে তখনকার নিয়মানুসারে তাঁকে লেখার সম্মান মূল্য রেল দপ্তরে জমা দিতে হত। অন্য রকম অসুবিধাও থাকা সম্ভব। পরে তিনি সর্বক্ষণের লেখক হলেন—চাকরি ছাড়লেন। এসময় 'দেশে' তিনি ঘন ঘন আসতেন। অদ্বৈতবাবুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় তখনই হয়ে থাকবে।

আমরা □ আর কিছু যদি মনে পড়ে।

জ্যোতিষ বাবু □ অদ্বৈতের স্বাস্থ্য ভালো ছিল না তেমন। দেখে মনে হত সারা শরীরে অপুষ্টির ছাপ আছে। তাঁর মৃত্যুর পর একজন ভাগ্নে সাগর বাবুর কাছে আসতেন। ভদ্রলোককে সাগরবাবু কিছু অর্থ সাহায্য করতেন বোধ হয়। মানুষটিকে দেখলেই বোঝা যেত অদ্বৈত মল্লবর্মণের পরিবারে আত্মীয় পরিজনরা ছিলেন অভাবী, দুস্থপ্রকৃতির। আর তেমন কিছু মনে পড়ছে না।

অদ্বৈতের বইগুলি রামমোহন লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ যত্নের সঙ্গে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শুনেছি তাঁরা কিছু কিছু বইকে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বলে গণ্য করেন।

আর তেমন কিছু মনে পড়ছে না। আসলে স্মৃতির টোপে একটির সঙ্গে অন্য অনেক ছবি মিলে মিশে যাচ্ছে।....

আমরা □ আচ্ছা, জ্যোতিষবাবু, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।

জ্যোতিষ বাবু □ নমস্কার।

ঋত্বিকমঙ্গল

অদ্বৈত মল্লবর্মণ
ও
তিতাস একটি নদীর নাম

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

তিতাস একটি নদীর না

শাদা হাওয়া
অদ্বৈত মল্লবর্মণ

A FILM BY
RITWIK GHATAK

অসমান
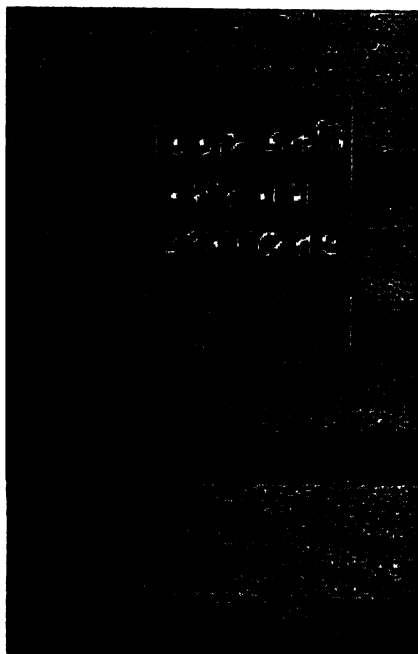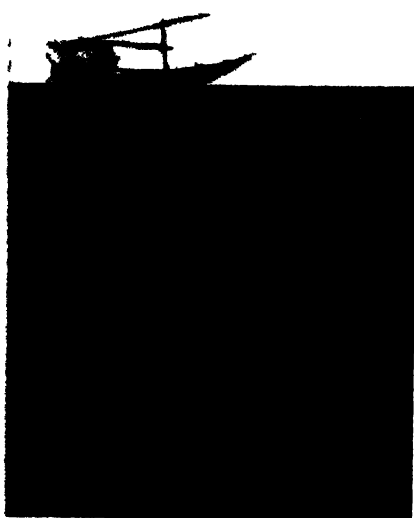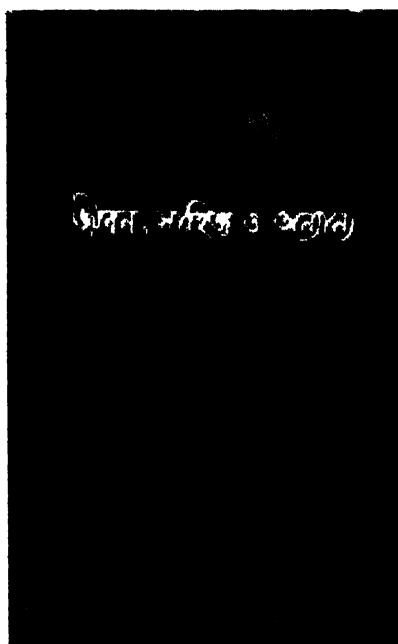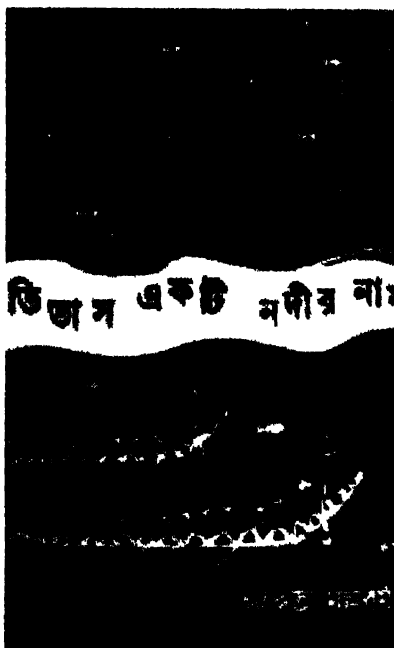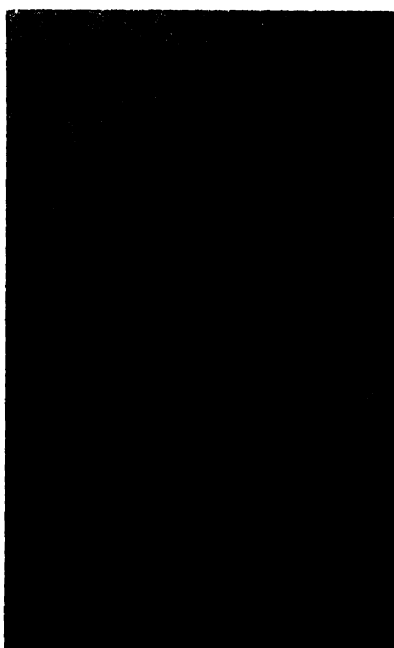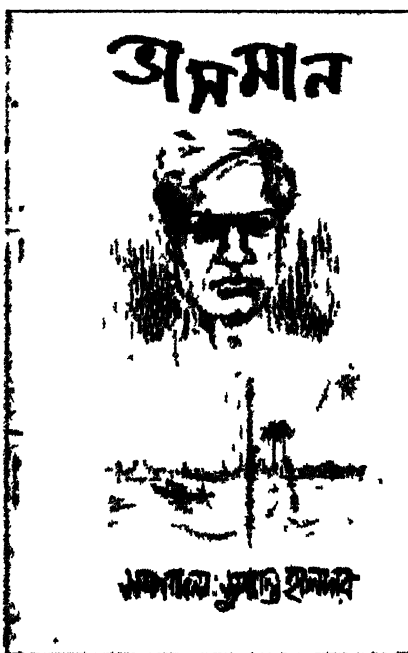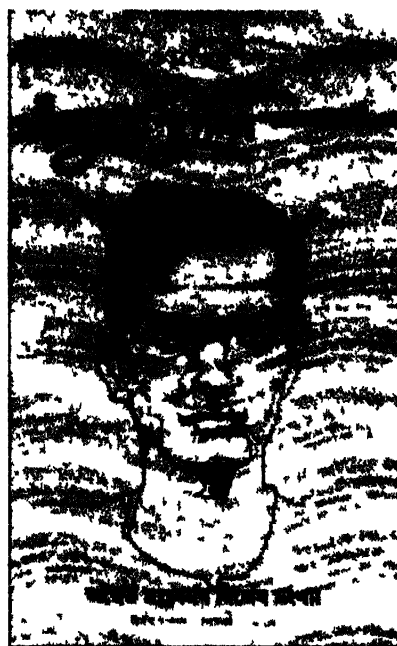
অদ্বৈতকে নিবেদিত কবিতা

তিতাসকে নিবেদিত কবিতা

অলস জল

শঙ্খ ঘোষ

পা-ডোবানো অলস জল, এখন আমায় মনে পড়ে ?
কোথায় চলে গিয়েছিলাম ঝুরি-নামানো সন্ধ্যাবেলা ?

খুব মনে নেই আকাশ-বাতাস ঠিক কতটা বাংলাদেশের
কতটা তার মিথ্যে ছিল বুকের ভিতর বানিয়ে-তোলা

নীলনীলিমা ললাট এমন আজল-কাজল অন্ধকারে
ঘনবিনুনি শূন্যতা তাও বৃক্ষ ইব চতুর্ধারে !

কিন্তু কোথায় গিয়েছিলাম ? মাঝি, আমাদের বাংলাদেশের
ছলাৎছল শব্দ গেল অনেক দূরে মিলিয়ে, সেই

শব্দকুহক, নৌকাকাঙাল, খোলা আজান বাংলাদেশের
কিছুই হাতে তুলে দাওনি, বিদায় করে দিয়েছ, সেই

স্মৃতি আমার শহর, আমার এলোমেলো হতের খেলা,
তোমায় আমি বুকের ভিতর নিইনি কেন রাত্রিবেলা ?

অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মরণে

অনাথ বন্ধু পাত্র

হারিয়ে তুমি যাওনি হে প্রিয়
স্মৃতি কভুও হবে না ম্লান
কেমনে ভুলিব তোমার কথা
কেমনে ভুলিব তোমার দান।

সুরলোক হ'তে তুমি এসেছিলে
আমাদের পথ দেখাইবে বলে
দলিত-মথিত যারা পলে পলে
ছিল তব প্রাণে কত টান।

তোমার লেখনি দেখায়েছে পথ
নিলাম তোমার স্মরণে শপথ
শুকাতে দেব না "তিতাস" মোরা
নয়নের জলে আনিব বান।

স্বপ্নের তিতাস

ঝর্ণা বর্মণ

তিতাস একটি নদী
তিতাস একটি জীবন
তিতাস একটি তুলি
জীবনের ছবি আঁকে,
সত্যিকারের ছবি —
যার কাছে হার মানে
লাখ লাখ টাকা দামের
বনেদী পোর্ট্রেট।

তিতাস জীবনের ছবি আঁকে,
একে একে ভিড় করে
সেই সব খেটে খাওয়া মানুষ —
অকূল গাঙে যারা নৌকা ভাসায়,
বাড়ি-ঘর প্রিয়জন ছেড়ে
নতুন করে ঘর বসায় জলের ভিতে,
জীবনের রাখে অন্য নাম।
ঘাটে ঘাটে বাঁধা হয়
অকথিত জীবনের কত গাঁথা।

তিতাসের কবি,
তিতাসের চিত্রকর,
তুমি তো রুপোর চামচ মুখে
জন্মাওনি,
গোলাপ বিছানো পথে
হাঁটোনি কোনো দিন,
সব মানুষকে আশ্রয় দিতে গিয়ে

হয়েছো নিরাশ্রয় বারবার।
সকলকে নিরাময় করতে গিয়ে
দেহের গোপন আস্তানায়
রাজরোগ বেঁধেছে বাসা।
এর ভয়ঙ্কর পরিণাম জেনেও
অকুতোভয়ে, দৃঢ়হাতে লিখে গেছো
সেইসব নিপীড়িত মানুষের কথা
কিশোর-সুবল-অনন্ত-বাসন্তী,
যারা শেষ হয়েও অনিঃশেষ—
নদীর মতো-চিরন্তন প্রবাহের মতো।
কবিগুরুর ভাষায় —এ নয়
'শৌখিন মজদুরি'।

যখন তিতাসের বুক
দড়ির মতো শুকিয়ে আসে,
বালি জমে জেগে ওঠে
তিতাসের লাশ
যখন আর কোন বাসন্তী
'চৌয়ারী' ভাসাবে না তিতাসের বুকে
মাঘমণ্ডল ব্রতের দিনে,
তখনও শিল্পী এঁকে যাবে
জীবনের ছবি-সুখ-স্বপ্ন-মাখা।
তিতাসের বুক ভরা জল—
হাওয়া তাকে দোলায়,
তিতাস কেবল ডোবায় না, ভাসায়।
রঙীন রঙীন মিষ্টি স্বপ্নেরা
কেবল ঘুরে ঘুরে আসে—
ঘুরে ঘুরে আসে,
জলের মতো কলকলিয়ে কথা কয়।
স্বপ্নেরা ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে
জলের মতো কথা কয়-কথা কয়।

রাজমুকুট

লক্ষ্মণ কুমার হালদার

অদ্বৈত মল্লবর্মণ পরকণ্ঠভূষা
মালো সমাজের।
প্রথম প্রভাতী সূর্য নাগশিরোমণি
তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী।
তুমি ধ্রুব রাজপট্ট ধরেছ তুলিয়া
এ বিশ্ব ভুবনে।
মল্লবীরের জয়গান গাহিয়াছ
তুমি আজ নাই।
তবু এত নাম তিতাস নদীর নামে
আমরা অমর।
তুমিও রেখেছ কৃতি কৃত্তিবাস সম
হে বন্ধু মহান;
তুমি যে অজেয় তাই তোমারে স্মরিয়া
ভরে ওঠে প্রাণ।

অদ্বৈত মল্লবর্মণকে মনে রেখে

গৌতম চন্দ্র চন্দ

তোমার সময়ে
মতাদর্শগত সংগ্রামের তীব্রতায়
ভারতবাসীর চিন্তাশক্তি আলোড়িত হচ্ছিল
সারা দেশময় প্রতিভাত ছিল
পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন
নেতৃবর্গের দেশপ্রেম আর অন্তঃসার-শূণ্যতার মাঝে
একটি সত্য প্রকট ছিল
সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র, মহাজনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদীর নিষ্পেষণে
দেশের নব্বই ভাগ লোক ছিল বঞ্চনার শিকার
চাষীরা পেত না ন্যূনতম শ্রমের মূল্য
সামান্য কাজের জন্য সম্পত্তি গ্রাস করত মহাজন
খনিতে খনিতে কারখানায় কারখানায়
অভাগা শ্রমিকদের সীমাহীন বঞ্চনার কালসর্প দংশন করত
শ্রমিকের প্রাপ্য সুযোগ সুবির্ধা দিতে
মালিককুলের কুম্ভীরাশ্রু ঝরত
সর্বস্তরে অনুন্নত কৃষক-শ্রমিকদের
জীবনের মূল সুবিধা থেকে বঞ্চনা করত ধনীদের দল
এ হেন সময়ে নির্যাতিত তৃতীয় বিশ্বের কথা মনে রেখে
তুমি ভারতবর্ষের চারণ
চিঠি লিখেছিলে, খোলাচিঠি, পার্ল বাক কে।

ভারতবর্ষের মতো চীনও তখন ছিল নির্যাতিত
বিদেশী আগ্রাসনে আর সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণে
নাভিঃশ্বাস ফেলেছিল চীনের সাধারণ মানুষ
সীমাহীন দারিদ্র্য আর বঞ্চনার মাঝে চলছিল
নয়া চীন গড়বার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

তোমার সময়ে
তোমার অভিপ্রেত ছিল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা
সাম্য প্রতিষ্ঠার নামে তখন দেশে দেশে চলছিল
পরমতনিষ্পেষণের নির্মম প্রচেষ্টা
ফ্যাসীবাদের উলঙ্গ আগুনে
পুড়ে যাচ্ছিল বিশ্ব
মৈত্রী হয়েছিল কেবল অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তি জোট গঠনে
এ হেন সময়ে
তুমি স্বাধীনতার চারণ
নির্যাতিত পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে
চিঠি লিখেছিলে, খোলা চিঠি, পার্ল বাক কে!
পার্ল বাক দরিদ্র চীন কৃষকের উত্তরণের
কাহিনী লিখে অমর হয়েছিলেন
তোমার সময়ে
তুমি দেখেছিলে মন্বন্তরের ভয়াল বিভীষিকা
মজুতদার ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণে
এক মুঠো ফ্যানের জন্য কত শত নরনারী শহীদের মৃত্যু
দেশের মানুষের কথা মনে রেখে।
তুমি চিঠি লিখেছিলে। খোলা চিঠি পার্ল বাক কে।
হে মূল্যবোধের চারণ!
মানবদরদী লেখিকার কাছে তোমার চিঠি বোধকরি
পৌঁছায়নি; যদি তা হত তাহলে
পার্ল বাক আরেকটা গুড আর্থ দিয়ে যেতেন।

তিতাস

আল মাহমুদ

এ আমার শৈশবের নদী, এই জলের প্রহার
সারাদিন তীর ভাঙে, পাক খায়, ঘোলা স্রোত টানে
যৌবনের প্রতীকের মতো অসংখ্য নৌকার পালে
গতির প্রবাহ হানে। মাটির কলসে জল ভরে
ঘরে ফিরে সালিমের বউ তার ভিজে দুটি পায়।
অদূরের বিল থেকে পানকৌড়ি, মাছরাঙা, বক
পাখায় জলে ফোঁটা ফেলে দিয়ে উড়ে যায় দূরে;
জনপদে কি অধীর কোলাহল মায়াবী এ নদী
এনেছে স্রোতের মতো, আমি তার খুঁজিনি কিছুই।

কিছুই খুঁজিনি আমি, যতবার এসেছি এ তীরে
নীরব তৃপ্তির জন্য আনমনে বসে থেকে ঘাসে
নির্মল বাতাস টেনে বহুক্ষণ ভরেছি এ বুক।
একটি কাশের ফুল তারপর আঙুলে আমার
ছিঁড়ে নিয়ে এই পথে হেঁটে চলে গেছি। শহরের
শেষ প্রান্তে যেখানে আমার ঘর, নরম বিছানা,
সেখানে রেখেছি দেহ। অবসাদে ঘুম নেমে এলে
আবার দেখেছি সেই ঝিকিমিকি শবরী তিতাস
কি গভীর জলধারা ছড়ালো হৃদয়ে আমার।
সোনার বৈঠার ঘায়ে পবনের নাও যেন আমি
বেয়ে নিয়ে চলি একা অলৌকিক যৌবনের দেশে।

তিতাস তুমি কেমন আছো

মিহির দেব

দীঘল কালো জলের শরীর তিতাস তুমি কেমন আছো?
হয়তো তুমি ভুলেই গেছো, জল রাখে কি ধরে ছায়া!
পালিয়ে এলাম জানের মায়ায় প্রাণ যে তবু রইলো পড়ে।

এখন কত নতুন ছেলে তোমার কোলে নাইতে আসে,
তোমার কোলে সাঁতার কাটে, রাত্রি কাটায় মাছের পিছে,
কলস জেতে নৌকো দৌড়ে, বালু খোঁড়ে ডিমের খোঁজে।

মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি দোর-জানালার খুলবে খিল,
প্রাণের নদী বাঁধ মানে না, থাকবে না টান রক্তেও কি?
জল কাটে না ছুরির ঘায়ে, আজ না হোক মিলবে কাল।

দীঘল কালো জলের শবীর তিতাস তুমি কেমন আছো?
দেয়াল তুলে ফটক এঁটে বন্ধ করে জানালাগুলি
বেশতো আছি পৃথক পৃথক, হৃদয় বোকা মিছেই কাঁদে।

তিতাস, আমার তিতাস

মনোরঞ্জন বিশ্বাস

আমার নিভৃত সময়ের
নরোম শরীর বেয়ে
তোমার স্মৃতি আমায়
উদ্বেল করে তোলে।
হৈমন্তী দিনে তোমার কূলে কূলে
মালতীশাইল, লক্ষ্মীবিলাস, কনকতারা-
আরও কত নাম-না-জানা সোনা-রং ধান
কৃষকের বুকের ওমে নির্মাণ করতো আশার সরতাজ।
আজও কি শস্য-সাধনায়
তুমি তেমনি অকৃপণ?
আনন্দবাজারের সেই আনন্দ-হিল্লোল
এখনও কি সমান সতেজ? মেড্ডার শ্মশান,
কালভৈরব এখনও কি শিহরণী সৌন্দর্য-বিলাসে
মগ্ন? এখনও কি তোমার মধুবর্ষী ধারা
হতাশা-দীর্ণ অতৃপ্ত পরাণে
বয়ে আনে শান্তির অমিয় ধারা?
মনে পড়ে চৈতালি উৎসবের
আনন্দ-মেখলায় বিভূষিতা তোমার কথা।
মনে পড়ে, বিজয়া দশমীর বেহাগে
তোমার রূপোলী বুক
কি বিষণ্ণতায় মূক হয়ে যেত।
'কাইল বুঝি বিজয়া দশমী গো অভয়া,
ছাইড়্যা যাইতে পরাণ বিদরে গো অভয়া-
এখনও কি রিক্ত হৃদয়ের আর্তি তোমায় ভারাক্রান্ত করে?
কতোদিন নিশুতি রাতে তোমার
বুকফাটা চাপা কান্নার শব্দে

আমি সচকিত হয়েছি।
কতোদিন তোমার ছই-নৌকোবিহীন,
বিশাল বিস্তৃত ঢেউয়ের
উজ্জ্বল যৌবন আমায়
ঘুমুতে দেয়নি
ধরখার, উজানিসার, কাশীনগরের
গোদারা-পারাপারের গোধূলি দৃশ্য
আমায় নির্বাক করেছে।
এখনো কি ন্যাংটো শিশুর দল
গ্রীষ্মের গন্‌গনে দুপুরে
ঠাঁইজলে, সাঁতার জলে, অথৈ জলে
দাপাদাপি করে প্রাণের প্রাচুর্যে?
পানকৌড়ি, গাঙশালিক, মাছরাঙাদের
প্রাণোচ্ছল উড়াউড়ি,
এখনও আগের মতো কলকণ্ঠ-মুখর?
ভরা বর্ষায় তোমায় রুদ্র রূপ
দেখেছি কতোবার
কুরুলিয়ার খাল থেকে দিগন্ত-বিস্তৃত-
সীমাহারা তোমার শরীর।

খলাপাড়া, মেড্ডা, বুড্ডা, গুল্লা, ভাদুগড়ে
তোমার বেহিসেবী নির্মম উপস্থিতি দেখেছি-
দেখেছিল ঈশাণের পুঞ্জিত মেঘের আহ্বান
তোমায় কেমন মাতাল করে তুলতো।
তিতাস! আমার মায়াবী তিতাস!!
সময়ের চালচিত্র বুকে নিয়ে এখনও কি তুমি বও
সুখ-অসুখের একান্ত বিলাস?
কতো বর্ষা-বসন্তে রাত্রি ও দিন
নিশ্চিহ্ন বিলীন!
তোমার ঢেউয়ের মতো কতোদিন ছোঁয়া-যায় এমন দূরত্বে
থেকেও
তোমায় দেখিনি, তোমার কুশল পাইনে-
পাইনে মর্মের মরমী পরশ।
হে আমার শৈশবের তিতাস!
আমার কৈশোরের তিতাস!!
হে আমার যৌবনের তিতাস!!!
এখনো তোমার স্মৃতিতে আমার মগন পারাপার।

তিতাস বন্দনা

(তিতাস-পাড়ের প্রবাসী বন্ধুদের উদ্দেশ্যে)

জয়দুল হোসেন

১.

তিতাস বন্দনা যদি মনে পড়ে যায়
বিদেশে বিমাতৃভূমে থেকে নিরালায়
আমার কবিতাখানি পড়ে নিও মনে
স্মৃতির মিনারে চড়ে গোপনে গোপনে
দেখে নিও তিতাসের বুকভরা জল
জেলে-মাঝি কৃষকের শ্রমের ফসল
কার ঘরে চলে যায় কারা করে লুট
কার ঘরে ভাত নাই কার ভরে মুঠ।

২.

আষাঢ়ে নতুন জল ঢেউ ভরা নদী
ছোট তরী রাঙা পাল মনে পড়ে যদি
যদি মনে পড়ে যায় নায়রির নাও
কূলে কূলে জেগে থাকা জেলেদের গাঁও
আর সেই মাঝিদের ভাটিয়ালি গান
বিগলিত করে যদি দেহ মন প্রাণ
আমার কবিতাখানি পড়ে নিও মনে
শান দিও স্মরণের তারে সযতনে।

৩.

ফুল ফোটে পাতা ঝরে পাখি গান গায়
জোনাক-জোনাকী জ্বলে সাঁঝের মায়ায়
মউঃমক্ষী বাস বাঁধে রসালের ডালে
কবি ভনে থেকে যাবে, যা আছে কপালে
চাক ভাঙা মধু খাবো ঢেউ ভাঙা জল

কলমির ডগা আর খাবো পানিফল
পানকৌড়ি বালিহাঁস গাঙকলা গাছ
খেতে বড়ো সাধ হয় সরপুঁটি মাছ।

৪.

শীতের সকালে নদী কুয়াশায় ঢাকা
ওড়নার ফাঁক দিয়ে যেনো চেয়ে থাকা
কিশোরীর সদা চোখ শিশিরের মতো
ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে অবিরত
আর সেই শ্যামা মেয়ে রজকিনী হেম
রাধিকা বিহনে কাঁদে বনমালী প্রেম
বেহুলার ভেলা নিয়ে ধীরে বহে নদী
ভালোবাসা ঢেলে দিও মনে পড়ে যদি।

৫.

ডাহুক ডাহুকি ডাকে ঝোপে আর ঝাড়ে
গাঙচিল বাসা বাঁধে নদীর কিনারে
মাছ লোভী মেছো বক মাছের নেশায়
ধ্যানমগ্ন ঋষি যেনো খাড়া এক পায়
ডুবে ডুবে মাছরাঙা মাছ ধরে খায়
মরাল মরালী চলে ধীরে গতি পায়
নোঙর ফেলেনা নাও তিতাসের তীরে
সুখ-দুঃখ বারোমাস কাটে ধীরে ধীরে।

৬.

পরগাছা বেড়ে ওঠে রাঘব বোয়াল
দিনে দিনে খালি হয় গবাদি গোয়াল
তিতাসের কালো জল খরাণে শুকায়
কৃষকের আঁখিজল পরাণে লুকায়
পাথর সময় যেনো কাটেনা প্রহর
মাঝ গাঙে চড়া পড়ে বহেনা নহর।

তিতাস বন্দনা গীত নদী সমাচার
আপাত এখানে শেষ, গাহিব আবার।।

রক্তের ভেতর শুয়ে থাকা নদী

দিলীপ দাস

আমার রক্তের ভেতর এক অথৈ নদী
খেলা করে দিনরাত
স্মৃতির বেগুনি পানাফুল।
হৃদয়ের ঢেডয়ে ঢেডয়ে
ঢেউয়ের ওঠাপড়ায়
এ নদী বয়ে চলে শত শতবার
আমার পিতা-প্রপিতামহের রক্তের
উত্তর পুরুষের সুদূর ভাবনা।

বর্ষায় এ নদী জলসত্র তৃষ্ণার বিলে মজা খালে
বিপিন মাঝির দাওয়ার কিনারে
কমলাদের ঘরের উনোনে, ইঁদুরের গর্তে।
কেরায়া থেকে ফেরে আমার দাদু
দত্তখলার চর বায়ে রেখে
বর্ষাল ধানের দুধবতী বুকে
গলুইয়ের ছোঁয়া জাগায় অদ্ভুত শিহর।
তখন শাপলা পাতায় শুয়ে
রোদ পোহায় লিকলিকে সাপ
জলের নিঝুম তলে শালুক ডগায়
গা মাজে মীন রূপসীরা।
শ্যাওলার আদর মেখে বৈচা-দারকিনা
নীরব নক্শা বুনে জলের চাদরে।
তারপর এ নদী স্থির-নীর নিজ অন্তরের শীতে।
তখন বোরো খেতে ধান রোয় ঈশমত শেখ
অধরের নাও সারায় গোবিন্দ ছুতোর
নদীর বুড়ী বুকে জাল বেড় দেয়

পুব পাড়ার কৈবর্ত শশী
বিলের নাড়ায় তলায় তখন মেঠো কচ্ছপ
ডিম পাড়ায় ব্যস্ত নিবেশক-
মেড্ডার শ্মশান ঘেঁষে চিতার পোড়া কাঠ
লোফালুফি খেলে,
আলীদের ছেলে আলমের ঘনসি
ও গামছা
মিয়াদের ছোটো মেয়ে
আমিনার নীল ডুরে শাড়ি
চুরি করে নদী লাই খেলার ফাঁকে।
তোমার ঝিনুকের কটোরায় নদী
খুঁজে দেখো আজও জমা আছে
আমার হারানো বোতাম মাদুলির ছিন্ন
অবশেষ
দাদুর ডাঙা ডিঙির ছই ও গলুই

এক অচেনা কিশোরের ফুটন্ত কল্‌হার
তুমিই ছুঁয়েছিলে নদী করমির তারুণ্যে
তুমিই প্রথম প্রেম
বাদামী মাঝির ভাটিয়াল জীবনে
তোমার তালাশ আমার উজানে ভাসানে।

তিতাস

সানাউল হক

পূর্বরাগ

একটি অনতি নদী যার দুই তীরে
দীঘল বনের ছায়া রূপসীর চোখের কাজল
হয়ে ঝরে। এই নদী আকাশীর চর ঘুরে-ফিরে
এসে যেই থামে মনে হয় চেনা নয়। ছলছল
দুইচোখ, মলে-দেয়া স্তিমিত যৌবন
যদি বলো পরিহাস, পরিচিত সে কি?
স্মিত হাস চোখাচোখি, মৃদু সম্ভাষণ ঃ
নদী মাঠ মেয়ে বধূ জলস্নাতা একাকার একি!

জলস্নাতা সে কোন গাঁয়ের মেয়ে ভেজা কালোচুলে
আব্রুমেঘের ছায়াকে পুষ্ট যুগল পূর্ণিমা-
নিটোল সম্ভার তবু প্রকাশ্য তনুর উপকূলে ঃ
একচুপি যেই দেখো আর নেই! মাঠপ্রান্তসীমা
বনরাজিনীলঘেরা-সচকিতা গোপনে উধাও।
আশ্চর্য আত্মীয় নদী ঘাট ছেড়ে মাঠ ফেলে ফের
কুয়াশায় কথা কয় ঃ এখনো ঘুমাও?
ঢুলুঢুল চোখে কেন বিবসনা ও নেশার জের?

কাঁঠালবনের ছায়া সুরমাচোখের কাঁচা নীল
মাছরাঙাশাড়ি ঝিলমিল যার দুর্বাঘাটে।
সুরঞ্জিন মীনপুচ্ছ ক্ষীণজীবী ঃ তীক্ষ্ণনখা চিল
ধারালো সুতোর মতো অনায়াসে কাটে
পুঁটিকই কত জলঘুড়ি। বিয়োগান্তদৃশ্য-নদী
প্রেম মৃত্যু বুকেপিঠে ঃ দোনলার সখের গর্জনে

স্তব্ধ যদি চখা, ঘুরে-ঘুরে চখি হৃদয় অবধি
ঢেলে দিতে চায় আহা প্রেমতীর্থে নির্ভয়-ক্রন্দনে।
আষাঢ়ে দুরন্ত ঢেউ বুনোমেষপাল
রসিকতা রাখাল হাওয়ার সেই বাড়াবাড়ি।
অসময়ে কটিপ্রান্তে শ্লথ অগোছাল
জলস্নাত শাড়ি লজ্জাবতী। দেহসীমা ছাড়ি
যাবো যাবো সবুজসম্ভ্রমী। ঝাপটা প্রবল
তেড়ে-তেড়ে আসে ঃ সুপ্তোত্থিতা তনুস্নিগ্ধা হাসে
ঘনিষ্ঠ ব্যাপ্তির স্বাদ অঙ্গে অঙ্গে আবেশ-বিহ্বল!

মিহিঢেউ বউকথা শব্দের স্তনন কত
ঘনগন্ধী ঋতুসমাহারে। কবে যেন কার
শিশুকমঠ আধোবলা ছিল এক ব্রত ঃ
খল খল এই হাসি; নিস্তরঙ্গ এই মুখভার।
প্রেয়সী আশ্বিন আহা! টলোমল যুবতী যৌবন,
উদ্বেল প্রথমা মন, লগ্নান্তরে শর্বরী প্রণাম ঃ
ঘরোয়া স্বনামলক্ষ্মী, যদি দাও অন্যতর নাম
তাকাবে সজল চোখে নীলমণি নদী সবেধন।

প্রিয়তরা-বিভোল ভ্রুভঙ্গিবাঁকা কী ভঙ্গি কোমরে!
জড়ানো আশ্লেষ কতো, নীলাঞ্চল বিস্রস্ত বিবশ।
তনুরঙ্গা টলোমল, পূর্ণিমার ফেনশ্রী অধরে।
হেমন্তে হলুদহাসি, ঠোঁটতটে ফোঁটা-ফোঁটা রস
ঘাসের শরীরে ঃ খরগোস-বাঞ্ছিত সবুজ।
সুহৃদ সজ্জন নদী প্রসারিত বাহুডোরে শুয়ে
ঘুমঘুম দেহলীনা, হয় তো বা খেয়ালী অবুঝ-
ঘাসল মাটির স্বাদ অবিরাম চেখে আর চুয়ে।
শীতল পাটির মতো ঠিক আমাদের প্রিয়া নদী
রূপোলী কেশের গুচ্ছ সুচিক্কণ ঢেউ ঢেউ যার-
তনুপূর্ণা-কতো স্নান উন্মীলিত ভাঁজে-ভাঁজে তার।
ডুব দাও গহীন বুকের স্বাদ পেতে চাও যদি!
ঘাটে-ঘাটে ডুব-লুকোচুরি, ওৎ পাতা লুব্ধ উঁকি ঝুঁকি ঃ

স্ফুটিত স্তনের আভা একফালি বুঝি সৌরলোক।
ঢলঢল কী আভা স্ফটিক মুখে, কী শান্তশ্রী চোখ-
আকর্ষণে ঝাঁপ দেয় সন্ধ্যাতারা, চাঁদ সোনামুখী।

অনতি নামের নদী ভাসায় না ভিটি মোষপাল-
কাঁখের কলস তোমরা ভাসাতে পারো যতো চাও,
শবদেহ মরাগরু ঝরাপাতা যখন আকাল।
আসলে স্নানের নদী-এসো এসো শরীর জুড়াও ঃ
ধূসর মালিন্য ক্লান্তি যতো দিবা অবসানে-
সৌজন্য সজলস্পর্শে ধুয়ে মুছে দেবে বিলক্ষণ।
আয়ত স্নেহের নদী, ভারস্নানে শান্তি রোজ আনে।
এদেশের মাতা-বোন তাই বুঝি এ নদীর মন?

স্রোতস্নান বেগবতী নিজে নয়। অরুন্ধতী
ক্ষীনজ্যোতি আহা! ক্ষিপ্রস্রোতা কাজের মিছিল
তবু নদী-অনুগামী। যেন ঘামের প্রণতি
ঝরে শতায়ু শিকড়ে। তাই মিল ও অমিল
সম্পর্ক যোজনা, ঐস্পাতিক মজ্জার দ্যোতনা।
মাঠের সমৃদ্ধি বলো, গঞ্জের গৌরব-
সোনাধান কই ঃ প্রার্থিত পণ্যের আল্‌পনা
এ নদীর বিন্যাস-স্বরূপ, সার্থক প্রসব।

দেশে দশে যাদের সম্মান, কীর্তিনাশা যারা বীর
প্রমত্ত প্রলাপ। (ভয়স্তব্ধ সহজ কলাপ।)
লালাস্রাবী যারা ঘোরে পাড়াময় শিকার-অস্থির-
স্বনামপ্রতিষ্ঠ মহারথী সব। নৈকট্য সংলাপ
অসম্ভব কথা ঃ লেজুড়গুটানো ভয়-হিম।
শুভানুধ্যায়ী মিনতি মিষ্টি এই নদী বিপরীত ঃ
বিজয়নী নয় উল্লাসে, তবু পরাজিত
ঘ্রাণে-দানে কাকলিমিথুনে সৌহার্দ্যে অপরিসীম।
নিভৃত মনের নদী ঃ তিলোত্তমা ইতিহাস নয়।
চোখের কাজল নদী ঃ আয়ত আয়ুর সিঁথি

রুপোলি রেখায় মিহিটানা ! ঘনগুচ্ছবীথি
কোমল কেশের মেঘে-মেঘে, এত অপচয়
ক্ষয়িষ্ণু গ্রামের এসে মেশে; শাপলা বিলের কত
বিরস বৈশাখীকান্না পাশে জেগে থাকে, অপাপস্ফটিক
রসজ্ঞান আজন্ম সিঞ্চিত। প্রাচুর্য নিয়ত
দুইতীরে শর্ষেফুলে অঘ্রাণের মাঠে-মাঠে ঠিক।

তীরে-তীরে কতোনা বন্ধন, নানা নীড় পাখি
কত বউকলসিনী ধান ও ধসের ইতিহাস ঃ
হাসিঝরা প্রিয়মুখ, ছলছল অভিমানী আঁখি;
ভাঙামঠ রাঙামাঠ একপাল মোরগাবি হাঁস।
কাশফুল গো-বাথান জেলেপাড়া বুড়োকুঁজোবাড়ি ঃ
এই নদী কারিগর তটশিল্পী হয়তো বা কবি-
ধ্যানীজ্ঞানী যাযাবর খেয়ালী কি আজন্ম নেশাড়ী ঃ
বুকে গান ঠোঁটে রস কটিবাঁকে কতো ফোটে ছবি।

দৃশ্য পরিক্রমা

ছবি, দৃশ্য পরিক্রমা চিত্রাবলী মিছিল
জ্যামিতিক বাড়া বাঁকে।
বেহিসেবী বাঁয়ে কি ডাইনে
আরশিজলের আসমানে
ভাসমান মেঘ, অভিষেক
একবার হয়েছিল নিঃশব্দ দর্শনে ঃ
সন্ধ্যাগমে সে লজ্জার টোল
বর্ণালী স্পর্শনে আশ্চর্য নিটোল।
তটপটে ছবি অন্যতর ঃ দুর্বাঘাস
আরেক আকাশ, ফড়িঙ জাহাজ
সবুজ ডানার এক ঝাঁক
ফুরফুর দেয় এসে ঝাঁপ।
কলম তুলির কথা ও রেখায়
বাঁধবে পোষ মানাবে

বিবর্তিত ভঙ্গিমার চমক বুঝবে -
জেগে ওঠে আরেক বিস্ময় ঃ
চোখ টেপে হেসে-হেসে নদী যেই
অন্য কথা কয়।

দিগ্বিজয়ী দৃশ্যজয় কেমনে সম্ভব হয়
কে রাখে হিসেব;
কতো দৃশ্য ক্ষিপ্রকটি এলোকেশ জমা
সূর্য-ছোঁয়া গণ্ডদেশে, রূপচাঁদা-দেহে
রোহিত চিতল খলসের নৃত্যদোলা
শাড়ির ঝলকে,
অন্য ছবি, জোছনার মন যদি ঝুপ করে নেমে
ডুব দিয়ে মাছ হয় চোখের পলক।
এইখানে হরিৎকর্মা শর্ষে মাঠে
প্রজাপতি কবি,
ওইখানে ধানকাটা খড়নাড়া
নেড়ামাঠ পোড়া ছন্নছাড়া
এই বাঁকে জেলেনীর শাড়ি
হাওয়ায় লুটায়-
অই দূরে বেদেনীর নাও
নিমেষে উধাও ঃ
কুতূহলী ধ্যানীবক ঘাড় তুলে
আড়চোখে চায়।

কতো নৌকা আহা

নক্সীকাটা সরঙাই নাও
তরতর নিয়ে যাত্রীদল
গ্রাম ছেড়ে গঞ্জঘাটে কবুতর যেন
অবিকল।
ক্ষিপ্রতর ক্ষীণকটি ছিপ
সাঁ-করে বেরিয়ে যায়

অন্ধকারে মেশে ঃ
এই এলো ভয়নীল মোড়লের পাড়া,
নিবু-নিবু ক্ষীণাঙ্গী প্রদীপ!
সুমন্থর জেলেডিঙি
হাড্ডিসার হ্যাংলা চিকন-
এক দুই তিন চার কতোনা গড়ন,
আজানুলম্বিত বাহু দিশারী চরণ
তালপাতার সেপাই বুঝি
হেলে দুলে অন্বেষণে সময় ভুঞ্জন
হুঁকোয় তামাক ফুঁকে দুপুরে জিরায়
কুমিরের মতো কেউ পউষের
রোদ্দুরে পোহায়,
ডিঙি নয়, মরি মরি পোড়াকাঠ
ঠিক পানকৌড়ি!

ক্ষয়হীন খেয়া নাও নড়বড়ে দেহ
পারাপারে তার জুড়ি আর নয় কেহ।
যাত্রীদল ভিড়াক্রান্ত হয় যদি কভু,
বেসামাল মুখে ডাক, রক্ষা করো প্রভু।
প্রবীণ পাটের নাও, চাল রাসভারী
গজেন্দ্রগমন আহা দেমাগ-ভাণ্ডারী
পাটনি-চালক পাটনাই নাও
ফেরিঅলা পণ্যবারাতুর-
ত্রিভঙ্গামুরারীদেহ মাল্লাদের হাঁক ঃ
মিশূলতলার হাট আর কতোদুর।

আর কতোদূর ভাই, বলো কোন বাঁকে
শ্রীমুখী আমার গ্রাম? ঝিকিমিকি
তার দেখা পাওয়া যাবে নাকি?
অই দ্যাখো তালগাছ মঠ পাশাপাশি
নাকসোজা মাছধরা বাঁধ,
তারপর মরাগাঙ বালিঝুরি,

সবশেষে সিঙারার বিল,
তার ঘেঁষে সবুজ টিলার ঢেউ
কাঁঠাল পাতায় ঝিলমিল ঃ
ছইয়ের ভেতর থেকে ঠুংটাং শব্দ আসে
নাইওরীর বেলোয়ারী চিকণ চুড়ির।

বজরা পিনিস ভাউলিয়া নাও
মোরগের খাঁচাপিঠে চলে কিনা চলে ঃ
পীর সাহেব চোখ বুঁজে তামাকু ফোঁকেন,
পদতলে বান্দাদুই পাটেপা-বেহুঁস।
হালে মাঝি জোরে দেয় চাড়া
অমৃতবচন মোহে কানখানি খাড়া!

নৌকাদৌড়

নৌকাদৌড়, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে
এ নদীর বার্ষিক উৎসব ঃ
হৈ রৈ ধুমধাম লোকারণ্য মহা!
কেউ বীর বাহাদুর, কেউ নটরাজ
(তার আগে পড়শী এসো দুইহাত লড়ি
মারবো তোমায়, না হয় পরে নিজেই মরি!)

দুই

শ্মশান ঘাটের নিত্য মরা পোড়া
তীরটি ঘেঁষে অজানা কালজোড়া
অকালমৃত্যু আকালমৃত্যু ডুবিমৃত্যু কতো
ভূমিযুদ্ধে মরতে যারা জানে মরার মতো-
কী আশ্চর্য শবদেহ সব ভস্ম পোড়া ছাই।
সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ জ্বালা হয়নি ঘরে যার-
কোন সে মেয়ে চুল ছেঁড়ে, আর একলা বসে
কাঁদে ঃ
সন্ধ্যাতারা কেমন অবাক রাখল খবর তার।

তিন

আবার কখন আশার আজান
উজান হাওয়ায় কাঁপে -
পাশের গাঁয়ে একটি ঘরে
সতেজকণ্ঠী প্রতিধ্বনি বাজে।
একটি নতুন শিখা-আরেক নায়ক
মঞ্চে এসে আলগোছে দেয় দেখা।
কাল যে ফুল দুর্বাতলা ভাসিয়ে নিল নদী-
আজকে দেখি ঢালছে পানি,
খাটছে এসে অন্য ফুলের পাঁপড়ি ফোটার কাজে।
তাই বলে কি অসময়ে আজান এমন
আকাশ ডেকে আনে?

কিশোরীর হাঁস

কালোমেঘ ছায়াছবি আরেক সন্ধ্যার
ভুলে যাই নদী-
থমথমে মুখভাব ঠিক গাবতলা
জোড়া হাঁস ফেরে নাই ঘরে ঃ
কিশোরী জেলের মেয়ে এলোখোঁপা
পিঠে নিয়ে ছোটে-
আর পথে-পথে ডাকে ঃ
ঘরে আয়, ঘরে আয়, কই তোরা ওরে!

কে যায় কোথায়
পানসি ভাসায়
সাঁতার কাটে
ডুবুরী নেশায়
গুগলি কুড়ায়
মাঠের ঘাটে।
দোদুল ঢেউ বাদশাজাদা
বাচ্চা ছেলে-

কাঁকড়া বলে এতো সাহস
কোথায় পেলে ?
সোনালী ফড়িং পালের নাও
কে যাবে আগে ?
গলুইবসা আলসে মনে
চমক লাগে।
ফুরফুরফুর পাল ও পাখার
সুমুখ গতি-
শাপলার বন, নেয়ের বউটি
মানল নতি।
'পালের নাও, এ কোন ধারা
মাড়িয়ে ছোটা ?
ফড়িং কুমার, হুজুগী ব্যাঙ
দেবোই খোঁটা
'দোহাই থামো, কী চাও বলো
চৈত্র হাতীর শুঁড়-
বালির পোকা দারুণ ধোঁকা
নষ্ট আখের গুড়-
চৈতপরবে নদীর পাড়ে
নানা উপাখ্যান-
কিছু না চাও, একটু চেখো
মিষ্টি রসের পান।।
রং পরিক্রমা
কেউ কি জানে, বুঝলো মানে
এক আকাশে রং কতোনা ফোটে-
এই না দেখলে টুকরো হৃদয়
রক্তমাখা টাটকা লাল ঃ
এই তো নীল কাকের ডিম
বিষণ শীতের তাড়ায় বিকল
হন্যে হাঁসের পাল।
আবার কখন মুখটি হাঁড়ি
কান্না সজল মুখ

পৌষালী মাঠ মুখটি পোড়া
গনগনে চোখ আগুন সর্বভুক।

মাঠের ফ্যাসাদ

কেউ কি জানে, বুঝলো মানে
ন্যাংটা ছেলে হোগলা বনের থেকে
কী মজা পায় মাঠের ফ্যাসাদ দেখে ঃ
বাহাদুর কে চরকি ঘোরায় লাঠি,
মাঠ-কাঁপানো, ধূল-ওড়ানো কণ্ঠে ছাড়
হাঁক।
একটু পরেই হুকুম হালুম, রাখ বেটারা রাখ।
এক পলকে থামলো খেল, মুখটি কাচুমাচু-
ন্যাংটা ছেলে আকাশ-পড়া অবাক
মাঠ-আসরে খেল দেখালো যারা,
দুইহাতজোড়া, কোমরবাঁধা হারলো শেষে
তারা।
একটু মধু?
পেছন থেকে হদ্দ ডেকে
নেয়ের বধূ।।

চৈত পরবের মেলা

নদীর পাড় যেখানে উঁচু
অশথ ছায়ায় ঘেরা-
রাতারাতি কখন সেথায়
পড়লো তাঁবু, উঠলো এত ডেরা।
চৈত পরবের মেলা,
হরেক রকম খেলা।
দেখবে তোমরা এসো ঃ
মাথায় যদি চরকি ঘোর
ভিড়ে এসে মেশো।
ভিড়ের ঠেলা চ্যাপ্টা কলা

ভন্ ভন্ ভন্ পাঁখা-
ময়রামিষ্টি মণ্ডামিঠাই
সন্তাদরে চাখা।
রাহাপুতুল ছোট্ট কনে
লজ্জাবতী মেয়ে,
খোকনমণি বায়না ধরে
অনেকগুলো চেয়ে।
সাপের খেলা বানর খেলা
ডুগডুগি আর বাঁশী-
হরেক খেলার হুল্লোড়েতে
মিশল কখন আসি।
যাদুর ভেল্কি, গণক কল্কী
ভানুমতীর খেল-
একটি ভুলে দুইবার নাকি
পরীক্ষাতে ফেল্।

তিতাস একটি নদীর নাম-এর পোস্টার

পোস্টার শিল্পী : আব্দুস সবুর

তিতাস একটি নদীর নাম-এর স্থিরচিত্র
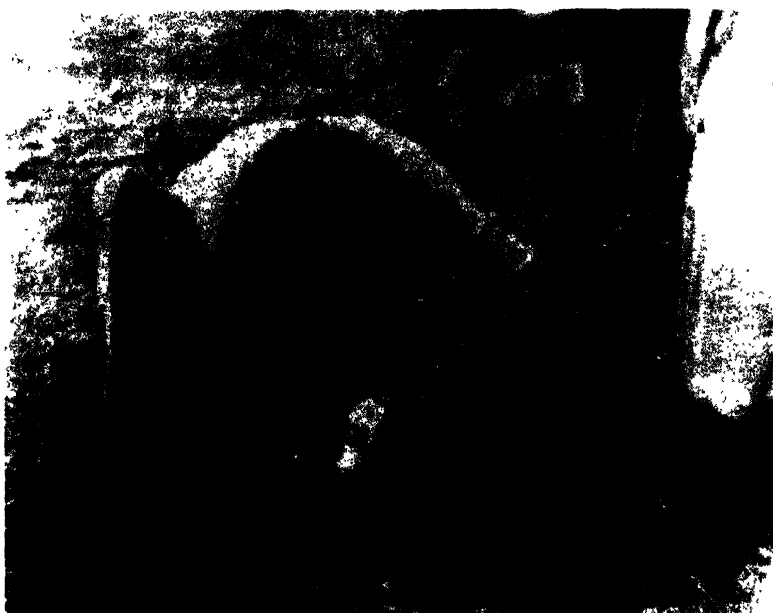
ঋত্বিক ঘটক ও 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর
স্থিরচিত্র গ্রাহক সুনীল আমিন
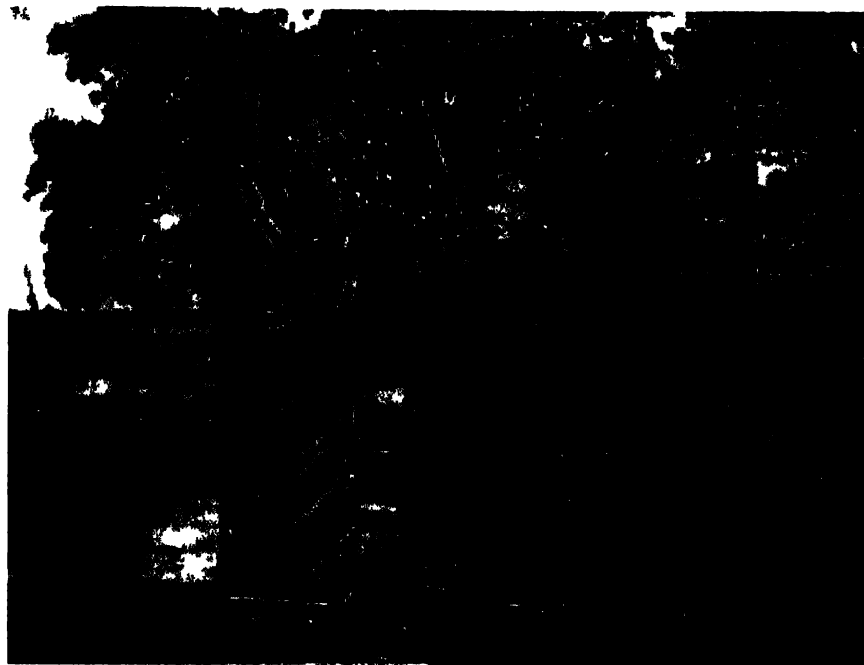
তিতাস একটি নদীর নাম ও ঋত্বিক ঘটক : ফিরে দেখা

তিতাসের হাওয়া বৈচিত্রের হাওয়া

বেবী ইসলাম

(সা : চিত্রালী প্রতিনিধি)

পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিটি এদেশে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি বিদগ্ধ মহলে সুখ্যাতি পেয়েছিল। 'অযান্ত্রিক', 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণরেখা' শ্রী ঘটকের এক একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

আজ বাংলাদেশে ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের কাহিনী নিয়ে এ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক স্বয়ং। কাহিনীটি ছাপার অক্ষরে কাহিনীকার দেখে যেতে পারেন নি। তার আগেই তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তিতাসের সৃষ্টির পেছনে যাঁদের সহযোগী হাত অক্লান্তভাবে কাজ করেছে তাঁরা সবাই এদেশেরই শিল্পী-কলাকুশলী। ছবিটির মুক্তি লগ্নে ছবির চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলামের সঙ্গে তিতাস প্রসঙ্গে কিছু আলাপ হয়েছিল। বেবী ইসলাম অভিজ্ঞ ও প্রবীণ চিত্রগ্রাহক হিসেবে চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়া থেকেই ছবির জগতের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন।

প্রশ্ন . বর্তমানে ধুম-ধারাক্কাপূর্ণ ছবির হিড়িকে 'তিতাস' দর্শকদের কাছে কতটুকু নতুন উপাদান নিয়ে আসছে?

উত্তর : 'তিতাস' দর্শকদের একঘেয়ে ক্লান্ত চোখকে বৈচিত্রের আস্বাদ দেবে। এটা একটা ব্যতিক্রমধর্মী ছবি। দর্শক এ ছবি দেখে আনন্দ পাবে। তিতাসের তীরে বিচিত্র জীবনযাত্রার বাস্তব ছবিগুলো দর্শকদের মনে দাগ কাটবে।

প্রশ্ন : পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে কাজ করে আপনার অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলুন।

উত্তর : 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণরেখা'-র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক সুদীর্ঘ বার-তের বছর হাত গুটিয়ে বসে থেকে যে সময়টি হারিয়ে ফেলেছিলেন 'তিতাস'-এর মাঝে শ্রী ঘটক সে সময়টিকে আবার ফিরে পেয়েছেন বলে আমার ধারণা। বাংলাদেশের চিত্র গ্রাহকদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম একজন ভাল চিত্রপরিচালকের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।

প্রশ্ন : 'অযান্ত্রিক', 'কোমল গান্ধার' এবং 'সুবর্ণরেখা'র পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে বিদগ্ধ মহল 'তিতাস'-এর মাঝে খুঁজে পাবেন কি?

উত্তর : কিছু কিছু। জবাবটা আপেক্ষিক। ঋত্বিক ঘটক নিজেই বলেছেন 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিটি নাকি তাঁর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। অথচ এ ছবিটি যদি বিদগ্ধ মহলে সুখ্যাতি পেয়ে থাকে, 'তিতাস'ও সেই সুখ্যাতি পাওয়ার আশা রাখে।

প্রশ্ন : অভিযোগ তুলে কোন কোন চিত্রনির্মাতা বলেছেন, 'এ দেশে ভাল ছবি করা সম্ভব নয়।' এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর : এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। একটি ভাল ছবি তৈরির পেছনে এ দেশের শিল্পী ও কলা-কুশলীদেরও যে সুনিপুণ হাত রয়েছে তা প্রমাণ হবে 'তিতাস'-এর মুক্তির পর।

প্রশ্ন : 'তিতাস'-এর চরিত্রগুলোতে তারকা প্রথা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু প্রধানাংশ চরিত্রগুলোতেই দেখা গেছে নামী দামী তারকারা রয়েছেন। এর কারণ কি?

উত্তর : ছবির স্যুটিং তাড়াতাড়ি শুরু হওয়ার তাগিদ ছিল। সম্পূর্ণ নতুন শিল্পী খোঁজার জন্যে দীর্ঘ সময় নেয়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তবু বেশ কিছু নতুনদের সমাবেশ এ ছবিতে দেখা যাবে।

প্রশ্ন : পরিচালক ঘটকের সঙ্গে কাজ করে তাঁর কোন দিকটা আপনার ভাল লেগেছে?

উত্তর : তাঁর সৃষ্টি, তাঁর কাজকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু কাজের আড়ালে বোহিমিয়ান অগোছালো ঋত্বিক ঘটককে চিনতে গেলে মন মাঝে মাঝে চমকে উঠে। মানুষ ঋত্বিক ঘটক তাই মাঝে মাঝে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ অস্থির থাকেন। তাই মাঝে মাঝে মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের ভারসাম্যও তিনি হারিয়ে ফেলেন।

প্রশ্ন : আজকের প্রমোদ ছবির ভিড়ে তিতাসের প্রযোজক এ ছবির পেছনে এত বড় ঝুঁকি কেন নিয়েছেন? এ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

উত্তর : ঋত্বিক ঘটকের অন্যান্য ছবি দেখে এবং সৃজনশীল পরিচালক হিসেবে শ্রী ঘটককে ছবিতে পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্বভাব দিতে পেরে প্রযোজক নির্লিপ্ত মনে এ ছবির পেছনে এত বড় ঝুঁকি কেন নিয়েছেন? এ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা।

প্রশ্ন : তিতাসকে যদি দর্শক স্বাগত জানায় আগামীতে আমাদের চিত্র নির্মাতারাও কি এ ধরনের ছবি করতে সাহস পাবেন?

উত্তর : তিতাস দর্শকদের কাছে সমাদর পেলেও সহসা এ দেশের পরিচালকরা এ ধরনের ছবি তৈরি করতে সাহস পাবেন না বলে মনে হয়। কারণ প্রমোদ ছবির গড্ডালিকা প্রবাহে এ দেশের চিত্র নির্মাতাদের বাণিজ্যিক মনটাকে সংযত করতে সময় লাগবে অনেক দিন।

তিতাসের প্রযোজকের সঙ্গে কিছুক্ষণ

খালেদ হায়দার ও বাকির আবদুল্লাহ

১৯৭৩ পর্যন্ত ঋত্বিকের সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'সুবর্ণরেখা'। মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬৫তে। দীর্ঘ আট বছর আর কোন ছবি নাই। মাঝে অবশ্য '৬৮তে একবার 'রঙ্গের গোলাম' নামে একটা ছবি বানানোর চেষ্টা নিয়েছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্তই।

১৯৭৩ সালে এই বাংলাদেশের মাটিতে এসে তৈরি করলেন 'তিতাস একটি নদীর নাম'। '৬৫ থেকে '৭৩ তাঁর জীবনের একটি বিতর্কিত সময়। তাঁর স্বদেশের মাটিতে (ভারত) এ সময়ে কেউ এগিয়ে আসেনি তাঁকে দিয়ে ছবি তৈরী করাতে। স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে এগিয়ে এলো একজন তরুণ প্রযোজক তারুণ্যের উদ্দামতা নিয়ে। প্রচণ্ড এক ঝুঁকি নিয়ে। এ প্রযোজকের নাম হাবিবুর রহমান খান। এর আগে জীবনে কখনো চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেন নি। জীবনের প্রথম প্রযোজিত ছবির পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটক। যিনি জীবনে বহু ছবি শুরু করে শেষ করেন নি। কিন্তু 'তিতাস' শেষ হলো। মুক্তি পেল। এই তিতাসের প্রযোজকের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার আমরা এখানে পত্রস্থ করছি।

প্রশ্ন : মিঃ খান, 'তিতাস' আপনার প্রথম ছবি এবং এর আগে ছবি তৈরির কোনো রকম অভিজ্ঞতাই আপনার ছিলো না। শুরুতেই আপনি ঋত্বিক ঘটকের মতো একজন চলচ্চিত্রকারের পরিচালনায় ছবি তৈরিতে আগ্রহী হয়েছেন কেন আর সে সময়ে তাঁর সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানতেন ?

উত্তর : দেখুন, চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমার আগ্রহ স্কুল জীবন থেকেই ছিলো। চলচ্চিত্র সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকাও খুব পড়তাম। ঋত্বিক ঘটকের সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন রচনা পড়ে আমি তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছিলাম। সহপাঠীদের সাথে শৈল্পিক চলচ্চিত্র নিয়ে আলাপ-আলোচনার সময় তারা যদিও সত্যজিৎ রায়কে গুরুত্ব দিতো, তবু আমি এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমি যে পথে চিন্তা করি তিনি সেই পথেরই চলচ্চিত্র নির্মাতা। মজার ব্যাপার হলো তার সাথে আমি ছবি তৈরির কথা ঠিকঠাক করেছি তাঁর কোন ছবি না দেখেই। যাই হোক, আমার বন্ধুরা সত্যজিৎ রায়কে এ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালকের সম্মান দিলেও আমি ঋত্বিকের লেখা এবং ঋত্বিক সম্পর্কিত বিভিন্ন রচনা পড়েই, অদ্ভুত ব্যাপার যদিও। কলেজ জীবন থেকেই আমার বিশ্বাস

ছিল যে, বাংলাদেশ একদিন স্বাধীন হবে এবং তারপর আমি ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় ছবি তৈরি করতে পারবো আর সেটাই হবে সাক্ষাৎকার। আমার প্রথম ছবি। উনিশ শ' বাহাত্তুরের একুশে ফেব্রুয়ারির একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারত থেকে আগত বিভিন্ন শিল্পীদের মধ্যে গায়ক শ্যামল মিত্র আর বরুণ বকশী নামে একজন সংস্কৃতিপাগল লোকের সাথে আমার আলাপ হয়েছিলো। শ্যামল মিত্রের কাছে আমি শুনলাম ঋত্বিক ঘটক ছবি তৈরির নামে প্রযোজকদের কিভাবে ভুগিয়ে থাকেন। সেটাকেও আমি একটা চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলাম। আমার আগ্রহ দেখে বরুণ বকশী আমার আর ঋত্বিক ঘটকের যোগাযোগে মধ্যস্থতা করতে রাজী হলেন। তিনি কোলকাতায় গিয়ে সেখানকার গাজা পার্ক থেকে ভীষণ রকম অসুস্থ ঋত্বিককে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে নিয়ে উঠালেন, কারণ ঋত্বিকের দেখাশুনা করবার মতো কেউ তখন ছিলো না। খবর পেয়ে আমি শ্রীঘটকের সাথে ছবি তৈরির ব্যাপারে আলাপ করলাম। আমি ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় এমন একটা ছবি তৈরিতে আগ্রহী ছিলাম যাতে বাংলাদেশের রূপ যথার্থ ভাবে ফুটে উঠবে। সে জন্যই অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের কাহিনী নির্বাচন করা হয়। সে উপন্যাসটার স্বত্ব তখন একটা ট্রাস্টের হাতে ছিলো। এর আগে কয়েকজন চলচ্চিত্র নির্মাতা উপন্যাসটির কাহিনী নিয়ে ছবি করতে চেয়েও ট্রাস্ট্রের অনুমতি পাননি। কিন্তু ঋত্বিকের বেলায় ট্রাস্ট্রের কর্তৃপক্ষ আপত্তি করে নি। ছবি তৈরির সময় ঋত্বিকের একটা অদ্ভুত স্বভাব আমি লক্ষ করেছিলাম। লোকেশনে গিয়ে তিনি যে সত্যিকারের তিতাসের কাছে আছেন এ অনুভূতিটাকে গভীর করবার জন্যে প্রায়ই তিনি আঁজলা ভরে তিতাসের পানিতে মুখ মুছে নিতেন।

প্রশ্ন : ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় ছবি তৈরির পর তাঁকে পরিচালক হিসেবে কতখানি সহযোগী বা অসহযোগী বলে আপনার মনে হয়েছে?

উত্তর : তিতাসের কাজে হাত দেবার আগেই আমি শুনেছিলাম, ঋত্বিক ঘটক ছবি তৈরির সময় বিভিন্নভাবে প্রযোজকদের ভীষণরকম অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়ান। কেউ কেউ এমন বলতেন যে, তাঁকে দিয়ে কোনো মানুষের পক্ষে ছবি তৈরি করানো সম্ভব নয়। প্রযোজকদের সাথে এমনি অসহযোগিতার কারণে তিনি 'তিতাস' তৈরির আগের দশ বছর সময় ধরে কোনো ছবি তৈরি করতে পারেননি। 'তিতাসের' কাজ চলবার সময় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ছবির কাজে তাঁর প্রয়োজন মিটিয়ে চলতে, তবুও তিনি যেন অনেকটা খামখেয়ালীর বশে, কখনও বা প্ল্যানিং এর অভাবের কারণে, কখনও আমাকে আর কখন পুরো ইউনিটকে অনেক রকম অসুবিধায় ফেলেছেন। যেমন ধরুন, একদিন আশি জনের ইউনিট নিয়ে আমরা আরিচার লোকেশান শুটিং-এ গিয়েছিলাম। যাবার আগে, সেখানে পৌঁছেও শ্রীঘটকের কাছে জানতে চাইলাম, তিনি সেখানে শুধু সেদিনেই শুটিং করবেন, না একনাগাড়ে কয়েক দিন। উত্তরে তিনি নির্দিষ্টভাবে কিছুই বলতে পারলেন না। এমনিভাবে পুরো ইউনিটকে একটি অনিশ্চিত রেখে হঠাৎ করে.সেদিনেই প্যাক-আপ করলেন।

প্রশ্ন : একজন ভারতীয় চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ একবার ঢাকায় এসে বলেছিলেন, ঋত্বিক ঘটক মূলত একজন ভালো চলচ্চিত্রকার হলেও তিনি নিজের ছবির প্রযোজক নন। ছবি তৈরির সময় তিনি বিভিন্ন ভাবে এতো বেশি সমস্যার সৃষ্টি করেন যে, নিতান্ত জেদী বা ফেঁসে যাওয়া প্রযোজক ছাড়া আর সবাই তাঁকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন, যে কারণে ঋত্বিকের বেশীরভাগ ছবিই অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। 'তিতাস' তৈরির সময় কি এমনি কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো ?

উত্তর : হ্যাঁ, ব্যাপার ঠিক তাই। 'তিতাস' তৈরিতে আমি হাত দিয়েছিলাম শুধুমাত্র শিল্প সৃষ্টির জন্যেই। টাকা খরচের বেলায় কোনো সীমাবদ্ধতা ছিলো না, আর এ টাকা যে ছবিটার ব্যবসায়িক ব্যর্থতার জন্যে ফেরত পাওয়া যাবে না তাও জানতাম। তার পরেও তাঁর খামখেয়ালীপনা, অতিরিক্ত মদ খাওয়া এসব ব্যাপার যন্ত্রণার মতো লাগতো। কখনও তিনি পুরো ইউনিটসহ লোকেশনে গিয়ে কোনো কাজ না করেই ফিরে এসেছেন। এ সব করে যে বাড়তি খরচ তিনি করিয়েছিলেন তার পরিমাণও বড় কম নয়। কাজের সময় তিনি ভীষণরকম মনোযোগী এবং কাজের প্রতি একাত্ম হয়ে থাকতেন, তবু ও মাঝে মাঝেই খামখেয়ালী হয়ে উঠতেন। ছবি তৈরির জন্যে যেসব জিনিসপত্রের দরকার ছিলো, তিনি আগেই তার একটা বড় তালিকা তৈরি করে দিয়েছিলেন। সে তালিকা অনুসারে আমি ব্যবস্থাও করেছিলাম। তার পরেও কখনো কখনো তিনি হয়তো একদিনের নোটিশেই এমন সব জিনিষের অর্ডার দিয়ে বসতেন যার ব্যবস্থা করতে আমার আর ইউনিটের লোকজনের প্রাণান্ত হ'তো। এমনকি তাঁকে সরবরাহ করা কোনো কোনো জিনিষ কয়েক দিন পরেই খুঁজে পাওয়া যেতো না।

প্রশ্ন : তাঁব বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ আছে যে, বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসের কারণে তিনি মনে করতেন, প্রযোজক যেহেতু ধনী ব্যাক্তি, তাকে যতো বেশী খরচা করানো যায়, তাতেই এক ধরনের ভালো কাজ করা হয়। এমনি ধারণার জন্য তিনি তাঁর প্রযোজকদের অনেক সময় এমন সব খরচে বাধ্য করতেন, যা ছবি নির্মাণের বা তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের বাইরে, আর তাই করে ছবির নির্মাণ ব্যয় অকারণে বাড়িয়ে দিতেন। আপনার বেলায় কি তিনি এমনটা করেছেন ?

উত্তর : হ্যাঁ, প্রচুর করেছেন। কোনোদিন হয়তো চায়নিজ রেস্তোরাঁয় গিয়ে অনেকগুলো আইটেমের অর্ডার দিয়ে অল্প খেয়েই উঠে পড়লেন। অথবা ধরুন লোকেশনে গিয়ে শুটিং না করে ফিরে আসা। এ ধরনের ঝামেলার জন্যে ছবির নির্মাণ ব্যয় কম করেও বাড়তি দু'লাখ টাকা যোগ করতে হয়েছে। আর এ নিয়ে কখনো অভিযোগ তুললে তিনি বলতেন, 'গরীব মানুষদেরকে কিছু পাইয়ে দিলাম, বুর্জোয়ার কিছু গেল।'

প্রশ্ন : ঋত্বিকের ব্যক্তিজীবন তাঁর কর্মজীবনকে ব্যাহত করতো বলে আপনার মনে হয় ?

উত্তর : ভীষণভাবে করতো। আমার মনে হয়, তাঁকে দিয়ে ছবি তৈরী করানোর ব্যাপারটাকে যদি আমি চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ না করতাম, তা হলে এ ছবির নির্মাণ কখনো

শেষই হতো না, তাঁর খামখেয়ালীপনার জন্যে। তিতাসের প্রথম পর্যায়ের শুটিং শেষ হবার পর তিনি কোলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে আমি যখন কোলকাতায় গেলাম, তিনি আমাকে একেক দিন একেক সময় একেক জায়গায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে থাকলেন। একবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন 'আগামীকাল ভোর পাঁচটায় গাজা পার্কে'। গিয়ে দেখি সেই ভোরবেলাতেই তিনি মাতাল হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। তাঁর সাথে যদ্দিন কাজ করেছি তাঁকে সামলে রাখবার জন্যে দিনরাত তাঁর পেছনে লেগে থাকতে হতো আমাকে। কাজের ফাঁকে যখন তিনি কোলকাতায় চলে যেতেন তখন তাঁকে সামলাবার ভার ছিলো আমার সেখানকার বন্ধু-বান্ধবের ওপর। কোনো কোনো সময় তাঁর সাথে আলোচনা করে শুটিং এর সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে তাঁর ঢাকায় আসবার প্লেনের টিকেট যোগাড় করে ফেলবার পর তিনি সেদিন ঢাকায় আসতে রাজী হতেন না। এদিকে সবকিছু তৈরি থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাজ পড়ে থাকতো। তাঁকে কাজে ফিরে আসতে রাজী করবার জন্যও অনেক সময় দিনরাত তাঁর পেছনে লেগে থাকতে হতো।

প্রশ্ন : তাঁর খামখেয়ালীপনা আর ব্যক্তিজীবনের প্রভাবে তাঁর কাজের গতি কি খুব ধীর হয়ে যেতো?

উত্তর : সাংঘাতিকভাবে। তিতাসের কাজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো এক বছর সময় নিয়েছিলো। শুরু করেছিলাম বাহাত্তুরের জুলাই মাসের প্রথম দিকে, রিলিজ হয়েছে তিয়াত্তুরের ২৭শে জুলাই। সে এক বছর ঋত্বিককে কাজে ধরে রাখবার জন্য আমাকে অন্য সব কাজ থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। এর পরেও কোলকাতার অনেকে ছবিটার কাজ শেষ করতে পারায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তবে শ্রী ঘটক ছবিটার প্রথম পর্যায়ের শুটিং খুব খেটে এবং প্রাণ দিয়ে করেছিলেন। এরপর থেকেই যখন আমি ছবিটার নির্মাণে ভালোভাবে জড়িয়ে পড়েছি, তাঁর খামখেয়ালীপনা চরম আকার নিয়েছিলো।

প্রশ্ন : অন্যান্য দিক, যেমন ধরুন, সহকর্মীদের কাছ থেকে কাজ আদায়ের বেলায় তিনি কতোখানি পারদর্শী ছিলেন? আর তাঁদের সাথে তিনি কেমন আচরণ করতেন?

উত্তর : কাজ আদায়ের বেলায় তিনি খুবই পারদর্শী ছিলেন। ছবির জন্যে তাঁর প্রয়োজন তিনি ঠিকই বুঝে নিতেন। সহকর্মীদের সাথে আচরণের বেলায় মাঝে মাঝে তিনি কেমন যেন আনব্যালেন্সড হয়ে পড়তেন। তাঁর স্ত্রীর সাথে আলাপ করে জেনেছিলাম, শ্রী ঘটক ডাবল পারসনালিটির, দ্বৈত মানসিক সত্তার রোগে ভুগতেন। সম্ভবত সে জন্যেই এটা হতো। কখনো মদ খাওয়া নিয়েও তিনি রাগারাগি বাঁধাতেন। আমি তাঁকে মদের কোটা করে দিয়েছিলাম। দুপুরে তিন পেগ রাতে ছ'পেগ। তবু তিনি সব সময়ই মদ খেতে চাইতেন।

প্রশ্ন : শ্রী ঘটক সহকর্মীদের কর্মদক্ষতায় কতোখানি ভরসা করতেন বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আমাদের এখানকার পরিবেশ তাঁর জন্য ছিলো নতুন। তাই প্রথম দিকে তিনি দ্বিধার ভেতর ছিলেন। কিন্তু প্রথম পর্যায়ের শুটিং-এর পর আমাদের ইউনিটের ওপর তাঁর বেশ কনফিডেন্স এসে যায়। যে জন্য পরবর্তী সময়ে তিনি ক্যামেরাম্যান বেবী ইসলামের কাজের তদারকির খুব একটা প্রয়োজনবোধ করতেন না। তিতাসের সম্পাদক বশীর হোসেনকেও তিনি তাঁর অনুপস্থিতিতে সম্পাদনা করবার লিখিত অনুমতি দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : কাজের বেলায় সহযোগীদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিলো কি?

উত্তর : এ ব্যাপারটায় তাঁর তেমন মাথাব্যথা ছিলো না। তাঁর যে কাজ দরকার সেটা আদায় করাতেই তিনি বেশি মনোযোগী ছিলেন।

প্রশ্ন : তিতাসের ক্যামেরাম্যান, সম্পাদক, সঙ্গীত পরিচালক এদের নির্বাচনে কার ইচ্ছেকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিলো, আপনার না ঋত্বিক ঘটকের?

উত্তর : ঋত্বিক ঘটকের সাথে আমার এমনি কথা হয়েছিলো যে, তিতাস হবে পুরোপুরিভাবেই বাংলাদেশের ছবি এবং পরিচালক ছাড়া এর আর সমস্ত শিল্পীকলাকুশলী থাকবেন বাংলাদেশ থেকে। তারপরে শ্রী ঘটক যখন ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খানকে সঙ্গীত পরিচালক নির্বাচন করলেন, আমি আপত্তি করেছিলাম। ঋত্বিক বললেন যে, ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খানকে নিলে তাঁর অনেক সুবিধা হবে, কারণ তাঁর আগের ছবিগুলোও তাঁরা এক সাথে কাজ করেছেন। আমি শিল্পের স্বার্থে সেটা মেনে নিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : চলচ্চিত্রের টেকনিক্যাল দিক সম্পর্কে, আপনার ধারণা অনুসারে ঋত্বিক কতোখানি জানতেন?

উত্তর : এ ব্যাপারে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিলো। ফিল্মের এ টু জেড একেবারে মুখস্থ। ক্যামেরা থেকে ল্যাবরেটরি পর্যন্ত এমন কোনো ব্যাপার নেই যা তিনি জানতেন না।

প্রশ্ন : ছবি পরিচালনায় তিনি যতোদিন ছিলেন, আপনার স্মৃতিতে কোন স্মরণীয় ঘটনা আছে ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে?

উত্তর : আসলে সবটাই স্মরণীয়—প্রতিটি মুহূর্তই স্মরণীয় যতোদিন ছিলাম। এতো বেশি খামখেয়ালী করতেন যা ঠিক বলার মতো নয়। প্রথমতো তাঁর সাথে সাথেই থাকতাম। পরবর্তীতে লোক রাখতাম তাঁকে দেখাশোনার জন্য যখন রাতে আমি কাছে থাকতে পারতাম না। আসলে কি জানেন? উনি প্রথমে এতো অমানুষিক কাজ করতেন যা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমার মনে হয় এভাবে যদি ছবিটা শেষ করতে পারতেন তবে এ ছবি কি যে হতো? অনেকেতো ক্লাসিক ছবি বলেন তিতাসকে, আমার মনে হয় তার চাইতেও বেশি কিছু হতো। শেষ দিকে তো তাঁকে কমাণ্ড করতাম। বলতাম আমি জানি অনেক ছবিই আপনি শেষ করেন না কিন্তু আমার ছবি শেষ আপনাকে করতেই হবে। জানেনতো আমরা মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। শেষ পর্যন্ত তো ভয়ই দেখাতাম। একদিন কি হয়েছে জানেন? রাত্রে শুটিং শেষের

পর বলছেন, আমাকে মদ দিতে হবে। আমি তো মদ খাইনা— এখন মদ কোথায় পাই। শেষ পর্যন্ত এই মদের জন্য আমাকে গণিকালয়ে যেতে হয়েছিলো।

প্রশ্ন : আপনি ঘটকের ক'টি ছবি দেখেছেন?

উত্তর : চারটা। মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা, কোমল গান্ধার এবং তিতাস।

প্রশ্ন : ঘটকের ছবি হিসেবে বিশেষত তিনটে ছবি আলোচিত হয়— সুবর্ণরেখা, কোমল গান্ধার ও তিতাস। তাঁর best creation? অর্থাৎ তিতাস কে আপনি কোন গ্রেডের মনে করেন।

উত্তর : সেকেন্ড।

প্রশ্ন : বেস্ট কোনটাকে মনে করেন?

উত্তর : কোমল গান্ধার।

প্রশ্ন : তিতাস নিন্দিত ও নন্দিত হয়েছে এবং আপনি নিজেও বলেছেন দ্বিতীয়। এ ছাড়া প্রচণ্ড খামখেয়ালীপনা আপনাকে সহ্য করতে হয়েছে। এর পরও কি আপনি তিতাস করে হ্যাপী?

উত্তর : যথেষ্ট অসুবিধা, যথেষ্ট যন্ত্রণা পেলেও ছবি যখন শেষ হলো— পর্দায় দেখলাম, আমার ভালো লাগলো, আমি খুশি কেননা আমি মনে করি ছবি কালেক্টিভ আর্ট, সেহেতু আমি যখন এ ছবির প্রযোজক তখন আমারো কিছু দান এখানে আছে— আমার ইনভলবনেস আমাকে গর্বিত করেছে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে তৈরি 'মুখ ও মুখোশ' থেকে আজ পর্যন্ত 'ধীরে বহে মেঘনা' অর্থাৎ যৌথ প্রয়াসসহ যতো ছবি হয়েছে তিতাসের স্থান কোথায় বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : উপরে। অনেক উপরে। এ ছবির মানকে স্পর্শ করতে বাংলাদেশের অনেক কষ্ট করতে হবে এবং তাও যে ধরতে পারবে তাও বলতে পারি না।

প্রশ্ন : আপনি তো বেশ কিছু দিন ঋত্বিক ঘটকের সাথে ছিলেন। তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের এমন কোন দিকের পরিচয় কি পেয়েছেন যা তার চরিত্রের সামগ্রিক দোষ ত্রুটি যার মুখোমুখি আপনাকে অনেকবারই হতে হয়েছে তাকে ছাপিয়ে তাঁর মহৎ হৃদয়কেই প্রতিষ্ঠিত করে?

উত্তর : এটাতো খুব স্বাভাবিক কেননা ছবি যখন পর্দায় দেখেছি তখনই সব ভুলে গেছি— ছবি তৈরির সময় যত কষ্টের— অশান্তির কারণই হোক না কেন।

প্রশ্ন : ছবির সম্পাদনার ব্যাপারে বিতর্ক দেখা গিয়েছিলো আসলে ব্যাপারটি কি?

উত্তর : ছবিটা মোটামুটি সম্পাদনা তো তিনিই করেছিলেন, পরে একটু কারেকশনের যখন বাকি ছিল তখন তাঁকে যক্ষ্মা হাসপাতালে চলে যেতে হয়। তিনি অত্যন্ত ভেঙ্গে

পড়েছিলেন। আমাকে বললেন, 'দেখ হাবিব, আমি হয়তো আর ফিরতে নাও পারি। তিতাস আমার অনেক সাধনার ছবি, তুই এভাবেই রিলিজ করে দে একটু ঠিকঠাক করে'। আমি বললাম, 'আপনি যদি বলেন তা আমি করতে পারি, কিন্তু আপনার ছবিতে তো কেউ হাত দিতে চাইবে না আর যে দেবে তাকেই ভবিষ্যতে কথা শুনতে হতে পারে। তবে আপনি যদি লিখিত অনুমতি দেন তবে করতে পারে'। তিনি লিখে দিলেন বশির হোসেন এটি সম্পাদনা করবে।

প্রশ্ন : পরবর্তীতে বশীর হোসেন বিবৃতি দেন 'ছবি আমি এডিট করিনি', এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

উত্তর : বশীর হোসেন full ok করলেই ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। এখন যদি তিনি বলেন, কি জন্য বলেছেন, কি করে বলি, টেকনিসিয়ানদের ব্যাপার।

প্রশ্ন : পরে তো আবার re-editing হয়েছিলো? উনি ঢাকায় আসার পর।

উত্তর : সেটা নমিনাল ব্যাপার। আপনারা তো ছবিটা দেখেছেন। ছবির মূল আবেদনের উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করেনি।

প্রশ্ন : আপনি ছবি করার সময় ঋত্বিক বাবুকে যতটুকু দেখলেন তারপর তাঁকে কোন্ শ্রেণীর পরিচালক বলে মনে হয়।

উত্তর : তুলনাবিহীন। উপমহাদেশের কেউই তাঁর পাশে দাঁড়াতে পারবে না। বিশ্বের অন্যতম পরিচালক।

প্রশ্ন : ঋত্বিক ঘটকের ছবির কোন্ দিকটি আপনার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে?

উত্তর : কোন কিছু বলা— যা সরাসরি, যা ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়, কোথাও আপোষ নেই, এমনকি কারো বিরুদ্ধে কোন রাগ নেই শুধু সরাসরি বলে যাওয়া।

প্রশ্ন : এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন রাখতে পারি তা হলো এই বলার জন্য তিনি নাকি ন্যূনতম চলচ্চিত্র জ্ঞানেরও অনেক সময় পরিচয় দেন না অনেকে অভিযোগ করেন, আপনি এ প্রসঙ্গে কি বলেন?

উত্তর : চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তিনি কোন গ্রামার মানতেন না। তিনি বলতেন, যা বলতে চাই তা বোঝা গেলেই হলো। পূর্ব নির্ধারিত গ্রামার আবার কি? গ্রামার দিয়ে ফিল্ম সাক্ষাৎকার হয় না।

প্রশ্ন : মারা যাওয়ায় ব্যথিত নিশ্চয়ই হয়েছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, মারাত্মকভাবে শোকাহত।

প্রশ্ন : ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন। পারিবারিক জীবন কেমন ছিল। তাঁর স্ত্রীর সাথে—সন্তানদের সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল? আমরা জানি স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য-বিচ্ছেদ নেমে এসেছিলো ...।

উত্তর : হ্যাঁ তাঁর স্ত্রী-সন্তানরা আলাদা হয়ে গিয়েছিলো। একটা স্কুলে মাস্টারি করতেন—আসলে উনার খামখেয়ালীপনা উনার ব্যক্তিগত জীবনকেও যেমন তেমনি চলচ্চিত্র জীবনকে অনেক বিপর্যস্ত করেছে।

প্রশ্ন : আমরা একটা কথা শুনেছি উনি বিভিন্ন পুরস্কারের যে সব মেডেল পেয়েছিলেন সে সব বিক্রি করে দিতেন—এ সব কি সত্য?

উত্তর : হ্যাঁ, চেষ্টা করেছেন। যেমন পদ্মশ্রীটা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি।

প্রশ্ন : 'তিতাস' বাচসাস কর্তৃক শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসাবে পুরস্কৃত না হবার পর আপনার সাথে কি তাঁর দেখা হয়েছিলো?

উত্তর : না ওনার সাথে আমার দেখা হয় নি।

প্রশ্ন : এ নিয়ে তো এখানে খুব হৈ চৈ হয়েছিলো। আপনি ওনার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কিছু জেনেছিলেন?

উত্তর : না। আসলে আমি ব্যক্তিগতভাবে এ রায় মেনে নিতে পারিনি। আমার ভালো লাগেনি— দুঃখ পেয়েছিলাম এবং এ সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

প্রশ্ন : তিতাসের পরে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি— যেগুলোকে মোটামুটি ভালো ছবি বলা হয়, সেগুলো দেখলে দেখা যায় সেগুলো ভীষণভাবে তিতাসের প্রভাবিত— মনে হয় কেউ যেন দুর্বল হাতে তিতাসকে অনুসরণ করে চলেছেন। এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

উত্তর : এটা অবশ্যই খারাপ। খুব খারাপ। যেমন ইদানিং ১৬ লেন্সের ব্যবহার বেড়ে গেছে তিতাসের পর—আগে যে ব্যবহার হয়নি তা নয় তবে এখন যেন একটু তীব্র হয়ে গেছে। শুধু ব্যবহার করলেইতো হয় না তার ব্যবহারের যৌক্তিকতার দিকে একটু দৃষ্টি রাখতে হয়।

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ছবির লোকেশানে একদিন

মনোয়ার আহমেদ

রাত প্রায় শেষ। দু’টো গাড়ি বোঝাই করে কলাকুশলী ও শিল্পীসমেত রওয়ানা হলাম আরিচা ঘাটের দিকে। ভোরের শীতল হাওয়ায় মনে হচ্ছিল শীত আগত প্রায়। ভালই লাগছিল বহুদিন পরে এই রকম একটা সকাল পেয়ে।

এক গাড়িতে আমি, কবরী চৌধুরী, রোজী, পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটক, ক্যামেরাম্যান বেবী ইসলাম ও প্রযোজক হাবিব সাহেব। অন্য একটি গাড়িতে ছিলেন সুপ্রিয়া ও অন্যান্য কলাকুশলীরা। আমাদের দু’টি গাড়িই অন্ধকার ভেদ করে দু’টো ফেরী পার হয়ে ছুটে চলল আরিচা ঘাটের দিকে। বেলা ছ’টা নাগাদ আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছল আরিচা ঘাটে।

এসে দেখি এখানে শুধু আমরা একা নই। অনেকেই আছেন। এদেরকে পূর্বপ্রাণ কথাচিত্রের প্রোডাকশন কন্ট্রোলার একটি বাসে করে আগেই নিয়ে এনেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন রহিমা খালা, সবিতার মা, মেসবাহউদ্দিন, নতুন নায়ক প্রবীর মিত্র, আবদুল মতিন এবং আরও কয়েকজন একস্ট্রা শিল্পী। ইউনিটের লোকসংখ্যা সব মিলিয়ে ছিল মোট চুয়ান্ন জন।

সবাই সকাল বেলার নাস্তা নিয়ে ব্যস্ত। একমাত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ছাড়া। পরিচালক আরিচা নেমেই তাঁর সহকারীদের বুঝিয়ে দিলেন বিভিন্ন কাজ। সহকারীরা নিজ নিজ কাজ বুঝে নিয়ে চলে গেলেন। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক মেকআপম্যান শাহজাহানকে নির্দেশ দিলেন মেজবাহ, মতিন ও ছোট শিল্পীকে মেকাপ করার জন্য। আর নিজে স্ক্রীপ্ট নিয়ে বসলেন কবরী ও রোজীকে দৃশ্য ও চরিত্র বোঝাবার জন্য। পরিচালক যখন কবরী ও রোজীকে চরিত্র বোঝাচ্ছিলেন তখন ওই ঘরে কারও প্রবেশ ছিল নিষেধ। প্রডাকশনের সবাই নতুন। তাই কাকে কিভাবে সমাদর করতে হবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আমি দেখলাম এইভাবে বসে থাকলে সকালের নাস্তা ভাগ্যে জুটবে না। কি খাওয়া যায়—কারণ সব কিছুতেই তো ভেজাল। ঠিক করলাম আজ সকালে বাঙ্গালী নাস্তা করবো।

আমি আরিচা ঘাট থেকে আস্ত দু’টো নারকেল কিছু মুড়ি ও বাতাসা কিনে নিয়ে মেকাপ রুমে গেলাম। মেকাপ রুম হচ্ছে আরিচার ডাক বাংলো। নারকেল ভেঙ্গে মুড়ি ও বাতাসা মিশিয়ে কবরী ও রোজীকে জিজ্ঞেস করলাম মুড়ি, নারকেল ও বাতাসা চলবে নাস্তা

হিসেবে? তারা সবাই রাজী হয়ে নাস্তা খাওয়া আরম্ভ করে দিলেন। কি আর করা যাবে এ ছাড়া আর উপায়ও ছিল না।

পরিচালক ঋত্বিক ঘটক লুঙ্গি পরে ও খালি গায়ে কবরী ও রোজীকে ছবির কিছুটা কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। একজন সহকারী এসে খবর দিলেন—দাদা সব রেডি। পরিচালক বললেন, যাও কন্টিনিউটি দেখে শিল্পীদের কস্টিউম পরিয়ে দাও। এদিকে ক্যামেরাম্যান বেবী ইসলাম ক্যামেরা নিয়ে অপেক্ষা করছেন নদীর ঘাটে। ক্যামেরাম্যানকে পরিচালক বললেন—তুমি আর কবরী, মতিন, মেজবাহ ও এই বাচ্চাসহ এই নৌকায় আমার সঙ্গে ওঠ আর অন্য নৌকায় রিফ্লেক্টরসহ সহকারী ও লাইট বয়দের ওঠাও।

তিতাস-প্রসঙ্গ : প্রাসঙ্গিক তথ্য

নৌকার ছইয়ের নীচে বসে আছেন রাজার ঝি মানে কবরী, অনন্ত (সফিক) মানে কবরীর ছেলে, নিতাই (মেজবাহ) গৌর (মতিন)। অনন্ত রাজার ঝির একমাত্র সন্তান। মেজবাহ উদ্দিন তার আশ্রয় দাতা, অনন্ত তার খেলার সামগ্রী নিয়ে আপন মনে নৌকার পাটাতনের উপর সব কিছু সাজিয়ে চলেছে।

রাজার ঝি নীচের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। থেকে থেকে চোখ জলে ভরে আসছে। হাল বাইতে বাইতে গৌরেরও চোখ জলে ভরে উঠছে। চোখা চোখি হতেই রাজার ঝি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে। নিতাই ব্যাপারটা দেখে গৌরের দিকে তাকায়। পরিচালক নিজ হাতে ফ্রেমিং করলেন। তারপর বললেন 'বেবী টেক কর'।

ক্যামেরাম্যান শট নেওয়ার জন্য তৈরী হলেন। সহকারী পরিচালক বৈরাগী স্ক্রীপ্ট খুলে বসলেন। পরিচালকের নির্দেশ মত যথা সময়ে ক্যামেরা চালু হল, নেপথ্য থেকে স্মারকের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সহকারী পরিচালক বৈরাগী। তাকে লক্ষ করে সবাই সংলাপ বলছে। প্রথম শট এনজি। দ্বিতীয় শট ওকে। এতক্ষণ দৃশ্য চিত্রায়িত হচ্ছিল যমুনা নদীর উপর নৌকায় পাশাপাশি। দূরে নৌকা চলছে যমুনার বুক চিরে, নৌকা ভাটির দিকে যাচ্ছে।

সকাল থেকে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে ভদ্রলোক একটানা কাজ করে যাচ্ছেন লুঙ্গি পরে, খালি গায়ে। আশ্চর্যের বিষয় এতটুকুও ক্লান্তি বোধ করছিলেন না। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক একটি ব্যতিক্রম চরিত্রের অধিকারী। ঘটক একটা নাম একটা জলন্ত প্রতিভা। তিনি ইচ্ছা করলে একটা সদ্য নবজাত শিশুর কাছ থেকেও কাজ আদায় করে নিতে পারেন। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল।

বেলা প্রায় একটা থেকে দেড়টা হবে। আমি, কবরী ও রোজী একটা নৌকায় বসে গল্প করছিলাম। আর অন্য দিকে অন্যান্য শিল্পীদের শট চলছে। সকলেরই ক্ষিদে পেয়েছে। আমরা অধীর হয়ে খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি আর অন্য দিকে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক নায়ক প্রবীর মিত্রের একটা দৃশ্য চিত্রায়িত করছেন। এক সময় নৌকা থেকে বেরিয়ে দেখি

ক্যামেরাম্যান বেবী ইসলাম ও পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ক্যামেরা নিয়ে গলা পানিতে দাঁড়িয়ে আছেন, নায়ক প্রবীর মিত্র তার বাবা ও মা-র শট নেওয়ার জন্য। আমি এই সুযোগ হারাতে চাইলাম না— সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম। একটা ব্যাপার দেখে আশ্চর্য লাগল, ঋত্বিক বাবু ভেজা কাপড়ে এই রোদে দিব্বি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এক সময় খাবারের কথা শুনলাম। এক নৌকাতে বসে আছি আমি, কবরী, রোজী, সুপ্রিয়া আর সবিতার মা। আমাদের সামনে হঠাৎ কয়েক থালা ভাত, কিছু মাছ ও ডাল এল। মুখে যেই ভাত দেব সেই সময় একজন এসে বল্লেন যে ডালে ও ভাতে ব্যাঙ পরেছিল। এই কথা শুনে আমার আর খাওয়া হল না। অন্যান্যরা কোন রকমে কিছু খেলেন।

এদিকে সূর্য যাওয়ার পথে। গৌর ও নিতাই রাজার ঝিকে তার গন্তব্য স্থানে পৌছে দিয়ে গেলেন।

তাকে সান্ত্বনা দিলেন রহিমা খালা, বিধবা বাসন্তী (রোজী), মূংলী। বাসন্তী তাকে প্রশ্ন করলেন :

—ছাওয়ালের বাপ কোন হানে আছে দিদি?

—জানি না। উত্তর দিল রাজার ঝি।

—বলি মইরাতো যায় নাই?

—জানি না।

—আমি কই বিয়া তো একটা হইছিলো দিদি।

—জানি না।

—পোড়া কপাল কই এই ছাওয়ালডা আইছে একটা বিয়া অইয়াতো?

—জানি না।

—খালি জানি না জানি না জানি না। তুমিতো দিদি কিছুই জান না।

বাসন্তীর কণ্ঠে উষ্মার আভাস। রাজার ঝি মাথা নিচু করে থাকে। অনন্ত দেখছে যে দুরে গৌর নিতাই চলে যাচ্ছে। গৌর নৌকার ভিতরে বসে বসে কাঁদছে।

কবরী ও রোজী শট ওকে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঋত্বিক বাবুকে বললেন, দাদা ছ'টা থেকে আমাদের (অস্পষ্ট) স্যুটিং আছে। আমাদের তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিন। ঋত্বিকবাবু বললেন, আচ্ছা তোমরা যাও। আমরা তাড়াহুড়ো করে একটা নৌকায় এসে উঠলাম। হঠাৎ শুনি প্যাক আপ। মানে আজকের মত 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির স্যুটিং শেষ। পরিচালক এবং অন্যান্য কলাকুশলীরা আর একটা নৌকায় উঠে বসলেন। আমাদের নৌকা কিছু দূরে যাওয়ার পর নৌকার গুণ ছিড়ে যায়। দেরী হওয়াতে নৌকা থেকে নেমে নদীর পাড় দিয়ে

হেঁটে যাচ্ছিলাম আরিচা ঘাটের দিকে। আমরা হাঁটছিলাম—কবরী, রোজী, সুপ্রিয়া, রহিমা খালা ও সবিতার মা। অবশেষে সন্ধ্যার সময় এসে পৌঁছলাম আরিচা ঘাটে।

আমরা যেভাবে ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম ঠিক সেভাবেই গাড়িতে উঠে বসলাম। আমাদের গাড়ি অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলছে ঢাকার দিকে আর ঋত্বিক দা' একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছেন। অবশেষে রাত সাড়ে নয়টায় আমরা ঢাকা পৌঁছলাম।

Information Minister Inaugurates 'Titas Ekti Nadir Nam'

(Morning News, 27 July, 1973, p.6)

The premier show of 'Titas Ekti Nadir Nam' directed by Ritwik Kumar Ghatak and produced by Purbapran Kathachitra was held yesterday at a local cinema. The film was inaugurated by the Minister for Information and Broadcastin Mr. Sheikh Abodul Aziz. The Minister, in his inaugural speech, said that it was time now to start the task of nation building through the medium of film and other mass media. The Minister observed that film was not merely for recreaton. It had a vital role in imparting knowledge and ideas to the masses, he said. He expressed his delight over the Indo-bangladesh venture in the making of the film 'Titas Ekti Nadir Nam' and said that it would go a long way to strengthen the friendship of these two neighbouring countries.

Mr. Habibur Rahman a co-producer of the purbapran Kathachitra confessed the guilt of the local producers to the effect that they stole the purses of the cinema-goers by catering to them all stuff and non-sense so long. "In the name of entertainment what we did so far was, mere commercialism. There must be an end to it and we are devoted to this cause," he said.

A message from Mr. Ritwik Kumar Ghatak, the maker of this film now in convalesences in Calcutta, was read out to the audience where in he expressed his sorrow for his absence on this occasion. Mr. Ghatak also tendered his whole-hearted thanks to the artists, the producers, the technicians and the people connected with the film industry here who in his language, "rendered very valuable co-operation in every respect."

The show was well attended by the local film-circle, the press and the connoisseurs.

A Human Document :
'Titas Ekti Nadir Nam'

The moving tale of a village on the river Titas : its inhabitants–their hopes and desires causes and conflicts, superstitions and prejudices, love and desolation, rites and rituals along with a tinge of radiant ray of optimism behind an arid murky darkness–all these are combined together in a film, nay a human document, called 'TITAS EKTI NADIR NAM'.

I feel inclined to call the film a human document because it deals with the life of toiling masses, at least with a fraction thereof, adroitly.

Every shot, scene and sequence bear the masterly touch of imagination of Ritwik Kumar Ghatak. Ustad Bahadur husain Khan's music is a precious addition to the titas. Baby Islam's camera painted the titas vividly.

In the acting parts Rosy, Kabori, rousan Jamil, Probir, Mustafa, Khalil and all others played their roles well.

ঋত্বিকের বাণী : তিতাস কলকাতায় এলে খুশী হবো . চলচ্চিত্র প্রতিনিধি

(বাংলার বাণী, ৩ আগস্ট, ১৯৭৩, পৃ ৩/৫)

পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটক তাঁর পরিচালিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটির বাংলাদেশে শুভমুক্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে বাণী পাঠিয়েছেন। এ বাণীতে শ্রী ঘটক আশা প্রকাশ করেছেন যে, ছবিটি যদি পশ্চিমবাংলায় একযোগে মুক্তি পেতো, তাহলে তিনি এবং পশ্চিমবঙ্গীয় লোকেরা খুশী হতেন। উক্ত উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে প্রধান আতিথ্য গ্রহণ করেন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শেখ আবদুল আজিজ। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক অসুস্থতার জন্যে এ প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তিনি তথ্য ও বেতার মন্ত্রী সমীপে আবেদন জানিয়েছেন যে, 'তিতাস' যেনো পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পায়। সেজন্য প্রযোজনীয় সাহায্য পাওয়ার জন্য তিনি আবেদন করেছেন। শ্রী ঘটক বলেছেন, আমাকে প্রথমে শোনানো হয়েছিলো, বাংলাদেশে শিল্পী নেই, কলাকুশলী নেই এবং সেজন্যে ভাল ছবি তৈরী হয় না। এ ধারণা ভুল। তিনি বলেন, বাংলাদেশের শিল্পী ও কলাকুশলীদের মধ্যে প্রতিভা রয়েছে। এ পরিচয় আমি 'তিতাস' নির্মাণকালে পেয়েছি। তিনি বাংলাদেশের শিল্পী ও কলাকুশলীদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন।

ঋত্বিক ঘটক বলেন : আমি ছাড়া তিতাস হতো না : চিত্রালী রিপোর্ট

"আমি ছাড়া তিতাস সৃষ্টি হতো না। তিতাস ছিল আমার স্বপ্ন। আমার মমতা দিয়ে এ কাহিনীকে কেউ তুলে ধরতে আগ্রহী হতেন না।" গত ২৪ শে জুলাই বৃহস্পতিবার স্থানীয় মধুমিতা প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটির প্রিমিয়ার শোতে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে একথা বলেন। পরিচালক শ্রী ঘটক অসুস্থ হয়ে বর্তমানে কোলকাতায় অবস্থান করছেন।

স্মারকলিপিতে পরিচালক ঘটক বলেন, "আমাকে বলা হয়েছিল বাংলাদেশে ভাল ছবি তৈরি করার মত ভাল কলা-কুশলী নেই, দক্ষ অভিনয়ের জন্যে ভাল শিল্পী নেই। কিন্তু বাংলাদেশে 'তিতাস' সৃষ্টি করতে গিয়ে সে ধারণা আমরা কাছে সম্পূর্ণ ভুল বলে মনে হয়েছে। আমি জোর গলায় বলবো বাংলাদেশের শিল্পী ও কলা-কুশলীদের দ্বারা যে কোন ভাল ছবি করা সম্ভব।"

স্মারকলিপিতে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক 'তিতাস' ছবির চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলামের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ছবির প্রযোজক সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এমন প্রযোজক এর আগে আমি আর কখনো পাইনি।

Film Critic
'Titas Ekti Nadir Nam' : A unique ballad on the impoverished

(The People, 3rd August 1973, P-6-7)

Titas, the familiar river of Bangladesh, appears to all with its serene nonchalance and forceful silence–a common scene perception of it would tell so. But then, enough of common sense is genius, where in Ritwik Ghatak, with his qunique touch of clairvoyance has found, incarcerated within the rythms of Titas, choked murmurs and smoulders of the people living alongside it.

Painted against this river is the Kaleidoscopic pageantry of a generation–'Titas Ekti Nadir Nam.'

In the film, we find a distillation of Ritwik Ghatak's percipient attitude towards life, not regarding the contentiousness of man but the plain uncertainties that chain him down to a telling futalism.

Though a fragmentary analysis, 'Titas Ekti Nadir Nam' envisages the spectrum of Bangalee life, in its entirely, carried through the vicissitudes of time. The film is a brilliant study in contrast– pleasure and pathos, sorrows and sentiments; hopelessness in living and yet the impossibility of an escape the religious sensibilities and the endurance of superstition and tradition the typifying image and universality of its appeal; the sure approach to an end and yet, the continuity of living and civilization; a recumbency and a resilience all at once.

In the simplest words, 'Titas Ekti Nadir Nam' is a vivid delineation of the typically pallid and impoverished living in Bengal.

Ritwik Kumar Ghatak, the famous Indian director, has taken on 'Titas Ekti Nadir Nam', only in the interest of pursuing the traditions that are very much his. We, in Bangladesh, have had the opportunity to enjoy his 'Meghe Dhaka Tara', a mediocre story done into exquisite verses. According to Ritwik Ghatak himself, 'Meghe Dhaka Tara' carries tacit, touches of commercialisation. He is of the

opinion that 'Subarnorekha' is the most that he has acnieved so far. Indian cine critics and journalists are prone to accept 'Komal Gandhar' and Ajantric' as also among the best exponents of art-films. As a matter of fact, Ritwik Ghatak is still regarded as the best spokesman of art-film making in the intellectual quarter. They are of the contention that where Satyajit ray give in, Ritwik begins. However firm the contention is, the basic discrepancy between the line of thinking of this two stalwarts is that the former is lyrically philosophical while the latter is redely practical. Unlike Ray, who is aware of the suppleness and tenderness of human suffering, Ritwik takes to a sympathetic study of the uncouthness and grusomeness of existence that he finds arroud. He believes in poignancy though his treatment of the subject is ruthless; he has a monumental distaste for ploughing into the hidden pathes of philosophic platitudes. He has a commitment allright politically or socially but he is never didactic about it. He simply places the vicious problems of life in all their ugliness and pristine form. 'Titas Ekti nadir Nam' is one more promise in the tradition of Ritwik Ghatak.

By all means, Bengalees as we are, we ought to tender a note of gratitude to Ritwik Ghatak in whom we find an obsession for the land and people of Bengal. In asmuch as in any of his films, this warmth of a feeling is palpably felt in 'Titas Ekti Nadir Nam'.

The story of 'Titas Ekti Nadir Nam' by Adwaita Malla Burman, a resident on the bank of Titas opens up showing the people along the river trying to make a living out it. fishing or otherwise they manage to brave the rigours of want or poverty. Against the canvas of this universal striving, Kishore Chand Burman (Prabeer Mitra) and Rajar Jhee (Kobori) are unexpectedly, and as effectedly by norms of conservatism united by the bonds of marriage. As ill luck would have it, the two are estranged the night after when Kishore is going back to his village, and attacked by gangster. Rajar Jhee makes an escape by diving into the stillness of Titas. But this is a jump from the frying pan into the fire, since she does not even recall the name of face of Kishore, and hence loses herself in the wilderness. Kishore on the other, fails to withstand the shock and is mentally derailed : Incidentally Basanti (Rosy) of Kishores village, has been long expecting a hand

from Kishore– circumstances change, and she gets married elsewhere and widowed almost at once. Rajar Jhee with her son Ananta (Shafiq) who moves about aimlessly in search of Kishore, finds a happy and warm shelter in Basanti. Kishore and Rajar Jhee are near to each other, but the moment they recognise each other, both of them pass away quite queerly. The events there after revolve around Basanti the centrifugel force, and in whom we find an uncanny identity with mother. Bengal— with all her patience and forbearence to thwat off from her mopish and moribound state. The Titas changes course due to alluvial deposits the village go dry. Basanti dies of hunger and thirst, but only on a note of optimism — she beholds the green fields and a new generation aheads. And in the manner, the director has recognised and received an eternal truth.

The velocity of the events was rather slow but meaningful. Together with it, the director gave a sedulous treatment of a frightful but trenchant monotomy and voidness. These were powerful attachments fo the story.

Ritwik Ghatak has been successful in giving a natural touch to every episode which all smelled the odour of a miasma that our rural living intinged with — indeed a careful painting of colourless life.

Again we are caught by Ritwik's sense of optimism, which in itself is a remonstrance against the existing order of things.

Speaking on the technical side, the director has elegantly used a few covers — the frequent rains, the pale darkness, the stickyness of a sequence — all very much redolement of a tranquility, an indolense and a retirement.

New sequences were strikingly pungent — Ananta recalling his dead mother is caught by the vision of mother Basanti. Titas in a shot is shown an insignificant row in the screen being ridiculously dwarfed by the interminable expanses of the skies. The water hyacinth and Ananta shown together question our sympathy. The rigmarole of the village woman adds to the honesty of the theme. The oozings from the trees, after the rainfall, have been movingly significant, and seemed to be in union with the beatings of the heart.

'Titas Ekti Nadir Nam' is however, not without its gags. In the first place, there were too many shades to the woft and the warp that built the texture, which went thick and opeque to purposefulness. It has been felt that the character of Basanti has been properly handled. Care should have been taken not to make it loud and melodramatic. The dual role of Mustafa as Ramprashad and Kader lacked a spark except to drive home the director'sm non-communal feelings. Kader-kalu (Khalil) episode appeared extraneous to the main currents of the film.

Basanti's re-union with Kishore appeared a coincidence, and hence temperd with the naturalness of the treatment. However, there seemed a few apparantly disjointed sequences — the boat race, the quarrel over the new land etc. which hampered the flow of film.

In the cast of 'Titas Ekti Nadir Nam', Kabori, Mustafa and Rosy stand out convincingly for doing justice to their respective roles. Others played so-so. Rani Sarkar overstand her role while Shafiq in the role of Ananta played well but should have been more orphanlike.

Music by Ustad Bahadur Hussain Khan was controlled and meaningful, particularly the back-ground notes.

Photograph by Baby Islam was elegant and vivid. It went hands in glove with the mood of the sequences and the director.

Editing and sound recording was poor and definitely told upon the smoothness and of the theme.

A Falguni Kathachitra presentation, 'Titas Ekti Nadir Nam' is a fresh and daring attempt at rendering art-films in Bangladsh. With that touch of sophistication and art-making from Ritwik kumar Ghatak. 'Titas Ekti Nadir Nam' has been a spell-binding exposure of our rural Bengal, a monumental and incisive study of the anals of civilisation of ours, in its barest attire, and a tranchent expostulation therein.

A Human Document : Titas Ekti Nadir Nam

– A.U.M. Fakhruddin

Ritwik Kumar Ghatak has put in the film 'Titas Ekti Nadir Nam' the versification of the poetry of life, moistened with tears, of an impoverished people living on the bank of the river named Titas. Although the story encircles the life of a few fishermen living in the village around the Titas, nevertheless, its approach being introspective and sociological, is capable of creating universal impact. The pathos in the struggle for life and living of the poor creatures, in a sense, embodies that of larger communities and societies throughout the world over who are labouring under the protracted process of exploitation by their dominant classes as well as their class enemies. As such these few characters, portrayed in this film, one conceivably discernible and identifiable by their counterparts elsewhere in the wide world.

No attempt, deliberate or unintentional, has been made to complicate and compound the story. It is as plain and simple as the life of the havenots.

The matrimonial function of Kishore and Rajluxmi is solemnised without the least eclat. The marriage is made binding on both of them, specially on Kishore, by the primitive and predominantly conservative community of the fishermen (the malo caste). Earlier Kishore, a young man from a different village, saved a Rajluxmi and at the same time committed a sin, beyond his knowledge, by touching a virgin, who had falledn unconscious during a commotion. The social taboo ordains them to be married. Kishore has to surrender to the verdict of the ritualistic society, foregoing his sweet-heart Basanti, a girl from his own village, to whom he was to be married.

Kishore and Rajluxmi enjoty their first (as also the last) conjugal union in the bride-chamber.

On his way back to his village, with his wife and mates by boat, Rajluxmi is abducted by pirates. After much effort she frees herself form their hands, jumps into the river, manages to escape, and takes refuge to a terraincognito.

Year after, possiby for subsistence or for a newer struggle for life, Rajluxmi, along with her son Ananta, makes her journey, sheer coincidentally, to such a village as belongs to her husband, the Malo caste, provides her with accommodation. Kishore is now mentally unbalanced. Basanti, left widowed by the deceased Shukla Malo, becomes highly sympathetic to Rajluxmi and Ananta.

On the occasion of Dol, a religious festival, rajluxmi some what recognises her husband and accompanies him on the the river wharf. Suddenly Kishore takes her in his arms and runs away from the spot. In seclusion he kisses her tenderly, wherupon the chasing village-folks beat him unto his falling down unconscious on the ground for his commission of (yet another) sin by touching an unrelated woman.

The gasping Kishore, in his dying state, cries for water to quench his mortal thirst. Rajluxmi, hitherto unable to sit due to fear and exhaustion, rolls her body down to the river soaks the fagend of her apparel, rolls herself up again to her husband, wrings out little drops of water into his mouth and looks on earnestly. Kishore opens his eyes for a while, fixes his look on his wife's face, recognises her.

Then he ardently pronounces the words 'my wife' and expires. Unabearable as the shock of Kishore's death is, she cannot restrain herself. the death of her husband brings about in her psychological composition a sense of fulfilment and satiety, and at the sametime a sense of resignation from life arising out of dejection throughout her lifetime.

Mother wells up in Basanti to rear up the orphan Ananta after Rajluxmi's death. But to her parents liing from hand to mouth, this affection of hers for the lad is not palatable. Consequently Ananta is warded off from their house. Basanti is left alone thirsty for Ananta, to her a substitute for her own offspring, for ever. Ananta is adopted by Udayatara, a women from the same village.

Waves of time roll on. But the flow of the waters of the Titas diminishes due to the deposit of silt on her bed. How formidable can the cosmic relationship be is seen in the utter destitution of the people who from time immemorial depend on her for their living. Coupled with it comes the persecution of the exploiter moneylenders on the helpless folks. The money-lenders, preparing fraudlent bonds of loan and indulging in other malicious designs and finally proving the poor fishermen defaulters and guilty, set fire to their dwelling houses.

Some of them take to begging, some set out for migration to elsewhere. Basanti, rejected and ailing, goes to fetch some water by the sapped up Titas and falls almost unconscious. Suddenly she hears the resonance of a horn played by someone. She opens her eyes, and finds a bonny babe on the move in the alluvian paddy field blowing his horn of the glowing days of fruition to come.

The proper understanding of a work of art generally calls for a creative and sensitive participation of a connoisseur, or at least his sympathetic and analytical approach to it, but that the entire purport of the work is likely to remain in conceivably enigmatic.

In the treatment of the plot, based on the only voluminous immortal novel by Adwaita Mallabarman, Ritwik Ghatak's creativity in the method of doing it into a film has travelled wide a far from the confines of that particular literary form. The literary elements of the novel have transcended to a large form. The literary elements of the novel have transcended to a large dimension upon assumption of a kind of transubstantiation, a noble entity in his hand. Ritwik's candour in portratiure, range in context, wit in handling human relations, immense knowledge of a community, conception of economic status, cosmic relation, struggle and profound sense of artistic distance, restraint and balance have made 'Titas Ekti Nadir Nam' a classic.

Anthropologically there is no denying of the fact that form time immemorial rivers like the Valga, Rhine, Nile, Ganga, Missippi, Amazon, Thames or the Yanktze Kiang have played an important role in the evolution of human civilization. In cultivation, navigation and in various other ways they have proved their utility to be a countable factor. Out in agrarian and riverine Bangladesh, this truth is all the

more pronounced. A great many of her people depend largely upon the rivers for their bread and livelyhood. So is, presicely was, the case· with the river Titas, a tributary of the river Meghna, in Comilla. In parts of Comilla it still does flow; but at Brahmonbaria it is only a name now because deposit of silt reduced it to a narrow canal some half a century ago from today. How seriously overwhelming could be its adverse consequences on the life and living of the fishermen of the local Gokorna Ghat of Brahmanbaria on the bank of the Titas 'but a few drops of which even their death too is not complete to them?' Narration of this tragic tale by Adwaita Mallabarman has been translated into cinema by Ritwik Ghatak.

Although water earns them their bread yet the fishermen are not nomadic Gipsies like the Badiyas who live in boats. They are very much terrestrial.

The Malo caste is one bound by too many stack notions, superstitions and prejudices. This predominantly conservative community have their own values and attitudes towards life as other primitive social groups do. Pangs of life, to them are their destined and prearranged fate, codifite or not. Hence Kishore's touching of an unrelated woman brings about his impromptu marriage to Rajar jhee or Raja Malo's daughter. Another touch, juxtaposed to this context, causes his death. To skip to another sequence of a sub plot, Kader Mia is persistently apathetic to give his gradson education because, to him, education makes an animal out of man. In the same sub plot Kader, ready to kill the money-lender being defrauded by him, withdraws only to kill the money-lender being defrauded by him, withdraws only to honour the latter's got up assurance, even though the former will have to pay a costly price by that. Deep sense of morality of one squarely react upon the other who ultimately commits suicide. Impoversihed, skinny, dreaty, threadbare people on the Titas whose eyeball have gone deep into their sockets and whose skeletons are palpably exposed due to starvation and consequent malnutrition can discriminate between good and evil when in the arbitration Mungli reflects the charges of suspicion by Kestachandra on Rajar Jhee saying- – 'these are the headmen of our community who govern the mother's-

in-low and allow their same by going to bed with their daughters to lie with their friends'.

Conservatism of the community can again be seen in the scenes where Basanti and her female neighbours, and in one case Basanti herself, gustly rushes on Aswini and Bairagi who attempted to entice and tease her.

To be effective in bringing home the purport of a given plot or that of a theme, the cinema, a visual art form demands of a director to be in possession of the quality of visual sense. Ritwik demonstrates his impecable sense of this quality in this respect. Exploitation of montage in his hand has attained a virturo appeal. The basic aim and function of montage, to qoute Eisenstein, is that 'two film pieces of any kind, placed together, inevitably combine into a new concept, a new quality, arising out of that justaposition'.

After the abduction of Kishore's wife we perceive a dark river on which pass boats, with lantern, and hert only lanter's light is visible alluding to the agony of her future. her rescue by unacquainted boatmen to a terra incognita follows the drifting away a series of boats under torn and heterogenously patched sails connoting lapse of increase time. Visual details are present in the scences of the bathing of Kishore when his father expressed sighs of sorrow the frustrations of his life. The festive occasion of dol has been made vivid with details of river wharf, a wave of merriment and two frolicking kids on the move. Gossiping season of the women, expecially Udayatara's reference to sexual humour. Ananta's playing with toy boat by the side of a pond, the following morning nocturnal storm, Basanti's mother's strewing of rice, the rural market place, basanti's thread making— all these are fine examples of the director's keen sense of cinematographic details.

In the planning of some shots Ritwik has shown a balance sense of restraint as may be called the artistic distance. Fro a director who seldom maintains any shaved and soaped screenplay and keeps scenario in his memory only in fact very much out of the covention it sounds really incredible.

The death sequence of Rajar Jhee depicted of the director's subjective and lyrical approach to a ragged reality is one such specimen.

The grim intensity of melodrama of the two consecutive deaths— Kishore's followed by Rajar Jhee's— has got a delicately suave touch. The lingering storm of despair that was hovering within Rajar Jhee's bosom as long is now unleashed by the demise of Kishore which prompts her to self-extinction. As her total entity is void and meaningless to her so she relinquishes her life in the river. Unlike jumping into it she suspends her body right on the edge her hair waving with the ripples and thus reducing the rudeness of melodrama to a serene lyricism. Some of our papers have objected to this treatment because in the novel it is wholly dissimilar. Film making being a creative art should not necessarily dog the author always.

Ananta now an orphan finds nest of solace in Basanti. this sequence has been shown in a symbolic method. The camera follows the lone Ananta to the whraf of Titas wher his eyes are in constant search for a shelter. Within the range of his vision came shady waters the wide river and finally he discovers a patch of sky from beneath the shade of trees.

After a considerable lapse of time Ananta is warded off and his is adopted by Udayatara. In his parting sequence he jumps upon the deck of her boat. 'Its bad to jump like a ponn,' scolds Udayatara. Basanti beholds this with an eyeful of wrath and jealousy while her heart tends to break into pieces. The psychological cindition of Basanti has been expressed with the effective sound of flinging cloths. Against the background of the river she is left alone. Camera makes her come closer. An ufocused boat at a far distance crosses her body suggesting a discretion of her entity— because her Ananta is not a separate entity from her.

The director's imaginative and dexterous treatment of situations is also sustained in the sequence of boat race. From start to finish it is superb. During the race begins a feminal dual fought between Basanti and Udayatara centering round their right of guardianship over Ananta. The phyxical confrontration of the two is shown in fusion with the climax of the race in medium shot significantly a montage and tereby it achieves a surrealistic elevation. All quit in the river bank : Basanti, Udayatara and Ananta are mum and motionless after the quarrel. The

venue of the race in juxtaposition, is seen lying disarranged and disorderly.

"I think I cease to have the right to practice fine art if I fail in my duty to project the problem of my country in some way or other" said Mr. Ghatak sometime back. This is the key-note of his philosophy which has been exemplified in his earlierworks such as Subarna Rekha, Ajantrik and Meghey Dhaka Tara. Ritwik does not atleast morally give in to the conditions presented by the society. Rather he concludes with a note of optimism. In Meghey Dhaka Tara his optimism arrives at the point of a road in the process of being constructed afresh. Likewise in the final scene of the Titas he hearls through a bonny baby playing his leaf-made horn on a paddy field the message of glowing future. And in the stop frame is composed the smiling face of the dead basanti. Her efforts to fetch water from under the thick layer of sand (in the former shot) meets with success and although she does not live longer to see the happy days to come yet she relishes to enjoy. that flashed forward symbolic vision.

But as the film is not altogehter flowless so all its treatments are not wholly sunshiny.

The insane Kishor's behaviour in the sequence of cooking cakes is identical to that of a peeping Tom. The concluding shot of the scene of insult on Basanti's father by money-lenders could be more impressive rather than being expressive had the lone figure of the insulted person been left alone to dissolve. Appearance of another character has only over simplified it.

Again, the scene wherein Rajar Jhee falls unconscious for the first time suffers from hazy abstruction.

The profession of the Malo caste, that is fishing, is shown by a few shots of fishing boats and nets and a dialogue of Basanti's father (Ananta let us go a fish-catch). Often or not, at least once a year— in and around the month of November— the fishermen all over Bangladesh enjoy a happy season of fish-catch. Exploitation of this could be a rich addition to this film. Compared to this, Rajen Tarafder's Ganga, a tale about the same community depicts their profession in both, speech and action while in Titas the same undergoes understatement.

The sequence of arson, undoubtedly a store of high drama and a formidable factor to the fate of the community, has been done in an amaturishly prosaic way. More divisions of shots and a few optic shots could also save the sequence.

Dramatics personal of the film have potrayed their respective characters faithfully. The director has been successful in getting them to act proportionately. From among the central characters Rosy as Basanti stands out as a singular figure. Kabori as Rajar Jhee, Roushan Jamil as Basanti's mother, Sufia rustam as Munglee and Khair as Basanti's father have gien a balanced performance. Mustafa as Kader Mia and Ramprasad needs a little mention. Irrespective of caste and creed, the face of Kader's and Ramprasad's are same and similar. They repressent the traditional 'good angel'. Master Shafiqul Islam in the role of Ananta is commendable.

Remarkable no western musical instrument has been used in the musical part of Titas. The theme music of which has been composed in a pathos-alluding note of Sarod by Ustad Bahadur Khan. Traditional folk tunes have supported the emotionally significant sequences approximately. Repeatition of the tune, of 'Lila Bali Lila Bali ... Ki Diya Sajaimu Torey' has been used skilfully in a numer of sequences.

But, equally the quality of sound recording has been much below the average standard. During the first meeting of Kishore and his wife in the nuptial chamber, the duration of sound effect of Rajar Jhee's respiration should have lesser.

In composition of frames and in controlling light, Baby Islam has proved his worth. The following shots of abduction, shower, Ananta's aloneness, Basanti's skirmish and above all the drying spectacle of Titas bear the propriety of this remark.

It would be more resonable of Baby to choose a single river to harmonise its impact. Of course in wharf scenes he has aptly done it. In the scenes of rain, spherical aberration and curvature of field have resulted in the photography.

Editorial treatment of the film, with exceptions of course, is not upto the expectations. Compilation of the shots at the beginning are rather incohesive. The suicide episode of Magan Sardar seemed

'incredibly hasty'. Editing of the last shot may be debated because most of the viewers desired that the duration of the noding pose of Basanti should have been a little longer. AS regards this it may be argued that had it been a little longer it wold have suggested that Basanti was alive. Kishore's lustful grab of Rajar Jhee has been misunderstood by some people as Pakistani style. But this action has a purpose. It alludes to the copullation of the two which further establishes her conception of Ananta. And again, the drying up of Titas and its consequent effect has not been convincing enough. As a result the impact, in totality, remained sort of incomplete.

Ritwik Ghatak, in 'Titas Ekti Nadir Nam', has set forth his conception and visualisation thereo as an artist; and in so doing he has set aside his dialectical belief and motivations. In fact, this a pure film.

Still 'One' Cheer for Titas

Special Correspondent

(The Wave Weekely, 14 August 1973, P-5)

This week saw the last hesitant flickers of *Titas* die out. I don't mean the gas– Goodness forbid it. But the film, Opening on July 27 at eight Dacca cinema houses, it went off at all of them the week next. Little Naz picked it up perhaps out of a sort of kind condescension to its makers' S.O.S. And Naz too said good bye on Thursday. The most discussed film of the 20-year old Dacca cinema industry went out most ignominiously.

Week before last [1] I had tried to pin-point one of the reasons for Titas's apparent failure to hook what editor pralay Shoor of Movie Montage, Calcutta calls– Shalar public– abar whimsical– o botey. Plain unadulterated communalism– nothing very much really to do with the public's aweful immaturity as cine-goers– caused the most damage.

How I wish Pralay Shoor was in Dacca after the release of Titas. For in that case he would have exclaimed Shalar critic– abar whimsical– o botey. *Chitrali and Bichitra,* the too most sought– after entertainment weeklies simply dared not join the fray at least till Thursday last. The heat already generated was too much. One week *Dainik Bangla* extolled the great qualities of the film and in the very next dismissed it as little better than nothing.

Banglar Bani wouldn't commit itself either excepting a passing reference aimed at a critic of the film who they felt had gone mad. But such inexplicable reservation provided only conspicuous exceptions to the general ovation given to the film by all other critics and journals– excepting one– and there lies the greatness of Alamgir Kabir the big.

One fine morning Alamgir Kabir came into print to proclaim his greatness as the the master of spiteful. When this critic turned

film-maker, one thought the journals would be the poorer by the loss of a master of the land and the garish and a supreme artist in self-publicity. He is even credited by some as having observed that now that he had embarked on film-making, he wouldn't anymore dabble in film criticism for that would be neither fair nor fitting. Titas's will be the unenviable distinction of drawing Alamgir out in all his cultivated ignorance of the medium. Let alone the whole film– there are patches which should have or indeed could have made him exclaim to himself "Boy, that will take me twenty years to comprehend and copy"– only if he were honest to himself and knew a bit or two about things he has written most of life on. But that was not to be. For he sees himself as a *Bangladeshi Satyajit* in the making. he perhaps knows that more than making everyone his enemy, Ritwik Ghatak has come to be admired and championed by the better part of Indian intellectual stalwarts, his alcoholism notwithstanding. And he has been and continues to be a supreme source of discomfiture to Satyajit who nevertheless nurses a great fund of respect and admiration for this erratic wayward artist. Alamgir is no artist and he hasn't the making of ever growing into one. So the cat must be killed on the very first night.

it doesn't need a great mind to take Alamgir on point by point – anyone one of those crazy film society boys can do that. And some of them can even excel him in his own art– spite. But a film is altogether a different matter– specially if it happens to be such a cre-ation as ritwik Ghatak's *Titas. Titas* may not come to be the greatest money spinner Bangladesh has ever know– but has been decidedly one thisg– a film of consequence. And life-long endeavours of the ones such as Alamgir would be gruelling exercises in the inconsequentical, if his *Holiday* review is any true indicator.

If films have anything to do with art (which is quite debatable if one hasn't seen better things than the rubbish churned out by Holywood, Bombay and Dacca), *Titas* has been the first significantly artistic creation made in Dacca. If a film can be an important cultureal event– Titas has been the first of such things this side of the Ganges. If films can inspire and can endow men with greater insight into their

own society– *Titas* is the very first that will do son in Bangladesh. *Titas* documents the humannity of the toilling people of Bengal. If not their drudgery which is only demeaning– and does it in the best of film languages.

Titas is not really a paragon of technical flawlessness. But that should not have been excuse for a government-owned cinema-house to get it off the screen even while the turnover was fair to good. The fact is Titas has run into a motley array of forces working up to murderous resols. Even if it means certain ruin to those financing it– it is welcome. For, from now on truly creative forces in film and those that have been prospering by prostituting the medium will perhaps start polarising. *Titas* has already done this good turn to the strange world of Bangladesh films.

And why should the makers of the film come to ruin. It was the government's supreme duty to do something to develop a healthy and meaningful trend in the industry. And to discourage what is at its best a nuisance and at its worst positively harmful joy-ride, both socially and culturally. The government has failed in that illustiously. Now that some other people had taken it upon themselves to do the need of the hour– will the government let let it be punished for their folly thus allowing itself to become indirect accomplices of the forces of prostitution?

No, The government has been offered a golden chance of showing that it is an uncultured ungrateful wretch– as is supposed by many. By a flick of pen they can do wonders at least in this case. *Titsa* is the strongest case that was ever for being allowed exemption from the amusement tax. My appeal to the government is : Give back to the produceers of this momentous film whatever accrues by way taxes collected on it and you will see rush for making good films. Keep it up, institutionalise it as India has done. When the honest and the creative will know that however challenging a film may it is not going to lose money, the greatest will have been done to this domain, till now of the least worth.

Meanwhile, I would appeal to the exhibitors, specially Mr. Awal, their spokesman, to realise that their performance has been shameful.

Balaka and *Gulistan* were doing fine business with *Titas*, in spite of the communal possibly hired, barracking. We, the more conscientious of the cine-goers, call upon you to see that *Titas* is not condemned to accompany potato to some Dacca cold storage. It won't be a bad idea to try to justify once in in while the fleecing of the people, done in wounderful concert by the government, the producer-distributors and the exhibitors.

ঋত্বিক ঘটক অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস' কে আঁকতে পারেন নি

সাইদ তারেক

মহরত উপলক্ষে একটা সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল হোটেল ম্যান্ডারিনে। ডান পাশে হাসান ইমাম আর বাঁ পাশে বেবী ইসলাম, মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঋত্বিক ঘটক সেদিন বলেছিলেন তাঁর আগামী ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম' কিভাবে তুলবেন, কেমন হবে ওটা, কে কে থাকবেন তাতে ইত্যাদি। জনৈক সাংবাদিক সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন : অদ্বৈত মল্লবর্মণকে কি আপনি সত্যিই জীবন্ত করে তুলতে পারবেন?

পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে দু'ঠোঁটের ফাঁকে পুরেছিলেন তিনি। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ওঠা ধরিয়ে জবাব দিয়েছিলেন : কাজটা খুবই কঠিন। তিতাসের পাড়ে পাড়ে গড়ে ওঠা জেলেদের সমাজ-সংস্কৃতি, ওদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ যত আপনার করে বুঝতে পেরেছিলেন, আর কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। তবুও তাঁর সমগ্র বইটা পড়ে যতটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয় মল্লবর্মণের মূল বক্তব্যটাকে আমি বুঝতে পেরেছি, আমি তারই ছবি তুলবো। সে বিশ্বাস আমার আছে।

সে বিশ্বাস আমাদেরও ছিল। আমরা বাংলাদেশের বাঙালিরা ঋত্বিক ঘটককে খুব সামান্যই দেখেছি। ওইটুকুতেই তাঁর সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি তাতে আমাদেরও বিশ্বাস ছিল অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাসকে তিনিই জীবন্ত করে তুলতে পারবেন।

সেই তিতাস মুক্তি পেয়েছে। মুক্তি পেয়েছে এমন এক সময়, ছবিটির নির্মাতা শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটকের যখন কোলকাতার একটা নার্সিং হোমে রাজরোগের চিকিৎসা হচ্ছে। গত মে মাস পর্যন্তও তিনি এদেশে ছিলেন। মহাকালী যক্ষ্মা হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে সহকারী সহকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন। কাজ থেমে থাকতে দেননি।

পদ্মা, মেঘনা যমুনার তীরে তীরে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে। ফিটের পর ফিট ছবি তুলে গেছেন। পছন্দ হয়নি, ফেলে দিয়েছেন। সহকর্মীদের গালাগাল করেছেন এবং অবশেষে তিতাস মুক্তি পেয়েছে।

কিন্তু ছবিঘর পর্যন্ত এসে টিকেছে মাত্র চৌদ্দ হাজার দু'শো বারো ফুট লম্বা সেলুলয়েডের ফিতে। ঋত্বিক ঘটক তাতে আকঁতে চেয়েছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাসকে।

কিন্তু পারেন নি। অদ্বৈত মল্লবর্মণের মূল উপন্যাসটি যাঁদের পড়া রয়েছে, ছবিটি দেখে তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন, ঋত্বিক ঘটক অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাসকে সেলুলয়েডের ফিতেয় আঁকতে ব্যর্থ হয়েছেন।

তিতাস যে নদীটির নাম, তাকে আজ খুঁজে আর পাওয়া যাবে না। মেঘনা নদী থেকে ডাইনে বাঁক নিয়ে এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে যে ছোট নদীটি আবার মেঘনারই বুকে এসে আছড়িয়ে পড়ছে, তিতাস নামের ঐ নদীটিকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ যে রূপে দেখেছিলেন, সে রূপ আজ আর তার নেই। তিতাসের পাড়ে গড়ে ওঠা মালোদের বসত, তাদের সমাজ,গোষ্ঠী, বিচার আনন্দ, দুঃখ—অদ্বৈত মল্লবর্মণকে যা হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে, সে সবের কিছুই হয়তো আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।[১]

অদ্বৈত বর্মণও আজ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

কিন্তু তাঁর উপন্যাসটি রয়েছে। যার শুরুতেই তিনি বলে নিয়েছেন, তিতাস এমনই একটা নদী,'দুষ্ট পল্লী বালক তাকে সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে না, আবার ছোট নৌকায় ছোট বউ নিয়া মাঝি কোন দিন ওপারে যাইতে ভয় পায় না।'

অথচ ঋত্বিক ঘটকের তিতাসকে এমনটি মনে করার কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায়না। এতে তিতাসকে কখনো মনে হয়েছে পদ্মা-মেঘনার মতই বিশাল, আবার কখনো মনে হয়েছে বুঝিবা শীর্ণকায়া কোন খাল।

তিতাস পাড়ের মালো পাড়াগুলোর অবস্থান নির্দিষ্টকরণও পুরোপুরি সফল হয়নি। এক্ষেত্রে ঋত্বিক ঘটক ছবিতে কোন রকম জিওগ্রাফিক্যাল চার্ট মেইনটেইন করতে পারেন নি। যার ফলে রামপ্রসাদকে মনে হয়েছে গোকর্ণ ঘাটেরই অধিবাসী। ধলা গ্রামটিকে মনে হয়েছে আসে পাশেরই কোন একটা গ্রাম। উদয়তারার নিজের গ্রামটিকেও মনে হয়েছে তেমনি।

যার ফলে তিতাস এবং তার পাড়ের গ্রামগুলোকে এক এবং অভিন্ন বলে মনে হয়েছে। অথচ চিত্রনাট্যে দু'একটা ছোটখাট শট সংযোজিত করে বা শিল্পীদের ঠোঁটে কয়েকটা সংলাপ জুড়ে দিয়েই এই জটিলতা খোলসা করা যেত।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর উপন্যাসে তৎকত্রালীন জেলে সমাজ এবং তাদের আচার-সংস্কৃতির চিত্র আঁকতে সহস্র চরিত্রের আমদানী করেছেন। প্রতিটি চরিত্রই আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর এবং উজ্জ্বল। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তিনি এগুলো এঁকেছেন, এরই মাঝে কয়েকটা চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। ওগুলোর ওপর তাঁর ব্যক্তিগত দুর্বলতা ছিল বলেই।

কিশোর-বাসন্তীর প্রেমোপাখ্যান বা অনন্ত, বাসন্তী, উদয়তারাকে নিয়েই অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর গল্প ফাঁদেন নি। তিনি আঁকতে চেয়েছেন ওই বিশেষ সমাজটিরই সঠিক প্রতিচ্ছবি। কিন্তু 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটিতে যেন বাসন্তী, কিশোর, অনন্ত এরাই প্রাধান্য পেয়েছে। এদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালী, সমস্যা, গড়ে ওঠা সম্পর্ক, প্রেম প্রীতি, স্নেহ ইত্যাদিই মূর্ত হয়ে উঠেছে ছবিটির প্রতিটি দৃশ্যে। অন্যান্য চরিত্রগুলো এসেছে এদেরই প্রয়োজনে। কিশোর-অনন্তের মা'র নাটকীয় মৃত্যু, অনন্তর রহস্যজনক অন্তর্ধান এবং বাসন্তীর করুণ মৃত্যু—এগুলোর সঙ্গেই যেন এসেছে মালো সমাজের ভাঙন, তিতাসের মৃত্যু ইত্যাদি (ছবিতে যেমন মনে হয়েছে)।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ কিন্তু তেমনটি চাননি।..... (অস্পষ্ট) চেষ্টা করেছেন এই সমাজটিরই অবক্ষয়ের কারণসমূহ উপাখ্যানে বর্ণনা করতে। কি করে স্বার্থবাদী চক্র এদের একতার মূলে কুঠারাঘাত হেনে ওদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি,আচারকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো আধুনিক যাত্রাগানের জোয়ারে, কি করে এদের বিশ্বাসের শিকড় উপড়ে ফেলা হলো, কি করে এদের ধ্বংস করা হলো– অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর উপন্যাসের 'দুরন্ত প্রজাপতি' খন্ডে অত্যন্ত সুন্দর করে সেই সব চিত্র এঁকেছেন। অথচ ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে এই পরিচ্ছেদটি একেবারে অনুপস্থিত বললেই চলে। জমিদার, জোতদার, সামন্তপ্রভু, সুদখোর, মহাজন, গ্রাম্য টাউট, নব্য ধনিক গোষ্ঠির সুপরিকল্পিত চক্রান্তে কি করে মালো সমাজের একতার ভিত ভেঙে গেল, এই পর্বটি ছবিতে ফুটিয়ে তোলা উচিত ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে এবং এভাবেই অদ্বৈত মল্লর্মণের মূল বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যেত।

এ সব ছাড়াও মূল উপন্যাসের সঙ্গে ছবির অসঙ্গতি আরো অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান। অদ্বৈত মল্লবর্মণ অনন্তকে শহরে পাঠিয়েছেন,শিক্ষিত করে তুলেছেন, এবং একবার গোকর্ণ ঘাট গ্রামেও ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ছবিতে তেমনটি হয়নি। নৌকা বাইচের সময় উদয়তারার সঙ্গে বাসন্তীর মারামারির পর থেকে অনন্তকে বিদেয় করে দেয়া হয়েছে। অথচ অদ্বৈত মল্লবর্মণ অনন্তবালা নামক জনৈক বালিকার সঙ্গে অনন্তের সম্পর্ক গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা আর শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি।

পাগল কিশোর এবং অনন্তর মা-র মৃত্যু দৃশ্যটিও অতি নাটকীয় তো বটেই অত্যন্ত হাস্যকরও। নদীর ঘাট থেকে একজন পাগল একটি সন্তানের মা-কে কোলে তুলে নিয়ে পালালো। নদীর তীরে এনে নামিয়ে রাখলো। সমাজসেবীর দল এসে পাগলকে ডান্ডা পেটা করলো এবং এরপর থেকে দু'জনের মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে কোন একটি প্রাণীও (যারা নদীর ঘাটে ছিল) এগিয়ে এলো না, ওই ঘটনা নিতান্তই হাস্যকর। অথচ মূল উপন্যাসে এই অংশটুকু অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে কিশোরের বাড়ির উঠানে। সকলের সামনেই। কিশোর মারা যায় পরদিন ভোর রাতে আর অনন্তের মা মারা যায় চারদিন পর।

বাসন্তীর মৃত্যুদৃশ্যটিও ঋত্বিক বাবুর কল্পনাপ্রসূত। উপন্যাসে তার কোন অস্তিত্ব নেই।

ঋত্বিক কুমার ঘটক অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসের কাব্যময়তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি বলেই এমনটি হয়েছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবি দেখে মনে হয়েছে ঋত্বিক ঘটক যেন তাঁর মন থেকে এই নাটকের নাটকীয়তাগুলো ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন নি। যার জন্যে তাঁর চিত্রনাট্যটিও রচিত হয়েছে ঐ নাটকের ধাঁচে।

মূল উপন্যাস থেকে এতকিছু বাদ দিয়েও ঋত্বিক বাবু শেষ পর্যন্ত পর্দায় যতটুকু এনেছেন, তার প্রশংসা করতেই হবে। আমাদের দেশের চিত্রশিল্পে, যে দুটো শব্দ প্রচলিত আছে অর্থাৎ 'আর্ট ফিল্ম' এবং 'কমার্শিয়াল ফিল্ম' ঋত্বিক বাবু এক্ষেত্রে প্রযোজকের সঙ্গে

আপোষ করেন নি। এবং তা করেন নি বলেই তিনি ছবিটিকে এত সুন্দর করতে পেরেছেন। বিদগ্ধ মহলে এমনও মন্তব্য শুনেছি, রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা'র চেয়েও কোন কোন অংশে 'তিতাস একটি নদীর নাম', ভালো হয়েছে।

চিত্রনাট্য অত্যন্ত সবল। সংলাপ মূল উপন্যাস থেকেই নেয়া। সেই সঙ্গে শট ডিভিশনও নিঃসন্দেহে গল্পের ঘটনা পরম্পরার মাঝে মিল রাখতে সমর্থ হয়েছে।

অবশ্য ছবিটির কোন কোন স্থান দুর্বোধ্য ঠেকেছে। মূল উপন্যাস থেকে অনেকখানি করে ঘটনা কেটে ফেলে সম্পাদনা করা হয়েছে বলেই এমনটি হয়েছে। এমনও দেখা গেছে একই প্রেক্ষাপটে নেয়া একটি শটের কাট টু শটই হচ্ছে চার বছর পরের ঘটনার শট। যার জন্যে অনেকক্ষেত্রে সময়ের পরিবর্তন বুঝতে হয়েছে—রামপ্রসাদের মাথার কাঁচা চুলের পরিবর্তে সাদা চুল দেখে।

'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির পরিচালক হিসেবে ঋত্বিক কুমার ঘটক বরাবরের মত এ ছবিতেও তাঁর কৃতিত্বের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

শিল্পীর কাছ থেকে তিনি কাজ আদায় করে নিয়েছেন ষোল আনা। ফাঁকি কেউ দিতে পারেন নি। এক কথায় বলতে গেলে রোজী, মোস্তফা, রানী সরকার, খলিল সবাই ভালো অভিনয় করেছেন। প্রবীর মিত্রও যথাসাধ্য করেছেন। তবে তাঁর চরিত্রটি ছিল আরো অদ্ভুত। চিত্রনাট্যে তা সম্পাদনা করা হয়েছে।

ছবিটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন 'তানহা' ছবির পরিচালক-ক্যামেরাম্যান বেবী ইসলাম। ফটোগ্রাফি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে (যদিও প্রিন্টের দোষে অনেক সময় উল্টো চলে এসেছে)। বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ শটগুলো গ্রহণে ফ্রেম কম্পোজিশনে, আলোক নিয়ন্ত্রণে বেবী ইসলামের প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেছে।

ঋত্বিক বাবু অসুস্থ হয়ে পড়লে মোটামুটি বেবী ইসলাম, সহকারী পরিচালক ফকরুল হাসান বৈরাগী, সম্পাদক বশীর হোসেন এদের উপরই পুরো ছবিটার দায়িত্ব এসে পড়েছিল। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে শেষ পর্যায়ের কাজগুলো এদেরকেই শেষ করতে হয়েছে।

সম্পাদনার কতগুলো অংশ চমৎকার হয়েছে। বাসন্তী-উদয়তারার মারপিটে উদ্যত শট থেকে নৌকা বাইচে কাট্‌টু শটের সংযোজনা নিখুঁত। ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে শব্দ গ্রহণ। যার জন্য সংলাপ প্রায় সবগুলোই অস্পষ্ট। বিশ্রী হয়েছে টাইটেল অংশটুকু। ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খানের পরিচালনায় গানগুলো শ্রুতিমধুর। আবহ সঙ্গীতের উচ্ছাস এ ছবিতে নেই বললেই চলে। এটা নতুন মনে হয়েছে।

পর্দায় যতটুকু আমরা দেখেছি, তার প্রতিটি যেন ঋত্বিক ঘটক ছাড়া মানাতোই না। অদ্বৈত মল্লবর্মণকে তিনি যতটুকুই রেখে থাকুন না কেন, চিত্র নির্মাণ, পরিচালনা, চিন্তা সর্বোপরি ব্যবসার সাথে আপোষে অবিরাম অনমনীয়তা ঋত্বিক ঘটককে তাঁর নিজের আসনেই অধিষ্ঠিত করে রেখেছে।

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে ঋত্বিক ঘটক 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির মাধ্যমে এক নতুন ধারার সংযোজন করে দিয়ে গেলেন।

সেই সঙ্গে এটাও বলতে হয়, মূল উপন্যাসের যথাযথ রূপায়ণও কেবলমাত্র তাঁর দ্বারাই সম্ভব ছিল।

তিতাস একটি নদীর নাম

বশীর হোসেন

গত শুক্রবারের চিত্রালীতে 'আমি তিতাসের সম্পাদক নই' শিরোনামায় পরিবেশিত সংবাদটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সংবাদটির উপস্থাপনার উদ্দেশ্য সম্পর্ক কোন মন্তব্য না করে জানাতে চাই যে সংবাদটি একদিকে যেমন অসম্পূর্ণ একদিকে তেমনি ভ্রান্ত।

বহু বিতর্কিত ছবি তিতাসের চিত্রগ্রহণ থেকে শুরু করে রূপালী পর্দায় পৌঁছানোর মূহূর্ত পর্যন্ত অনেক ঘটনা নেপথ্যে হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস অনেকেই হয়তো জানেন না। আর জানেন না বলেই হয়ত সমালোচক ভাইদের কলমও পরিপূর্ণতা খুঁজে পায় না। বিতর্কিত তিতাসের যে পর্বে আমিও আজ টানা হেঁচড়ার শিকার সেই পর্বকে লক্ষ্য করেই শুধু নয় বরং আসল সর্বসমক্ষে তুলে ধরার তাগিদ উপলব্ধি করছি বলেই আজ আমার মুখ খুললাম।

চিত্রজগতে নিজেকে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িয়ে তুলতে পারার পর থেকেই আমি স্বপ্ন দেখতাম 'তিতাস একটি নদীর নাম' একদিন ছবি হবে এবং আমি হব তার সম্পাদক। সে সুযোগও আমি পেয়েছিলাম কিন্তু সে স্বপ্ন আমার সফল হয়নি। আমার স্বপ্নের বাস্তব রূপ আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সেদিন যেদিন ঋত্বিক ঘটক আমায় ডাক দিলেন। বললেন — 'বশীর তোকে নিয়ে এডিটিং টেবিলে বসে আমি এ ছবি তৈরি করবো'। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম।

একদিন সত্যি সত্যি তিতাসের সম্পাদনার কাজ শুরু হল। ঋত্বিকদার সৃষ্টির চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিতাসের বুকে কাঁচি চালানোর দায়িত্ব মাথায় তুলে নিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু করার অল্প কয়েকদিন পরই অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য কোলকাতা চলে যাই।

অসুস্থ আমার দেহে অস্ত্রোপচারের পর হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি ভাবতাম তিতাসের কথা।

তারপর দেশে ফিরে এসে অসুস্থ শরীর নিয়েও আমি সম্পাদনা কক্ষে ছুটে যাই এবং আমার সহকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতায় ঋত্বিকদাকে নিয়ে তিতাসের প্রথম পর্যায়ের সম্পাদনার কাজ শেষ করে আনলাম। এ সময়ে চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলাম আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার পিছু ছাড়লো না। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ঋত্বিক ঘটক চলে গেলেন কোলকাতায়। দূর থেকে ঋত্বিকদা এ ছবির সম্পাদনার পূর্ণ দায়িত্ব আমাকে দিতে চাইলেও তাঁর অনুপস্থিতিতে তিতাসের বুকে কাঁচি চালানোর সাহস আমি হারিয়ে ফেললাম।

তবুও তিতাসের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু কিভাবে হয়েছে সেই ইতিহাস আজ জানা নেই।

রূপালী পর্দার তিতাসও আমি দেখিনি। এ আমার দায়িত্ব এড়ানোর যুক্তি নয়, আসল সত্যটি উপস্থাপনার প্রয়াস মাত্র।

আজও আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবি কালো কালির আঁচড় কেটে কাগজের বুকে তিতাসের রূপকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ আর যুগান্ত সৃষ্টিকারী পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটকের জীবনালেখ্যর সাথে কোথায় যেন একটা মিল। একই সাথে আমি বশীর হোসেন সমালোচকদের হাতে নাজেহাল— তবু আমি সুখী। সুখী এই ভেবে যে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক আর তিতাস একটি নদীর নাম, আমার চিন্তার জগতে চির সমুজ্জ্বল।

তিতাস একটি নদীর নাম

সুকদেব বসু

'তিতাস আমি দেখিনি'— চীৎকার করে যদি কোন ঐতিহাসিক জনসভায় কিংবা নেহায়েৎ একটা গণজমায়েতে এমন কিছু বলা যেত, তবে আর কিছু না হোক অন্তত তিতাসের অগাধ আলোচনায় নির্বোধের মত নাক-গলা হতে হোতনা। আর নয়তো তিতাস নিয়ে কিছু লেখার এমন সুস্বাদু সাহস কোন কাগজের প্রায় মসৃণ পৃষ্ঠাগুলোর সতীত্ব নষ্ট করতো না।

তবু যা হোক, ঋত্বিক ঘটককে দেড় হাতের মধ্যে পাইনি, পেলে নিশ্চয় করে জিজ্ঞেস করতাম 'মহাশয়, একি অকল্যাণ করিলেন! ইহারা রংবাজ হইতে পারে কিন্তু অবুঝ মন ইহাদের। কোথায় দুটি চারিটি প্রেম ভালবাসার কথা শুনাইয়া সান্তনা দিবেন — মন কেমন করা গীত শুনাইবেন, আড়ি-ভাব দেখাইয়া অতঃপর সুখে শান্তিতে বসবাস দেখাইবেন, তাহা নয় মাতালের মত অশ্রাব্য ভাষায় গালগাল করিয়া তুমুল কান্ড বাঁধাইয়া বিকট একটা চড় কষাইয়া দিলেন, এখনো যাহার জ্বালা আপনাকে অপবাদ দিতেছে।' কিন্তু তাঁর ভাগ্য ভাল বলতে হবে। ছবিটি সামগ্রিক ভাবে 'শেষ' করার পূর্বেই তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় কোলকাতায় চলে যেতে হয়েছে। আপাতত কিছুটা সুস্থ হলেও অচিরেই তাঁর ঢাকায় আসার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই এবং ভবিষ্যতেও যে আসবেনই, সে ব্যাপারেও নিশ্চিত করে বলা যায় না।

কিঞ্চিৎ সুখের সঙ্গে বলছি ঋত্বিক ঘটককে দেখিনি, কিন্ত তাঁর তিতাস আমি দেখেছি। এবং ভয়ে ভয়ে বলছি, একবার নয় ক্রমাগত সাতবার। অতঃপর যাঁরা ঋত্বিক ঘটককে ভারসাম্যহীন মাতাল বলার স্পর্ধা রাখেন তাঁরা নিঃসন্দেহে আমাকে আস্ত একটা পাগল ঠাউরালেও বিস্মিত হব না। কেননা 'তিতাস একটি নদীর নাম'- এর স্রষ্টা যদি ভারসাম্যহীন মাতাল বলে বিবেচিত হন তবে কেবল আমি কেন আমার পূর্ব পুরুষ মহাপুরুষ, আত্মীয়-পরিজন, শত্রু-বন্ধু, চোরাকারবারী-মজুতদার, শিল্পী-কেরানী, বুদ্ধিজীবি-বেশ্যা এবং বিশ্বের তাবৎ রাষ্ট্রপ্রধান-প্রধানমন্ত্রী আর তাদের আপ্লুত জনগণও তাই।

'চালিয়াতি আমার আসে না' — একথা যিনি নিজের বিশ্বাস থেকে উচ্চারণ করতে পারেন তিনি এবং বিশ্বস্তভাবে কেবল তিনিই সৃষ্টি করতে পারেন, অন্য কেউ নয়। তিনি একতন্ত্রী বাঙালি ঋত্বিক কুমার ঘটক এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ যার মুদ্রিত সমর্থন। আর তাই তিনি দশ বার বছর পরও যে ছবি করেন তা সাম্প্রদায়িক দর্শক নেয় না। কারণ তাঁর ঐ পাঁচিল, যে পাঁচিলের কথা তিনি একবার লিখেছিলেন তাঁর একটা প্রবন্ধে— "এই যে একটা

ঢাকনার মত মানুষের সব শুভকে ঢেকে রেখেছে শুধু প্রাণধারণের গ্লানি, সেটা হঠাৎ যেদিন উঠে যাবে, সেদিন হাইড্রোজেন শক্তির পরিব্যাপনের মত মানুষের ইচ্ছা আর ক্ষমতা ব্যাপ্ত হবে, সেদিন আমরা আর কাঁদুনি গাইতে আসবনা। সেদিন যে আসবেই তার প্রমাণ আদিম সাম্যেই রয়ে গেছে। সেদিন সবাই খেতে পেত। তবু, এত খেটে নতুনতর নতুন জন্ম হল, তাই না সভ্যতা জন্মাল, তাইনা আজ চাঁদের পিঠের আগ্নেয় ধুলিতে মানুষের গুলতীর গুলি গিয়ে ঠেকতে পারল। সেদিন রাস্তায় এত গুলিও চলবেনা, এত মাও কাঁদবেনা। আর আমরা চুটিয়ে ছবি করবই"। তাই করেছেন ঋত্বিক ঘটক। কিন্তু ধ্বসে যায়নি সবগুলো পাঁচিল।

মহৎ সাহিত্যকর্মের চলচ্চিত্রায়ণে অবশ্যই মাত্রিক সুঃসাহসের প্রয়োজন এবং তার চাইতে প্রয়োজন চলচ্চিত্রকার মূল অর্থে চিত্রনাট্যকারের গভীর জীবনানুভূতি, চলচ্চিত্রবোধ এবং একটা দিগদর্শন যা ছবির বক্তব্যের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করবে। এ প্রসঙ্গে লেনিন ও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী লিয়েফ লান্দাউ-এর একটি ক্ষুদ্র বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলতে চেয়েছেন — "সাহিত্য কর্মকে পর্দায় রূপান্তরের প্রশ্নে যা অবশ্য প্রয়োজন তা হচ্ছে মূল রচনার কেন্দ্রস্থ ভাবের প্রতি চিত্রনাট্যকারের বিশ্বস্ততা।" সেদিক থেকে পথের পাঁচালী কিংবা ওয়ার এ্যান্ড পীস যেমন তিতাসও তেমনি, জীবন মৃত্যু এবং সমাজ ভাবনার পরিণত শিল্পরূপ। যার content : দার্শনিক ধর্মনৈতিক মনোভঙ্গী, শ্রেণীসম্পর্ক, ব্যক্তি সম্পর্ক এবং জীবন সম্পর্ক।

যোশেফ ফন স্টার্ন বার্গের যুগ যদিও অতিক্রান্ত তথাপি ঋত্বিক সাহিত্যরীতির আধিপত্যকে বিলোপ করে সম্পূর্ণরূপে তাঁর দৃশ্যধর্মিতার উঠোনে তিতাসের বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। যেখানে ছবির বক্তব্য অঙ্কন-গ্রহণ-সমর্থ। কোমল গান্ধারের বেলায়ও পরিচালক এই একই ভাবনায় আক্রান্ত ..... "বক্তব্য কথাটিই সাহিত্য গন্ধী। 'রূপক' ও তাই। আধুনিক কাব্যে এমনকি নাট্যশিল্পের একটি বিশিষ্ট ধারাতেও তাদের প্রয়োগ তার উদাহরণ স্বরূপ। চলচ্চিত্র শিল্প তথাকথিত 'সাহিত্য' উপায় অবলম্বনে নিঃসঙ্কোচ, সে উপায় তির্যক কিংবা সরল যাই হোক।"

অথচ 'এরই' মধ্যে ঋত্বিক অবরুদ্ধ বিপরীত। বিরুদ্ধের বিরুদ্ধে। সুস্টার্থ বিদ্রোহ। সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রে ঋত্বিক ঘটকের যে নিজস্বতা, আত্ম-সংস্কৃতি সেটা তাঁর প্রকাশ ভঙ্গিতে বিরোধালঙ্কারের মত। এবং এই যে এক ভাবত্ব কিংবা অদ্বিতীয়ত্ব এটা তাঁর দর্শনের অনিবার্যতার কারণে। তাই তাঁর প্রতিটি ছবিতেই সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সমান্তরাল। তথ্যগত নয় সত্যগত কারণে তিনি তাঁর সিনেমাটিক লাইনআপ-এ অনেক ক্ষেত্রে সংযতচারী নন্। হতে চান্ না। হতে পারেন না। কেননা তিনি মনে করেন জ্যামিতিক অর্থে 'ছবির প্রাথমিক স্তরে টানা গল্প, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের মাঝে একটু গভীর স্তরে প্রবেশ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক, সামাজিক দ্যোতনাগুলো খেলা করছে। এবং আরও গভীরে দর্শনগত ও শিল্পীর আত্মচেতনা অনুসারে দিগনির্দেশগত সংকেতগুলো।' এই emotional effect কিংবা

sentiment - এর কারণে তাঁর সৃষ্ট চলচ্চিত্রেও realism এবং romanticism নাটকের এ দু'টো গুণই আছে। সমষ্টি এবং ব্যাক্তিগত উপলব্ধি আবেগ অনুভূতি প্রকাশ পেয়ে তাঁর শিল্প সৃষ্টি— classical concentration নয়।

"শিল্পকে committed হতেই হবে। সর্বশিল্পের শেষকথা মানুষ। বর্তমান মানুষ, যারা শোষিত তাদের স্বার্থের বাইরে কোন শিল্প করা আমি পাপ মনে করি। committed মানে সংগ্রামী দুঃখী মানুষদের সঙ্গী হওয়া যাতে ভালবাসা এবং ঘৃণা দু'টোই তীব্রভাবে প্রকাশ পাবে।" ঋত্বিক ঘটকের প্রতিটি ছবিতে তাই পরিচিত সংগ্রামী মানুষের মুখ। সমকালীনতার প্রেক্ষিতে তিনি একটি অখন্ড জনসমষ্টির সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতিক জীবনবোধের বিশ্লেষণের গভীর থেকে একটি বক্তব্যকে তুলে ধরেন। মৃত্যু-অবক্ষয়-দারিদ্র বৃত্তায়িত অযান্ত্রিক, মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা, কোমল গান্ধার এবং তিতাসে। নাগরিকেও মধ্যবিত্ত জীবনযন্ত্রণার শিল্পরূপ প্রকাশ পেত। পায়নি। মানুষের কথা, জীবনের কথা বললে অবক্ষয় কিংবা নৈরাশ্য-বাদের কথা বলা হয় না— এটা ঋত্বিক-ছবির মূল সুর। তাই তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচনে একবার, দু'বার, প্রতিবার এবং আবার প্রাধান্য পেয়েছে বাংলা। এ বাংলা ঋত্বিক ঘটকের বাংলা। তাঁর প্রায় ছবিতে তাই শহর উহ্য। বাংলার প্রতি জরাজীর্ণ মমত্ববোধ সম্ভবত এর কারণ। তাঁর সব ছবিতেই এই ভাঙ্গা বাংলার মানুষের সমস্যা, জীবন সংস্কৃতি নিয়ে তিনি তাঁর চলচ্চিত্র সৃষ্টির জীবনে আন্ত-ভ্রমণ করেছেন। সাহিত্য-মঞ্চ-চলচ্চিত্রে তাঁর এই একই বিশ্বাস শ্লোগানে উচ্চারিত— "চারিপাশের যে দ্বিধা, যে ভাঙ্গন, আমি জানি, তার মূল হচ্ছে ভাঙ্গা বাংলা। পূর্ব-বাংলার লোক বলে এ কথা মনে করিনা। গোটা বাংলার ঐতিহ্যটা আয়ত্ত করার চেষ্টা করি বলে একথা জানি যে, দুই বাংলার মিলন অবশ্যম্ভাবী। তার রাজনৈতিক তাৎপর্য আমার হিসেব করার কথা নয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক মূল্য আমার কাছে অবধারিত।" দশ বার বছর পূর্বে তিনি যে মূল্যবোধ নিয়ে চলচ্চিত্র সৃষ্টিতে নিবেদিত ছিলেন তিতাসেও তা অপরিবর্তিত থেকেছে। আবারও আমাদের বিচলিত চিত্তকে স্পর্শ করেছে তাঁর দিগদর্শন চিহ্নিত প্রায় বিশ্রুত লোকসঙ্গীত এবং দ্রুপদী, কীর্তন বাউল, আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের জলবতী প্রয়োগ। যাকে তিনি ভাবেন এ দেশের অতীত বর্তমান সমাজ সংস্কৃতির সেতু-রূপ। এ ক্ষেত্রে তিনি আইজেনস্টাইন, ডি সিকা, প্রকিয়েভ কিংবা সত্যজিতের চাইতে ভীষণ ভিন্ন। একক।

ছবির শুরুতে টাইটেলেই তিতাসের উপস্থিতি— দেরাজউদ্দিন ফকিরের উদাত্ত কণ্ঠে লালনের গান 'তোমার আজব শীলা নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই' মুহূর্তে একটি সাঙ্গীতিক উপলব্ধিকে আমন্ত্রিত করে। চলচ্চিত্রে আবহ সঙ্গীতের আত্মীয়তা অনুভবের মাচাঙে দোল খায়। এ সঙ্গীত ছবির শেষ ফ্রিজ শটটির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সমাহৃত। তিতাসে সঙ্গীতকে ধ্বস্তাধস্তি করে আনা হয়নি। প্রয়োজনে, অত্যন্ত নিরুপদ্রবে তা এসেছে ছবির শরীরে। ছবিতে তাই যতক্ষণ গান আছে জীবন আছে, গান নেই জীবনের ক্রমক্ষয়িষ্ণুতা সমস্যা বিপর্যয়

আন্তরিত। (ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খানের প্রযোজনা এবং ওয়াহিদুল হকের গ্রন্থনায়) সঙ্গীত ব্যবহারে এমন নিষ্ঠা বাংলাদেশের দ্বিতীয় কোন ছবিতে নেই। এই অর্থে যে আঞ্চলিক লোকগীতি, কীর্তন কিংবা শাহের গান ব্যবহারের অনিবার্যতা এবং অন্তরাল সঙ্গীত রচনায় এ পরিমিতিবোধ এই প্রথম। এ প্রসঙ্গে চার্লি চ্যাপলিন এবং নোয়েল কাওয়ার্ডের ছবি কিংবা ভিন্নার্থে মার্কিন ছবি 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি'র কথা উল্লেখ করতে হয় যে ছবিটি সঙ্গীতমুখর হয়েও যথেচ্ছ ব্যবহারে সঙ্গীত ভারাক্রান্ত নয়।

ঋত্বিকের ছবিতে আর যে ব্যাপারটি তা হচ্ছে তাঁর প্রায় প্রতিটি ছবিতে একই চিত্রকল্প, শব্দ, সঙ্গীত এবং প্রত্যেকের আচরিক ব্যবহার। রেনোয়াঁ, ফ্লাহার্টি, ডনস্কয় এবং সত্যজিতের মত কেবল অনেকক্ষেত্রে নদী জলেই তাঁর প্রকৃতি প্রতীককে সীমাবদ্ধ রাখেননি । তিনি আরও বিস্তৃত। ভিন্ন। তাঁর ছবির মূল প্রতীকেরা—নদী-গাছ-পাহাড়-আকাশ-বৃষ্টি বারংবার একই মন্দিরার অন্তর্জীবনে সুর তুলেছে । তাই 'সুবর্ণরেখা'র ঈশ্বর জীবনের সংগ্রাম থেকে পালিয়ে নৈসর্গিতায় জীবনের মূল্যবোধকে খুঁজে বেড়ায়, 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা বাঁচার আশায় পাহাড়ের সামনে পরিচিত ঢাকের শব্দে মহাপ্রয়াণে যাত্রা করে, 'অযান্ত্রিক'- এর নববিবাহিতা রমণী পাহাড়ে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে এসে আদিবাসী গানের ছন্দে জীবন হঠকারিতাকে উপলব্ধি করে আর 'তিতাস একটি নদীর নাম'- এ বাসন্তীর সমস্ত দুঃখ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে যখন তার মাতৃহৃদয়ের অনন্ত তাঁকে ছেড়ে চলে যায়।

"আমরা নব মনস্তাত্ত্বিকদের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা থেকে শিল্পবিচারের কতকগুলো মূলসূত্র পাই, যাকে comparative mythology আমাদের সামনে illustrate করে। ..... মানুষের পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার আগের থেকেই বিধৃত হয়ে আছে social collective unconscious অর্থাৎ মানবজাতির যৌথ অবচেতন স্মৃতির ভান্ডার। মানুষের যা কিছু গভীরতম অনুভূতি সবেরই উৎস এইখানে। এবং কিছু কিছু মৌল প্রতীক (archetype) মানুষের বিভিন্ন ঘটনার প্রতি যে প্রতিক্রিয়া তাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। স্বতস্ফূর্ত মানুষের যে প্রতিক্রিয়া তার বেশির ভাগেরই মূল এইখানে। এবং এই archetype সব সময়ই image-এর মধ্য দিয়ে symbol হয়ে দেখা দেয়"। ..... ঋত্বিক ঘটকের লেখা বিশ্লেষণ দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ থেকে এটুকু উদ্ধৃত করতে হোল এ কারণে যে তাঁর সৃষ্ট চলচ্চিত্রে এই archetypal image অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। যেমন 'অযান্ত্রিক'- এর বিমল জগদ্দল, 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা, 'কোমল গান্ধার'-এর ভৃগু-অনুসূয়া কিংবা 'সুবর্ণরেখা'র ঈশ্বর-গীতা-হরপ্রসাদ এই প্রত্যেকটি চরিত্র আমাদের সামাজিক মৌল প্রতীক (archetype) । সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীর ইন্দির ঠাকরুণ সিকোয়েন্স-এ দু' একটি জায়গায় যেমন বুড়ি গ্রামবাংলার আত্মারূপে প্রতিভাত হতে পেরেছিল। অবশ্য অপুর সংসারে গোচারণরত সহায় সম্বলহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণপুত্র ব্রিজটের ব্যাপারটি তিনি এড়িয়ে গেছেন। তিতাসের রাজার ঝি এবং বাসন্তী চরিত্র দু'টি archetype, —রামপ্রসাদও তাই। 'সুবর্ণরেখা'র কালীমূর্তি যেমন পুরাকল্পীয় চিত্রকল্পের ভাবরূপ

নিয়ে এসেছে তেমনি তিতাসেও মা ভগবতী। অপরাজিতের কালপুরুষ, বুনুয়েল এর 'নাজারিন'-এ যীশু খৃষ্টের ব্যাপারটি কিংবা ব্রায়ান ফরব-এর 'হুইসাল ডাউন দি উইন্ড' এবং রোভে ব্রেসোর ও হ্যার্জাড বালথাজায় পরিচালকদের একই চিন্তার কারুকাজ মুদ্রিত।

মৃত্যু—ঋত্বিক ছবির প্রধান শর্ত। মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর ধারণা পুনরুজ্জীবনের অন্তহীন প্রবাহের শর্তে আরোপিত। ঋত্বিক ঘটকের প্রায় সব ছবির শেষ চিত্রকল্পে এই মৃত্যুচেতনা জীবনের প্রতি আসক্তি ও আকর্ষণের চিত্রণবোধক। তাই নীতা, অনসূয়া, গীতা, রাজার ঝি এরা একইভাবে মৃত্যুকে আমন্ত্রিত করেছে। গদারের ছবিতে যেমন মৃত্যু পবিত্রতা ভরে ওঠে তেমনি ঋত্বিকের ছবির মৃত্যুর চিত্রার্থ— মৃত্যুর জন্যে বেঁচে থাকা।

তিতাসের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গে অন্তর্নাটকের যে বিক্ষিপ্ততা তা 'নবতরঙ্গের' ধারাকে অনুসরণ করে নয়। কিংবা 'নিও রিয়ালিজম' কে উপেক্ষা করেও নয়। তুচ্ছ ঘটনাকে নাটকীয়তার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে চিত্রকল্প-পরস্পরা-স্পন্দন (rhythm) এর সৃষ্টি করে। দৃশ্য চিত্রায়ণে তাঁর এ নাট্যভঙ্গি একটা সুশৃঙ্খল পদ্ধতি (system) হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিরিশ দশকের ফরাসি 'আঁভা গার্দ' চলচ্চিত্র আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা লুই বুনুয়েল একবার বলেছিলেন — "নিও রিয়ালিজম চলচ্চিত্রের প্রকাশ রীতিতে কিছুটা নতুনত্ব এনেছে, তার বেশী নয়। নিও রিয়ালিষ্ট বাস্তব অসম্পূর্ণ, নগণ্য এবং সর্বোপরি বুদ্ধি সর্বস্ব। কাব্যবোধ ও বিস্ময়বোধ যার দ্বারা ইন্দ্রিয় ও গ্রাহ্য বাস্তবের সম্পূরণ ও প্রসারণ হয়, তার স্পর্শ নিও রিয়ালিষ্ট ছবিতে পাওয়া যায় না। নিও রিয়ালিষ্ট ছবিতে বাস্তববোধে গোলমাল করে ফেলা হয় অলৌকিক (fantastic) আর শ্লেষাত্মক আজগুবির (ironic fantasy) মধ্যে।" ঋত্বিকের ছবিতে এ মন্তব্যের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন-সান্নিধ্য প্রন্যাসিত।

সত্যজিতের সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের আপাত বিরোধ এইখানে। সত্যজিৎ রায় নবতরঙ্গ ভাবিত সম্ভবত কিন্তু ঋত্বিক নবতরঙ্গ শাসিত নন, সত্যজিতের ছবিতে কেমন একটা পরিশীলিত অভিনয়, 'ধোপদুরস্ত' ভাব — মাপা মাপা কথা, শব্দ-সঙ্গীত-মুভমেন্ট ইত্যাদি ঋত্বিকের ছবিতে যা অনুপস্থিত। সত্যজিৎ বিভিন্ন চিত্রকল্পের মধ্যে একটি পারস্পর্য রক্ষার অন্তিম চেষ্টা করেন, ঋত্বিক যা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। সত্যজিৎ তাঁর ইচ্ছাগুলোকে গুছিয়ে-গাছিয়ে যত্নতার সঙ্গে পরিবেশন করেন কিন্তু ঋত্বিক ঘটক যা ইচ্ছে তাই করেন। এ জন্যই তিনি ঋত্বিক ঘটক এবং একমাত্র ঋত্বিক ঘটকই বলতে পারেন "সত্যজিৎ রায় এবং সত্যজিৎ রায়ই তাঁর শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তে আমাদের সত্য নিঃশ্বাস কেড়ে নেওয়ার মত সত্য — ব্যক্তিগত স্বকীয় সত্য সম্বন্ধে সচেতন করতে পারেন। পথের পাঁচালীর ইন্দির ঠাকুরন দৃশ্যাবলী আমার ব্যক্তিগত মতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের মধ্যে সবচেয়ে মহৎ ও প্রকৃত শিল্পের নিদর্শন। যেমন করেই হোক সত্যজিৎ সমসাময়িক বাস্তবতার সাথে সংযোগ স্থাপন করেছেন ঐ মুহূর্তে।" এরও অনেক পরে সত্যজিৎ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন — "বাংলাদেশে চলচ্চিত্র মাধ্যমটাকে

যদি কেউ বুঝে থাকে ভাবে সে একমাত্র সত্যজিৎ রায়।" আমরা জানিনা আর একটা ঋত্বিক ঘটক জন্মালে আজকের পৃথিবীর এ 'ঋত্বিক ঘটক' সম্পর্কে তিনি কী মন্তব্য উচ্চারণ করতেন।

কেননা অনেকে এবং প্রায় প্রত্যেকেই ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা-তর্কে সত্যজিৎ রায়কে টেনে আনেন অপ্রাসঙ্গিকভাবে। বিজ্ঞের মত বলেন — লেখেন— ও হলে এই হোত, এ হলে ওই হোত, এমন না— তেমন, ফলনা দক্না ইত্যাদি। কিন্তু তাঁরা বোঝেন না কিংবা বুঝতে চান না যে সত্যজিৎ সত্যজিৎ। ঋত্বিক ঋত্বিকই।

সত্যজিৎ-ঋত্বিক অথবা ঋত্বিক-সত্যজিৎ প্রসঙ্গ যখন এসেই পড়ল তখন ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউটের 'মুভি মন্তাজের' (প্রলয় শূরের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানিয়ে) একটি নিবন্ধের কিছু মন্তব্যাংশের উল্লেখ না করে পারছি না। উপাদেয় ব্যাপার নিঃসন্দেহে। প্রলয় শূর এভাবে লিখছেন—

"…. যেদিন পৃথিবীর এগারজন পরিচালককে নিয়ে একটি 'বিশ্ব মানচিত্র' তৈরি হয় তাতে এগারজন পরিচালকের নাম এবং ফটো ছিল তাতে ঋত্বিক ছিলেন না, ছিলেন ক্রফো। তখন পর্যন্ত ক্রফোর ছবির সংখ্যা ঋত্বিকের ছবির সংখ্যার চেয়ে বেশি নয়। আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে অযান্ত্রিক, কোমল গান্ধারের চেয়ে 'ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ', 'জুল এন্ড জিম' Better film! ক্রফো যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের 'অন্যতম' হতে পারেন, ঋত্বিক কেন সেই শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের আসরে প্রবেশাধিকার পাবেন না, এটা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয়।

বিদেশী ছবি সম্পর্কে তাঁর অদ্ভুত সব মন্তব্য, যা কারো সঙ্গে মেলেনা সেখানেও আমাদের ভুল বোঝার কোন অবকাশ নেই। তাঁর নানা উদ্ভট মন্তব্য, তাঁর জীবনধারণ, তাঁর চলচ্চিত্র, সমস্ত কিছু মিলে তাঁর চরিত্র। তাঁর ছবিতেই কেবল সত্যজিৎ বিরোধী, বিপরীত রায় একটা শিল্পব্যক্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

সত্যজিৎ ক্যামেরার যে জাতীয় ব্যবহার পছন্দ করেন ঋত্বিক তা করেন না। দু'জনের হাতে দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্যামেরা, ভিউ ফাউন্ডারে সত্যজিৎ যা দেখেন, ঋত্বিকের চোখে তা পড়ে না, ঋত্বিক যা দেখতে দেখতে অস্থির হয়ে ওঠেন, সত্যজিৎ তা দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে যান। সত্যজিৎ পরিমিত, সংযত। প্রয়োজনের বেশি একটি সংলাপ ব্যবহার করেন না, একটা বাড়তি দৃশ্য রাখেন না, ঋত্বিকের ছবিতে সংযম নেই। ঋত্বিক চলচ্চিত্রের পরিমিতি সম্পর্কে সচেতনতায় বেশী সময় অকারণে ব্যয় করতে চান না। তাঁর ছবিতে অনেক দৃশ্য বাড়তি বলে মনে হয়। দু'জনের গল্পকথনের রীতি সম্পূর্ণ আলাদা। সত্যজিতের ছবিতে সঙ্গীতের ব্যবহার ঠিক যতখানি তাঁর প্রয়োজন তার বেশি তিনি ব্যবহার করেন না। ঋত্বিকের ছবিতে সঙ্গীতের বিচিত্র ব্যবহার ঠিক এর বিপরীত। ঋত্বিক মনে করেন সঙ্গীত অত্যন্ত সংকেতবহ, সেই সংকেত তাঁর কাজেই তা ব্যহত হয়— তার পেছনে একটা সচেতন নকশা

থাকে। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অপর একটা স্তরে সমান্তরালভাবে ছবির বক্তব্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। সত্যজিৎ co-incidence পছন্দ করেন না, ঋত্বিক সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে বলেছেন co-incidence টাকেই একটা form হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। সত্যজিৎ কোন রকম ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেন না, 'মেঘে ঢাকা তারা'তে শুধু নয় ঋত্বিকের সব ছবিতেই ওটা মারাত্মক, হয়তো ইচ্ছে করেই রাখেন— আবেগপ্রবণ বাঙালি জীবনে যেহেতু ওটা খুব বেশি।

সত্যজিতের শিল্পবোধ, জীবনবোধ, কল্পনাশক্তি, vision, সত্যজিতের style, তাঁর রীতি, তাঁর নিষ্ঠা, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর ডিসিপ্লিন, ঋত্বিকের সঙ্গে এ-সবের মিল নেই— ঋত্বিক শিল্প বলতে যা বোঝেন, যেমন করে বোঝেন, সত্যজিৎ নিশ্চয়ই সেভাবে বুঝতে চান না, ঋত্বিকের শিল্পবোধ সত্যজিৎ থেকে ভিন্ন বলেই তা আমাদের হৃদয়ে এসে ধাক্কা মারে অন্য কোনভাবে। ...."

কানাল, মিরাক্‌ল ওয়ার্কার, মসিয়েঁ ভার্দু, হ্যাপিনেস অব আস এলোন, বাইসাইকেল থীফ, হিরোসিমা মন আমুর, ব্যাটল্‌শি্‌প পোটেমকিন, অপুর সংসার ইত্যাদি বিভিন্ন দেশীয় ছবির পরিচালকরা যেমন তাঁদের চলচ্চিত্র সৃষ্টিতে ডি-ড্রামাটাইজেশন-এর আশ্রয় নিয়েছেন তেমনি ঋত্বিক ঘটকও তাঁর তিতাসে। তবে আঁদ্রে ওয়াইদা, চ্যাপলিন, আইজেনস্টাইন, রেনে, ফেলিনি, ক্রুফো, ভিসকন্তি এবং সত্যজিৎ এদের চাইতে ঋত্বিক ঘটক কিছুটা বেশি ভিন্ন, জেঁকো এবং অপরিচিত। পার্থপ্রতিম চৌধুরী এ প্রসঙ্গে তাঁর এক চিত্রালোচনায় বলেছেন "..... কিন্তু ডি-ড্রামাটাইজেশন-এ গতির মাধ্যমই সব সময় অপরিহার্য নয়, অপরিহার্য হয়েছে ইঙ্গিত, ইঙ্গিতের তীব্রতা, এবং তারপরেই এক নিদারুণ প্রচন্ড অব্যক্ত অনুভূতি, সিনেমার ভাষায় ডেড মোমেনটাম সৃষ্টি করার প্রাখর্যে। এই ডেড্‌ মোমেনটাম বা জিরো ফিলিংস-এর ইনফিনিট সেন্স ছায়াছবিতে সর্বাধুনিকতার লক্ষণ, ফেলিনি বা রেনে, ক্রুফো, ভিসকন্তি এবং ভারতের সত্যজিৎ রায় আর ঋত্বিক ঘটকের তুলনায় বহুলদৃষ্ট, স্বতঃস্ফূর্ত এবং বলিষ্ঠ। ঋত্বিক প্রতিভার মহৎ উন্মেষ অযান্ত্রিকে। 'অযান্ত্রিক' ছবির শিল্পচিন্তায় প্রায় সর্বত্রই সিনেমার এক নতুন ভাষা কাজ করেছে বা 'পথের পাঁচালী'র সর্বত্রই সিনেমার এক নতুন ভাষা কাজ করেছে যা 'পথের পাঁচালী'র বিস্ময়কর সাফল্যে চিহ্নিত না হয়েও স্বতন্ত্র। অযান্ত্রিকের সিনেমার ভাষা রোম্যান্টিক নয়, তথাকথিত সিনেম্যাটিক নয়, লিরিক্যাল নয়, অ্যানালজিক্যাল নয়, এসব থেকে আলাদা হয়েও বিশিষ্ট। এই অর্থে বিশিষ্ট যে এ ছবি আগাগোড়া জাতের ছবি, চিত্র স্রষ্টার ট্রিটমেন্ট লাইন এ ছবিতে গভীর সুতীক্ষ্ণ এবং শিল্পসন্ধানী। এ ছবির ভাষা পজিটিভ— অসম্ভব ধার ছিল 'অযান্ত্রিক' স্রষ্টার স্বতঃস্ফূর্ত রুক্ষ্মতায় এবং লাবণ্যে।" যার এতটুকু নিরুদ্দিস্ট হয়নি তিতাসে। বরঞ্চ ভিজ্যুয়াল ইমেজ এবং সাউন্ড ইমেজের কমপেয়ার এন্ড কনট্রাস্ট এ ছবির পাঙ্কচ্যুয়েশনগুলোকে এসটাবলিশ করতে সহায়ক হয়েছে অতিমাত্রিক।

আদি-মধ্য-অন্ত নীতিকে ঋত্বিক তিতাসে এখন সব ছবিতেই পরিহার করেছেন। তাঁর ছবির ইলাসট্রেশন, আইডেনটিফিকেশন, প্রিপারেশন, ক্লাইমেক্স, কমপ্রিহেনশন, এগুলো

চিত্র সম্পাদনার ধারাবাহিকতায় অনুপস্থিত থেকেছে। তিনি চিত্র সম্পাদনার যথা প্রচলিত harmony- কে উপেক্ষা করে স্ব-সৃষ্ট চিত্রকল্পের এসটাবলিশিং মুড তৈরি করেছেন। গদারের ছবির চরিত্রসমূহের ক্ষণস্থিতি-দীর্ঘস্থিতি এবং তাদের আগমন প্রস্থান ও আচরণ যেমন চলিত নিয়মকে অবজ্ঞা করে তেমনি ঋত্বিকের চিত্রাঙ্গিকও প্রথানুগ নয়— বাস্তবানুসরণ, জীবনদর্শন, দেশকালের উপস্থাপনা। উপাদেয় গল্প নেই — পুনরাবৃত্তি আছে— প্রচলিত অর্থে ভারসাম্যহীন এবং গল্পের মেজাজ যা হাস্যকর। প্রতীক বিরোধ এবং প্রতীক সমর্থনে তাঁর আঙ্গিকের অনিবার্য লক্ষ্য হচ্ছে গূঢ় মনোবিশ্লেষণাত্মক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়া। ফেদেরিকো ফেলিনির 'এইট এন্ড হাফ' এবং 'জুলিয়েট অব দি স্পিরিটস্' কিংবা ভিন্নার্থে রেনের মনোলগধর্মী ছবি 'লাস্ট ইয়ার ইন ম্যারিয়েনবাদ'-এর মত শিল্পস্নাত 'তিতাস একটি নদীর নাম' আপাত দুর্বোধ্য বিরক্তিকর বলে আখ্যায়িত হলে টাস্‌কী খাবার কিছু নেই। কেননা চলচ্চিত্রের দুর্বৃত্তরা যদি তাদের অপরিশোধিত মন্তব্যের দুর্ভাষণে একে ব্যর্থতা বলেও উল্লেখ করেন তবু সেক্ষেত্রে ঋত্বিক ঘটকের বক্তব্য থেকে যায়— "আমাদের জাতীয় culture complex যেভাবে constellate করেছে তার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হবার চেষ্টা আমার সব ছবিতেই করেছি, যার ফলে হয়তো সব সময় সহজবোধ্য থাকতে পারিনি, শুধু ওদেশে নয়, এদেশেও। তার কারণ আমার অক্ষমতা ছাড়াও আর একটা আছে। সেটা হচ্ছে আমাদের দেশ— বিশেষ করে তার মুখর অংশ—খুব সহজেই এই যুগে শেকড় হারিয়েছে। এটা একটা অত্যন্ত তিক্ত বাস্তব ঘটনা। এরং এই শেকড়হীন ভদ্রশ্রেণী কোন অবলম্বনই এখনও ধরে উঠতে পারেনি। আর অনেক মারাত্মক ঘটনাই ঘটেছে, তার মধ্যে আমার ব্যর্থতা অতি তুচ্ছ একটা ঘটনা মাত্র।"

তিতাসের পাড়ের মানুষ, গোকর্ণঘাটের সেই জীবন—ঝড় রৌদ্রে যারা জলে নৌকো ভাসায়, নদীতে জাল ফেলে, উঠোনে গাবের খাদা চরকী-টেকো-তকলী নিয়ে সুতো কাটে, প্রকৃতি পরিবেশে যাদের জীবনে আসে সুখ-আনন্দ-গান- পার্বণ-দারিদ্র- অভাব-অসুন্দর-ঈর্ষা-বিবাদ-মৃত্যু—এগুলোর মুখোমুখি ঋত্বিক ঘটক তাঁর ক্যামেরার চোখকে এনে দাঁড় করিয়েছেন। এর প্রত্যেকটা এপিসোড জীবনের টুকরো টুকরো ছবি—সমগ্রতায় 'তিতাস একটি নদীর নাম'।

মাঘ মণ্ডলের ব্রত। বাসন্তী-সুবল-কিশোরের ছেলেবেলা। সঙ্গীতমুখর চৌয়ারী-ভেউরা ভাসানো জীবন। রামপ্রসাদ তিতাসের জলের সমান্তরালতায় দৃষ্টি রেখে বলছে 'মরণকালে যেই জল মুখে না দিলে পরানডাতো আর বাইর অল্পনা, একদিন হয়ত দেখুম তিতাসে সেই জলটুকুও নাই। শুকাইয়া খটখইট্টা অইয়া গ্যাছে—ড্যাংগা (যে রামপ্রসাদ সত্যি একদিন তিতাসের চর দখল নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে লাঠালাঠি করে মারা যায়, তিতাসে যখন সত্যি জল নেই— শুকনো। জল গেছে, মালোরাও গেছে— এটা সে মানতে চায়নি)। কিন্তু ক্যামেরা ততক্ষণে রামপ্রসাদ বাসন্তীকে ছাড়িয়ে তিতাসের জলে। নৌকো—নৌকোর পাল। একটা। দুটো। ক্রমশ অনেক।

সময় অতিক্রান্তের দু'টো শটই নেয়া হয়েছে তিতাসের জল-আকাশ-নদী-নৌকোর পাল ছুঁয়ে। টাইম ল্যাপস-এর প্রচলিত রীতিগুলোকে অগ্রাহ্য করে এ ক্ষেত্রেও তিনি

অপরিচিত রাস্তার ধুলো কঙ্করে পা রেখেছেন।

যেমন নদীর পাড়ে অল্প পানিতে ধীরস্বভাব ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে। রাজার ঝি বালু-জলে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। রাত্রি শেষ। সূর্য ওঠার আলোময় সংকেত গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, নেমে এসে রাজার ঝিকে তুলে নিল। পুরো ফ্রেম জুড়ে একটা পাল এসে ঘুরে গেল। তারপর আরও। নদী-জল-আকাশ। পাল তোলা নৌকা। একটা, দু'টো, অনেক। বর্তমানে প্রবাহিত অতীতমুখী সময়–ক্রমাগত ভবিষৎ। জীবন যে রকম।

ঋত্বিক ঘটকের নিজস্ব একটা evocation অর্থাৎ চাক্ষুষ দৃশ্যবস্তুর অতীত অবস্থা সৃষ্টির বিন্যস্ত ক্ষমতা আছে। অযান্ত্রিকে যেমন নির্জন দীঘির পাড়ে রাস্তার ওপর ভাঙা গাড়ি থামিয়ে বিমল 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়, গান গায় তেমনি তিতাসেও 'লীলাবালি' গানটির রিপিটেশন এবং সরোদের সুষম ব্যবহার ঐ একই কারণে। তিতাসে ঋত্বিকের দৃশ্যগঠনশৈলীর অনন্যতা এবং বলিষ্ঠতা ছবির প্রতিটি স্তর এবং তন্নিস্ট ভাব-বিশ্লেষণে দুর্ধর্ষ। বিশেষত কিশোর এবং রাজার ঝি'র যন্ত্রণাময় মানসিকতার অস্থিরতম নির্জনতায়। ক্রমবদলের গভীরতা নির্দেশ যার চূড়ান্ত পরিণতি। উপলব্ধির উচ্ছন্নতা। উজানীনগরের খলাতে দোল পূর্ণিমার উৎসবে রাজার ঝি অজ্ঞান হয়ে পড়ল-কিশোর তাকে পাঁজা কোলে করে তুলে নিয়েছে–সরোদ নিঃসৃত সুরে তার অস্থির দৃষ্টি রাজার ঝি'র শান্ত মুখে, এই একই দৃশ্য পুনঃসৃষ্টি করা হয়েছে আর একটি দোল উৎসবে, পাগল কিশোর যখন স্মৃতির মন্দিরে অনুপ্রবিষ্ট।

রাজার ঝি–সে তখন অনন্তর মা। কালোর মা'র ভিটের মুংলীর সঙ্গে চার ঘর হয়ে। বাসন্তী তখন সুবলার বিধবা বৌ, রাড়ি, অনন্তর মাসী। এ দু'টি চরিত্রকে চিত্রনাট্যকার কিংবা পরিচালক কখনো এক হতে দেননি। তাই 'পরস্তাব' বলতে গিয়ে অনন্তর মা যখন বলছে–জানিনা, বাসন্তী তখন বলছে–জানি, কিন্তু কমুনা। এবং আলস্তির দিনে পিঠে বানানোর আনন্দময়তার মধ্যেও দু'টি ভিন্নমুখী চরিত্রের সমান্তরাল দুঃখ আলোকিত।

যেমন বাসন্তী যখন মা-বাবাকে বলছে 'শিশুকালে বিয়া দিছলা। মইরা গ্যাছে। জানলাম না কিছু, বুজলাম না কিছু, সেই অবুঝকালে ধম্মে কাঁচা বাড়ি বানাইয়া থুইছে। সেই অব্দি পোড়া কপাল লইয়া বনে বনে ঘুরি। তোমরাত সুখে আছ, তোমরা কি বুঝবা আমার দুঃখের গাঙ কত গহীন।' আবার অনন্তর মাকে এবং প্রকারান্তরে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এই বলে যে 'আমারও দিদি সময় সময় মনডা অচল হইয়া পড়ে। কিন্তুক আমি প্রতিজ্ঞা কইরা রাখছি এইভাবেই চালামু।' সে প্রতিজ্ঞার চূড়ান্ত–যখন বিপর্যস্ত মালো পরিবারের ক'টা নারী অসম্ভব নীচে নেমে গিয়ে জীবনকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছে, তখন বাসন্তীর প্রত্যয়াংকিত চোখ-মুখের বিগ ক্লোজআপে সমূহ চরিত্রগুলোকে অনুপস্থিত করে দেয়।

অন্যদিকে অনন্তর মা যখন মাত্রিক বিশ্বাসে ধুচনীতে পিঠে নিয়ে পাগলের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন কিশোর তাকে দা উঁচিয়ে মারতে গেল। কিন্তু অনন্তর মা'র অবিশ্বাস্য-আবেগ-স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে সে থেমে গেল। সাউন্ডট্র্যাকে কয়েক মুহূর্ত কোন শব্দ নেই। তারপর সেই বিয়ের গানের রিপিটেশন—'লীলাবালি বর ও যুবতী সই গো কি দিয়া সাজাইমু তোরে'—সঙ্গীত ক্রমে উঁচুতে। কিন্তু ক্যামেরা যখন আপতিক অর্থে কিশোরের চোখে এল গান তখন উল্টো ট্রাকে। বিস্মরণ। বিস্মৃতি। মনে থাকা না থাকা। নির্জনতার মধ্য দিয়ে কিশোরের প্রস্থান ক্রমশ অন্ধকারে। সেই অনন্তর মা'র কিন্তু কোন প্রতিজ্ঞা নেই বাসন্তীর মত। সে তার বিশ্বাসের অসহায়তায় নিজেকে সমর্পিত করছে এই বলে যে 'আমি কেবল জানি একলা জীবন চলেনা, পাগলেরে পাইলে তারে লখ্ কইরা জীবন কাটাই।' এখানেই চরিত্র দু'টির ভিন্নতা।

ছবির মা'র অজ্ঞান দেহটাকে তুলে নিয়ে কিশোর নদীর পাড়ে উঠে আসছে—যখন সে বিশ্বাসের কণ্ঠদেশে এবং অনুভবের বুকে মুখ রেখেছেন—কীর্তনের সুর ক্রমে উঁচুতে 'একি অপরূপ শোভা মনোহর, রাধা-কৃষ্ণের মিলন হোল দেখিতে সুন্দর.....।' আবার গভীর নিস্তব্ধতা। হঠাৎ কোলাহল। লাঠি হাতে একদল লোকের প্রবেশ। প্রহার। দু'টো অচেতন দেহ পড়ে আছে তিতাসের বালুতে। শেষের শটটি নেয়া হয়েছে তিতাসের পাড়ে রাখা একটা অকেজো নৌকোর মধ্য দিয়ে। তারপর কিশোরের মৃত্যু—প্রশান্তি—একটা পাখীর বিশ্রী ডাক—অনন্তর "মাসী" বলে চীৎকার—বাসন্তীর কান্না বৃষ্টি। সুবর্ণরেখায় সীতার মৃত্যু দৃশ্যে যেমন সঙ্গীত ছিল না তেমনি তিতাসেও।

শ্রাদ্ধের দিন। রাত্তিরে অনন্তর মাসী ধীর গলায় বলছে—অনন্ত শুনছে, নতুন লাগছে কথাগুলো—"মা যদি মইরা যায় সেই মা আর মা থাহে না, শত্তুর অইয়া যায়। মইরা যেইহানে যায় পোলাডারেও হেইহানে লইয়া যাইতে চায়। তার আত্মাডা পোলাডার চাইর পাশে ঘুইরা বেড়ায়। একলা পাইলে কিংবা আন্ধারে, বট, তেতুল গাছের তলায়। কিংবা নদীর ঘাটে পাইলে কাছে কেউ না থাকলে লইয়া যায়। নিয়া মাইরা ফালায়।" সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠে অনন্ত—"না, আমার মায় অমন না। মায় আমারে দেখা দেয়, চোখে বড় ব্যথা, কান্দে। কী জানি কয়, ঠাহরও পাইনা।" অতঃপর অনন্তর মা'র ভগবতী বেশ— বাসন্তীর কোলে অনন্ত শুয়ে আছে—কাঁসর ঘন্টা বাজছে—ধূপ ধোঁয়া—এ দৃশ্যকল্প রচনার সম্পূর্ণতা একটা ঝড়ে। এর আগে টুকরো টুকরো দু'তিনটে শট-এ অনন্তর অবচেতন মনে তার মায়ের ভগবতী রূপ কল্পনার ইমেজটাকে যত্নতার সঙ্গে গড়ে তোলা হচ্ছিল।

তিতাসে ঋত্বিক ঘটকের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম যেটুকু তা হচ্ছে নৌকা বাইচের আরম্ভটা এবং এর শেষ। চিত্রালোচনা প্রসঙ্গে অনেকেই হয়ত এর শিল্পকৃতি নিয়ে দুর্বল ধিক্কার উচ্চারণ করবেন এবং তর্কের সিঁড়িতে অসংখ্য গ্রাম্যতাপূর্ণ উদাহরণ-মন্তব্য এনে দাঁড় করাবেন। কিন্তু যুক্তি তর্কের ধার ধারেন না ঋত্বিক ঘটক। তাই তিতাসের পরিণতির কথা ভেবেই তিনি

কখনো পিকাসোর নন-কম্পোজিশন'- এর আশ্রয় নিয়েছেন আবার কখনো আইজেনস্টাইনের 'দি জেনারেল লাইন' কিংবা দভ্‌ঝোঙ্কার 'আর্থ'-এর মত চলচ্চিত্রশিল্প মাধ্যমকে অনেকটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করে চিত্র- সম্পাদনার নতুনতর পরীক্ষা নিরীক্ষার সান্নিধ্যে চিত্রল ভাষায় একটি সমাজের অনেকগুলো জীবনের ধংসোন্মুখীনতার প্রতি ঈঙ্গিত করেছেন।

নৌকা বাইচের ঐ একটি শ্বাসরুদ্ধকর-ভয়ঙ্কর-সুন্দর দৃশ্যময়তার জন্য তিনি অনেকগুলো টুকরো টুকরো দৃশ্য নির্মাণ করেছেন। যেমন উদয়তারার সঙ্গে অনন্তর চলে যাবাব দৃশ্য-অনন্তর দৃষ্টিতে তার মাসীর জলভেজা পা থেকে মুখ পর্যন্ত তুলে আনা- ঘাটে কাপড় আছড়ানোর শব্দ- যেখান থেকে অনন্তকে নিয়ে নৌকোটা চলে গেল সেই অস্থির জলটুকুতে দৃষ্টি রেখে বাসন্তীর 'কুত্তা' শব্দোচ্চারণে স্নেহকে বিতাড়িত করে ক্ষোভকে আমন্ত্রিত করা- কান্নার সঙ্গে প্রকৃতি-নিয়তির একাত্মতা একটা বৃষ্টিতে, যখন ফ্রেমে রোজীকে প্রলম্বিত রেখে একটা খালি নৌকা চলে যাচ্ছে।

তারপর নৌকা বাইচের প্রস্তুতি। এক একটা নৌকো, ভিন্ন ভিন্ন গান। জীবনময়তা। সংগ্রামী মানুষের পরিচিত মুখ। জলের জীবন। মুখর তিতাস। এরই মাঝে অনন্তর সঙ্গে অনন্তর মাসীর সাক্ষাৎ। দু'টি প্রবল মাতৃস্নেহ মনের অন্তর্প্রতিযোগিতা রূপ নিল যখন একটি কলহে- সেখান থেকে কাট করে নৌকা বাইচের শুরু। আবার প্রচণ্ড উত্তেজনাকর নৌকা বাইচের শেষে ভীষণ রকমের নিস্তব্ধতা। নিঃশব্দ ফ্রেমে তিনটি মুখ-বাসন্তী-অনন্ত-উদয়তারা। দৃষ্টি প্রসারিত তিতাসের আবির জলে। একটি দিনের শেষ-বেলা ডুবছে ক্রমশ। কর্মোৎসব ক্লান্ত ছায়া ছায়া ঘরমুখো মানুষগুলো তিতাসের ধীরস্থির জলে অল্প শব্দে বৈঠা ফেলে সে নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

অনন্ত যেমন একদিন বনমালীর সঙ্গে নৌকোয় চড়ে মাছ ধরতে যেতে চেয়েছিল ঃ জালের নক্‌শী জল ফোঁটার ফাঁকে ফাঁকে অনন্তর গলার ধড়ার সুতোয় হাত রাখা আদুর গা, উজ্জ্বল চোখ, দুর্বল দুটি হাত দিয়ে জোর করে নৌকোর গলুই ধরে রাখার অন্তিম চেষ্টা। এবং অতঃপর জলের ওপর দিয়ে ক্যামেরায় অনন্তর পেছন থেকে নৌকোর চলে যাওয়া-ক্রমশ দূরে-একটা কচুরী পানা ভেসে যাওয়া-এ দৃশ্যের সঙ্গে বাসন্তীর নিরুত্তাপ খেদ "অনন্ত যেমন আমার কাছে একটা নাম, তিতাসও তেমন একটা নাম অইয়া রইল। নামডা আছে নদীডা মরছে"- এর যে সুসংবদ্ধতা এটা ঋত্বিক ঘটকের চিন্তা-সৃষ্ট।

আবার যেমন ছবির শেষ অংশটুকু। ঋত্বিক ঘটকের কাব্যিক সৌন্দর্য অলংকরণ-মরুময়করণ বাসন্তী কাঁথা জড়িয়ে উঠে আসছে- তিতাসের উঁচু নীচুবালু পাড় ছেড়ে, নদীর গভীরে-এ দৃশ্য বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতম চিত্রকর্মের সঙ্গে তুলনীয়। শুকিয়ে যাওয়া তিতাসের বালু খুঁড়ে জল তুললো বাসন্তী- অলস দু'হাতে ঘটিটাকে জাপটে মুখের কাছাকাছি তুলতেই প্রায় সবটুকু জল গড়িয়ে পড়ল-মুহূর্তে শুষে নিল তা তিতাসের বালু, ঠিক তখন

যখন ক্লোজ-আপে বাসন্তীর পিপাসার্ত চোখ মুখ, সেই দৃষ্টির অবাকতায় ভেসে এল নারকেল পাতা বাঁশির এলোমেলো সুর। মালোদের সম্ভাবিত শত্রু কৃষকের দখল করা চরে ফসলের মাথা দোলা- তার মাঝ দিয়ে উঠে এল একটা জীবন। সেই ফসলের ক্ষেত ধরে গামছা কাছা দেয়া আদুর গায়ের শিশুটি ছুটে গেল কোমরের ঘন্টি বাজিয়ে। বাঁশিতে সুর তুলে। পাতার বাঁশি। ভেঁপু। সেই স্বপ্ন। সংগ্রাম। জীবনের -মৃত্যুর। অতঃপর পুরো ফ্রেমে বাসন্তীর আনন্দময় বেদনাঙ্কিত মুখের শটটি ফ্রিজ হয়ে যায়। ঋত্বিক ঘটকের এই মার্কসীয় ভঙ্গি তাঁর সব ছবিতে জীবনের সত্যে স্পর্শায়িত।

তিতাসের সমাজ বিশ্লেষণে চলচ্চিত্রকারের একটা চেতন মন কাজ করেছে গভীর অনুভবে। যে কারণে সমবায় ঋণদান সমিতির ফিসারী শাখার ম্যানেজার বিধুভূষণ পাল মালোদের যাত্রা দিয়ে অন্তরে মেরে এবং ট্যাহা দিয়ে প্রাণে মেরে ব্যাং নাচান নাচানোর দুঃসাহস দেখায়। রজনী পাল যদিও জানে মালোরা তিতাসের জলে নেমে মিথ্যে কয়না কিন্তু আশ্বস্ত হয় এই ভেবে যে রাধাচরণের দুঃস্বপ্ন সত্যি হলে তিতাসই এদের পাক খাওয়াবে। মালোদের সামাজিক নীতির বন্ধনও শ্লথ হয় তামসীর বাপের মত বামুন কায়েত ঘেঁষা স্বার্থান্বেষী মালোদের কারণে। "পান-তামাক খাবা দশজনের দশ কতা হুনবা" এবং ভারতের বাড়ির উঠোনচালার বিচার দৃশ্য (যা প্রায়শ লং শট এবং মিড শট এ দেখানো হয়েছে) যত না বাস্তব তার চাইতে সত্য কেষ্টচন্দ্রের মত নৈতিক দুর্নীতিবোধসম্পন্ন বিশ্বাসহন্তার প্রতি রাম প্রসাদের আক্ষেপ "শাস্ত্র এগোরে ভেড়া বানাইয়া থুইছে। আমি তো ধর্মের শত্তুর।" কিন্তু এর বিপরীতও আছে— প্রতিবাদ। বিপর্যয় হতাশা মৃত্যু যখন গ্রাস করছে মালো সমাজকে তখন বাসন্তীর পুরুষ্ট কণ্ঠের সতেজ চীৎকার— 'মালো সমাজের গায়ের রক্ত কি তিতাসের জল অইয়া গ্যাছে!"

আবার এই সমাজ বিশ্লেষণের কারণেই কাদির মিয়াকে আনা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্ম সম্প্রদায়ের বিভিন্নতায়ও সমাজে রাম প্রসাদ এবং কাদির মিয়াদের মত সমান্তরাল চরিত্রের মানুষ বিদ্যমান। যদিও সে বাস্তববোধের বিশ্বাস থেকে রমুকে বই হাতে মক্তবে না পাঠিয়ে পাঁজন হাতে গরুর পিছে মাঠে পাঠাতে বেশি আগ্রহী।

এ ছবির ক্ষেত্রে ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে যে কথাটি অবশ্য বলবার তা হচ্ছে তিনি বাংলদেশের যথাপ্রচলিত সুসজ্জিত সেটের বিরুদ্ধে একটি স্বধর্মী প্রতিবাদ। যদিও কাহিনী বিস্তারের স্বাভাবিকতায় তাঁকে এটি করতেই হোত, যেমন করতে হয়েছিল ইতালীয় নব্য বাস্তববাদী ফরাসি চলচ্চিত্রকার জাঁ রেনোয়ার সুযোগ্য সহকারী ভিসকন্তিকে তাঁর 'ওসেসিওনের' বেলায়। তাতেও প্রকৃতি পরিবেশের একাগ্রতা লক্ষণীয়। বিশেষত তিতাসের কিছু শট নির্মাণে বিশ্বাসযোগ্য স্থান-কাল-সময়-মুহূর্ত-পরিবেশ নির্বাচন। যেমন মাগন সর্দারের চরিত্রটি বোঝাতে তাকে দাঁড় করানো হয়েছে নদী পাড়ের শিকড় প্রায় উপড়ানো একটা উঁচু নারকেল গাছের তলায়। এমন আরও অসংখ্য টুকরো টুকরো দৃশ্য আমাদের জীবনানুভবকে স্পর্শ করে। যেমন শুকদেব

পুরের 'রাই জাগো' গানের সকাল, কালোর মা'র উঠোনে উদয়তারার শ্বশুরের তুমরী খেলার বেত্তান্তো, আলন্তির দিনের পিঠে বানানোর রাত, শ্রাদ্ধের দিন অনন্তর ভগবতী রূপ কল্পনার পর বৃষ্টিজলে দু'টো হাঁসের নিঃশব্দ ভেসে যাওয়া, বৌ নিয়ে ফেরার পথে কিশোর সুবলের কথাবার্তা, টিমটিমে আলোর নৌকোর 'আল্লাজীর লীলা কে বুঝিতে পারে' গান, কাদের মিয়ার সঙ্গে ওক্সছলের বৌ খুশীর কথা কাটাকাটি, বাসন্তীর মা'র সঙ্গে বাসন্তীর চুলোচুলি ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও আছে, যেমন— রাজার ঝি'র rescue নদীর পাড়ে এবং মৃত্যুও তাই, বাসন্তীর আন্তর্জিজ্ঞাসার সঙ্গে ঢেঁকির শব্দ, মালোদের গৃহে যখন আগুন লাগানো হচ্ছে তার মধ্যে হঠাৎ করে একটা মাচাঙ-লাউয়ের মুহূর্ত উপস্থিতি, রাজার ঝি'র 'পরস্তাব' বলার সময় 'পাগল অইল'—কথার সঙ্গে সঙ্গে পিঠার ছেঁকা শব্দ ধোঁয়া; মালা বদল, এবং আবির মাখানোর সময় কিশোরের দ্রুত অস্থিরতা এবং রাজার ঝি'র স্থির যত্নতা, বাসন্তী যখন অনন্তকে তাড়িয়ে দিচ্ছে তখন অনন্তর কেমন একটা মুখভঙ্গি, ছড়ানো ভাতে কাকের মিছিল, 'কাউয়ার বাচ্চা' বলে অনন্তকে চড় মারা, অনন্তকে নিয়ে চলে যাবার সময় উদয়তারার অসম্ভব স্থির মুখে ক্রমশ কঠিন একটা হাসির আভাস—এমন সব চিত্রকল্প।

ঋত্বিক ঘটকের ডিটেলের কাজকে কেবল চমৎকার-চমৎকার শব্দ মেখে বললে সত্য-সুন্দর-শিল্পকে উপেক্ষা করা হয়। ঝড়ের পর নিকানো দাওয়া, বাসন্তীর তেলের শিশি রাখা, কাদের মিয়ার ট্যাক থেকে পয়সা দেয়া, বাসন্তীকে মারতে গিয়ে পিঁড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার শব্দ, গোকর্ণ ঘাটের দু'কেটা ডাক, গেরাপী দেয়া নৌকোয় অনন্তর উঠে আসা এবং বৃষ্টি ভেজা আম গাছের নিচে জমা জলে পাতায় ধরে থাকা ফোঁটা ফোঁটা জল পড়া, এগুলোর জন্য নিশ্চয়ই ঋত্বিক ঘটককে ভাবতে হয়েছে—সেইখানেই তাঁর শৈল্পিক অসার্থকতা (?) কিংবা মানসিক সুস্থতার প্রশ্ন। এবং এর উত্তর।

তারপর যেমন তাঁর great mother— এটাকেও established তিনি করেছেন তিতাসের শরীরে। বাসন্তী তাই ঘরের দাওয়ায় শুয়ে মাকে বলে 'মা, একটা জিনিসই বুঝলাম—এই দুনিয়াতে মা-ই সব, মা ছাড়া আর কিছু নাই।' এই মা কখনো বাসন্তী নিজে, কখনো রাজার ঝি আবার কখনো উদয়তারা। 'জ্যানটিপে' নয় কেউ।

ফেদেরিকো ফেলিনি ইতালীয় চলচ্চিত্রবিদ তুলিয়ো কেজিচ-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর ক্যামেরাম্যান মটেলী এবং ভেনানজো প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন যে 'ক্যামেরাম্যান পরিচালকেরই একটা হাত যা কিছু নির্দিষ্ট ফল পেতে সাহায্য করে। যে আমাকে অনুসরণ করে ও কথামত কাজ করে, সেই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান। সে যদি বুদ্ধিমান হয় তবে ভালই, কেননা, বুদ্ধি তো আর ক্ষয়ে যায় না। নির্দিষ্ট রুচিবান ক্যামেরাম্যান অপেক্ষা মনোনয়নকারীকে আমি পছন্দ করি। এমন একজনকে দরকার যেন আমার ইচ্ছেটা ধরতে পারবে এবং সেই ইচ্ছাকে রূপায়িত করার জন্য নিখুঁত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে।" অবিশ্বাস্যভাবে যেমন করেছেন বেবী ইসলাম। তিতাসে। নিরুত্তাপ নিষ্ঠাবান এই চিত্র গ্রাহকের

ক্যামেরা বিশ্বাসযোগ্যভাবে সহায়তা করেছে তিতাসে। তাঁর কৃতিত্ব ছবির পা-মাথায় বিতরিত। তাঁর wide angle -এর depth যেমন দৃশ্যমুক্তি ঘটিয়েছে তেমনি ক্রিয়েটিভ কিছু মিড শটও এক একটি চিত্রকল্পকে করেছে গর্ভবতী।

ক্লাসিক কিংবা আর্ট ফিল্মের স্বপক্ষে যে দু'টো ব্যাপার অবশ্য ক্রিয়াশীল এবং অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় তা হচ্ছে সম্পাদনা এবং এফেকট সাউন্ড। কিন্তু এ দু'টোই পরিপূর্ণতা পায়নি ছবিটিতে। চেষ্টার অন্তিমে যদিও তা আন্তরিক। এর ভিন্ন কারণ হতে পারে ছবির অ-আ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত ঋত্বিক ঘটকের উপস্থিত না থাকা। কিন্তু আরও একটা প্রকান্ড কারণ হচ্ছে, এফ.ডি.সি.র অসুস্থ যন্ত্রপাতি এবং এর অব্যবস্থা। আর নয়ত 'তিতাস একটি নদীর নাম' এর চাইতেও বিশুদ্ধ ছবি হতে পারত।

তারপর আরও যে কথা তা হচ্ছে তিতাস যখন একটা শিল্প ছবি— ঋত্বিক ঘটক যেটা নির্মাণ (make) করেননি, সৃষ্টি (create) করেছেন, যে চলচ্চিত্র সৃষ্টি কিংবা ছবির কিছু ত্রুটি স্বাভাবিক ভাবেই অনেক জিজ্ঞাসা এবং প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। ঋত্বিক ঘটকের individualism ও যেখানে প্রায় অপারগ অসমর্থ এ ত্রুটিগুলো ডিঙ্গিয়ে তিতাসকে একটি সার্থক শিল্প সৃষ্টির পর্যায়ে নিয়ে যেতে। যেমন রাজার ঝি'র মৃত্যুদৃশ্যের elongation, রামপ্রসাদ এবং কাদির মিয়ার একভাবত্ব, মালো পাড়ায় আগুন লাগানোর দৃশ্যটির অবাস্তবতা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজার ঝি'র আধুনিকত্ব, সংলাপ উচ্চারণে প্রায় সকলের অশুদ্ধতা, আলন্তির দিনে পিঠা বানানোর সময় পাগল কিশোরের হঠাৎ স্বাভাবিক আচরণ, ঘরের খিল এঁটে বাবুকে ওভাবে হেনস্থা করে জলে ফেলে দেয়া। অস্পষ্ট এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় লিপি ইত্যাদি।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে তিতাস শিল্পোত্তীর্ণ ছবি নয়। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের পোষা সাংবাদিকদের দ্বারা তিতাস সমাদৃত হবে—এমন কোন কথা নেই। তিতাস যে সপ্তাহখানেকের বেশি চলেছে এই তো ঢের। এজন্যে প্রিয়জনের মৃত্যুর শোকের মত দুঃখ দুঃখ ভাব নিয়ে প্রযোজক পরিচালককে সান্ত্বনা দিতে বলেনি কেউ। বাংলাদেশে নির্মল চলচ্চিত্র আন্দোলনে তিতাস যে ধারাকে প্রবাহিত করেছে তা ক্রমশ ঢেউ তুলবে—ডুবে যাবে ভেসে যাবে আর সব।

রুগ্ন-রুচি গণদর্শকের কথা না-ইবা তুললাম। কেননা বংশ পরম্পরায় এরা জ্ঞানপাপী নয় আদৌ। মূলত তিতাসেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের দ্বিধাবিভক্তি—এদের একদল দায়িত্বশীল সৎ এবং চলচ্চিত্র শিক্ষিত। অন্যদল বলতে কি, থু-থু চাটা অতি হীন চাটুকার এবং মহামূর্খ। এরা চট করে চীৎকার ধ্বনি সহযোগে কাউকে অপমানিত করতে না পারলে কিংবা ব্যর্থ হলে কখনো 'বাজে' কখনো 'দুর্বোধ্য' শব্দের আশ্রয় নেয়। রেসকোর্সমার্কা জনগণ দু'হাত তুলে তাকেই সমর্থন জানায়। কিন্তু এজন্যে আমাদের এখানে কোন প্রতিবাদের শামিয়ানা টাঙানো হয় না, যেমন হয় ওদেশে, পশ্চিম বাংলায়—ধ্রুব গুপ্তের মাথার 'পর—'মহৎ সাহিত্য,

শ্রেষ্ঠ চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, সুগভীর সঙ্গীতের রসাস্বাদনের জন্য বিদ্যাবুদ্ধিগত প্রস্তুতিতে আমাদের কোন ক্লান্তি থাকবে না অথচ চলচ্চিত্র শিল্পের বেলায় তার আবেদনকে তাৎক্ষণিক এবং মুখের কাছে পাকা ফলটির মত সহজলভ্য হতেই হবে—এমন দাবির মধ্যে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় নেই'।

(সূত্র ধ্রুপদী, তৃতীয় সংকলন, ১৯৭৪, পৃ ১৮৭-২০৮)

তিতাস একটি নদীর নাম : বর্জিত পাঠ
অচিন্ত্য বিশ্বাস

১ প্রবাস খন্ডের ৫২ পৃঃ (নবম সংস্করণ ঃ ১৪০১) 'বাঁশিরাম মোড়লের ঘাটে যখন নৌকা ভিড়িল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।' বাক্যটির আগে বেশ খানিকটা পাঠ বর্জিত। যথা-

শুকদেবপুরের বাঁশিরাম (Sic) মোড়ল খুব 'মালদার' লোক। নদীর উজান ভাঁটি জুড়িয়া পাঁচমাইল তাঁর শাসনে। এই সীমানায় তাঁর বিনা অনুমতিতে কেউ জাল ফেলিতে পারেনা। এছাড়া বড় বড় তিনটা বিল আছে তাঁর। বর্ষা অন্তে সেচিয়া হাজার ভার মাছ পায়। আর আছে গুটি বারো 'খেউ'। মেঘনার বাঁকের পিছনে যে-যে অংশে স্বাভাবিকভাবে স্রোত ঝিমাইয়া পড়িয়াছে, সে-সব স্থানে গভীর জল দেখিয়া জলে ডুবিয়া যায় এমন জাতের সব গাছ গাছলা ফেলিতে থাকে। নদীর তলা থেকে উপরিভাগ পর্যন্ত। জলের উপরে থাকে ঘন দল-বনের গাঁথনি। জীবন্ত সে পাসা-বন বাড়িয়া আরো ঘন হইয়া যে ছায়ালোকের সৃষ্টি করে তারই আশ্রয়ে ডালপালার খোপে খোপে হাজার মাছেরা ঘর-সংসার পাতে। স্রোতের মুখে উজানভাটি যাইবার সময় বিশ্রামান্বেষী আমারপ্রিয় মাছগুলি একবার দেখিয়া যাইবার নাম করিয়া সেই যে ঢোকে আর বাহিরে হইবার নাম করে না। এর সুখ-নীড়ে বাঁধা পড়িয়া গিয়া, স্রোতের টানে ভাসিয়া চলার পরাধীন জীবনকে ধিক্কার দেয়, যাযাবর আপনদিগকে ছাড়িয়ে থাকিতেও ক্লেশ বোধ করে না। কেননা, এখানে স্রোতের টানাটানি নাই, এখানে অজস্র ডালপালায় শেওলা জম্মে, অনেক শামুক তার গায়ে গায়ে ডিম পাড়ে, খাওয়ার ভাবনা নাই। অনেক লোভাতুর মাছই এদিক সেদিন হইতে আসিয়া বাসা বাঁধে, সখ্য আর আত্মীয়তা ভাঙ্গিবে না। ডুব দিয়া মেঘনার তলায় গিয়া প্রত্যেকটি বাঁশের গোড়ায় মাটির সঙ্গে ঠেকাইয়া জালের কিনারা লটকাইয়া দিয়া আসে। ফাঁক থাকিলে চলিবে না। (তাহা হইলে তোলার সময় বেপরোয়া মাছের সামান্য ফাঁকটুকু বিশগুণ বাড়াইয়া বড় ফাঁক করিয়া নিজেরাও পালাইবে অন্য মাছেদের পালাইবার ডাক দিয়া যাইবে) একডুবে দশ বারোটা বাঁশের গোড়াতে জাল ঠেকাইয়া ভাসিয়া যখন ভোঁস করিয়া নিশ্বাস ছাড়ে, মনে হয় যেন জলেরই কোন জানোয়ার, লম্বা একখান বাঁশ ধরিয়া বিদ্যুতের মত হাত চালাইয়া তলায় নামে, আবার সেইটি ধরিয়াই ভাসিয়া উঠে। সারাদিন ভর ওঠানামার দরুণ কালো শরীরে

শেওলা জমিয়া যা রূপ হয় জলের কুমীর আর কি। জালের এই দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা হইয়া গেলে উপরের পানা-বন সরাইয়া ফেলে, বাঁশের আগায় হুঁক লাগাইয়া জলের ভিতর হইতে ডালপালা গুলি টানিয়া তুলে এবং নৌকা বোঝাই করিয়া তীরে নিয়া ফেলে। সব পরিষ্কার হইয়া যায়, কিছু থাকে না, থাকে শুধু মাছেরা। তখন তারা বুঝিতে পারে কি একটা যেন হইতেছে। এর মধ্যে একদিন গঙ্গা পূজা হয়। খেউকাটিতে জলে ডুবিয়া কত লোক চিরদিনের জন্য তলাইয়া যায়। কোথায় যায় কে জানে। লোকে বলে গঙ্গাদেবী লইয়া যায়। নিয়া চাকর বানায়। মাছের রাখুয়ালি করিতে হয় তাকে সেখানে।

সুবল শিশুর মত ভাবে, আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মাটির কোল হইতে নামিয়া বিপুল নদীর অতলতার মাঝে, সকল নদীর কর্ত্রী গঙ্গাদেবীর দরবারে, হুকম তামিল করিতে, এমন কতগুলি মানুষ না জানি আজ পর্যন্ত জমিয়াছে। তারা কি আর মানুষের মত কথা বলিতে পারে। গরু রাখালের মত হাতে পাচনি লইয়া ভোরে মাছগুলি নিয়া বাহির হয়, সারাদিন ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দিনের শেষে তাড়াইয়া লইয়া আসে। তাদের গায়ে কত শেওলা জমিয়াছে। মাছের তাকে ভয় করে,মানে। এমন একজনে যদি একপাল (মাছ?) জন্মিতে বিলম্ব হয় না। এখানে আরো সুখ আহারের প্রাচুর্য পাইয়া বড় মাছগুলি ছোট মাছগুলিকে ধরিয়া খাইবার তাগিদ ভুলিয়া যায়। পরম আনন্দে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা মাছেরা বাহির হয়, খেলে, বেড়ায়, কিছুদিনের মধ্যে বড় হইয়া উঠে। বর্ষার পর শরতের পর হেমন্ত, তারপর শীত-এতদিন সেগুলি তেলে মাংসে যৌবনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

তারপর একদিন প্রসঙ্গে তার চারিদিকে পড়ে জালের বেড়া

বাঁশিরামের প্রসঙ্গে তার 'খেউকাটার' এই লোভনীয় বিবরণ বলিতে বলিতে কিশোরের চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বাপের নিকট বাঁশিরামের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছে। শ্রোতে সুবল শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া গেল। তিলকের নিকট এসব পুরনো। সে প্রগাঢ় নিরাসক্তিতে হুকা-মুখে শুইয়া পড়িল।

'আচ্ছা কিশোরদাদা, মাছেরা জম্‌ল কেম্‌নে, একথা ত কইলা না।' জাল নামই 'খেউ জাল'। আমাদের দেশের খেউ জালের চেয়ে আরও শক্ত। আরো বেশী লম্বা। আর তিতাসের খেউ আর মেঘনার খেউত এক জিনিষ নয়। এখানে নদী যেমন গভীর, গাছপালা যেমন অনেক বেশি লাগে তেমনি মাছও পড়ে অনেক বেশি। আর এত বেশি মাছের ধকল সামলানো আমাদের দেশের মত তিন-সুতার জালের কর্ম নয়। একাজে এরা লাগায় 'পাঁচ সুতার জাল'। এক একখানা জাল এত বড় যে, তিনখানা নৌকা বোঝাই করিতে হয় একখানা জাল। এক একখানা জাল এত বড় যে, তিনখানা নৌকা একখানা জাল বহিয়া আনিতে। মুনিসগুলিও এখানে খুব সরেস। চারিপাশে বাঁশ পুতিয়া বেড়ার কাঠামো করে। তার উপর সেই জাল দিয়া দেয় বেড়া। সে এক কাজ বটে। তারা মানুষগুলি যেমন মোটা তেমনি শক্ত। শরীর কালো, চিক্ চিক্ করে। বিশে পঞ্চাশে মাছের গুঁতায় সে-শরীর বড় দেখিয়া মাছ

তাড়াইয়া আমার জালের ভিতর লইয়া আসে। দুর ছাই, তারা কি আর ততদিনে মানুষ থাকে, না কোনদিন মানুষ ছিল সেকথা মনে করিয়া রাখে। তারা ততদিন জলের জানোয়ার হইয়া যায়।

শোন্ সুবলা! কি ভাবিস্। অন্য ভাবনা ছাড়িয়া, যেদিন খেউ তুলে, আর মাটির সঙ্গে ঠেকাইয়া রাখিয়াই একটু একটু করিয়া জাল গুটাইয়া স্থান সংকুচিত করে। তলার জাল হাঁটাইয়া আনে বাঁশের খুঁটি চালাইয়া। যাইবে, তখন আর হাজার বাঁশ দিয়া পিটাইয়াও মাছের গতি ফিরানো যাইবে না। যখন অর্ধেক জাল গুটাইয়া আসে তখন ভিতরে এক কান্ড হয়। মাছেরা লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া,গুঁতাইয়া,হুড়াহুড়ি ধ্বস্তাধ্বস্তি পাড়াপাড়ি করিয়া তুমুল কান্ড বাধায়। অতগুলি বন্দী মাছ। বুঝিতে পারিয়াছে। মরিয়া হইয়া, মারাত্মক হইয়া, খেদায়-পড়া হাতীর মত সাংঘাতিক হইয়া বড় মাছগুলি চারপাশের জালের বেড়া আক্রমণ করিয় থাকে। একযোগে মাথা কুটিয়া একশা হয়। ব্যর্থ হইয়া দ্বিগুণ আক্রোমণ করিতে থাকে। একযোগে মাথা কুটিয়া একশা হয়। ব্যর্থ হইয়া দ্বিগুণ আক্রোশে গুঁতাইয়া চলে। উপরের (দিকে?) ডিঙ্গাইবার জন্য এতজোরে লাফ দেয় যে, বেপারীদিগকে সাবধান থাকিতে হয়, তারা যেন গায়ে না পড়িয়া না'য়ে পড়ে। এরকম লাফাইয়া পড়া মাছেই পাঁচ ছটা নৌকা বোঝাই হইয়া যায়। তারপর সারা জাল গুটাইয়া আনিয়া যখন একযোগে সব মাছ তোলে তখন দুনিয়ার কেউ দেখে নাই এরকম কান্ড হয়। তখন মাছগুলি কি যে কান্ড করে—

নিজের উজ্জ্বল চোখটিকে সুবলের চোখে ডুবাইয়া কিশোর বলে, 'জব্বর হরগ্রি-চৈতলৈ ভয়ানক তোলপাড় করেরে সুব্লা।'

২) প্রবাস খন্ডের ৬০.পৃঃ 'মোড়ল আগেই ঘাটে বসিয়াছিল।' প্যারার আগে-পরে বর্জিত পাঠ খানিকটা দেখানো হচ্ছে।

অ. এইবার 'নাও ঘুরনি'। নৌকা চরকির মত বনবন করিয়া ঘুরিবে। কিশোরও জালে হাত দিল। গলুইর নিকট কোমর বাঁকাইয়া দুইজনে ধরিয়া, জালের দিকে হাত বাড়াইয়া জাল আছড়াইতে লাগিল। আর পাছা হইতে সুবল সামনে ঝুঁকিয়া ঝুকিয়া 'কোরা'য় চাপ দিয়া, নৌকা বিদ্যুতের গতিতে ঘুরাইতে লাগিল। 'নাও ঘুরানি'র প্রচন্ডতার সহিত সমতালে আছড়অইয়া জালের ময়লা ছাড়াইতে লাগিল।

আ. জাল ধোয়া শেষ হইলে নাও ঘুরানিও শেষ হইল।

গ্রামের উত্তরে, খোলা মাঠে অনেকগুলি মাছ শুকাইবার 'ডাঙি'। অসংখ্য বাঁশ দিয়া বাঁধা মাথা উঁচু মাচান। তাতে মাদুর চাটাইয়ের বিছানা। তার উপর বাঁশের খুটির দোতালা। জালের চাল, জালের বেড়া। কাকেরা ঢুকিতে পারেনা কোনো মতে। ঝাঁকা ভরতি (কেচ্কি) মাছ তারা সেই জাল আবরণের ভিতরে নিয়া শুখাইয়া দিল। রোদের পাতে শুটকি হইবার জন্য। ইহারই নাম ডাঙ্গি। মোড়লদের এইরকম ডাঙ্গি অনেক আছে। প্রতি বৎসর ঐ সকল ডাঙ্গিতে তার অনেক মাছ শুকাইয়া শুটকি হয়। আর সেই শুটকি দেশে দেশে চালান যায়। আসে অজস্র টাকা।

একদিন বড় বড় দশখানা নৌকা মোড়লের ঘাটে নোঙর করিল। খালি নৌকা। তবু এক একটাতে দশ-বারোজন করিয়া মাঝি মাল্লা।

তাদের শরীরে ক্লান্তি কাপড়ে চোপড়ে শুটকির গন্ধ। কিন্তু মুখে উৎসাহ উদ্দীপনার ছাপ।

নানা বাজারে বন্দরে তারা শুটকি বেচিয়া বোঝাই খালি করিয়াছে। (নৌকাগুলি খালি পাইয়া জল ছোঁয় কি ছোঁয় না অবস্থা। যুবতী নারী যেমন ভারি কলসী কাঁকাল হইতে নামাইয়া হালকা হইয়া চলিতে পা তার মাটিতে লাগে কি লাগেনা।

অথচ এসকল নৌকাতে যখন মোড়লের 'খাদের' শুটকি ভরা হইয়াছিল মাস খানেক আগে, তখন তারা 'বাতা' অবধি জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। ক্লান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

মোড়লের ঘাট আজ ভরন্ত। জন-মুনিসে বাড়ি সরগরম। তারা একত্রে দল বাঁধিয়া স্নান করিতেছে, খাইতেছে। মোড়ল গিন্নি একা কুলাইতে পারিতেছে কি করিয়া!

কিশোরের খুব খারাপ লাগিতেছে। এসকল সমারোহে তার স্থান নাই। ব্রাহ্মণের পাশে নমশূদ্রের মত এই নৌকাগুলির পাশে তার ছোট নৌকাখানি নড়াচড়া করিতেছে। তিলক-সুবলের এসকল দিকে মাথা ব্যথা নাই। দুপুরে খাইয়া তারা ঘুমাইয়াছে। কিশোরের চোখে ঘুম আসিল না। মোডল আজ কত বড়। দশখানা বেশাতের (=বেসাতের) নৌকা হইতে কত টাকা আজ তাব ঘরে উঠিয়াছে। কত লোক তার বাড়িতে খাইতেছে। মোড়ল আজ কত বড়। মোড়ল আজ পর্বতের মত উঁচু। আর কিশোরের হাত দুটি কত খাটো (নাগাল পাওয়া তার কর্ম নয়) আর তার কাছে সে কত সামান্য।

বিকালে কিশোরের ডাক পড়িল। সে ভয়ে মোড়লের সামনে দাঁড়াইলে মোড়ল তার সঙ্গে এক নতুন ধরনের বৈষয়িক আলাপ আরম্ভ করিলেন।

শুন কিশোর, আমার মাল সব চেয়ে চড়া দামে বিকাইয়াছে তোমার মুল্লুকে।

কিশোর সবিনয়ে বাধিত হইবার ভাব প্রকাশ করিল। কথা বলিল না।

তোমরা কেউ যদি আমার সঙ্গে চালানি কারবার কর, তবে সেখানে আমি একটি স্থায়ী আড়ত বসাইতে পারি।

অনেক বড় দরের কাজ। কিশোরের কোনোপুরুষে এত বড় কাজ করে নাই! মনে মনে ঘাবড়াইয়া গিয়া, জানাইল, আমি এসবের কিছুই জানি না, আমার দেশে কালোবরণ বেপারি, ভারত বেপারি আছে, এসব করে।

মোড়ল জানাইল, দেশে গিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিও, তাহাদের মতামত চিঠি দিয়া আমাকে জানাইও।

কিশোর ঘাড় কাত করিল। মনে মনে বলিল, আগে তো দেশে যাই। তারপর মত জানাইব—

এ কারবারে অনেক লাভ। চালাইতে পারিলে তোমার গাঁয়ের লোক এক বছরে লাল হইয়া যাইবে। তার গাঁয়ের কয়েকজন এ কারবার করিয়া বছরের পর বছর লাল হইয়া

আসিতেছে, কিশোর তাহা দেখিয়াছে। বলিল: কয়েক জনে তো অনেক লাল হইয়া গেছে।

মোটে কয়েকজন?

হ। কয়েকজনেই করে কি না, সকলে তো করে না।

তুমি কি কও! সকলেরে ভাগ না দিয়া খালি কয়েকজনে লাভ খাইতেছে?

হ। যেমন তুমি লাভ খাইয়া বড় হইতেছ।—কিশোর একটা জ্বালা মিটাইল।

আমি তো একলা লাভ খাইনা। আমার কারবারে সকল মহাজনের বাড়ি গন্ডায় গন্ডায় টিনের ঘর উঠিবে আর 'জন-মুনী'র কপাল চাপা পড়িবে 'চৌদ্দ সানকি'র তলায়।

কিশোরের চোখের সামনা হইতে একটা কালো পর্দা সরিয়া গেল। মনে মনে বলিল, কেন তোমার বাড়ি ঘরের শ্রী নাই এতক্ষণে বুঝিলাম। বুঝিলাম তোমার ঘরে কেন সোনা দানা টাকার সিন্দুক নাই। তুমি কেন শিবের মত বিবাগী সংসার চালাও। মুখে বলিল, তোমার তো মোড়ল ভাইবান্ধব পুত্রকন্যা নাই। আছে কেবল দুই জনে। টাকা পয়সার কাজ নাই, মান মর্যাদার দিকে লক্ষ্য নাই তোমার। পাইয়া-ধন হারাইতে তোমার কতক্ষণ? (বাধেনা)। কিন্তু তারা? ভাই-ভাতিজা স্ত্রীপুত্র সব নিয়া সংসার করে। টাকা না জমাইলে চলে? ধনে জনে লক্ষ্মীর সংসার বাড়াইবে না তারা? গরীবের মুখ চাহিয়া তারা কেন আপন সুখের পথে কাটা দিবে।

মোড়লের মুখে বেদনার ছায়া পড়িল। যত্নহীন চুলে আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে দেনার ভার হালকা করিয়া নিয়া বলিল,'(কেচ্‌কি) জাল্লা। আমার কেউ নাই একথা তুমি কইও না। শুকদেবপুরের সারা মালো গুষ্টি আমার ভাই বান্ধব। (যারা গরীবের পাতে হাত দিয়া আপনা পেট উঁচা করে, তোমার দেশের কালি চাঁদ শ্যামসুন্দর সেই দলেরই পরমারা ভাই। তারা মলো গুষ্টির কেউ না। মালোগুষ্টিও এ-সমস্ত লোকের কেউ না। একদিন তারা মরবে, কিন্তু মরার আগে মালো গুষ্টিরে তারা মারবে। আমার এই গর্ব—সারা শুকদেবপুর আমার, আমি সারা শুকদেবপরের। আমি এদের মারি না, তাই এদের হাতে আমিও কোনদিন মরিব না। কিন্তু তোমার গ্রামের বেপারিরা মরিবে। একদিন তারা সাধারণ মালোগুষ্টিরই সমান ছিল। তখন প্রত্যেক মালোর বাড়িতে দুই তিন খানা করিয়া ঘরদুয়ার ছিল। আজ বেপারিদের বাড়িতে আটখানা করিয়া টিনের ঘর উঠিতেছে। কিন্তু আর সব মালোদের একটা দুইটা করিয়া ভিটা খালি হইয়া যাইতেছে। দেশে গিয়া চোখ মেলিয়া দেখিও। আমার শুকদেবপুরের সব মালোর ঘর ঠিক আছে। ঘরের ভিতরের সম্পদেও কমতি পড়িতেছে না।)

দেখ মোড়ল। তুমি দীন-দয়াল মানুষ। তুমি আপনা-ইচ্ছাতে সকলের সুখের জন্য নিজের সুখ ছাড়িতে পার। কিন্তু সকলে তো তোমার মত 'দয়ালদার' না। তুমি ভাল কাজ করিতেছ, তোমারে 'ভক্তি' করি। কিন্তু আমি দয়ালদার না, আমি সুযোগ পাইয়া বড় হইতেছি। এরজন্য তুমি তো আর আমারে কানে ধরিতে পার না। তারা দেখিতেছে, নিজের হাতে যখন অনেক টাকা আছে, তখন পুঁজি খাটাইয়া বেপার করিবার ক্ষমতাও আছে। এদিকে আমার

হাতে টাকা নাই। তখন (?) একলা তারা বেপার করিতে পারে না, আমার মত সুবলার মত তিলকের মত বিনাপুঁজির লোক চাই। আমরা গেলাম। তারা আমরা মিলিয়া করলাম বেপার। হইল লাভ। এই লাভ যে আমরা ভাগাভাগি করিয়া নিব তা কি হয়? তা হইলে আমি পাই পাঁচিশটাকা, কালোবরণও পায় পাঁচিশ টাকা। তা কি হয় মোড়ল। তা হইলে অত যে পুঁজি দিল, তার দাম কই রইল।

এই পুঁজি দিয়াই একদিন তারা দেশের সর্বনাশ করিবে। টাকায় টাকা বিয়ায় বলিয়া কথা আছে। এখন বিয়ায় বলিয়াই তো গাছ থেকে হওয়াইতে পারিবে না। আরেকজনের গাঁইট খালি করিয়াই ত আসিবে তার হাতে। এইরকম করিয়া কয়েক জনের সিন্ধুক ভরিতে লক্ষ জনের গাঁইটের কড়ি চাই তো। তারা ফুলিয়া ফাঁপিয়া বড় হইয়া বাঁচিবে, কিন্তু লক্ষ জনের জঠর জ্বলিয়া 'ছালিমাটি' হইয়া যাইবে। তোমরাও আর অত খবর রাখ না। কায়স্থ ভদ্রের কথা কই। জান ত তাদের বাড়িল (= বাড়ির) বিড়ালেও আড়াই আখর জানে। তারা তমসুক লেখে, খাতা লেখে, মুহরিগিরি করে মুক্তারি করে। কত বুদ্ধির পেচ। জিলাপির পেচের মত তারা বুদ্ধির পেচ কষায়। সেই বুদ্ধি খাটাইয়া তারা টাকা জমায়, পুঁজি বাড়ায়, বড়লোক হয়। চারপাশের মানুষের রক্ত শোষিয়া তারা লাল হইয়া উঠে। (তোমার আমার চেহারা কালো। তোমার আমার 'মা-ভইনে'র শরীরের যত্ন নাই। তারা সোনার মত কান্তি ধরে। তাদের বউ-ভইনেরা রূপে টুকটুক করে। কাপড়ে চোপড়ে গয়নাগাটিতে রূপে জৌলুসে তারা এক একজন দুর্গা মা। আলাদা হইয়া যায় আর দশজনের থেকে। তখন তারা কি করে জান? তোমার মত (কেচ্‌কি) জাল্লার নাউ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, জাল ইন্দুরে খাইয়াছে, টাকা নাই, বউ-বাচ্চা লইয়া উপোস করিবে, নদীতে নামিতে পারিবে না। তমসুক লেখাইয়া আন টাকা। ভিটাখানি কিন্তু বন্ধক থাকিল। যেই একবার আনিয়াছ কি ডুবিয়াছ। আসল টাকা তোমার জন্মে ও শোধ করিতে পার না, সুদ দিতে জীবন শেষ। এইভাবে তারা কত লোকের জমি নিলাম করিয়াছে, কত লোকের নাও জাল কাড়িয়া নিয়া আরেক মালোর কাছে বেচিয়া (দিয়াছে?)। এইভাবেই তারা বড়লোক হইতেছে। দশটাকা দিয়া পঞ্চাশ টাকা আদায় করিয়াছে। (কতজনার বুক ভাঙ্গিয়াছে, কতজনার ভিটা গেছে, ক্ষেত গেছে, সর্বস্ব গেছে। আর তারা কি হইতেছে? বড়লোক, আরো বড়লোক।) এমন বড়লোক মালোগুষ্টির মধ্যে কোনো কালে ছিল না। এখন দেখা দিতেছে। (মাথা উঁচু করিতেছে)। কিন্তু আমার মুল্লুকে এর গোড়া কাটিয়া দিয়াছি। নিয়ম করিয়াছি, কোনো মালো অপর কোনো মালোকে 'মুনী' খাটাইতে পারিবে না। কেউ 'মুনী' খাটিবেও না, কেবল ভাগীদার হিসাবে কাজ করিবে। পরিশ্রম করিয়া যাহা পাইবে, সমান ভাগ করিয়া নিবে।

এখন আমার হাতে পুঁজি আছে, যদি কই আমার পুঁজি আমি দিব না, তুমি কি করিয়া ব্যবসা চালাইবে?

পুঁজি তুমি দিবে না, তবে কি তা (ভাজা করিয়া) ভাজিয়া খাইবে?

ঠিসারা কইর না মোড়ল। আমি কষ্ট কইরা পুঁজি জমাইছি। তুমি ঠ্যাং-এর উপর ঠ্যাং তুইল্যা, নারিঙ্গি গাইয়া আমার পুঁজির মুনাফা ভাগ কইরা নিবা। মজা কত।

কেচ্‌কি জাল্লা একটা বড় কথা কই। জ্ঞাতি হিসাবে যেমন সম্পত্তির উপর দাবি আছে, তেমনি জাতি হিসাবে তোমার পুঁজির উপর আমার দাবি আছে, এই আমার মত। কিন্তু একথা বড় দূরের কথা। আরো কাজের কথা কই। আমরা দশজনে যদি তোমার পুঁজি কাজে না লাগাই, এ পুঁজি দিয়া একলা তুমি কি করিবে? তোমরা সাতভাই আছ, শুকদেবপুরের ঘাট হইতে শুট্‌কি বোঝাই করি বাজারে বন্দরে বেচিয়া মুনাফা করিতে পার! কিন্তু সকলের সঙ্গে মিলিয়া কারবার না করি? তার নৌকা চালাইতে, বোঝা বইতে, বেচিতে সব কিছু করিতে লোকের দরকার। দেখ 'কেচ্‌কি জাল্লা', পুঁজিওয়ালারা ঘুড়ি, আসমানে উড়িতে খুব পারে, কিন্তু হাতের লাটাই হইতেছ তোমরা। লাটাই ঠিক থাকিলে ঘুড়ি আর কতদূর যাইতে পারে।

মোড়ল মানুষ তাকে বারবার কেচ্‌কি জাল্লা বলাতে কিশোরের অপমানবোধ হইল। একটু ঝাঁকা দিয়া বলিল, এসব তুমি গাওজোরির কথা কইলা। আমরা না হইলে তার ব্যবসা হইবে না! বেশ আমরাও যাইব না তার ব্যবসাও হইবে না। একটা রাগারাগির কথা হইয়া গেল। কারবার চলিল না। সেও বড় হইল না, আমিও ছোট হইয়া রহিলাম। মীমাংসার কথা ত নয়। যাতে সেও পুঁজি লাগায়, আমিও লাভের ভাগ পাই, সেও (ফাঁপিয়া) আকাশে উঠিল না আমিও রসাতলে গেলাম না এমন একটা পথ বাতলাও। আমি আগেই কহিয়া রাখি তুমি দয়ালদার, সকলের ভালর জন্য পুঁজি বিলাইয়া দেও; আমি দয়ালদার না, আমি বিলাইয়া দেই না। অথচ, তুমি দয়ালদার হইলে তোমার চরণধূলি মাথায় নিতে পারি। কিন্তু আমি দয়ালদার না হইলে তুমি তো আর কানে ধরিয়া ঘুরাইতে পার না!

দেখ জাল্লা, (কেচ্‌কি জাল্লা) এর মীমাংসা খুব সোজা। নিজের দিকে একবার চাহিয়া দেখ। তুমি নিজেই এই নটখটির মীমাংসা করিয়া বিদেশে আসিয়াছ। আমি আর কি বাতলাইব।

চিকন কথা রাখ মোড়ল। 'ছোট জাল্লা' বলিয়া অনেক ঠিসারা করিয়াছ। বড় বেপারি তুমি। তোমার সঙ্গে (?) তর্ক করাই আমার অন্যায় হইয়াছে।

ভাই আমার কাঁচা মাছের মত অবোঝ! কিন্তু এইসব বোঝার মধ্য দিয়াই আমরা মালোরা সহজভাবে একটা জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া আসিয়াছি। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া। মাটিতে যত সহজে ঘাস জন্মায় নদীতে যত সহজে ঢেউ উঠে, মালোরা দুনিয়ার এক ঘোর সমস্যাকে তেমনি সহজে সমাধান করিয়া আসিয়াছে যুগের পর যুগ।

কথাগুলি রাগত (?) ভাবে বলিয়া মোড়ল কিশোরের দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকইল।

কিশোর দিশাহারা হইয়া বলিল, কি কইতে চাও কও না।

কইতে চাই তোমার নিজের কথা। তুমি নিজে একজন পুঁজিদার। তিলক-সুবলের নাও-জাল নাই, তোমার নাও-জাল আছে। তোমার নাও গড়াইতে জাল বুনিতে টাকা লাগিয়াছে, মেহনত লাগিয়াছে। তুমি খরচা করিয়া জালে দেও গাব নায়ে দেও আলকাতরা। এরজন্য

তুমি নাও জাল দুই বেসাতের জন্য প্রত্যেকের আধভাগ করিয়া পুরা একভাগ পাও। তিন জনে আসিয়াছ। যাহা রোজগার হইবে, চার ভাগ হইবে, তোমার নাও-জালের একভাগ, আর তিনভাগ তিনজনের। নাও-জালের ভাগটা পাইবে তুমি। এই ব্যবস্থায় বড় কারবারও চলিতে পারে। (পুঁজির জন্য একটা ভাগ রাখিলে হইল) অন্যথায় জাতি একেবারেই মারা পড়িবে।

মারা যে পড়িবে একথা কিশোরের মনেও বহুদিন পরপর দুই একবার উঁকি দিয়া যায়। তারা চোরাবালিতে পা দিয়া আছে। বালি এখন শক্ত ঠেকিতেছে। কিন্তু আশঙ্কা আছে একদিন উহা ফাঁক হইয়া মালোদিগকে গ্রাস করিবে। (কিন্ত) সেদিনে কেউ তাহাদিগকে টানিয়া তুলিতে আসিবে না। কিন্তু সেদিন বড় সুদূরের। গহীন ঘুমভাঙার রাতে জোরদার মানুষের মনেও মৃত্যুর এক একটা নিশ্বাস ঢেউ খেলিয়া যায়। পরে কাজে-কর্মে ডুবিলে সে-বিশ্বাস কোথায় মিলাইয়া যায়—তারা জানে না। মালোদের অবস্থাও তাই।

কিশোর নৌকায় ফিরিয়া তিলককে বলিল, তিলক, সেই গানটা একবার গাও না।

কোন্ গানটা জিজ্ঞাসা করাতে কিশোর বলিয়া দিল। তিলক মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, অবেলাতে পীরিতের গানের সখ আমার মহাজনের কেন হইল। কেউ মস্কারা দিল না তো?

তুমি বড় আলগা কথা কও তিলক। আমি কি মহাজন? মহাজন হইলে তোমরা হইতে বেতনধারী 'মুনী'। কিন্তু তা ত না। তোমরা তো আমার ভাগীদার।

জানা কথা। তিলক তর্ক না বাড়াইয়া গান জুড়িল, আমার বন্ধু রঙ্গিচঙ্গি, হাওরে বাইন্ধাছে টঙ্গি, টঙ্গির নাম রাখিয়াছে উদয় তারা—

জান তিলক, আমরা মালোরা হাওরে টঙ্গি বাঁধিয়া চলিয়াছি। এক ঢেউ আসিয়া কোন্ দিন নদীর জলে তলাইয়া নিয়া যাইবে। আমাদের পায়ের তলার মাটির নাগাল নাই। জলের উপর ভাসিয়া আছি। গলা জলে। গোড়ালি তুলিয়া পায়ের বুড়ো আঙুলের আগা মাটিতে ঠেকাইয়া নাকমাত্র জাগাইয়া রাখিয়াছি। জলের একটা ঢেউ আসিলে মাটির নাগাল রাখিতে গেলে শ্বাসবন্ধ হইবে, আর শ্বাস বাঁচাইতে গেলে মাটির নাগাল ছাড়া হইয়া যাইবে। আমরা মালোরা বোধহয় কোন একদিন সকলে মরিয়া যাইব।

সিদ্ধিতে টান দিয়া আসিয়াছে নাকি কিশোর।

৩.৬৭ পৃ: ইহাকে বলে 'খলা-বাওয়া'। অংশের পর সামান্য বর্জিত পাঠ—

কিশোর সুবল ছেলেমানুষ। অত তথ্য জানে না। তিলক এসব জানা শোনার ব্যাপারে যথার্থই প্রাজ্ঞ। খলাকারীদের (?) নিত্যদিনের কাজকর্ম ছাড়া তাদের জীবনের অনেক কথা ও কাহিনী তার জানা আছে। একটি কাহিনী এই : আমার যৌবনকাল। জাল বাইতে গেছলাম। আর এক দোল! সেইদেশের খলার নাম ছেলে-কাটার খলা। মাইয়া লোকেরা এমনি কইরা মাছ কাটতেছিল। এক বেটির কোলে ছিল ছাইলা। রাতদিন মাছ কাটা আর মাছকাটা। বড়

বড় সব মাছ। মানুষের কাচ্চাবাচ্ছার মত বড়। কাটতে কাটতে বেটির চোখে জড়াইল কাল-ঘুম। শিশু তখন চুক-চুক কইরা দুধ খায়। এক সময় মাছ মনে কইরা শিশুরে বটিতে লাগাইয়া দিল ঠেলা। রক্তে খলা লাল হইয়া গেল। তার থেকে নাম হইল ছেলে-কাটার খলা।

না তিলক তুমি এ কাহিনী আর কইও না, বুকে বড় বেদ্না লাগে।

৪. প্রবাস খণ্ড ; ৬৭ পৃ; 'এ পক্ষ প্রস্তুত।' — প্যারার শেষ

'ঠাকুরের চরণে আবির দেও।' তার পর একটি বর্জিত উপচ্ছেদ—

এরপর এখানে এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিল। কিশোরের বিবাহ হইয়া গেল। পরস্তাবের রাজপুত্র যেমন হঠাৎ একদিন রাজকন্যা পায় কিশোরে তেমনি হঠাৎ সেদিন এক উপযুক্ত বউ পাইয়া গেল। ব্যাপারটা তিলকও দেখিয়াছিল। কিন্তু কিসে যে কি হইল তাহার কিনারা করিতে পারিতেছে না।

পরিষ্কার হইয়াছিল সুবলের কাছে। কিভাবে শুরু হইল আর কিভাবে শেষ হইল কল্পনার আবেগ মিশাইয়া সে বেশ গোছাইয়া বলিতে পারে অবিকল। তিলক কান পাতিয়া শোনে।

৫. ঐ। 'কেউ জানে না' - অংশের পর সামান্য—

সেবার উজানী নগরের খলাতে উল্লেখযোগ্য দুইটি ঘটনা ঘটে। একটি মারামারি ব্যাপার। অন্যটি কিশোরের পত্নীলাভ। বাস্তবে যা ঘটে না কেবল রূপকথায় ঘটে তেমনি এক অদ্ভুত উপায়ে সেটি সম্পন্ন হইয়াছিল।

৬. নয়া বসত ; ৯২ পৃ· 'আইজ রাজার ঝিরে লইয়া গোকর্ণ ঘাটে যামু কিনা'— বাক্যটির পর সামান্য বর্জিত পাঠ .

কেন লইয়া যাইবে কার কাছে দিয়া রাখিয়া আসিবে জানিবার জন্য চিনিবাসের কৌতূহল হইল। কিন্তু হরিদাসের চোখে মুখে বিরক্তি। তার নিজেরও সময়াভাব। আর শীতের আবরোধ ঠেলিয়া বৃদ্ধের গলা হইতে অত কথা নিরুদ্বেগে বাহির হইয়া আসিবে এমন সম্ভাবনা খুব বেশী নাই দেখিয়া চিনিবাস নৌকা ভাসাইয়া দিল। তাহাকে উজান ঠেলিয়া যাইতে হইবে—ওদের পথ তো ভাঁটা মুখো। ওদিকে যোয়ান চিনিবাস গামছা পরিয়া জলে নামিয়া পড়িয়াছে। স্রোতের উজানে ডিঙ্গি টানিবে সে। তার দিকে চাহিয়া হরিদাস কি বলিতেছিল, ঠোট কাঁপিল মাত্র, তারপর ঝপাৎ করিয়া বাহির হইয়া, আসিল, বাবা মরা গাঙ্গে স্রোতের তোড় কত।'

৭.১০১ পৃ; 'নুতন ঘরে অনন্ত দিগকে রাখিয়া একদিন বুড়া বিদায় হইল।' বাক্যটির পর সামান্য বর্জিত পাঠ:

ঘাট অবধি আগাইয়া দিতে আসিয়া ছেলে কোলে অনন্তর মা অনেকক্ষণ পর্যন্ত আত্মসংবরণ করিয়াছিল। নৌকাতে উঠিয়া তারা যখন দাঁড়ে হাত দিয়া নৌকা ভাসাইল, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। হু হু করিয়া তার চোখে জল আসিল। দুই চোখ আঁচল চাপিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। ঘাটের নারীরা কাজ ফেলিয়া তার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কান্না

দেখিয়া তাকে কেউ কিছু বলিতে (পারিল না) সাহস পাইল না। এই সময়ে কি কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে হয়, তা তো আর সকলের জানা থাকে না। তার উপর অপরিচিত মানুষ সে। অনন্তর মা চোখ তুলিয়া চাহিতে দুই একজন ভরসা পাইয়া বলিল, 'বাপ বুঝি।'

অনন্তর মা তাদের দিকে না চাহিয়াই কোনো মতে বলিল, হাঁ।

৮. 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' ভাগে, ১৩৭ পৃ: 'যারা সবচেয়ে প্রিয়,.... মালোরা খুব খুশি হয়।' বাক্যটির পর সামান্য বর্জিত পাঠ:

'তেমন খুশি আর কিছুতে তারা হয় না। তাই সঙ্গে সঙ্গেই বউ আনিয়া যাদের অতিরিক্ত ঘর আছে খালি করিয়া দেয়, যাদের নাই তৈয়ার করিয়া দেয়। যাদের টাকা আছে, বেশি টাকা পণ দিতে পারে, বৌ (Sic) মরিলে তারা আবার বিবাহ করে। কেউ আবার এক বৌতে সুখ শান্তি না পাইলে আরেকটা বিবাহ করে, আগের বৌকে কিছুদিন বাপের বাড়ি রাখিয়া নয়া বৌ লইয়া ঘর করে, আবার নয়া বৌকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া পুরনো বউ আনিয়া সংসারী। যখন মাছের মরসুম পড়ে তখন দুই বৌ-ই আনিয়া রাখে। সারাদিন সে খাটে নদীতে দুই বৌ খাটে বাড়িতে।

৯. রামধনু-ভাগে ১৮৩ পৃ: আকাশ ভাঙিয়া বর্ষণ শুরু হয়, আর থামে না।'— বাক্যের আগে 'মোহাম্মদী' শ্রাবণ ১৩৫২;৪৩৩ পৃ: -র পাঠ:

বৌ-ঝিয়েরা ছোট থলিতে আবির নেয়, আর নেয় ধান দুর্বা। জলে পায়ের পাতা ডুবাইয়া থালিখানা আগাইয়া দেয়। নৌকায় যে পুরুষ থাকে সে থালার আবির নৌকার মাঝগুড়ায়, আগাপাছায় নিষ্ঠার সহিত মাখিয়া দেয়। ধান দুর্বাগুলি তর্জনীর আর অনামিকার সাহায্যে তুলিয়া ভক্তিভরে আবির মাখানো জায়গাটুকুর উপর রাখে। এই সময় বৌ 'জোকার' দেয়। তার রাগে তিতাসের বুকেও রঙের খেলা জাগে। তখন সন্ধ্যা হইবার বেশী বাকী থাকে না। তখনও রাগে তিতাসের বুকেও রঙের খেলা জাগে। তখন সন্ধ্যা হইবার বেশী বাকী থাকে না। তখনও আকাশ বড় রঙ্গীন— সেই তিতাসের বুকের আরসীতে (Sic) যে আকাশ নিজের মুখ দেখে সেই আকাশ।

চৈতের খরার বুকে বৈশাখের বাউল বাতাস বহে। সেই বাতাসে বৃষ্টি ডাকিয়া আনে। আকাশে কালো মেঘ গর্জায়। লাঙ্গল চষা মাঠ-ময়দানগুলিতে যে-ঢল হয়, ক্ষেত উপচাইয়া তার জল ধারাস্রোতে বহিয়া তিতাসের উপর আসিয়া পড়ে। মাঠের মাটী মিশিয়া সে জলের রঙ হয় গৈরিক-প্রায়। সেই জল তিতাসের জলকে দুই একদিনের মধ্যেই গৈরিক করিয়া দেয়। সেই কাদামাখা ঠান্ডা জল দেখিয়া মালোদের কত আনন্দ। মালোদের ছোট ছোট ছেলেদেরও কত আনন্দ। মাছগুলি অন্ধ হইয়া জালে আসিয়া সহজে ধরা দেয়। ছেলেরা মায়ের শাসন না মানিয়া কাদা জলে দাপাদাপি করে। এই শাসন না-মানা দাপাদাপিতে কত সুখ! খরার পর শীতলতার মাঝে গা ডুবাইতে কত আরাম।

১০. ঐ ১৮৪ পৃ: 'মালোর পুত, বড় বাঁচানটাই আজ বাঁচাইলা।'— বাক্যের পর সামান্য অতিরিক্ত পাঠ, 'মোহাম্মদী'র :

কিন্তু ধনঞ্জয়ের এদিকে কান নাই। সে কাদিরের ছেলের হাতে একখানা সেউত্ তুলিয়া দিয়া নিজে একটা মোটা দড়ি দিয়া এ নাওয়ের সাথে ও নাওখানাকে শক্ত করিয়া বাঁধিতে লাগিল। ছেলে দেখিল তার বাপ খোলা আকাশের তলায় জেলে নাওয়ের মাচানের উপর বসিয়া থাকিতে থাকিতে বুঝিবা পড়িয়া যায়। ডাকিয়া বলিল, বাজান, তু ছইয়ার ভিতরে যা, আমি পানি ছেচি।

মালো হোক, জেলে হোক, তবু হিন্দু ত। তারা ছইয়ের ভিতর ভাত ছালুনের হাঁড়ি রাখে, মাছ ধরার ফাঁকে ফাঁকে খায়। উপকার করিয়াছে। তার উপর যদি ও-সব সে নষ্ট করিয়া দেয় তবে তাদের চিত্তসুখ থাকিবে কি?

১১. রামধনু ১৮৭ পৃ: 'তারা বাপকে আদর করিয়া ডাকিয়া বসায়।' বাক্যটির আগে সামান্য 'মোহম্মদী'র পাঠ। শ্রাবণ ১৩৫২; ৪৩৫ পৃ:

দুই দিকের সিকায় দুধের ঘটী ঝুলাইয়া দুপুর বেলা এক পাক ঘুরিয়া আসে। সেও কতদিন তাহার সঙ্গে গিয়াছে। কত বামুন কায়েত তার বাপকে চেনে। বাড়ীর ঘাট দিয়া যাইতে দেখিলে তারা ডাক দিয়াছে, অ কাদির দুধ দিয়া যাও। তারা কাদিরের দুধ পাইলে আর কারো দুধ কিনে না, কেননা, বরং যেগুলি কাঁচি গাই, সে-গুলির দুধ বাড়িতে রাখিয়া যে-সব গাই ঘন দুধ দেয় কেবল সেগুলি দোয়াইয়াই বেচিতে আসে! কারণ, কাদিরের খরিদ্দার সব বামুন কায়েত। তারা কত বড়; সমাজের তারা শিরোমণি। খালি হিন্দু সমাজেরই নয়, মুছলমানরাও তাদের কথা শুনে।

১২. ঐ; ১৮৭ পৃ: 'নিজেরা চেয়ারে বসিয়া ছেলেপুলের হাতে একখানা ধুলিধূসর তক্তা আনাইয়া'...এর পরিবর্তে ছিল:

'নিজের চেয়ারে বসিয়া চাকরের নয়তো ছেলেপুলের হাতে ঘরের আঁধার কোণে নয়তো উঠানের কোণে আবর্জনার সহিত ফেলিয়া রাখা একখানা ধূলিধুসর তক্তা আনাইয়া'....

১৩. ঐ; ১৮৮ পৃ: 'কিন্তু বনমালী মালসায় হাত দিয়া দেখে জলের ছাঁট লাগিয়া আগুনটুকু নিবিয়া গিয়াছে' -এর পর খানিকটা 'মোহাম্মদীর' পাঠ (শ্রাবণ ১৩৫২;৪৩৫ পৃ:):

তামাক খাওয়া আর হইল না। অসতর্ক বনমালী নিজে না খাইতে পারিয়া যত না অপ্রসন্ন হইল, তার অধিক অপ্রসন্ন হইল কাদিরকে খাওয়াইতে পারিল না বলিয়া। মালসাটা আগে থেকে সাবধানে না রাখিয়া কি বোকামিই সে করিয়াছে!

বৃষ্টি ততক্ষণে একটু ফিকা হইয়া আসিয়াছে। নদীর তীর এখনও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই; তবে নদী তীরের ঘর বাড়ী ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে গাছগুলি তারা জলকণার ধোঁয়াটে যোগাযোগের চাপ ভেদ করিয়া মাথা জাগাইয়া দিয়াছে। এইবার হাটের কথা কাদিরের একান্তভাবে মনে পড়িয়া গেল। নদীর পারে হাটের ঘাট। আগে হইতে জায়গা না রাখিলে ভাল জায়গা পাওয়া মুশকিল। ভাল রোখের জায়গায় বসিলে ভাল বিক্রী হয়। ভাল জায়গায় না পরিলে বিক্রী হয় না। শেষে সন্ধ্যাবেলা পাইকারের নিকট জলের দরে মাল খালাস করিয়া আসিতে হয়।

অবিক্রিত আলুর বোঝাই তো আর ফিরাইয়া আনা যায় না। ফিরাইয়া আনিয়া লাভও নাই; কেননা, কাল সকালে গিয়া লাঙ্গাল ঢুকাইলেই অজস্র আলু সব মাটির উপর মাথা জাগাইবে।

বৃষ্টি থামিলে দেখা গেল দুইখানা নৌকাই জলে প্রায় বোঝাই হইয়া গিয়াছে। নগ্ন নৌকা। যত বৃষ্টির জল পড়িয়াছে, সবই নৌকাতে আটক হইয়াছে। কাহাকেও কিছু বলিয়া দিতে হইল না। বনমালী বড় নৌকায় আর কাদিরের ছেলে ছোট নৌকায় সেউতি লইয়া কাজে লাগিয়া গেল। দুই জোয়ান মানুষের কব্জির জোরে ডুবা-নৌকা হালকা হইয়া ভাসিয়া উঠিল। এইবার জেলে নৌকা (থেকে) হইতে কাদিরের নৌকায় আলু তুলিয়া দিবার পালা। সে নেহাৎ কম হাঙ্গামা নহে। আগেই বনমালী বলিয়া ফেলিল আলু এ নাওয়েই থাকুক। দুই নাওইত হাটের যাত্রী। হাটে গিয়া এ-নাও থেকে আলু হাটে বহিয়া তুলিলেই চলিবে।

দুইখানা নৌকা কাছাকাছি থাকিয়া পাশাপাশি চলিতে লাগিল মমতায় সুনিবিড় দুটি ভাইয়ের মত। জমিবার মুখে হাটে পৌঁছার জন্য উভয়েরই সমান তাড়া; অথচ কারোর কাউকে ফেলিয়া আগাইয়া যাওয়ার চেষ্টা নাই।

১৪. ঐ; ১৯৫ পৃঃ 'এই হাটের অল্প দূরেই তার স্বামীর বাড়ি।'—বাক্যটির পর 'মোহাম্মদী'র ১৩৫২, ভাদ্র, ৪৯৫ পৃ: থেকে কিছু বর্জিত পাঠ:

কাদির মিয়া খাইবার জন্য জল তুলিয়াছিল নদী হইতে। ঘোলা বলিয়া খাইতে পারে নাই। তাকে লইয়া গেলে হয়। একটা উপলক্ষ থাকিবে যে, অতিথি মানুষকে জল খাওয়াইতে আসিয়াছি। এছাড়া খালি হাতে যাওয়া যায় না বোনের বাড়ী। একটা কিছু লইয়া যাইতে হয়। একটা কিছু লইয়া যাওয়ার সুযোগ হয় না বলিয়াই না এতদিন তাকে দেখিতে আসিতে পারে নাই। শাশুড়ী আছে ননদ আছে, যদি নিন্দা করে; তাদের বউকে যদি খোঁটা দেয়। খুঁচিয়ে কথা বোনটি সহিতে পারে না। কিন্তু কি সুন্দর রামধনুটি!

১৫. ঐ; ২২৫ পৃ: 'কিন্ত এ প্রস্তাব সকলের মনঃপুত হইল না.....। কাজেই দ্বিতীয় প্রস্তাব উঠিল:' এরপর 'মোহাম্মদী' ১৮শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যার পাঠ:

রাত পিছু একজন করিয়া মালোকে সাবাড় করিতে থাক। যতদিন পর্যন্ত মালো পাড়া পুরুষ শূন্য না হয় ততদিন এইভাবে চলুক।

কিন্তু ঘন্টা বাঁধিবে কে তাহা লইয়া গোলমাল লাগিবে। রোজ রোজ লোক লাগাইয়া হত্যাকাণ্ড চালানো যায় না বিশেষতঃ এখনও মহারানীর রাজত্ব অক্ষুণ্ণ আছে।

১৬. ঐ; ২২৫ পৃ: 'তারপর নিয়া চল ভাঙ্গা কালীবাড়ির নাটমন্দিরে'—পাঠের পর মোহাম্মদীর উল্লেখিত সংখ্যার ৪৯৭ পৃ: থেকে কিছু বর্জিত পাঠ:

বৈঠকের মাতব্বর প্রস্তাবটি সংশোধন করিয়া দিল : একজনকে আনিলে কি একটা নরহত্যার জ্বালা জুড়াইবে? তার চাইতে এখন থেকে যে যখন পাও মালোপাড়ার বৌ-ঝিদের উপর অত্যাচার কর।

মালোপাড়ার কাছেই মুসলমান পাড়া। সে পাড়ার বাবুল্লা আর শরীয়তুল্লা দুই ভাই। শরীয়তুল্লার মালো পাড়াতে সপ্তাহে দুই একবার না আসিলে চলে না। ঝাড়ফুঁক করিয়া ছেলেপিলেদের জ্বরজারী ভালো করে। এই সে কোন মালোর চাচা কোন মালোর জ্যেঠা। তার বড় ভাই বাবুল্লা দুপুরে দুধ বেচিতে আসিয়া দয়াল মালোর দাওয়ায় গিয়া বসিল। এক ছিলুম তামাক টানিয়া বলিল, বাবা দয়াল, কাল উত্তর পাড়ায় মেয়ের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। ফিরিতে রাত্রি হইয়া গেল। তেলি পাড়ার পথ দিয়া আসিবার সময় দেখি, একঘরে বামুন কায়েত বারো জাতে মিলিয়া গুপ্ত বৈঠক করিতেছে আর মুখে কেবল মালো পাড়া মালোপাড়া জপিতেছে। দাঁড়াইয়া এই সমস্ত কথা শুনলাম।

সব কথা শুনিয়া দয়াল বেপারী রাগে কাঁপিয়া উঠিল। বলিল চাচা, ওই অবস্থায় তুমি কি করিতে পারমর্শ দেও।

বাবুল্লা বলিল ঃ মেয়ে ছেলের উপর নজর দিলে আমরা কি শাস্তি দেই তুমি ত জানই।

দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিয়া দয়াল বেপারী বলিল ঃ তাই হইবে, চাচা, তুমি মুরুব্বি মানুষ মালো গুষ্ঠিরে আশীব্বাদ কইর।

মালোরাও সেই রাতে বৈঠক করিয়া স্থির করিল ঃ যখন যে ব্যক্তি মালোপাড়ার মেয়েছেলের উপর কুনজরে চাহিবে, তখনই তাহাকে শেষ করিতে হইবে।

১৭ ঐ, ২৩৬ পৃঃ 'এ আমার পথের পাওয়া।' —সংলাপটির পর আরও একটু বর্জিত পাঠ, 'মোহাম্মদী' কার্তিক ১৩৫২ সংখ্যায় :

এ ত মুনিষ্যি নয় ভইন।

কি কইরা বুঝলে দিদি?

চোখ দুইটা বড় বড় কিরকম কইরা চায়। নিজে একখানা কথা কয়না, কিন্তু সকল কথা বুইঝা চুপ কইরা থাকে। এ কালসাপ তুই কৈ পাইলি!

অনন্ত বড় ভাল ছেলে দিদি। ওর মা বাপ নাই।

১৭. ঐ; ২৩৭ পৃ:, মোহম্মদী-তে অতিরিক্ত;

'এমন কইরা পরের ছেলে যদি আপন হইয়া যাইত...কিন্তু হয়না।'-র পর—

'—পরের পুত কুত্তার মুত, দুইদিন কর খেলা মেলা, চইল্যা যাইব দুপুইর বেলা। বড় বেইমান ভইন।'

আবার 'পরের ছেলে বড় বেইমান'—বাক্যটির পরে-

অনন্ত বোধ হয় তেমন বেইমান হইবে না।

না হইবে না। এইত একটু আগে বললি, সুবলার বউ না কে, মানুষ করিতেছিল—কই তার নামও তো চান্দে মুখে আনিতেছে না!

সে যে তাড়াইয়া দিয়াছে।

হ্যাঁ তাড়াইয়া দিয়াছে। এতদিন খাওয়াইয়াছে ধোয়াইছে, আর একদণ্ডের রাগে কি করিয়া ফেলিয়াছে, এতেই তাড়াইয়া দেওয়া হইল!

তুমি জান না দিদি, সে মাগী বড় বজ্জাত। সব পারে সে। এক বছরের মায়া মমতা এক পলকে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে পারে। নইলে এমন চাঁদের মত ছেলেকে ঘরের বাহির করিতে পারে? বড় বজ্জাত যে মাগী।

১৮ ঐ; ঐ; ঐ; 'নিঃসন্তান বুকের বেদনা নয়নতারা হাসিয়া হাল্কা করিল।' বাক্যটির পর :

কি আশ্চর্য্য। তিন বোনের কারো কোলে ছেলে নাই। মেয়ে মানুষের আবার ছেলে থাকিবে না কেন? তবে যাদের না থাকে, তারা যে মনঃকষ্টে দিন কাটায় তারা যে নিজেকে খুব ভাগ্যহীনা বলিয়া মনে করে তা তো কথাবার্তা থেকেই বুঝা গেল। কনিষ্ঠ বোনের দিন এখনও যায় নাই সন্তান হইবার। বাকী দু'জন থেকে এ আলাদা, দেখিতেও আলাদা। কাণের উজ্জ্বল দুইটি সোনার মাকড়ী প্রদীপের আলোতে জ্বল জ্বল করিতেছে। দুই বাহুতে দুইটা মোটা সোনার অনন্ত, গলার হার! আমাকে নিতে চাহিতেছে। এই সুন্দরী, স্বল্প ভাষী, ধনবানের স্ত্রী ছোট বোনটিও আমাকে নিতে চাহিতেছে।

১৯ 'দুরঙা প্রজাপতি' অংশে ৩০৮ পৃঃ, পাণ্ডুলিপিতে 'মা নাম শুনিয়াই অনন্ত তার পায়ে ঢিব করিয়া একটি প্রণাম করিয়া আসিল' বাক্যটির পর বর্জিত পাঠ :

শেষে শশাটি ভাঙ্গিয়া অর্ধেকটা রমুকে দিল অর্ধেকটা নিজে খাইল।

ইহারা দুই জনেই বড় হইয়া অনেক লেখাপড়া শিখিয়াছিল এবং আজ থেকে ঠিক বার বৎসর পরে দেশে যখন লোকে না খাইয়া মরিতে ছিল তখন ইহারা দুই জনেই দুঃখ কষ্ট লাঘব করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিল। লোকে অনেকদিন পর্যন্ত তাদের কথা ভুলে নাই।

দেশের ভালর জন্য দুই জনেই অনেক কাজ করিয়াছিল। লোকে অনেকদিন পর্যন্ত তাহাদের কথা ভোলে নাই।

'তিতাসের' কাহিনী ও লেখক স্মরণে

ড. ক্ষুদিরাম দাস

যতদূর মনে পড়ে সে বিগত চারের দশকের কথা। কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটের পুথিঘরে বসে শুনেছি। শুনছি অদ্বৈত মল্লবর্মণের হাতে লেখা পুথির পৃষ্ঠা থেকে পাঠ। সতীশবাবু' আবেগ সহকারে পড়ে শোনাচ্ছেন, আর আমি ও সুবোধ চৌধুরী বসে শুনেছি। সুবোধ তারিফ করছে, মন্তব্য করছে। তিতাসকেন্দ্রিক মৎস্যজীবী মালো সম্প্রদায়ের নরনারীর অদৃষ্ট-নির্ভর জীবনকাহিনী। স্থানে স্থানে খাপছাড়া, কিন্তু বাস্তব সহানুভূতিতে পরিষিক্ত মালোদের নদী-নির্ভর সুখদুঃখ ও বিশিষ্ট মিলন-বিরহ কথা যা এতকাল আমাদের অপরিচিত ছিল। সুপরিকল্পিত নির্দিষ্ট প্লট নেই, নেই রম্য-কাহিনী গ্রন্থনের শিল্পরীতি, তবু একান্ত চিত্তাকর্ষক ও নির্ভেজাল বাস্তবের বিবরণ। মল্লবর্মণের ঐ পুথির কিছু অংশ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তারপরে যায় হারিয়ে, তারপর লেখক আবার শ্রম সহকারে লিখে যথাসাধ্য শেষ ক'রে দেন এবং অকাল মৃত্যুর কবলে পড়েন।

বাঙ্লা সাহিত্যে পল্লীকেন্দ্রিক গল্প উপন্যাসের অভাব নেই। আগেকার দিনের নাম-করা ঔপন্যাসিকেরা মুখ্যভাবে পল্লীজীবনেরই কথক। কিন্তু তাঁদের রচনায় বাস্তব চিত্র ধর্মকে অল্পবিস্তর পিছনে রেখে প্লট ও কাহিনীর শৈল্পিক গ্রন্থনেই মনোযোগ দিতে হয়েছে। তবু ব্যতিক্রম ও কিছু ছিল, যেমন বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি ও আরণ্যক। আমার বাল্যে পড়া দীনেন্দ্র কুমার রায়ের পল্লীচিত্রও নির্জলা গ্রাম-পরিবেশেরই ছবি। রবীন্দ্রের কয়েকটি ছোটগল্পও তারাশংকরের উপন্যাসের ভিত্তিভূমি গ্রাম ও গ্রামের মানুষই, তবু সেগুলিও সচেতন শিল্পকৃতির ছোঁওয়ায় পুরো সাহিত্যিক সৃষ্টি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি এই তিতাসের মতই নদীকেন্দ্রিক জেলে মালো মাঝিদের জীবনকথা শোনালেও তা চরিত্র নির্মাণের শৈল্পিকতা থেকে মুক্ত নয়। অন্যপক্ষে তিতাসে যেন গল্প লেখার সজ্ঞান প্রয়াসের কোনো চিহ্নই নেই। লেখক ঠিক যা দেখেছেন তার হুবহু বিবরণই দিতে চেয়েছেন, এতেই তাঁর পরিতৃপ্তি। অথচ কী নদী, কী গ্রাম দুই মিলে পূর্ণ একটি নিসর্গচিত্র, আর তারই সঙ্গে আগাগোড়া মিলিত অদৃষ্ট-নির্ভর এক দলিত ও সংগ্রামী গোষ্ঠীর সুখদুঃখময় জীবন কথা। আগেকার দিনের সেই 'পল্লীচিত্র' এবং সাম্প্রতিক আবদুল জব্বারের 'বাংলা চালচিত্র' নির্মাণের সঙ্গে এই তিতাস'ও আমাদের একই শ্রেণীর দুলর্ভ সৃষ্টি। আর, বয়োবৃদ্ধ আমরা যাঁরা গল্প-উপন্যাস পড়ার সঙ্গে সমাজ ইতিহাসের দিকে ঝুঁকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, তাঁদের কাছে এই জাতীয় বাস্তব

বিবরণমূলক পরিচয় সমূহ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই দ্বিতীয় তিতাস- সন্ধ্যায় আমাদের হারানো বাঙলার সেই অনুরাগ ও বিষাদময় জীবন-কাহিনীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে উদ্‌যোগ নেওয়া হয়েছে এবং অদৃষ্ট বিড়ম্বিত যে লেখার মানুষটির সঙ্গে মানসিক পুনঃ পরিচয়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাকে আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন জানাই।

১. প্রয়াত সতীশ চন্দ্র রায় ছিলেন পুথিঘরের অন্যতম অংশীদার।

২. ১১.১.১৯৯৭ তারিখে লিখিত নিবন্ধটি ১৯.১.১৯৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত অদ্বৈত মল্লবর্মণের ৮৩তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ-ভাসমান-এ ছাপা যায় নি বিলম্বজনিত কারণে। এজন্যে আমবা দুঃখিত-সম্পাদক

ভালবাসার এক নাম তিতাস

সরোজ মোহন মিত্র

বিশ্বের প্রায় সবদেশেরই পুরা কাহিনীতে দেখা যায় সৃষ্টির আদিতে ছিল জল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও দেখা যায় জল থেকেই সৃষ্টির শুরু। জলজ প্রাণী থেকে ধীরে ধীরে উন্নত মানব সমাজের সৃষ্টি। আদিম ইতিহাসের সে এক বিরাট কাহিনী। অসীম বিস্ময়।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতির ফলে আমরা এখন প্রকৃতি থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছি। নাগরিক জীবনে বিজ্ঞান প্রকৃতির স্থান অধিকার করে নিয়েছে। তবু জল মানুষের বড় টানে। আমরা পাহাড় দেখতে চাই, ইতিহাসের নানা স্মৃতি দেখতে যাই; তার মধ্যেও জল আমাদের মনকে কেমন উচ্ছ্বসিত করে তোলে। পাহাড়ের সারিবদ্ধ আঁকাবাঁকা সামনে পিছনের দুরূহ পর্বতমালার মধ্যেও যখন একটু ঝরনার সাক্ষাৎ পাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। রাজস্থানের মরুপ্রকৃতির মধ্যে ও সায়রের দর্শনে আমরা পুলকিত হয়ে উঠি। জল অকবিকেও কবি করে, কবিকে নিত্য নতুন কল্পনার আবেগে ব্যাকুল করে তোলে।

এ সবই তো বাইরে থেকে দেখা। সাময়িকের উপলব্ধি। কিন্তু জলেই যাদের জীবন এবং জীবিকা তাদের জীবনযাত্রা বড় কঠিন বড় নির্মম। পৃথিবীতে জলভাগের পরিমাণই বেশী। তিন ভাগ জল। এখানে আছে কত নদী নালা, সমুদ্র সাগর মহাসাগর। জলেই যাদের জীবিকার সংস্থান তারা বাস করে জলের ধারে ধারে। আমরা তাদের বলি মাঝি, মালো, কৈবর্ত ইত্যাদি। ভৌগোলিকভেদে তাদের বাস স্বতন্ত্র। কিন্তু জীবিকার ক্ষেত্রে তারা এক। তারা জেলে, তারা মাঝি। জলের নীচে যে অপরিমেয় সম্পদ আছে তার সন্ধানে তারা ব্যস্ত। সে কাজ করতে গিয়ে কত মানুষ ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে ও রাতের পর রাত জলের মধ্যে কাটিয়ে দেয়। নৌকা ডুবে কত মানুষের প্রাণহাণি হয়। হাঙরের মুখে জীবন দিতে হয়। এদের জীবন দুঃসাহসের সংগ্রামের এবং আনন্দেরও। এত কষ্টের মধ্যে ও জলের মধ্যে থেকে রুপোলী মাছগুলো ছটফট করতে করতে জালের টানে যখন তাদের হাতে চলে আসে তখন তাদের নিশ্চয়ই আনন্দ হয়।

পৃথিবীর দেশে দেশে এদের নিয়ে কত বিচিত্র কাহিনী, উপন্যাস রচিত হয়েছে। চীনে, জাপানে, ইতালিতে, আমেরিকায়, রাশিয়ার সর্বত্র জেলেদের জীবন নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। সেই সাহিত্য নোবেল পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে জেলে মাঝি মালোদের নিয়ে কথা উঠলেই সর্বপ্রথম যে উপন্যাসটির কথা মনে আসে সেটা হল মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'। এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের পরম গর্ব। এই উপন্যাস সম্পর্কে ফরাসী সাহিত্যিক পিয়ের ফালোঁ যা লিখেছেন তা অনবদ্য। অনুপম।

তিনি লিখেছিলেন, "আমি যখন বাংলা শিখতে চেষ্টা করি, তখন স্বভাবত বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' ও আমি তখন পড়েছিলাম। এঁদের সকলের রচনা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, এঁদের কবিতাময় আদর্শবাদিতায় ও রোমান্টিক ভাবধারায় আমার মনকে বিশেষ করে নাড়াও দিয়েছিল। তবু আমার মনের কি একটা অভাব ও কৌতূহল তখনও পূর্ণ হয়নি। এই সময় একদিন মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' আমার হাতে পড়ে। আজও মনে আছে সেদিন প্রাণে একটা রূঢ় আঘাত পেয়েছিলাম। পল্লী জীবনের সেই মাধুর্যপূর্ণ ও ভাবমন্দ্রিত চিত্র আর নয়- এখানে পেলাম বাংলার সাধারণ মানুষের দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবনের একটি বাস্তব ছবি, যে ছবির আতিশয্যহীন ও মর্মস্পর্শী পরিচয় আমার দেশের লোকের কাছে, আমার ভাষাভাষীদের কাছে দেবার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। পড়া শেষ করে সেই রাত্রেই বইখানির কয়েকটি জায়গা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে ফেললাম। আমার এক ভাইকে সেই অনুবাদ পাঠিয়ে মাণিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম।"

তিনি তাঁর বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করে পরে লিখেছেন,কুবের মাঝির দুঃসাহসিক জীবনের চিত্রাঙ্কণ বইয়ের প্রধান আকর্ষণ নয়; পূর্ববঙ্গের সেই ধীবর পল্লীর জীবনযাত্রার অকৃত্রিম বর্ণনা ও গ্রামবাসীদের সরস কথ্য ভাষার অতি সার্থক প্রয়োগও উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণও নয়। সাধারণ মানুষের আদিম ও অমার্জিত মানবতা, অশিক্ষিত ও কষ্টপীড়িত মানুষের চিরন্তন হৃদয়বেদনা ও গভীরতম প্রবৃত্তির অশান্ত সংঘাত, ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ জীবন পরিধির মধ্যেও অপরিচিত ও অনিশ্চিত পরদেশের অনিবার্য আকর্ষণ 'পদ্মা নদীর মাঝি' বইখানিতে নিঁখুতভাবে রূপায়িত হয়েছে বলেই এই উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যের ভূমিকায় সার্থকতা অর্জন করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট চরিত্রগুলি রূপক নয়। কুবের, গণেশ, রাসু, মালা, কপিলা ইত্যাদি মানুষগুলি রক্তমাংসেরই মানুষ। বাস্তব ও জীবন্ত মানুষ। তবে লেখক সত্যকার স্রষ্টা ও শিল্পী বলে ঐ সকল চরিত্র সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্টগুলি অতিক্রম করে বাস্তবতার সঙ্গে এক গভীর ও সর্বজনীন সাঙ্কেতিকতার সফল সংমিশ্রণ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। লেখক দার্শনিক না হয়েও প্রকৃত দ্রষ্টা ছিলেন; তাঁর সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির গুণে তিনি এসকল মাঝিমানুষের অন্তরতম সত্তায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যেখানে তারা আর কেবল পূর্ববঙ্গের দরিদ্র ধীরব তো নয়, বিশ্বজগতের শ্রমকাতর ক্ষুধার্ত পদদলিত নর-নারীর প্রতিনিধি।"

উদ্ধৃতিটা একটু বড় হয়ে গেল। কিন্তু ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসটিতে বুঝতে গেলে এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আর ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ না বুঝতে পারলে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’কেও ঠিকভাবে বোঝা যায় বলে মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যে ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসের পরেই মাঝিদের জীবন নিয়ে লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ‘তিতাস একটি নদীর নাম।’ এই একটি উপন্যাসেই অকালে প্রয়াত অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলা সাহিত্যে চিরজীবী হয়ে আছেন। যতদূর জানি পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাস লিখতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকমাস পদ্মা তীরের মাঝিদের মধ্যে বাস করেছিলেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণকে কষ্ট করে মাঝিদের মধ্যে বাস করতে হয়নি। তিনি নিজেই ছিলেন মালো। তাই এই উপন্যাসের কোন চরিত্রকেই তাঁর কল্পনা করে নিতে হয়নি। বাসন্তী, কিশোর, অনন্তকে তিনি তাঁর নির্মম অভিজ্ঞতার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছেন।

তিতাস একটি মাঝারি নদীর নাম। মেঘনা - পদ্মার বিরাট বিভীষিকা তার মধ্যে নেই। “তার কূল জোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস।” নদীর এক পাড় ভাঙে এক পাড় গড়ে। তিতাসের কোন ভাঙাগড়া নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিতাস নিজেই হারিয়ে গেল, শুকিয়ে গেল। তার বুকে জেগে উঠল এক বিশাল চর। হারিয়ে গেল তিতাস। হারিয়ে গেল তিতাসের ভর করা মালো পাড়ার মানুষগুলো।

নদীর একটা দার্শনিক রূপ আছে। নদী বয়ে চলে। কাল বয়ে যায়। কালের বহার শেষ নেই, নদীরও বহার শেষ নেই। কতকাল ধরে কাল এবং নদী নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে যায়। কত মানুষের মৃত্যু হয়, কতমানুষের জন্ম হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিতাসের আর দার্শনিক রূপ থাকে না। সে শুকিয়ে যায়, মরে যায়। তাকে কেন্দ্র করে মালো পাড়ার কত মানুষ সুখে দুঃখে, হরিষে বিষাদে কাল কাটিয়েছিল। বাসন্তীকে কেন্দ্র করে যে কিশোর আর সুবলার দ্বন্দ্ব তার সব অবসান হয়েছে। কিশোর ভিনদেশের এক সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে বাড়ি আসার পথে তার স্ত্রীকে ডাকাতে মেরে ফেলার শোকে পাগল হয়ে মরে গিয়েছে। তার চার বছর পরে সেই ডাকাতের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং পরে সন্তান অনন্তকে নিয়ে ফিরে আসা বৌও মারা গিয়েছে। একই জায়গায়। কিন্তু একজন দু’জনের কাছে রহস্যই রয়ে গেল। অনন্ত কোনদিন জানতে পারেনি কিশোর তার বাবা। তিতাসের মাছের মতো ভাসতে ভাসতে অনন্ত শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে নিজের পায়ে। মাছ ধরে নয়, বি.এ. পাশ করে দুঃখী আর্ত মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করে। তার জন্য অনন্তবালা বুকের আগুন বুকে নিয়ে অনন্ত অপেক্ষায় দিন গুনছে।

মালোপাড়া আর নেই। সেখানে আর কেউ বেঁচে নেই। আছে শুধু দু’জন। কিশোরের বুড়া বাপ রামকেশব আর সুবলার বৌ বাসন্তী। ভিক্ষা তাদের অবলম্বন। মালোপাড়ায় এখন আছে শুধু মাটি। তার মালিকও মালোরা নয়।

একটু শূন্যতা, একটা বুকভরা কান্না, একটা গভীর বেদনার স্মৃতি শুধু অবশিষ্ট আছে। আর আছে লেখকের এক গভীর দীর্ঘশ্বাস। কারণ তিনিও তো মালোপাড়ার একজন। তিতাস তাই এক-বুক দুঃখের নাম, একটা অতীত ইতিহাস, একটা দুঃখঘন গভীর স্মৃতি। এর মধ্যে যেন লেখককেই গভীর ভাবে পাওয়া যায়। মনে হয় না এটা কোন বানানো আখ্যান। লেখক গভীর দরদ দিয়ে তার সীমাহীন দুঃখের আর্তি সাজিয়ে তুলেছেন। পড়তে পড়তে বুকে মোচড় দেয়। গলা পর্যন্ত কান্না এসে গভীর জমাট বাঁধে। তিতাসের মালোপাড়া বেঁচে থাকে এক গভীর অনুভবে। এখানেই অদ্বৈত মল্লবর্মণের সার্থকতা। এই দরদের মধ্যে, গভীর ভালোবাসার মধ্যে তিনি চিরজীবি। তিতাস পদ্মা নদীর মাঝির পরিপূরক।

প্রসঙ্গ ঃ তিতাস একটি নদীর নাম

বিজিতকুমার দত্ত

তিতাস নদী পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলায়। তিতাস একটি নদীর নাম-এর লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ পূর্ববঙ্গের নদীর কথা আমাদের শুনিয়েছেন। যে পূর্ববঙ্গের কথা তিনি বলেছেন সে পূর্ববঙ্গ তাঁর স্মৃতিতে সঞ্চিত ছিল। স্মৃতি রোমন্থনের মন্থর রূপটি এই উপন্যাসে বিস্তৃত হয়েছে। সম্ভবত মল্লবর্মণ তাঁর বাল্যে-কৈশোরে-যৌবন দেখা এ তিতাসের সুখস্মৃতিকে স্মরণ করে এক রকমের তৃপ্তি পেতে চেয়েছেন। দেশবিভাগের পর কখনও কখনও মনে হয়েছে একটা কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কালান্তরের মানুষ মল্লবর্মণ অন্যকালকে স্মরণ করে তৃপ্তি পাবেন এতে বিচিত্র কিছু নেই। স্মৃতিরোমন্থনের মধ্যে যে স্নিগ্ধ রমণীয়তার বিস্তার ঘটে এই উপন্যাসে সেই রমণীয়তার সঞ্চার লক্ষ্য করি।

মল্লবর্মণ তাঁর কাহিনীটিকে দু'রকম চালে চালিয়েছেন। সব উপন্যাসে যেমন দেখি লেখক নিজেই কথক বিশ্লেষক, তিতাসের কাহিনীতেও লেখকের সেই ভূমিকা। জন্ম-মৃত্যু বিবাহ-মানুষের এই আপাতবৈচিত্র্যহীন জীবনকাহিনীর মধ্যে যে রস জমা হয়ে থাকে মল্লবর্মণ সে রসের সন্ধান দিয়েছেন। বিশ্লেষণের লোভে তিনি পড়েননি। অবশ্য তাঁর নিজের কিছু বলার ছিল। একেবারে নিজের। সেটুকুকে এই বইয়ের ভূমিকাও বলতে পারি। বইটি আরম্ভ হয়েছে 'তিতাস একটি নদীর নাম'—এই শিরোনামে। এখানে লেখক উপন্যাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সমাবেশ করেছেন। পাঠকদের প্রস্তুত করে নিচ্ছেন তিনি। বর্ণনা-বিবৃতি ঈষৎ সংলাপের অবতারণার দ্বারা তিনি তিতাস এবং চারদিকের পরিবেশকে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বর্ণনাটাই অনেক সময় জরুরী। তারও একটা আভাস এই ভূমিকায় বিস্তৃত।

যদিও বইয়ের মূল অংশে সেই ভূগোল-প্রকৃতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিশে আছে বলে আরও গাঢ় রূপ ধরেছে কিন্তু প্রস্তাবনা অংশে এক রোমান্টিক আতুরতা নিয়ে লেখক তাঁর ছিন্নমূল জীবনের বেদনাকে আস্বাদন করতে চেয়েছেন। আমরা কথায় কথায় মিষ্টি শব্দটি প্রয়োগ করি। সার্থকভাবে উপন্যাসের প্রস্তাবনা অংশের বক্তব্য ভাবটিকে ঐ শব্দে চিহ্নিত করা যায়। অবশ্য নদীর রূপ-রূপান্তর নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখলে একটা রূপকাভাস নিয়ে আসে। এই রূপ-রূপান্তর কাল-কালান্তরের দ্যোতনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মল্লবর্মণ সেই কথা বলেন, 'নদীর একটা দার্শনিক রূপ আছে। নদী বহিয়া চলে। কালও বহিয়া চলে।' (১৭)

নদীর বুকে যেন নিরবধি কালের ইশারা। বলা বাহুল্য, এই দার্শনিক উপলব্ধি সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসে না। জনজীবনের খুঁটিনাটিই উপন্যাসের বিষয়। অবশ্য ঐ উপলব্ধিও সত্য। মানুষের জীবনের বিকাশের মধ্যেই সেই সত্যের সার্থকতা। এ রকম একটা উপলব্ধি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' উপন্যাসে টের পাওয়া যায়। তিনি ইছামতী নদীর তীরে বাস্তুভিটেগুলি সম্বন্ধে বলেছেন, 'এই সব ভিটে দেখে তুমি স্বপ্ন দেখবে অতীত দিনগুলির, স্বপ্ন দেখবে সেই সব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের, যাদের জীবন ছিল একদিন ওই সব বাস্তুভিটের সঙ্গে জড়িয়ে, কত সুখ দুঃখের অলিখিত ইতিহাস বর্ষাকালে জলধারাঙ্কিত ক্ষীণ রেখার মত আঁকা হয় শতাব্দীতে শতাব্দীতে এদের বুকে।'(৪) অন্যত্র বলেছেন, 'কতদিনের আগের সেই অভাগিনী কুলীন কুমারীর স্মৃতি বহন করে ইছামতী তাঁদের সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে, তাঁরই না-মেটা স্বামী-সাধের পুণ্য চোখের জল ওর জলে মিশে গিয়েছে কতদিন আগে।'(৫৬) বহতা নদী এবং কালের প্রবহমানতা একই মাত্রায় স্থাপিত। মল্লবর্মণ এবং বিভূতিভূষণ চোখের জলে ভিজিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। এবং তিতাসের রূপকার রূপে তিনি বলেন, 'এ শিল্পী মহাকালের তান্ডব-নৃত্য আঁকিতে পারে না। পিঙ্গল জটার বাঁধন খসিয়া পড়ার প্রচন্ডতা এ-শিল্পীর তুলিকায় ধরা দিবে না। এ শিল্পী মেঘনা-পদ্মা-ধলেশ্বরীর তীর ছাড়িয়া তিতাসের তীরে আঙিনা রচনা করে।'(১৫) একটু আগে বলেছেন, 'শিল্পের আরেকটা দিক আছে। সৌম্য শান্ত করুণ স্নিগ্ধ প্রসাদগুণের মাধুর্যে বঞ্চিত এ শিল্প।'(১১) পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে এমন কি দীর্ঘকাল ধরে প্রায় প্রবাদের মত পূর্ববঙ্গের যে নদীটি খ্যাত-কীর্তি সেই কীর্তিনাশাই যেন পূর্ববঙ্গের নদীপ্রতিনিধি হয়ে আছে।

কিন্তু পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর তীর ছেড়ে লেখক যখন তিতাসের তীরে আঙিনা রচনা করেন তখন দীর্ঘকালের ধারণাটা বদলে যায়। তখন ইছামতীর তীর আর তিতাসের তীরের জেলা মেশামেশি। কথাটা বদলে যায়। কথাটা বোধ হয় একটু স্পষ্ট করার প্রয়োজন আছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় পূর্ববঙ্গের নদীর (দক্ষিণ বঙ্গও বটে) সম্বন্ধে বলেছেন, 'ওই নদীর সাতনরী হার আরও নীচে গিয়ে এক হয়ে মিশেছে। তখন তার নদীর এপার ওপার নাই। মা- লক্ষ্মীর গলার সোনার সাতনরী হয়ে উঠেছে যেন মনসার গলায় অজগরের বেড়! নদী সেখানে অজগরের মতই ফুঁসছে। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ফুলে-ফুলে উঠছে, যেন হাজার ফণা তুলে দুলছে।'(৭) মল্লবর্মণ নদীর এ রূপের সঙ্গেও পরিচিত—'ঢেউয়ের আঘাতে তীরগুলি ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়ে। গৃহস্থালি ভাঙ্গে। খেত-খামার ভাঙ্গে, তাল-নারিকেল, সুপারির গাছগুলি সারি বাঁধিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। ক্ষমা নাই। ভাঙ্গা-গড়ার এক রুদ্র দোলার দোলনায়—করাল এক চিত্তচঞ্চল ক্ষিপ্ত আনন্দ, সে-ই এক ধরনের শিল্প।' (১১)। কিন্তু মল্লবর্মণ এই রুদ্র রূপের শিল্পী নন। সে কথা আগে বলা হয়েছে।

যে নদী ধীরে চলে, বর্ষায় খানিকটা চঞ্চল হয় আবার শীতে লাজনম্র হয়ে আসে তার তীরের মানুষগুলির জীবনও অনেকটা সেই গতিতে গড়া হয়। আপাত দৃষ্টিতে মন্থর হয়ে সেখানেও

এক রকমের ভাঙাগড়া চলে। বিভূতিভূষণ ইছামতীতে সবার অলক্ষ্যে যে পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটে তার কথা বলেছেন। আমার মনে হয় মল্লবর্মণও সেই গতিপ্রবাহের সরু মোটা রেখাগুলিকে স্পর্শ করবার চেষ্টা করেছেন। তারাশঙ্কর কিন্তু নদীর ভাঙাগড়ার কথা তেমন ভাবে বলেন না। তিনি কোপাইয়ের তীরের মানুষগুলিকে এমন একটা পটভূমিতে স্থাপন করেন যা অনুভব করে আমরা খানিকটা আতঙ্কে বিহ্বল হই। আসন্ন ধ্বংসের মুখে তিনি নিয়ে আসেন গোটা সমাজটাকে। যদিও সেই ধ্বংসের কারণগুলি তিনি বুঝিয়ে দেন অতীত স্মৃতিচারণা করেই তবু ধ্বংসের দাপানিতে আমরা শিহরিত হই। ইছামতী অথবা তিতাসে সে বস্তু নেই। নিস্তরঙ্গ জীবনের মাধুর্য এই দুইজনকে মুগ্ধ করে। এদিক থেকে আবার বিভূতিভূষণের সঙ্গে মল্লবর্মণের পার্থক্য আছে। বিভূতিভূষণ ইছামতীর সঙ্গে মানুষগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা বলেন না। ইছামতীর ভাঙাগড়ার সঙ্গে গ্রামজীবনের ইতিকথা বলেননি তিনি। এই নামটির সার্থকতা উপন্যাসে খুব আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মল্লবর্মণ তিতাসের সঙ্গে তার তীরের মানুষগুলির অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বারবার বলেন। তিতাসই ওই মানুষগুলির নিয়ন্তা। তিতাসের সঙ্গে মানুষের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের ধারাবাহিকতা। এরকম উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'। কুবীর, হোসেন মিঞাকে পদ্মানদী ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। (গঙ্গা---সমরেশ বসু) যেমন সমরেশ বসুর গঙ্গা ছাড়া তেঁতলে বিলাসকে ভাবাই যায় না। মল্লবর্মণের রচনারীতি নিয়ে আগে উল্লেখ করেছি। এই উপন্যাসে মেয়েরা যখন একসঙ্গে গল্প করতে বসেছে তখন একজন আর একজনকে 'পরস্তাব' বলতে বলেছে। এই 'পরস্তাব' মেয়েদের সম্পত্তি। পরস্তাব মানে প্রস্তাব। কোন কিছুর অবতারণা। অর্থাৎ একটি গল্পের অবতারণা। বাসন্তী আর অনন্তের মা নিজেদের জীবনের কাহিনীকেই পরস্তাবের আকারে বলেছে। আর উদয়তারা, নয়নতারা, আসমানতারা বলেছে 'শিলোক' অর্থাৎ শ্লোক। অদ্বৈত মেয়েলি পরস্তাব নীতিটিকে অধিগত করেছিলেন। এই পরস্তাবকে তিনি ব্রতকথার শৈলীতে ঢেলে নিজের গল্পটিকে বিস্তার করেছেন। ব্রতকথায় যেমন পরিবারের সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ জীবনের বিস্তার মল্লবর্মণের ব্রতকথায়ও। তাই ব্রতকথার সঙ্গে ঠাকুরমার ঝুলিকে তিনি মিশিয়ে দেন। ফলে আশার সঙ্গে স্বপ্নের, বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের অপরূপ যোগ দেখা যায় এই উপন্যাসে। এই শৈলী মল্লবর্মণের আরোপিত নয় ঐ জীবন থেকেই উদ্ভূত। বিষয়ের সঙ্গে রচনাশৈলী অপৃথক। চৌয়ারি জলে ভাসানোর দৃশ্যটি বলছেন এইভাবে অদ্বৈত, 'সেদিন মালোপাড়ার ঘাটে ঘাটে সমারোহ। ঢোল সানাই বাজিতেছে, পুরনারীরা গান গাইতেছে, দুপুরের রোদে তিতাসের জল চিক্ চিক্ করিতেছে। মালোর কুমারীরা আন্‌কোরা শাড়ি পরিয়া, তেল-জবজবে মাথায় চিত্র বিচিত্র চৌয়ারি তুলিয়া, জলে ভাসাইয়া দিবাব উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু মালোর ছেলেদের তর সহিতেছে না। মেয়েরা অনুনয় করিতেছে, এখনই ধরিও না, জলে আগে ভাসাই, তখন ধরিও।.....কিন্তু তাদের যারা ভাসাইল, তারা সুখী হইল কি? ছেলেরাই যদি ধরিতে না পারিল, তবে মেয়েদের উহা ভাসাইবার সার্থকতা কই?' (৩১)

দৃশ্যটির প্রত্যক্ষতা আমাদের চকিত করে। 'তেল জবজবে মাথায়' মেয়েদের আনন্দোচ্ছল রূপের ছবি আঁকলেন অদ্বৈত। সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ্য করতে বলি বর্ণনার ভাষা ব্রতকথার। অথবা রূপকথার। পূর্ববঙ্গের নদীতে বান আসে। ক্ষেত-পাথরের জল শুকায়, তারপর পথের রেখা পড়ে। এরপর? অদ্বৈতের বর্ণনায় 'তখন বর্ষা শেষ হইয়া যাইবে। গাঙ-বিলের দিকে চাও, দেখিবে পরিষ্কার—দিনের দিকে চাও, পরিষ্কার। কিন্তু ঘর বাড়ির দিকে চাও— পরিষ্কার দেখ কি? দেখ না।'(৩০৩) বঙ্কিমচন্দ্রের মত পাঠক সম্বোধন নয় অদ্বৈত যেন স্বগতোক্তি করছেন। নিজে দেখছেন এবং অপরকে দেখাতে আগ্রহ বোধ করছেন। এই আগ্রহ জাগানোর জন্যে অদ্বৈত কাহিনী বলবার চেষ্টায় রূপকথা-ব্রতকথার কৌশলটি নিলেন। কিন্তু ওই বর্ষায় মালোদের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যায়। তখন নারীরা কাজে নেমে পড়ে। 'পুরুষেরা জল আনিবে মুল আনিবে বাঁশ আনিবে বেত আনিবে— আনিয়া ঘরদুয়ার ঠিক করিয়া দিবে। তারপর মেয়েবৌরা তিতাসের পারের নরম সোঁদাল মাটি আনিয়া ধার-পিঁড়া ঠিক করিবে, লেপিবে পুঁছিবে, আরসির মত ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করিবে—তাতেও কোন্-না পনর দিন লাগিবে? বাকি পনর দিনের সাত দিনে কাঁথা কাপড় কাচিবে, চাটাই মাদুর ধুইবে, তারপর সাতদিন বাকি থাকিতে তেল-সাবান মাখিয়া দেবী হইয়া বাসিয়া থাকিবে—দিন আবার ফুরায় না?'(৩০৪) এই অংশটি বর্ণনা বিবরণও বটে আবার একটি নারীর ভাবনারও বিষয়। সে নারী উদয়তারা। কিন্তু অদ্বৈত অংশটি সংলাপাত্মক করেননি। নিজেই উদয়তারার গৃহিণীপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে স্বীকারোক্তি করেছেন। ঠাকরাইনের (দুর্গাদেবী) পূজার আগে শরৎকালকে আহ্বান করবার জন্যে নান্দীপাঠ করেছেন ওই অংশে লেখক। এখানেও ব্রতকথা-রূপকথার ধ্বনিটি লক্ষণীয়। ব্রতকথা-রূপকথায় কাহিনীর আকর্ষণই প্রধান। আবার মোটা তুলিতে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি অতিদ্রুত উচ্চারণ করাও ওই রচনার বৈশিষ্ট্য। 'চ্যাং ব্যাং' গল্পের দুখু চাঁদ-বুড়ির কাছে গিয়ে বুড়ির কথামত চানে যাচ্ছে। এর বর্ণনা শোনাই, 'ঘরে গিয়া দুখু,—কত কত ভাল ভাল গামছা কাপড় নিয়া, যেমন-তেমন একটু তেল মাথায় ছোঁয়াইয়া, এক চিমটী খার খৈল নিয়া নাইতে গেল।' (২২৮, ঠাকুরমা'র ঝুলি পঞ্চবিংশ সং)। গামছা, কাপড়, তেল, ক্ষার খৈল খুঁটিনাটি তথ্যের প্রতি রূপকথাকারের মনোযোগ লক্ষণীয়।

মল্লবর্মণ মালো জীবনযাত্রার তথ্য একরকমভাবেই প্রকাশ করেছেন। কেবল তাই নয়, যখন হৃদয়ের অথবা ঘরকন্নার প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়—যেখানে শোক-তাপ, আশা-আনন্দ রয়েছে—তখনও রূপকথার বর্ণনার মত মোটা তুলিতে মল্লবর্মণ এগিয়ে যান। সুবলের মা গগন মালোকে মনে করিয়ে দেয়, 'নাও করবা, জাল করবা, সাউকারি কইরা সংসার চালাইবা! এই কথা আমার বাপের কাছে তিন সত্য কইরা তবে ত আমারে বিয়া করতে পারছ। স্মরণ হয় না কেনে?' সংলাপে তিনটি ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া দিয়ে বিবাহপ্রার্থী বরের যোগ্যতা স্বল্প আয়োজনে ফুটিয়ে তুলেছেন অদ্বৈত। মঙ্গলবারের ব্রতকথায় জয়াবতীর কাজের বর্ণনা এইরকম, 'জয়াবতী ফুল তোলে, পূজা করে, মঙ্গলবার করে— কথা শোনে।' (মেয়েদের

ব্রতকথা, ৫৫) অথবা জয়াবতী জয়দেবকে মঙ্গলবারের ব্রতকথার মাহাত্ম্য শোনায় এইভাবে, 'হারালে পায়, স্বামী-পুত্র জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, ম'লে বাঁচে।' (ঐ ৫৬) এখানেও বর্ণনায়-সংলাপে কাটা কাটা বাক্য। এই ব্রতকথার বর্ণনা রীতি। পূর্ববঙ্গে ব্রতিনীদের যে ব্রতকথা বাল্যকালে শুনেছি আর কোন আদর্শ ছাপার অক্ষরে পাইনি। মল্লবর্মণের লেখায় তার আভাস পেয়ে সেই শৈশবের স্মৃতি জাগে। অদ্বৈত একটি সভার বর্ণনায় মেয়েদের বসবার জায়গার খুঁটিনাটি চিত্র দিয়েছেন, 'মেয়েরা যেখানে রাঁধে, ধান সিদ্ধ করে, মুড়ি-চিড়া করে, মাথায় তেল দেয়, উকুন বাছিয়া দেয় পরস্পরের সেখানটাতে একটা আবদ্ধ বেড়া।' (১৩৪) এখানেও নারীমহলের সুন্দর চিত্র। অথবা সুবলের করুণ মৃত্যু কাহিনী বর্ণিত হবার পর অদ্বৈত বলছেন, 'বাসন্তীর হাতের শাঁখা ভাঙ্গিল, কপালের সিঁদুর মুছিল।' (১৯৩) বাসন্তী, মঙ্গলবার মা আর অনন্তের মা পিঠে ভাজতে ভাজতে 'পরস্তাব' (১৮৬) বলছিল। সে পরস্তাব তাদের নিজেদেরই জীবনের কাহিনী। বাসন্তী স্বামী সুবলের কথা স্মরণ করছে। সুবলের বুক নৌকা পিন্ড করে দিল। বাসন্তী তারপর বলে, 'আর সে-নৌকা কার-নৌকা সবই জানি; কিন্তু বলিব না।'

'জান যদি, তবে কইবা না কেনে?'

'চোখে জল আইয়া পড়ে দিদি। কইতে পারি না।'

'একজনের কথা যে কইলা, সে মাইয়া কে?'

'তার নাম বাসন্তী। সে অখন নাই। মারা গেছে।' (১৮৮)

এখানেও ব্রতকথার মত সংলাপের হ্রস্বতা। আসলে এ সংলাপ তো একটি বঞ্চিত নারীর দীর্ঘনিশ্বাস। এর কথা অল্প, কথার আভা দীর্ঘ।

মল্লবর্মণ যে ব্রতকথাকে স্মরণে রেখেছিলেন এটা আমার অনুমান নয়।

বাসন্তী অনন্তের মাকে কিশোর-অনন্তের কথা শুনিয়ে বলে 'কন্যা, এই বর্তের কি এই কথা। অনন্তের মা অশ্রু গোপন করে বলে, 'হ' (১৮৯)। বাসন্তী বলে 'তবে ঘটে দেও বেলপাতা!' (১৮৯) স্পষ্টতই ব্রতকথার রচনাশৈলী মল্লবর্মণকে প্রভাবিত করেছিল। প্রভাব কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না। অদ্বৈত গোকর্ণগ্রামের মালো জীবনকে ব্রতকথাতেই রূপ দিতে চেয়েছিলেন।

এবারে বিষয়বস্তু উপস্থাপনে মল্লবর্মণ যে রূপকথা-ব্রতকথা শৈলী অবলম্বন করেছিলেন তাও লক্ষ্য করতে বলি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উপকথার শৈলী গ্রহণ করেছিলেন হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়। এমন কি নিজের কথাও তিনি কাহারদের ভাষার বলেছেন, অদ্বৈত উপস্থাপনে সচেতনভাবে একই কাজ করেছেন। কিশোর-সুবলের কাহিনী রাজপুত্র আর সদাগর পুত্রের কাহিনীকে স্মরণ করায়। কিশোর-সুবল একসঙ্গে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে কিন্তু তা বন্ধুভাবাপন্ন। একজন ধনী অন্যজন নিঃস্ব। কিন্তু তাতে বন্ধুত্বে ভাঁটা পড়েনি। একদিন কিশোর যাত্রা করল মেঘনার উদ্দেশে। রোজগারের আশায়। মালোর ছেলেরা এ

ভাবেই সাবালক হয়ে ওঠে। রাজপুত্র সদাগর পুত্র যায় রাজকন্যের উদ্দেশে। পথে বিপদ, বাধা। কিশোর-সুবলও বাধা পেয়েছে। বিরাট মেঘনা তাদের ভয় দেখিয়েছে। আবার দিশেহারা যুবক দুটিকে মেঘনাই আশ্রয় দিয়েছে। রূপকথায় আমরা যাদুকরী নারীর ছলনার কথা জানি। যার প্রলোভনে পুরুষ ভেড়া হয়ে যায়। কিশোরও বেদেনীর দেহের উষ্ণতাপে তপ্ত হয়ে উঠেছিল। বেদেনী কাজ হাঁসিল করে কিশোরকে মূর্ছিত করে দিয়ে যায়। বাসন্তীর সঙ্গে কিশোরের বিবাহের পাকা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর পুরুষজাতির মতই কিশোর বাসন্তীকে ভুলে যায়। নদী তার মনকে ভিন্ন বাঁকে নিয়ে যায়। এখানে সে রাজকন্যার সাক্ষাৎ পায়। এই রাজকন্যাকে ঘিরে তার রোমান্টিক স্বপ্ন বাস্তবতা পায়। কিন্তু রাজকন্যাকে দৈত্যপুরী থেকে হরণ করা একরকম দুঃসাধ্য। কিশোরও ঢাকঢোল বাজিয়ে সেই কন্যাকে হরণ করতে পারেনি। হঠাৎ দাঙ্গায় অভিভূত বিপর্যস্ত কিশোর নববিবাহিত পত্নীকে নিয়ে নৌকা ভাসিয়ে দিল। রূপকথার জগতে সব আশা শেষ পর্যন্ত সফল হয়। কিন্তু মানুষের জীবনে দৈত্য হানা দিলে সে দৈত্য জিতে যায়। কিশোর পড়ল সে দৈত্যের কবলে। অনন্তর মা অপহৃত হল! কিশোর পাগল হয়ে গেল। সমস্ত ঘটনাটাই রূপকথার আধারে স্থাপিত। রূপকথার যেখানে শেষ তিতাসের সেখানে আরম্ভ। অনন্তের মা'র দিনযাপনের মর্মান্তিক বিবরণই এই উপন্যাসের আকর্ষণ। এ-যেন সুয়োরানীর দুঃখ। যার জীবন সুখের, ঐশ্বর্যের হতে পারত তার জীবন হয়ে গেল ঊষর। আর অনন্ত? মা'র কাছ থেকে বাসন্তীর মমতায় আশ্রয় পেল। সে মমতার টানও অবস্থার বিপর্যয়ে শিথিল হয়। সে চলে আসে উদয়তারার কাছে। একদিন সে টানও নষ্ট হয়। সে গ্রাম ছেড়ে শহর আসে। অদ্বৈত নিজেরই কাহিনী বলেছেন অনন্তের একাকিত্বের বেদনায়। সুয়োরানীর ছেলে শেষ পর্যন্ত সুখের মুখ দেখল কিনা এই প্রশ্নের দোলায় পাঠক দুলতে থাকে। রূপকথার ব্রতকথার মানুষগুলি বারেবারেই প্রতিকূলতার সামনে পড়ে এরা উদ্ধার পায় দৈববলে, দেবতার কৃপায় অথবা নানা অলৌকিক বিধিতে।

রূপকথার এই আশ্বাস অদ্বৈত পাবেন কোথায়? বর্তমান তাঁকে নিশ্চয়ই জর্জরিত করেছিল। কিন্তু তিনি জানেন এ রূপকথার জগৎ ছিল। সেখানে দুঃখ শোক আছে। আবার তিতাস-মেঘনাও আছে। যার জলের তলায় সোনালী মাছেরা ঘুরে বেড়ায়। নৌকায় তুললে সে-সব মাছ নাচে। সে নাচ জেলের চিত্তে মাতন তোলে। অনন্ত যখন মায়ের সঙ্গে গোকর্ণ গ্রামে যায় তখনও তার সামনে রূপকথার নদীর স্বপ্ন, 'এইবার বড় নদী। অনন্ত কোল হইতে নামিয়া পড়িল। একটা নেংটি ইঁদুর বুঝি ধানক্ষেতের প্যাঁট হইতে বাহির হইয়া রূপকথার দেশের এক নদীর পাড়ে গিয়া দেখিল সামনে রূপার নদী। গলানো উপছালো রূপার নদী। সে তো নদী নয়, হাজার বছরের না শোনা গল্প, দুই তীরের বাঁধনে পড়িয়া একদিকে বহিয়া চলিয়াছে' (১০৮)। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে অনন্তের চোখে রূপকথার স্বপ্ন। কিশোর জাল ফেলল মেঘনার বুকে। যার বুকে মাছেরা চলে বেড়ায়। 'কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া কিশোর তাহার প্রথম খেউ তুলিল। ইঞ্চি পরিমাণ সরু সরু মাছ—রূপার মত রঙ্ ছোট ছোট ঢেউয়ের মত জীবন্ত। কিশোর

ক্ষিপ্রহস্তে টানিয়া এক ঝট্‌কায় 'ডরা'-তে ফেলিল, মাঝগুলি অনির্বচনীয় ভঙ্গিতে নাচিতে লাগিল। প্রথম খেউয়ের মাছ দেখিয়া কিশোরের চক্ষু জুড়াইয়া গিয়াছে। মাছগুলি দেখিতে এই সকাল বেলার মতই স্নিগ্ধ(৬২)। অনন্ত ও রূপার নদী দেখেছিল, তার বাপ ও রূপার মত মাছের প্রতি অনন্ত টান অনুভব করে। বাপের রূপার স্বপ্ন পুত্রের রূপার স্বপনে মিশে যায়। দুইয়ের খুশীতেই প্রাপ্তির স্বাদ। রূপকথার রাজকন্যার ঐশ্বর্য জেলেদের জীবনে নদীর বুকে—নদীতে।

বলা বাহুল্য অদ্বৈত রূপকথর স্বপনে ডুব দিয়েছিলেন বটে কিন্তু সে স্বপ্ন অধরা বস্তু নয়। এই উপন্যাসে আমরা মালোদের জীবনকাহিনীতে বাস্তবতার একটি বিশেষ দিকের প্রতি অদ্বৈতের মনোযোগ লক্ষ করি। বাংলাদেশের গ্রামের নারীদের জীবন এক চালাতেই বাঁধা। কিন্তু নিম্নবিত্ত সমাজে নারীর একটি ভূমিকা রয়েছে। কেবল নারী কেন এই সমাজের প্রতিটি মানুষই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। অতত্রব এই সব পরিবারে সন্তান-সন্ততির সম্ভাবনা অভিনন্দিত হয়। জোকারের দ্বারা নবজাতক-কে আহ্বান করে। জেলেরা জাল নিয়ে নদীতে যায় রাতের অন্ধকরে। এটা যেমন সত্য তেমনি নারীরাও নানা কাজে জেলেদের জীবিকার সাহায্য করে। 'কি অত কাজ? না, মেয়েরা বটি মেলিয়া কাতারে কাতারে বসিয়া যায়। পুরুষেরা মাছের ঝুড়ি ধরাধরি করিয়া আনিয়া তাহাদের পাশে স্তূপ করিতে থাকে। মেয়েদের হাত চলে ঠিক কলের মত। এত বড় মাছটাকে পলকে ঘুরাইয়া পেটে পিঠে গলায় তিন পোচ দিয়ে ঘাড়ের উপর দিয়া ছুঁড়িয়া মারে, সে-মাছ যথাস্থানে জড় হয়। আরেক দল পুরুষ সেখানে হইতে নিয়া ডাঙ্গিতে তোলে, শুকাইবার জন্য। দিনের পর দিন এই ভাবে তিন মাস কাজ চলে'(৭১)। অশোক মিত্র ১৯৫১ সালের বাংলাদেশের আদমসুমারির যে বিবরণ পেশ করেছিলেন তাতে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির এই প্রসঙ্গটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

এই অর্থনীতির রূপান্তর এখন নিশ্চয়ই ঘটেছে। কিন্তু জীবিকার এই যৌথ প্রয়াস গ্রামীণ অর্থনীতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য। অদ্বৈত এটা টের পেয়েছিলেন। তিনি কর্মক্ষম নারীর যে চিত্র এঁকেছেন তাতে শ্রম এবং মাধুর্য মিলে একটি সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে। জেলেদের জাল নেই। জাল দেয় মহাজনেরা। অতএব উৎপাদনের লাভের অংশ চলে যায় মহাজনদের ঘরে। কিন্তু মেয়েরা জেলেদের সাহায্য করে। অবসর সময়ে সুতা কাটে। অনন্তের মাকে তো সুতা কাটার যন্ত্র এনে দেয়। সুতা কাটার কৌশল শিখিয়ে দেয়। শ্রমের সঙ্গে জীবিকার এই সম্বন্ধ মানুষগুলির প্রাত্যহিক জীবনকে চিনিয়ে দেয়। 'দুপুরের পরে সুবলার বউ কতকগুলি সুতা কাটার হাতিয়ার লইয়া হাজির হইল। সেগুলি মাটিতে নামাইয়া বলিল, 'এই নেও বড় টাকু, মোটা সুতার লাগি, এই নেও ছোট টাকু, চিকন সুতার। আর এই একখানা পিঁড়ি দিলাম, গাটে গিয়া শণের লাছি এর উপরে আছড়াইয়া ধুইয়া আনবা। তারপর রইদে শুকাইভা। রাইতে আইয়া সব শিখাইয়া দিমু'(১২৬)। টাকু জেলেদের আর মাকু তাঁতিদের। এই উৎপাদন যন্ত্রের সঙ্গে এদের জীবন জড়িয়ে আছে। জেলেদের ঐশ্বর্য কিসে? অদ্বৈত জানেন তা। 'জেলে রমণীর

ঘরে থাকিবে কাটা আকাটা সুতা, এক আধকানা অসমাপ্ত জাল, আর সুতাকাটার জাল বোনার নানা রকমের সরঞ্জাম। এই যদি না রহিল তো জেলেনীর ঘরে আর কায়স্থানীর ঘরে তফাৎ রহিল কোথায়'(১২৪)। নদীর সঙ্গে বাঁধা জীবন এই মালোদের কথা অদ্বৈত কত অন্তরঙ্গ ভাবে পরিস্ফুট করেছেন। নদী দেয় মাছ। সেই মাছের জন্যে চাই জাল। জালের জন্য সুতা। সুতা কাটবার জন্য টাকু। মালোর ঘর কিসে আলো করে? বাসন্তী যখন বুঝিয়ে দেয় তখন পাঠকেরও বোঝা হয়ে যায়। প্রকৃতিকে কিভাবে মালোরা আপন করে নেয়? প্রকৃতি কর্ষণের ক্ষেত্র। এই কর্ষণে প্রাচুর্য। এখানে কর্ষণভূমি নদীই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মা নদীর মাঝি'তে জেলে জীবনের এই অর্থনীতির রূপটাকে অন্যভাবে দেখান। তিনি বঞ্চনার, লাঞ্ছনার শিল্পী। পদ্মা নদীর মাঝি দ্বিস্তরের উপন্যাস। এক স্তরে জেলে জীবনের খুঁটিনাটি। অভাব-অনটন। প্রেম-রিরংসা। অন্য স্তরে হোসেন মিঞার পুঁজিবাদী কৌশল। পাঠক দ্বিতীয় স্তরে উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার গন্ডী থেকে বর্তমান কালের পুঁজিবাদীদের শোষণকে দেখতে পান। তিতাসে অভাব-অনটন, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা আছে। কিন্তু অদ্বৈত 'কিষ্টমনী'। সব কিছুকে বৈষ্ণবীর ভাবনায় দেখতে চান। দুঃখকে তিনি জানেন কিন্তু সে দুঃখ শান্তরসের বিস্তারে স্নিগ্ধ।

কথাসাহিত্য (আশ্বিন ১৩৮৮, ২২ বর্ষ ১২ সংখ্যা) লেখকেব অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত

স্মৃতির সরণি থেকে ঃ অদ্বৈত মল্লবর্মণ
বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়

কলকাতায় 'কৈবর্ত সমিতি' ভবনে বেশ কয়েক বছর আগে একটি সভা হযেছিল। সেই সভার শেষে কথা প্রসঙ্গে বাংলার বিভিন্ন সাময়িক পত্র নিয়ে কয়েকজন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকেন। তাঁদের আলোচনার মধ্যে 'নবশক্তি' পত্রিকার নাম শুনে জনৈক পল্লীবাসী বলেন, এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ঃ অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তাঁদের পাশে বসে সেই আলোচনা আমার মনে দাগ কেটেছিল। স্মৃতির সরণিতে ভেসে ওঠে কয়েকটি ঘটনা। 'নবশক্তি' পত্রিকা আমাদের বাড়িতে দিয়ে যেতেন সম্পাদক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। এই কারণে আমার ভালো লেগেছিল তাঁদের কথা। আমি বলেছিলাম, আপনারা তাঁকে দেখেছেন কিনা, তা' জানিনা। কিন্তু আমি দেখেছি। একথা ভাবতেও আজ আমার ভালো লাগছে।

কৈবর্ত সমিতি ভবনে উপস্থিত ছিলেন বন্ধু সুশান্ত হালদার। তিনি আমাকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রসঙ্গে লেখার কথা বলেন। কিন্তু সুশান্ত হালদারের অনুরোধ মতো সম্ভবপর হয়নি। কয়েক বছর কেটে যাবার পরে, হঠাৎ একদিন এসে সেই অনুরোধ আবার করেন। এর মধ্যে বহু বছর কেটে গেছে। আমি অদ্বৈত মল্লবর্মণকে দেখেছিলাম, অল্প বয়সে। তিনি আমার মা-কে মাসিমা বলতেন। আমাদের ভাইদের মতো স্নেহ করতেন। এ-সব ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ-সব নিয়ে আলোচনা মনে হয় অন্যের ভালো লাগবে না। এই লেখার সময় হয়েছি দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু লিখতে হলো বন্ধুর অনুরোধে।

স্মৃতির সরণি থেকে লিখছি। সে সময়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণকে দেখেছি, বর্তমানে সে বাংলা নেই। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যতদুর মনে পড়ে গ্রীষ্মকাল। আমরা তিন ভাই দুপুরে খেয়ে নিদ্রিত। বাবার নাম করে দরজায় কড়া নাড়তে শুনে জানলা খুলে চোখে পড়লো জনৈক অল্প বয়স্ক বাবার খোঁজ করছেন। মা দরজা খুলে জিজ্ঞেস করেন, কোথা থেকে আসছেন ?

আগন্তুক মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলেন, শৈলেন বাবু (শৈলেন পাল) পাঠিয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, শৈলেন পাল ছিলেন, সেকালের 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণি পাল মহাশয়ের পুত্র। শৈলেন পাল ছিলেন আমার ছোট মামা মণি চট্টোপাধ্যায় বন্ধু। আমরা তাঁকে মামা বলতাম। তিনি আমাদের মাকে দিদি বলতেন। আগন্তুক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। মা তাঁকে ঘরে বসতে বলেন। তিনি আরও বলেন, শৈলেন পাল প্রেমেন্দ্র মিত্র -কে

জানিয়েছেন, একসময় আমার বাবা 'যমুনা' পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে সাহায্য করেন। এই শুনে প্রেমেন মিত্র 'নবশক্তি'র বিজ্ঞাপনের জন্য একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন।

আমাদের ঘরে এলোমেলো ভাবে ছিল অনেক বই এবং পত্র-পত্রিকা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ বসে এইসব দেখছিলেন। আমি ঘরে বসেছিলাম। মা ঘরে এসে তাঁকে বললেন, বাবা দুপুর বেলা নিশ্চয় না খেয়ে এসেছ?

মায়ের কথা শেষ হবার আগে অদ্বৈত মল্লবর্মণ বলেন, আমার ভাত ঢাকা থাকবে, পরে খেয়ে নেব।

মা বলেন, ঘরে যা আছে খেয়ে তারপর অপেক্ষা করো। আমি ভাত নিয়ে আসছি। তোমার খাওয়া হলে আমি খেতে বসবো।

বেশ মনে পড়ছে, অদ্বৈত মল্লবর্মণ মায়ের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। মনে হচ্ছিল, সমস্যায় পড়েছেন। কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে থাকেন।

মা তাঁর কথা না শুনে একটি ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে মেঝে নিকিয়ে আসন বিছিয়ে দেন। তখন আমরা মেঝেতে বসে আহার করতাম। আতিথিকেও ওই ভাবে আপ্যায়ন করা হতো। এই ছিল সেদিনের সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের করণীয় ব্যাপার। সাধারণ বাঙালীর ঘরে টেবিল - চেয়ার - এর আতিশয্য দেখা যেত না। ঘরে ওইসব আসবাব না থাকার জন্য কোন গৃহস্থ নিজেদের দরিদ্র ভাবতো না। অধিকাংশ সাধারণ মানুষের উদার মানসিকতা ছিল। অনেক নিঃস্ব গৃহস্থ দুপুরে প্রশস্তচিত্তে একজন অতিথিকে কিছু না খাইয়ে ছাড়তো না। এই ছিল সেই দিনের লোকধর্ম। এই ছিল সাধারণ বাঙালী গৃহস্থ বাড়ির করণীয় কর্তব্য। এই রকম অনেক কিছু আজ গেছে হারিয়ে।

অনেক সংকোচ দ্বিধা এবং কুণ্ঠার সঙ্গে আসনে খেতে বসেন। আসনে বসেও আবার বলেন, মাসিমা এইসব বাসন কিন্তু আমি মেজে দেব।

মা বলেন, কেন? এই মাসিমা থাকতে তুমি মাজবে কোন দুঃখে। আমার ছেলেদের খাওয়া বাসন আমি মেজে রাখি। তুমিও তো আমার ছেলে।

ওই সব দেখে এবং শুনে সেদিন আমি যে কেমন অভিভূত হয়েছিলাম। ছেলে বেলায় সেই মুহূর্তে ঠিক কি হয়েছিল, তা' ঠিক ভাবে আজ তুলে ধরার ক্ষমতা নেই। ভাষার দৈন্যদশার জন্য প্রকাশ করতে পারলাম না। কিন্তু বেশ মনে পড়ছে, মায়ের স্নেহে অদ্বৈত মল্লবর্মণের চোখে দেখা গিয়েছিল অশ্রুকণা। হয়তো, তাঁর নিজের মায়ের কথা মনে পড়েছিল ওই সময়। শুনেছিলাম তাঁর শৈশব কেটেছিল মা-বাবা হারানো এক অনাথ শিশুরূপে।

তারপর অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন। নিয়মিতভাবে 'নবশক্তি' পত্রিকাও আমাদের বাড়িতে পাঠাতেন। ওই সময় 'নবশক্তি'র অফিস ছিল লোয়ার রেঞ্জে, পার্কসার্কাস অঞ্চলে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ মাকে একটি বই দিয়েছিলেন। বইটি ছিল রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ গর্কির লেখা ঃ 'মা'। অনুবাদ করেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৫০ সালে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রায়ই সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' গ্রন্থাগারে আসতেন। কথা প্রসঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণ-এর পরিচয় কে যেন জিজ্ঞেস করেন। সেই সময় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, রুশ বিপ্লবের পরে রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন বার্তা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তখন আমাদের কাছে বেশি বই এবং সাময়িক পত্র বিদেশ থেকে আসতো না। এই সব পড়ার জন্য অদ্বৈত মল্লবর্মণকে ব্যাকুল হতে দেখা যেত।
গওসল খাঁ ছিলেন, 'পয়গাম' এবং 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সম্পাদক। দেশ ভাগ হবার পরে তিনি তালতলার গার্ডনাস্ লেন থেকে ওই দুটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তিনি ছিলেন, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-র নাতি। দৈনিক 'আজাদ' এবং 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সম্পাদক। আজাদ প্রকাশিত হতো 'ইন্টালি মার্কেটে'র পশ্চিম দিকের একটি বাড়ি থেকে। গওসল খাঁ জানিয়ে ছিলেন এক সময় অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'আজাদ' এবং 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন।
এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ছে, সেকালে দক্ষিণ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। নাম ঃ 'পতাকা'। অদ্বৈত মল্লবর্মণকে এই পত্রিকার সম্পাদনার কাজে আমন্ত্রণ জানানো হবে। ওই পত্রিকার কর্মকর্তারা বলতেন, বাংলার পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'পতাকা'। কিন্তু অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁদের রাজনীতি সমর্থন করতে পারেননি। তিনি বলেন, অনেক সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পড়ার সমস্যার সমাধান করতে হলে, সারা বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মিলিত আন্দোলনের প্রয়োজন। তার ফলে সমাধান হতে পারে। এই বলে তিনি 'পতাকা' অফিস ত্যাগ করেন। বহু বছর কেটে যাবার পরে অদ্বৈত মল্লবর্মণের অস্পষ্ট মুখ আজ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমরা অকালে হারিয়েছি একটি সময়কে। সেই সময়ের সঙ্গে আজকের কোন সাদৃশ্য নেই।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

নরেশচন্দ্র বর্মণ

অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্ম ১৯১৪ সালে। পরম পূজনীয় সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ আমার দাদু; মায়ের দূরসম্পর্কীয় খুল্লতাত। তাঁর জন্মস্থান ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় অবস্থিত (বর্তমানে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা) গোকর্ণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর থেকে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিম দিকে গোকর্ণঘাট, তিতাস নদীর উত্তর পাড়ে। তাঁদের বাড়ী একেবারে নদীর পাড়ের প্রথম বাড়ী। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন এবং পরে ত্রিপুরা জিলার সদর মহকুমা কুমিল্লা শহরে কলেজে অধ্যয়নকালীন তিনি কলিকাতায় চলে আসেন। এন্টালি মার্কেটের বিপরীত দিকে লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থিত দপ্তর থেকে প্রকাশিত 'আজাদ' পত্রিকায় তিনি রাত্রিতে কাজ করতেন। তাঁর বাসা ছিল নারিকেল ডাঙ্গার ষষ্ঠীতলা রোডে।

আমার জন্মস্থান বিদ্যাকূট গ্রামে, জন্ম ১৯১২ সালে। গোকর্ণঘাট থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৩ মাইল দূরে বিদ্যাকূট গ্রাম; আমাদের বিদ্যাকূট অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু গ্রাম ;গ্রামে তখনকার দিনে ৮টি বিদ্যালয় ছিল এর মধ্যে একটি হাইস্কুল, স্কুলটির নাম ছিল বিদ্যাকূট অমর হাইস্কুল। আমি ঐ স্কুলেরই ছাত্র ছিলাম। আমাদের বাড়ীতে বৎসরে প্রায় দু'একবার অদ্বৈত দাদু বেড়াতে আসতেন। তখন আমার বয়স ১৮/১৯ বৎসর; ৭ম বা ৮ম শ্রেণীতে পড়াশুনা করি। উনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। ১৯৪৬ সালে আমি কলকাতায় আসি। আসবার পরে আমি সর্বপ্রথম সন্ধ্যা:বেলায় 'আজাদ' পত্রিকা দপ্তরে দাদুর সঙ্গে দেখা করি। তারপর উনি আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে যান। সেইখানে বেশ কিছুদিন থাকার পর আমাদের স্বজাতির যে সমিতি ছিল তার সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বিশেষভাবে আমার সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন। দুঃখের বিষয় প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারীর নাম আমার মনে নেই। তবে সেক্রেটারী মহাশয় অত্যন্ত ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সমিতির একটি মিটিং হয় নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ারস্থিত অধ্যাপক সুরেন্দ্র দাস মহাশয়ের নিজ বাড়ীতে। সেই মিটিং-এ অদ্বৈত দাদু আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং আমার সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনান্তে স্থির করেন ছেলেটিকে কৃষ্ণনগরস্থিত ত্যাগচৈতন্য ব্রহ্মচারীর আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, সেখানে আশ্রমের প্রাইমারী স্কুলে সকালে মাষ্টারী করবে দু'ঘন্টা; সেই সঙ্গে কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে আই.এ. ক্লাসে পড়াশুনা করতে থাকুক। আমার ঠিক মনে আছে, সেক্রেটারী

মহাশয় নিজের পকেট থেকে পয়সা দিয়ে শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর রেলের টিকিট কেটে দেন। আমি কৃষ্ণনগরের ত্যাগচৈতন্য ব্রহ্মচারীর আশ্রমে প্রায় বৎসর দেড়েক থেকে কলকাতায় চলে আসি; নিজের খেয়াল খুশি মত। আমার বয়স তখন প্রায় ২১/২২ বৎসর। আশ্রম থেকে ঐভাবে নিজের ইচ্ছামত সেদিন কলকাতায় চলে আসা আমার নিতান্ত ভুল হয়েছিল বলে এখন বেশ বুঝতে পারছি। আশ্রম থেকে চলে আসার দরুণ সারা জীবনের সুখশান্তির সর্বনাশ করেছি, কারণ ত্যাগচৈতন্য ব্রহ্মচারী অত্যন্ত জনহিতব্রতী মানুষ ছিলেন। আমি যখন আশ্রমে ছিলাম, সেই সময় আমারই মত আর একজন ছাত্র ছিল; তাঁর নাম গৌর দাস, আমার চেয়ে ৪/৫ বৎসরের বড়; সেইজন্য আমি তাঁকে গৌরদা বলে ডাকতাম। গৌরদা আর আমি দু'জনে সকালে আশ্রমের স্কুলে ২ ঘন্টা করে পড়াতাম। গৌড়দা তখন কৃষ্ণনগর কলেজে আই.এ. পড়তেন। কয়েক মাসের মধ্যেই ব্রহ্মচারীজী কলকাতায় এলে গৌরদাকে জি.পি.ও-তে চাকরীর ব্যবস্থা করে দেন।

গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা

বেলারাণী পণ্ডিত

আজ আমার ৬০ বছর বয়স। প্রায় ৪০ কিংবা ৩৫ বছর আগের কথা বলতে চলেছি। আমার বাবা সে সময় খুব অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে দেখতে এসেছি। গঙ্গা-পদ্মা অববাহিকার দাগে জায়গা করে নেওয়া ভাগীরথীর তীরে শহর মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ থানার কাশীগঞ্জে বাবলাবনার লাগোয়া মালো পাড়ায় আমার বাবার বাড়ী। খুব ছোট বেলায় এই মালো পাড়ার ঘাটে দেখেছি, কেরী সাহেবের মুনসির স্যুটিং। আমাদের ঘাটের ঠিক ওপারে জলের ওপর নুয়ে পড়া একটি গাছে বসে তন্দ্রা বর্মণ গাইছে ভয় করি না ভরা গাঙ্গে, ভয় করি সই বানের জলে। আরো দেখছি লর্ড ক্লাইভের লীলাবতী জ্বলন্ত চিতা থেকে জলে ঝাঁপ দিলেন এই ঘাটেই। পরবর্তীকালে সময় মত বাপের বাড়ী এলে জঙ্গীপুর থেকে কলকাতা সাঁতার উৎসব এই ঘাট থেকেই দেখতাম। ঘাটের ধারে বাস করে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মালোরা। আমরা মালোরা গঙ্গা-পদ্মা ভাগীরথীর খোঁজ রাখতাম না। শুধু জানতাম এটি আমাদের গঙ্গা। এরই জলে আমাদের জন্ম হতে মৃত্যু সব কাজই হতো এমনকি তখন পানীয় জল বলতেও এই গঙ্গার জল। কলসী করে জল এনে সামান্য ফিটকিরি দিয়ে জলটা থিতিয়ে গেলে, সেই জল আমরা খেতাম। এই গৌরচন্দ্রিকা ধান ভানতে শিবের গীত মনে হতে পারে; কিন্তু সেই সময় থেকে অদ্যাবধি জেলে জাতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে তো মনে হয় না। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমরা যা দেখছি, সে কথা বলার লোক অনেক। আমি বলবো জেলে জাতির সাধারণ কথা। যাই হোক বাবা আধশোয়া হয়ে বসে আছেন, আমি পায়ের কাছে বসে আছি, বাবা বললেন, জানিস 'রানু' একখানা আশ্চর্য পুস্তক পাঠ করলাম। যতবার পড়ছি, আমার অসুস্থতা বাড়ছে, বুকের ভেতর একটা জান্তব ক্রোধ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি ক্রমশ শয্যাগত হয়ে পড়ছি, ভাবছি অদ্বৈত নিজেই কি অনন্ত? না হলে এমন অনুভূতি পেল কি করে। আমার তো মনে হচ্ছে এই পুস্তকখানি একখানি মহাকাব্য। সব মহাকাব্যের কোন না কোন চরিত্রে মানুষ তার নিজের ও মনের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। তাই সেগুলি মহাকাব্য হয়। মা বুঝি কাজের মাঝেও আমাদের কথার দিকেও কান রেখেছিলেন। রাগ প্রকাশ করলেন। এমন বই পড়ার কি দরকার? বাবা যেন রাগে ফেটে পড়লেন, কি বলছো দরকার নেই। রেগে ক্লান্ত শীর্ণ মুখখানা অপার্থিব হাসিতে ভরিয়ে বললেন দেখ আমার ক্ষমতা থাকলে এই বইটি ছেপে প্রতিটি জেলে তথা মালো পরিবারে

একখানি করে বিলি করতাম। ডেকে ডেকে বলতাম পড় তোমরা পড়। মালোজাতির মানুষ মহাকাব্য লিখেছেন তোমরা পড়ো আর ভাবো। হ্যাঁগো তুমি ভাবো তো তোমার পাড়ার লোকগুলো লেখাপড়ার ধার ধারে না। শেষ রাতে জাল বাইতে যায়। শীতকালে প্রচন্ড শীতে মানুষ যখন কাঁথার নীচে ওম খোঁজে, জেলে তখন সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে একলা ঘরে রেখে হাঁটু জল কিংবা বুক জলে মাছ ধরে বেড়ায়। এক সময় সেই মাছ বাজারে আসে। বাজারের সেই মাছ তথাকথিত ভদ্রজনের পাতে পড়ে, তখন একমাত্র তারই সুগৃহিনীর হাতে পড়ে মাছটি কতখানি স্বাদিষ্ট হয়েছে তারই আলোচনা। কেউ কি জানে এর জন্য জেলেকে কতখানি সংগ্রাম করতে হয়েছে কেউকি ভুলেও ভাবতে চেয়েছে এই মাছ কিভাবে আমার পাতে এল, এর পেছনে কি রহস্য আছে! তোমরাও পড় কারণ বাসন্তী তোমাদের মতই মেয়ে। ভাবছিলাম মা আবার হুংকার ছাড়বেন। ওমা দেখি তিনি আঁচলে চোখ মুছছেন; মাকে একটু রাগাবার চেষ্টা করলাম, কিগো মা তোমার বাবার কথা মনে পড়লো নাকি? মা উত্তর দিলেন তাতো পড়লোই, তোর কাকারা শেষ রাতে দুই কাকীকে তুলে তোর ঠাকুমার কাছে রেখে যেতো। আর সকালে তোর বাবা তর্জন গর্জন করতো, ভাইগুলো লেখাপড়া শিখলো না, তবেই বোঝ বাবা আবার কথার খেই ধরে ফেললেন। গোঁসাই বাবাজী যখন অনন্তকে কালো আখর শেখালেন পড়ে দেখো অনন্তর শিক্ষার শুবুটা কিভাবে হয়েছিল, শোনো আমি পড়ছি। "গোঁসাই বাবাজী যখন তাকে কালা আখর শেখালেন, সেদিন তার আনন্দ উপচাইয়া উঠিল। একটি নতুন জগত তাকে দুয়ার খুলিয়া ডাকিয়া নিয়া গেল তারপর দুই আখরে তিন আখরে মিলিয়া এক একটা কথা হইলো। এসকল কথা যেমন বলা যায় তেমনি লিখিয়াও প্রকাশ করা যায়। দেখিয়া তার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, আর তারপর অনন্ত উচ্চশিক্ষার জন্য পড়তে গেল সেও এক মহিলারই অনুপ্রেরণায়। আর দেখো আমি যখন ওদের পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলাম দেশে থাকতে কি দুর্গতি আমার হয়েছিলো। এখানে একটু শিবের গীত গেয়ে নিই। বিদগ্ধ পাঠক পাঠিকাগণ আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার বাবা তৎকালে তথাকথিত শিক্ষিত লোক ছিলেন। আজ এই বয়সে যখন চারিদিক সাক্ষরতার তোড় জোড় দেখি আর ভাবি তখনকার সেই মানুষগুলো যদি থাকতেন! আজ দেখতে পেতেন তাদের স্বপ্ন কতখানি সফল হয়েছে। তৎকালে ধুতির কোঁচা ঝুলিয়ে পরার রেওয়াজ ছিলো। আমার বাবারও কেঁচো ঝুলিয়ে পরতেন, আড়ালে সবাই বাবাকে বলতো কেঁচো-ঝোলানো অমুকবাবু। বাবা আবার শুবু করলেন, তুমি বলো লোকে আমাকে বলতো কেঁচো - ঝোলানো বাবু, লেখাপড়া শিখেছি, মাছ ধরতে যাই না একটা ছাপাখানা চালাই। তবে কি জানিস মা বাবা আমাকে বলতে লাগলে এদের দুঃখ যাবার নয় জন্ম হতেই এরা জলের জন্য বলি প্রদত্ত। দেশে থাকতে একবার ওদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টায় কয়েকদিন আগে থেকে প্রচার করে এক সন্ধ্যায় সবাইকে আমার বাড়ী আসতে বলি। শ্লেট পেনসিল, হারিকেন কিনি। নির্দিষ্ট দিনে উঠানে চটের ওপর সাদা চাদর বিছিয়ে সকলের বসার ব্যবস্থা করলাম; সন্ধ্যা হতে ২/১ জন আসছে, কিন্তু কেউ বসছে

না। ফিস ফিস করে কি যেন বলাবলি করছে বেশ কয়েকজন একত্র হতেই একটা হুংকার ভেসে এলো। এইডা কি ব্যাপার? কি অধিকার আছে তোমার, আমাগো অপমান করনের। আমি অবাক! অপমানের কথা আসছে কেন? আবার হুংকার। আমরা কি বাবু যে আমাগো লাগি সাদা কাপড় পাতিছ। বসতি যদি কও চট দাও। এতক্ষণে রহস্য পরিষ্কার হোলো। চট পেতে বসাই এদের অভ্যাস। বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঃ বন থেকে বাঘ তুলে আনা যায়, বাঘের মন থেকে বন তুলে ফেলা যায় না। প্রায় ৪০ বছর পরে এই কথা আজ লিখতে বসে মনে পড়লো কয়েকদিন আগে কোন একটা পূজা সংখ্যার কথা; কিছু শবর মানুষকে কলকাতা আনা হয়েছে একটা পূজা অনুষ্ঠানে, তো এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন আপনাদের কেমন লাগছে, লোকটি তো নীরব। হঠাৎ ভদ্রলোকের কি যেন মনে পড়লো। সরাসরি বললেন, তা তোদের কেমন লাগছে বল এবার, একগাল হেসে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলো লোকটি। আমার মনে হয় এই-ই আমাদের দেশ তথা ভারত। বাবা বলেই চলেছিলেন শেষ মেশ ওরা ঐ চটেই বসেছিলো। সে সব কথা তোদের মনে থাকার কথা নয়, তোর মা তো সব জানে। পাড়ার হরেনের ৯ বৎসরের মেয়ের ৪৯ বছরের লোকের সংগে বিয়ে হল, এসবতো আমরা মেনে নিচ্ছি। কলকাতার লোক এসব ভাবতেও পারবেনা, কারণ তার মূলে আছে শিক্ষা। বাবা আরো বলেছিলেন জানিস মা ওঁর লেখা কয়েক কিস্তি বেরোবার পর নাকি রাস্তায় হারিয়ে যায় পাণ্ডুলিপিটি। আমি বললাম সে কি বাবা? হ্যাঁরে, মা প্রায় ফিস ফিস স্বরে বলেছিলেন রহস্যময় হাসি হেসে, আসলে অন্য একজন লেখককে পড়তে দিয়েছিলেন। বক ধার্মিক লেখক আর ফেরৎ দেননি লেখাটা। লেখাটা হারিয়ে যেতে শোকে দুঃখে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলেন তা সত্ত্বেও প্রতিবাদী কলম আবার গর্জে উঠলো গলায় গর্জন এলো আমি জাউলার পোলা, বাবা চোখ বুজলেন চোখের কোনা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। কারণ বহুকাল আগে শোনা একটি গল্পকথার অনুভব কবে যে অনুরাগে পরিণত হয়েছে নিজেও বুঝতে পারিনি। ভাগীরথীর তীরের আমার দেখা ৪০ বৎসরের আগের মালোপোড়া আজো সেই মালোপাড়া আছে। তবে জানেন তো খই ভাজতে বসলে ২/১ টি খই ছিটকে খোলার বাইরে চলে যায়। তেমনিই ২/১টি উচ্চশিক্ষিত ছেলে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। পেছন ফিরে মালোপাড়ার দিকে তাকাবার তাদের অবকাশ কোথায়? আজ বহু বছর পরে লিখতে বসে ভাবছি জেলে জাত আঁধার রাত এ প্রবচনের শেষ কবে হবে। আজও আমাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার খুবই হতাশা ব্যঞ্জক। এই লেখাটা যাঁরা পড়বেন, তাদের কাছে আমার একটি ভিক্ষা প্রতি ঘরে যেন একটি করে তিতাস একটি নদীর নাম শোভা পায়। শুধু শোভা নয় পড়ুন প্রত্যেকে পড়ুন, প্রত্যেককে পড়ান। তিতাস একটি নদীর নাম প্রত্যেক অনুষ্ঠানে উপহার দিন। দেশের প্রতিটি লাইব্রেরীতে যাতে বইখানি থাকে তার ব্যবস্থা করুন। আমি মেদিনীপুরের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ খানি বই ক্রয় করিয়েছি। তিতাস একটি নদীর নাম আমি পড়েছি একবার নয়, বার বার। আজ মনে পড়ছে বাবা সেদিন অনেক কথা বলেছিলেন। তাঁর

অসুস্থতা বাবাকে কত ব্যথিত করেছিলো। যদি সেই ব্যথার লেশ মাত্র থাকতো তবে আমাদের কথা অন্য কাউকে লিখতে হতো না, আমরাই লিখতাম। আমাদের বক্তব্য হোক অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্য উপযুক্ত সম্মান চাই। চাই স্বীকৃতি, চাই প্রচার। মাত্র কয়েকজন মানুষের মুখে রক্ততোলা পরিশ্রম সার্থক হবে সেইদিন, যেদিন সমগ্র মালো জাতি এগিয়ে আসবে এই কাজে। ভাবতে হবে কিসের ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, শুধু এই কথা ভাবনার জন্য বার বার তিতাস একটি নদীর নাম পড়তে হবে। হয়তো তখন আমাদের জীবনের মেঘ সরে গিয়ে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত সামনে ভেসে উঠবে পথরেখা।

চিঠিপত্র
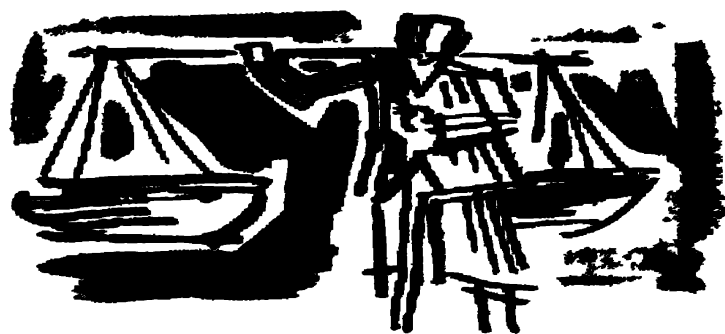
ছাত্র বয়সে লেখা চিঠি

From Adwaita Malla Barman
Gokanghat, Tipprah
23 6 34

প্রিয় ভ্রাত[১]

আপনার কাব্যখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। এ সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তা আমি এই পত্রে আপনার নিকট বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। আশা করি, আপনি আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন না। কাব্য খানার যেখানে যেখানে কোন দোষ, বৈসাদৃশ্য, ছন্দ ত্রুটি প্রভৃতি আছে, সেইখানে আমি চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি, সংশোধনের ভার আপনার স্কন্ধেই চাপাইলাম।

কাব্যছাপানো সম্বন্ধে এটুকু বলিতে পারি ... কাব্য মন্দ হয় নাই, নূতন লেখকের পক্ষে আশাতীতই হইয়াছে, তবু সর্বতোভাবে প্রকাশের উপযুক্ত হয় নাই। এইজন্য বলি, আপনি ইহা ছাপাইবার চেষ্টা করিবেন না। নিরাশ হইবেন না, অনবরত লিখিতে থাকুন, আপনি অল্প সময়েই বেশ নাম করিতে পারিবেন, এ বিশ্বাস এবং ভরসা আমার আছে।

এখানে কবিতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা আশাকরি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কাব্যকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া ফেলুন:

১। গীতিকাব্য (Lyrical Poems) ২। খন্ডকাব্য (Narrative Poems) ৩। মহাকাব্য (Epic)

আপনাকে প্রথমতঃ গীতিকবিতায় হাত পরিষ্কার করিতে হইবে। Picture-ই গীতি কবিতার প্রাণ। কাজেই আপনি Picture ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। তারপর খন্ডকাব্যে হাত দিবেন। অতীত বা বর্তমান ঘটনাবলী লইয়া আপনি খন্ডকাব্য লিখিতে পারেন, তবে অতীতকে নিয়া লেখাই প্রথমতঃ আপনার সুবিধাজনক হইবে। কারণ অতীতের উপর লেখকের কল্পনাকে উদ্দাম গতিতে চালানো যায়। বর্তমান সম্বন্ধে অনেক বিপদের আশঙ্কা, ইহা আপনি ক্রমে ক্রমে বুঝিবেন। কিন্তু সাবধান, এখন আপনি epic এ হাত দিবেন না। উহা ভয়ানক কঠিন কাজ। বিশেষ সিদ্ধহস্ত হইলে পর আপনি epic লিখিতে পারেন। হিন্দুশাস্ত্রে epic সম্বন্ধে বলে যে, উহাতে atleast নয়টি সর্গ থাকিবে। অতীত হইতে material সংগ্রহ করিতে হইবে। Style খুব grand হওয়া চাই। একাধিক ছন্দ ব্যবহার করা যায় না ইত্যাদি। Narrative বা epic এর materials আপনি হিন্দু বা মুসলিম mythology কিংবা history হইতে গ্রহণ করিতে পারেন। কাব্যের পূর্বাপর যাহাতে একটা বিশেষ সামঞ্জস্য থাকে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা চাই। ভাষা বা expression এর উপর যথেষ্ট দখল থাকা

চাই। আপনার তাহা আছে এবং আপনি অবশ্যই কৃতকার্য হইবেন। প্রকৃতিকে লইয়াই কবির কারবার, আর "nature is itself a grand picture" এই জন্যেই বলিতেছিলাম, আপনি picture ফুটাইতে বিশেষ যত্ন করিবেন। আর এক কথা — lyrics গুলি সামান্য বিষয়ের উপরই লিখিবেন। বড় বড় জিনিসের উপর রস ফুটাইয়া তোলাই কবির কৃতিত্ব। এ সম্বন্ধে আপনি যতই culture করিবেন ততই আনন্দে আত্মহারা হইবেন।

কাহাকেও follow করিবেন না [২]সর্বদা সর্বত্র[২] আপন [৩]ব্যক্তিত্ব[৩], বৈশিষ্ট্য এবং [৪]স্বাতন্ত্র্য[৪] বজায় রাখিয়া চলিবেন। অনুসরণ এবং অনুকরণ এর প্রভেদটুকু আপনি অবশ্যই জানেন। আপনি মধুসূদনের Blank verse এর অনুকরণ করিতে পারেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়তা বা মরমীবাদ বা mysticism এর অনুকরণ করিলে ইহা দোষের কারণ হইবে।

আর [৫]একটি[৫] মাত্র কথা বলিয়াই চিঠি শেষ করিব। সাধনা না করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে নাই। আর সাধনা যাহা করিবেন নীরবে নীরবেই করিবেন। আগুন কখনো ছাই ঢাকা থাকে না। আপনার প্রতিভাও একদিন নিশ্চিত সুধীজন সমাজে আদৃত হইবে। ইহা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি। আমার প্রতি যদি আপনার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ও ভালবাসা থাকে তবে আমার কথায় বিশ্বাস করুন, অনবরত লিখিতে থাকুন।

As a true friend আমি আপনাকে আমার সব বক্তব্য বিষয়গুলি খোলাখুলিভাবে লিখিলাম, ইহাতে যদি আপনার মনে বিরক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ইতি

আপনার

শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ

টীকা

১ পত্রটির প্রাপক কবি মতিউল ইসলাম (৫ নভেম্বর ১৯১৪- ২৯ অক্টোবর ১৯৮৪) ব্রাহ্মণবাড়িয়া -তে মল্লবর্মণের বন্ধু ছিলেন। চিঠি লেখার সময় অদ্বৈত উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর আর মতিউল ইসলাম দশম শ্রেণীর ছাত্র।

২ 'সর্ব্বদা সর্ব্বত্র' - বানান ছিল।

৩ 'ব্যক্তিত্ত' - বানান ছিল

৪ 'স্বাতন্ত্র' - বানান ছিল।

৫ 'একটী' লিখেছিলেন।

কাব্যটির নাম জানা যায় নি। পত্রটি প্রথম লোক চক্ষুতে আনেন অদ্বৈতের জীবনীকার শান্তনু কায়সার।

বেণু দত্তরায়-কে লেখা অদ্বৈত মল্লবর্মণের চিঠি

দেশ কার্যালয়
১ বর্মন স্ট্রীট
কলিকাতা
৭. ৬. ৪৮

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত কবিতাটি রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী সংখ্যা 'দেশে' প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রিকার এক কপি আপনাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আশাকরি উহা যথাকালে আপনার হস্তগত হইবে।

আপনার কুশল কামনা করি।

ইতি
অদ্বৈত মল্লবর্মণ
(দেশ অফিস)

যক্ষ্মা হাসপাতাল থেকে লেখা চিঠি

ওঁ

কাচড়াপাড়া টি বি হাসপাতাল

ওয়ার্ড নং বি-৩

২৮শে বৈশাখ, ১৩৫৭

কল্যাণবরেষু

বাবা চন্দ্রকিশোর,

কয়েকদিন আগে তোমার একখানা পত্র পাইয়া সকল বিষয় অবগত হইলাম। ইহার পূর্বে যেসব চিঠি লিখিয়াছ তাহা আমি পাই নাই। আমি এখনও হাসপাতালেই আছি। আরও কতদিন থাকিতে হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যতদূর মনে হয় আমি আরও এক বৎসর এই হাসপাতালেই থাকিতে পারিব। তারপর কোথায় যাইব ভগবান জানে। নবদ্বীপের সকলেই ভাল আছে। গঙ্গায় রোজি রোজগার নাই বলিয়া শুনিয়াছি। আমার শরীর আগের মতই আছে। তবে একটু ভালর দিকে বলিয়া মনে হয়। যাহোক আমার জন্য তোমরা কোন চিন্তা করিও না। আমার যতদিন ভোগ কপালে লেখা আছে ততদিন অবশ্যই ভুগিতে হইবে। (সব সময়) পত্র লিখিয়া তোমাদের কুশল সংবাদ অবগত করাইবা।

ইতি

আশীর্বাদক

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

অদ্বৈত মল্লবর্মণের রচনাপঞ্জী

।।১।। অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রবন্ধ-নিবন্ধ

১. "অপ্রকাশিত পল্লীগীতি" ঃ মোহম্মদী', মাঘ, ১৯৪৪

২."অপ্রকাশিত পুতুল বিয়ের ছড়া" ঃ 'নবশক্তি', ২২ অক্টোবর, ১৯৩৮

৩. "অপ্রকাশিত বাউল সঙ্গীত"ঃ'নবশক্তি', ২২ অক্টোবর, ১৯৩৮

৪."আম্রতত্ত্ব" ঃ 'নবশক্তি', ১২ মার্চ, ১৯৩৭

৫."এদেশের ভিখারী সম্প্রদায়"ঃ 'নবশক্তি ৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৬

৬. "উপাখ্যান মূলক সঙ্গীত"ঃ 'নবশক্তি'৯ ডিসেম্বর,১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৮

৭."ছায়াছবির ছবি আঁকা" ঃ 'দেশ'-শারদীয়, ১৯৪৬

৮."ছোটদের ছবি ও কাহিনী"ঃ 'দেশ

৯. "জল সওয়া গীত"ঃ'নবশক্তি',১এপ্রিল, ১৯৩৮

১০. "টি এস এলিয়ট"ঃ'দেশ', ১৩ নভেম্বর,১৯৪৮

১১."দুইটি বারমাসি গান"ঃ 'নবশক্তি', জানুয়ারী,১৯৩৬

১২."ত্রিপুরার একটি বারমাসি গান"ঃ'নবশক্তি', ৩জানুয়ারি,১৯৩৬

১৩."নাইওরের গান"ঃ 'নবশক্তি', ৪নভেম্বর,১৯৩৮

১৪."পল্লী সঙ্গীতে পালা গান",ঃনবশক্তি', ৪নভেম্বর, ১৯৩৬

১৫."পরিহাস সঙ্গীত" ঃ নবশক্তি',১৮ নভেম্বর,১৯৩৮

১৬."পাখীর গান" ঃ 'নবশক্তি',২৫ নভেম্বর,১৯৩৮

১৭."প্রাচীন চীনা চিত্রকলার রূপ ও রীতি"ঃ 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯ মে, ১৯৪৯

১৮."বর্ষার বাক্য" ঃ 'নবশক্তি', ৩০ জুন, ১৯৩৯

১৯. "ভাই ফোঁটার গান"ঃ 'নবশক্তি', অক্টোবর, ১৯৩৮

২০."মাঘমন্ডল"ঃ 'নবশক্তি',১৪ জানুয়ারি,১৯৩৮

*২১. "বরজের গান"ঃ 'নবশক্তি', ডিসেম্বর, ১৯৩৮

২২."রোকেয়া জীবনী" ঃ 'নবশক্তি',২১ জানুয়ারি,১৯৩৮

*২৩. "শেওলার পালা" ঃ 'নবশক্তি'

২৪. "সাগরতীর্থে"ঃ 'দেশ', ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬

।।২।। গল্প-কাহিনী-উপন্যাস

১. "তিতাস একটি নদীর নাম", পুথিঘর, ১৯৫৬। উপন্যাস

২. "জীবন তৃষা", অনুবাদ উপন্যাস ঃ আরভিং স্টোন-এর লেখা—Lust for Life এর অনুবাদ। 'দেশ' ১৯.৩.১৯৪৯ থেকে ২০.৫.১৯৫০

৩. ভারতের চিঠি—পার্লবাককে।

৪. "দল বেঁধে" ঃ গল্প গ্রন্থ

৫. "নাটকীয় কাহিনী", 'দেশ', ৬.১২.১৯৪৭- ১৩.১২.১৯৪৭ রম্যরচনা, বিদেশীকাহিনী অনুসরণে লেখা।

৬. "রাঙামাটি", উপন্যাস,'চতুষ্কোণ', প্রকাশিত।

৭. "শাদাহাওয়া", উপন্যাস,'সোনার তরী' শারদীয়া ১৩৫৫।

৮. "সন্তানিকা", গল্প। 'ভারতবর্ষ' ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

৯."স্পর্শ দোষ", গল্প।'চতুর্থ দুনিয়া', অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৯৪

১০. কান্না

১১. বন্দী বিহঙ্গা।।

২।। ক অনূদিত উপন্যাস।।

১. "A River called of Titash" : কল্পনা বর্ধন কর্তৃক অনুবাদিত ও সম্পাদিত। Penguin Books India (p) Ltd.1992.

৩।। অদ্বৈত-সাহিত্যের মূল্যায়ন আছে এমন গ্রন্থ

১. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ "কালের প্রতিমা" ঃ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৪

২. (ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট) ঃ "ঋত্বিক কুমার ঘটকের তিতাস একটি নদীর নাম", প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ কর্তৃক মুদ্রিত। পুস্তিকা। প্রকাশনস্থান ও কাল অজ্ঞাত।

৩. দেবী প্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত ঃ "বারমাসী গান ও অন্যান্য/ অদ্বৈত মল্লবর্মণ', প্রণীতা প্রকাশনী, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

৪. শান্তনু কায়সার ঃ "অদ্বৈত মল্লবর্মণ" বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাস ধারা", মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৪

৬. শাহীদা আখতার ঃ "পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার উপন্যাস (১৯৪৭-১৯৭১)" ঃ বাংলা একাডেমি, ঢাকা,জুন ১৯৯২

৭. সরোজ বন্দোপাধ্যায় ঃ "বাংলা উপন্যাসের কালান্তর" দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮০

৪।। অদ্বৈত সাহিত্যের মূল্যায়ন ঃ প্রবন্ধ বা অন্যরকম রচনা

১. অচিন্ত্য বিশ্বাসঃ " অদ্বৈত মল্লবর্মণঃ একটি সাহিত্যিক প্রতিস্রোত", 'চতুর্থ দুনিয়া'ঃ অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪

২. অজয় বসুঃ "তিতাস ও ঋত্বিক", 'চিত্রপট' ১০ সংখ্যা।

৩. আনন্দ বাগচী ঃ"অদ্বৈত মল্লবর্মণ"ঃ 'দেশ' ৩১ আশ্বিন ১৩৮৮

৪. আনন্দবাজার পত্রিকাঃ "অদ্বৈত মল্লবর্মণ", ১৮ এপ্রিল ১৯৫১

৫.গৌতম ভদ্র ঃ "তিতাস একটি নদীর নামঃ 'মালোর চোখে/তিতাস একটি নদীর নাম ঃমধ্যবিত্তের চোখে"ঃ 'চিত্রকল্প', ১৫ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৭৬

৬. চলচ্চিন্তাঃ "তিতাস একটি নদীর নাম", মে ১৯৭৬

৭. চিত্রকল্প ঃ "তিতাস ঋত্বিক ঘটকের সোয়ান সং", ১৫সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৭৬।

৮. জ্যোতিষ দাশগুপ্ত ঃ"সারা শরীরে অপুষ্টির ছাপ ছিল", সাক্ষাৎকার, 'চতুর্থ দুনিয়া'ঃ অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৮

৯. দেশ ঃ "অদ্বৈত মল্লবর্মণ" ১৮ এপ্রিল, ১৯৫২

১০. নীলোৎপল বসুঃ 'বাংলা দেশের হৃদয় হতে তিতাস একটি নদীর নাম প্রসঙ্গে", 'কথা গল্প ছবি', সেপ্টেম্বর,১৯৭৬

১১. বরুণ বক্সী ঃ "তিতাস একটি নদীর নাম", 'কৃত্তিবাস', অক্টোবর, ১৯৭৪।

১২. বিপ্লব চক্রবর্তী 'চিংড়ি, গঙ্গা' ও 'তিতাস একটি নদীর নাম' সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট", 'চতুর্থ দুনিয়া'ঃ অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর,১৯৯৪

১৩. প্রতিপক্ষঃ "তিতাস একটি নদীর নাম ভারতীয় চলচ্চিত্রের স্বরুপ সন্ধানে", জুন ১৯৯১

১৪. মনোহর বিশ্বাস ঃ "অদ্বৈত মল্লবর্মণ ঃ অতীতের পত্র পত্রিকার পৃষ্ঠা খুঁজে", 'চতুর্থ দুনিয়া' ঃ অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪

১৫. শান্তনু কায়সার ঃ "নদী ও মানুষের যুগলবন্দী", 'চতুর্থ দুনিয়া' ঃ অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪

১৬. সাগরময় ঘোষ ঃ "ভেবেছিলাম একটি মৌলিক উপন্যাস লেখাব–হলনা", সাক্ষাৎকার, 'চতুর্থ দুনিয়া' ঃ অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা,ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

১৭. সুমিতা চক্রবর্তী ঃ "ছোট গল্পের অদ্বৈত মল্লবর্মণ", 'চতুর্থ দুনিয়া' ঃ অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪

১৮. সুস্নাত জানা ঃ "তিতাস ঃ জেলে জীবনের মহাকাব্য" ঃ অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৪

অভিযাত্রী আরিন্দা

অদ্বৈত মল্লবর্মণের সংগৃহীত পুস্তকের নির্বাচিত তালিকা

বাঙলা

১. একদা	:	গোপাল হালদার
২. ১৩৫০	:	গোপাল হালদার
৩. বিপ্লবী যুগের কথা	:	প্রভাত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৪. ভারবর্ষের জাতীয় সংগীত	:	প্রবোধ চন্দ্র সেন
৫. চীনে ইতিহাসের ধারা	:	অমর সান্যাল
৬. পঞ্চাশের পর	:	গোপাল হালদার
৭. সোভিয়েত ইউনিয়ান	:	রেবতী বর্মণ
৮. এযুগের যুদ্ধ	:	গোপাল হালদার
৯. ছাড়পত্র	:	সুকান্ত ভট্টাচার্য
১০. গ্রীসের ইতিহাস	:	অশোক কুমার সরকার
১১. জৈন দর্শনের রূপরেখা	:	পুরণ চাঁদ শ্যামশুকা
১২. বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য	:	প্রবোধ চন্দ্র বাগচী
১৩. কলকাতার কালচার	:	কালপেঁচা
১৪. চীন দেখে এলাম	:	মনোজ বসু
১৫. আলো আর আগুন	:	প্রবোধ সান্যাল
১৬. আগামীকাল	:	প্রেমেন্দ্র মিত্র
১৭. চীনের ড্রাগণ	:	দীনেন্দ্র কুমার রায়
১৮. পঞ্চভূত	:	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯. বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ	:	রাহুল সাংকৃত্যায়ন
২০. আমার জীবন	:	চেখভ
২১. মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র	:	কস্তুর চাঁদ লালু আনি
২২. সন্ধিক্ষণ	:	অরুণ সরকার
২৩. প্রণয় তৃষ্ণা	:	এমিল জোলা
২৪. গান্ধী দর্শন	:	কংগ্রেস সাহিত্য সংগ্রহ
২৫. গান্ধী ও স্টালিন	:	লুই ফিশার

ইংরাজি

1. The penguin Political Dictionary: Compiled dy Walter Theimer
2. The political Dictionary,New Writing 29.: Ed-john Lahmann
3. The Spectation-Vol 3.: Addision,Steele and others
4. The Farm: Lowis Boomfield
5. Coming Age in Samoa: Margaret mead
6. India From Primitive Communism to slavery: S.A. Dange
7. Men of Science in America: Bernard Jaffe
8. Familiar Studies of Men and Books: R.L. Stevenson
9. The City of Dreadful night: James Thomson
10. Pleasent Valley: Louice Boomfield
11. The Loom of Language:Frederick Bodmer
12. The years: Verginia Woolf
13. Marxism and National Question: J. Stanin
14. Selected Works of Lenin Vol ll : V.I.L Lennin
15. Hungry Hill: Daphne du Maurier
16. i) Rights of Women: Mary-woll ston craft 10851
    ii) Subjugation of Women:John stuart mill
17. Romance of Bee keeping : kshitish CH. Dasgupata
18. World of Nsture: H.C. Knapp Fisher
19. Introduction to Modern Architecture: J.A. Richards
20. An Anthology of World poetry : Ed.MarkVan Doreu
21. Latar Modern poetry: Ed.G.N. Pocock
22. Lust for Life; Vincent Van Gogh: lrving Stone
23. Gioconda Smile and Other Stories: Albus Huxley
24. Groeing of New Guinea: Margaret Mead
25. Decameron Book lll & ll : Boccacio
26. Decameron Book lll & IV: Do
27. Full Score: D.H. Lowrence
28. Droll Stories : Balzac

সৌজন্য : চতুর্থ দুনিয়া।

জীবনপঞ্জী

১৯১৪ : বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের সন্নিকটে তিতাস নদী তীরবর্তী গোকর্ণঘাট নামক গ্রামে ১লা জানুয়ারি জন্ম

১৯২৭ : অন্নদা হাইস্কুলে ভর্তি

১৯৩৩ : ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

১৯৩৪ : কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি এবং অর্থাভাবে পাঠ অসমাপ্ত রেখে জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আগমন

১৯৩৪ : ত্রিপুরা হিতসাধনী সভার মুখপত্র 'ত্রিপুরা'য় যোগদান

১৯৩৬ : 'নবশক্তি' পত্রিকার সহ-সম্পাদক পদে যোগদান। সম্পাদক - প্রেমেন্দ্র মিত্র

১৯৩৮ : 'নবশক্তি'র সম্পাদক পদে উন্নীত

১৯৪১ : 'দল বেঁধে' গল্পসংকলনের সম্পাদনা। এই সংকলনে তাঁর একটি মাত্র গল্প 'স্পর্শ দোষ' স্থান পেয়েছে

মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় যোগদান। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি এই পত্রিকাতেই ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। কার্যত তিনিই এই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সেই সঙ্গে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায়ও কাজ করতেন

১৯৪৫ : সহ-সম্পাদক সাগরময় ঘোষ এর সহযোগী হিসেবে 'দেশ' পত্রিকায় যোগদান

১৯৪৮ : যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার জন্য কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি

১৯৫১, ১৬ এপ্রিল : নারকেল ডাঙার ষষ্ঠীতলা লেনের চার তলার এক চিলেকোঠায় নিতান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুবরণ

১৯৫২, ২৬ এপ্রিল : এক স্মরণসভার আয়োজন করে সাগরময় ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখদের সহযোগিতায় তাঁর সংগৃহীত বই রামমোহন লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষকে আনুষ্ঠানিক ভাবে দান

১৯৫৬ : মৃত্যুর পাঁচ বছর পর 'তিতাস একটি নদীর নাম' এই অমর উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়

১৯৬৩ . বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্তের পরিচালনায় মিনার্ভা মঞ্চে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি নাট্যরূপে অভিনীত হয়

১৯৭৩ : ঋত্বিক ঘটক কর্তৃক চলচ্চিত্রায়ণ

১৯৮২ : যাত্রাভিনয় 'তিতাস একটি নদীর নাম' সুশীল নাট্য কোম্পানি কর্তৃক

সূত্র : অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মারকগ্রন্থ-২০০৭, ত্রিপুরা সরকার

তিতাস একটি নদীর নাম

মূল কাহিনি : অদ্বৈত মল্লবর্মণ

পালা-রচনা ও নির্দেশনা

শ্যামল ঘোষ

প্রথম অভিনয় + ১৯৮২

প্রযোজক : সুশীল নাট্য কোম্পানি

চ রি ত্র

পুরুষ

রামকেশব
দয়ালচাঁদ
রামনাথ
তিলকচাঁদ
গৌরাঙ্গ
কাদির
সুবল
কিশোর
মদন
সোনাউল্লা
বনমালী
ছাদির
হারান
গরিবুল্লা
বাঁশিরাম

স্ত্রী

কিশোরের মা
রামনাথের মা
তিতাস
বাসন্তী
উদয়তারা
গিন্নি

প্রস্তাবনা দৃশ্য ও গীত

তিতাস নদীর পাড়। গোকন ঘাটের মালোর দল এবং গাঁয়ের আরো কত মালো নরনারী বরণডালার প্রদীপ জ্বালিয়ে গঙ্গাপূজার জন্যে জড় হয়েছে। তাঁদের গানে-জয়ধ্বনিতে তখন আকাশ বাতাস মুখরিত।

পদ্মা-ধলেশ্বরী-মেঘনা নদী
বহে নিরবধি
উচ্ছ্বাসে কল্লোলে দু-কূল প্লাবী
পূর্ববাংলার প্রাণপ্রবাহিণী
শোন সে কাহিনি।

শিবের আইজ বড়ো রঙ্গ
পিঙ্গাল জটার মাঝে
গঙ্গার তরঙ্গ।
গঙ্গায় চলো দেখি গিয়া গো
আনন্দ হইল মন,
গঙ্গারে পূজিতে আইল
যত নারীগণ।
ধান্য ও দূর্বা দিলা
দিলা পুষ্প-চন্দন,
গঙ্গায় চলো দেখি গিয়া গো
আনন্দ হইল মন।

মেঘনার কন্যা রূপবতী
শীর্ণদেহা মায়াবতী
তারই মায়ায় জেলেদের বসতি,
তাদের সারিগানের তালে তালে
ডিঙ্গা দোলে, ডিঙ্গা দোলে।

তিতাস নদীর পাড়ে তখন কুলবালাদের ধামাইল নাচের মত্ততা

আমরা   রব না রব না গৃহে
বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না।
এমন সুন্দর পাখি
হিদির মাঝে ধইরে রাখি
উড়লে পাখি ধরা দিবে না।
ঘরে আছে কুলবধু
হস্তে লৈয়া সর-মধু
কী মধু খাওয়াইলা জানি না।

ভাঙাগড়ার রুদ্রলীলায় তিতাসের হাসি শুকিয়ে যায়

তিতাস, তিতাস গো
তুমি আমার প্রাণেরও তিতাস।
তোমার বুকে ভাসি আমি
তোমার বুকে ডুবি
তোমার ভালবাসায় আমি
হইয়াছি উদাস।
তোমার ঢেউয়ের দোলায় দোলায়
কান্না ভেসে আসে
উড়ালি বাতাসে।
তিতাস, তিতাস গো
তুমি আমার প্রাণেরও তিয়াস।

অন্ধকারে ডুবে যায় গ্রাম। একটু পরে আলো আসতে দেখা যায় তিতাস নদীর পাড়ে গ্রামবাসীরা নৌকা বাইচের জন্যে জমায়েত হয়েছে।

১

মদন   আহা, কী নাও গড়লা কাদিরচাচা, তোমার ওই রঙিলা বাইচের নাও য্যান্ বাতাসের আগে ভাইস্যা গেল।

বনমালী	আর গানখানও গাইছে দয়ালখুড়া, বৈঠাগুলানরে মাতাইয়া দিছে একেলে!
গৌরাঙ্গ	নবীগঞ্জের নাওখানরে তো দশহাত পিছে ফালাইয়ে দিছে আমাগো পোলাগুলান।
দয়াল	হ, নাওয়ে উঠছিল কতগুলান বাঘের বাচ্চা। এতদিনের হারের বদলা হইল আইজ। নবীগঞ্জের কান মইলা দিছে একেলে।
মদন	কালে-দিনে মনে লয় আমাগো কিশোর চান্দির কলস জিত্যা আনব।
বনমালী	ওরে ওই দ্যাখ দ্যাখ, অহনে পেরাইজ দিব বাবুরা। ও কাদিরচাচা, তুমি যাও, পেরাইজ নিবা না?
কাদির	বুড়া হাতে পেরাইজ মানায় না রে পাগলা, হ্যার লাইগা চাই তগ মতন সমত্থ হাত। তরা যখন জিত্যা আস্যা বুক চিতাইয়া ঘুরবি, আমাগো বুকের মইধ্যে তখন তগ যৌবনের রক্ত ছলাৎ ছলাৎ কইর‍্যা নাচব। যা যা, সইরা দাঁড়া, ভাবি আসতাছে— উনারে দ্যাখতে দে। আসেন আসেন ভাবিজান, দ্যাহেন, আপনার পোলায় বাইচ জিত্যা সালাম কুড়াইতাছে বাবুগো। আসেন, দ্যাহেন।

কিশোবেব মা আসে

কিশোরের মা	কিশোর আইজ আমার পোলা না, ছুটভাই— আইজ ওই পোলা তোমার। আমোদ-আহ্লাদ যা খুশি কর গিয়া আমি কইতে যামু না। আইজ আমার পোলা ছাদির আর সুবলা। অগ ত মায় নাই, অগ আইজ বাহাদুরি দিব ক্যাডা? মায়ের কাছে গরব করতে না পারলে পোলাগো মন ভরে নাকি?
মদন	ও জেঠি, দ্যাখ দ্যাখ, পিতলা কলসখান ক্যামন চকচকায়? মনে লয় য্যান সোনার! ছাদির দাদায় মাথায় তুল্যা নিল!

ছুটতে ছুটতে আসে বাসন্তী

বাসন্তী	কই কই দেহি?
বনমালী	সুবলার কান্ধে খাসিখান দ্যাখ বাসন্তী, কত বড়ো?
বাসন্তী	হ, পেরায় তর মতন।

সোনাউল্লা — তাইলে একটু বেশি কর‍্যা প্যাজ-লসুন বাট্যা দিস, নাইলে ত বোকা বোকা গন্ধ ছাড়ব।

সকলে হাসে। রামকেশব আসে

রামকেশব — হঃ, হাস্য-মস্করায় জীবন কাটায় সব। নাও দৌড় করায়, বাইচ লড়ে, এইসব করলে য্যান মালোর পোলার প্যাট ভরব!

বাসন্তী — ও জ্যাঠা, দ্যাখ আস্যা, গোকন গাঁও আইজ কতবড়ো কলস জিতছে!

রামকেশব — ওই আকাম দেইখ্যা কাম নাই। মাছ ধরতে না পারলে ওই কলস গলায় বাইন্ধা ডুব্যা মরতে হইব মালোর পুতগো। সর সর, দেহি, খাসিখান কত বড়ো।

কিশোরের মা — দাঁত আছে নি সব কয়খান? জিগা?

রামকেশব — দাঁত লাগবো কোন কম্মে? এ মাগি তো কোন খবরই রাখে না শোনস্ নাই, জ্যাতা খাসির হাড় থাকে না? [কাদির হাসে] হাইসো না, হাইসো না কাদির। কোন আক্কলে তুমি এই বাইশহাতি নাও বানাইয়া পোলাগুলানের মাথা খাইলা কও দেহি?

কাদির — ক্যান, তোমার পোলারা যে গাঁওয়ের এত বড়ো ইজ্জতখান আইন্যা দিল হেইটা দেখলা না? অহন দশগাঁয়ে মাথা উচায়্যা সিনা টান কর‍্যা চলব এইহান কি কম কথা? চায়্যা দ্যাখ, গঞ্জের বাবুরা অগ কত বাহবা দিত্যাছে!

গৌরাঙ্গ — হ; বাবুগো বাহবার মর্য্যাদাই আলাদা। কত ইজ্জত!

রামকেশব — থাম থাম। মালোর ইজ্জত পিতলা কলসে না রে হারামজাদা, জালের টানে। মাঝের দাপে নাওয়ের পাটাতন ফাটলে তয় না মালোর ইজ্জত?

কাদির — তোমার পোলার বৈঠার দাপে তিতাস আজ উথাল-পাথাল হইয়্যা গ্যাছে বড়োভাই, মাছেরা সব ট্যার পায়্যা গেছে নতুন মালোর বাচ্চা আইছে এইবার— বাঘের বাচ্চা।

বনমালী — ও জেঠি, দেখ কিশোররে কত বড়ো ম্যাডেল পরায়্যা দিল দয়াল সা।

কিশোরের মা — ওইডা ভাইঙ্যা, এইবার আমার বউয়ের পায়ের তোড়া গড়ামু।

বাসন্তীকে কাছে টেনে নেয়

দয়াল	তাহলে এই ফাগুনেই দিন দেখি—না কি কস রে বাসন্তী?
বাসন্তী	[লজ্জা পায়] যাঃ! [ছুটে পালায়।]
রামকেশব	হঃ, রোজগার নাই কানাকড়ি, বউয়ের পায়ে তোড়া বানায়!
কাদির	আগে বিয়া দ্যাও বড়োভাই, দেখবা কেমুন রোজগারে ত্যাজ হইছে। আমার ছাদিররে দ্যাহ না— জমিলারে ঘরে আনতে অহন হালে-বলদে মন বসছে।
কিশোরের মা	বিয়ের কথা উঠলেই রোজগার রোজগার কর ক্যান? পোলার কি বয়স বয়্যা যায় না নাকি? কইছে তো, নাও সারাইয়া জাল নামাইবো গাঙে।
রামকেশব	হারে মাগি, আব বয়স পড্যা না থাকলেও আমারও তো বয়েস বয়্যা যায। না না— এই আমি সাফ কইয়া দিলাম, এই গোনে যদি জাল না নামায় তব পোলা, হেইলে কাদিরের কথা মতো নির্ঘাৎ অর বিযাই দিয়া দিমু আমি। তখন বুঝবা ঠেলা!
কাদির	হ যে বেযাধির যে দাবাই।

সকলে একসঙ্গে হেসে ওঠে।

২

চুযাবি নৌকা হাতে সুবল এল। নৌকাটি লুকিযে বাখল এক পাশে

সুবল	বাসন্তী— বাসন্তী— আরে ওই বাসন্তী—

বাসন্তী আসে

বাসন্তী	কই কই, কোন দিকে রে?
সুবল	কী কোন দিকে?
বাসন্তী	আহা ন্যাকা। কোন বাড়িতে ডাকাইত পড়ছে তাড়াতাড়ি ক।
সুবল	ডাকাইত আইব কই থিকা? তুই কি জাইগা জাইগা স্বপন দেখস নাকি?

বাসন্তী — ডাকাইত পড়ে নাই? তাহলে এমুন গলা চ্যাতাইয়া বাসন্তী বাসন্তী করলি ক্যান? আমি ভাবলাম বুঝি—

সুবল — কত রঙ্গা জানে। অহন কামের কথাখান শোন মন দিয়া।

বাসন্তী — তর আবার কামের কথা আছে নাকি? হক্কলই ত আকামের কথা।

সুবল — আবার! শোন, আইজ বাইচ জিত্যা আমরা যে খাসিখান পাইছি হেইখান রে দুইভাগ করা হইব। একভাগ রান্ধব ছাদিরের বউ জমিলা, আর একভাগ তুই। ত্যাল মশলা কাদির চাচায় কিন্যা পাঠাইয়া দিব কইছে। কিশৈরা কইয়া পাঠাইল, বুঝলি?

বাসন্তী — যে কইয়া পাঠাইছে হ্যারে কইস গলবস্তর হইয়া যেন কইয়া যায়। উটকা মাইনসের কথায় আমি হাতা-খুন্তি ধরি না, বুঝলি?

সুবল — কী? আমি হইলাম উটকা মানুষ? অঃ! দ্যামাকে যে তর মাটিতে পাও পড়ে না? হেইলে শুইনা রাখ, এই উটকা মানুষটা আইজ হালে না থাকলে তর ওই কিশৈরারে আইজ আর বাইচ জিততে হইত না, আর গলায় চান্দির ম্যাডেলও ঝুলত না। রামনাথের নাও তার আগেই ডুবাইয়া দিত গাঙের তলায়। দ্যামাকি! নে ধর।

বাসন্তী — কী?

সুবল — তর চুয়ারির নৌকা। কাইল চুয়ারি ভাসানের দিন, ভুইল্যা গিছি নাকি?

বাসন্তী — ওমা— এই নাও অহন আমার আর কোন কামে লাগব গ?

সুবল — তা ত জানি না। তর কুনো ভাই আছিল না বল্যা সাতবছর ধইর্যা এই চুয়ারির নাও আমরা বানাইয়া দিছি তরে— কোন কামে লাগব, তা ত ভাবি নাই? গীত গাইয়্যা গাইয়্যা তুই চুয়ারি ভাসাইতি তিতাসে—

বাসন্তী — আর তুই হক্কলার আগে ঝাপাইয়া ঝুপাইয়া হেই নাও তুলতিস মাথায়।

সুবল — হ— তুলতামই ত। আমার গড়া চুয়ারির নাও আমি অন্যারে দিমু ক্যান?

বাসন্তী — তুই বড়ো স্বার্থপর সুবলদা, তুই কিশোরদারেও ধরতে দিস নাই কুনোদিন।

সুবল — দিই নাই দিই নাই। অত আতুপুতু কইর্যা চুয়ারির নৌকা ধরন যায় না। [একটু থেমে] আসল কথা কী জানিস বাসন্তী, আমি নৌকা ধরলে তুই চট্যা যাইস দেখ্যাই আমি ধরতাম পিত্তিবার। আমার মজা লাগত খুবঐ।

বাসন্তী — কিন্তু এবারে কি করবি? আমার বরতো যে শ্যাষ হয়্যা গেছে গেল বছর। অহন আর কার নাও ধরবি?

সুবল — তুই আর ভাসাবি না?

বাসন্তী — ওমা, কী পাগলরে তুই? বরতো শ্যাষ, আর কার লাগ্যা ভাসামু চুয়ারি?

সুবল — ও! এতকাল কার লাইগা ভাসাতিস?

বাসন্তী — যে ধরে না— হ্যার লাইগা।

সুবল — [বিষণ্ণ] ও!

বাসন্তী — দূর বোকা, বরতোর নিয়ম ভাসাইতে হয়, ভাসাইতাম। মানুষ খুঁইজ্যা কেউ চুয়ারির নাও ভাসায় নাকি?

সুবল — যে ভাসায় হ্যার মনের খবর হেই জানে, আমি কমু কেমন কইর‍্যা?

বাসন্তী — [একটু থেমে] সুবলদা—

সুবল — এ্যাঁ?

বাসন্তী — কিশোরদা নাকি এইবার বড়গাঙে যাইব? ম্যাঘনায়?

সুবল — তরে কইল ক্যাডা?

বাসন্তী — না কওয়া কথা যে শুনতে জানে হ্যারে কি আর কওন লাগে? বাতাসের কানেই সে মনের কথা শুইন্যা লয়। সুবলদা, তর নৌকাটা তুই লয়্যা যা।

সুবল — মালোর পুতের লাইগ্যা এ নৌকা না রে বাসন্তী, আমাগো লাগে কাঠের নৌকা। যে নৌকা তিতাসের বুক ফাড়্যা তর্‌তর্ কর‍্যা উইড়্যা যায় বড় গাঙের দিকে। উথালি-পাথালি ঢেউ নৌকার কাঠে বাড়ি মারে আর শক্ত হাতে মালোর পুত জাল ভর‍্যা মাছ তুইল্যা আনে তার খোলের পাটাতনে। তোর নাও তুই ভাসায়্যা দে বাসন্তী, আমি আর কুনোদিন তোর নাও ধরুম না, কথা দিলাম কুনোদিন না।

চলে যায

বাসন্তী — যে কুনোদিন ধরলো না, হ্যায় তো এইবারেও ধরবো না। হেইলে আর চুয়ারি ভাসায়্যা লাভ কি?

(গান) ভাসাইলাম ভাসাইলাম নাও বাসনা করিয়া।
কে আসিয়া করিবে পার যৈবন দরিয়া॥

৩

রামনাথের বাড়ি। কথা বলতে বলতে আসে দয়ালচাঁদ ও রামনাথের মা

রামনাথের মা — পিছা মারি, পিছা মারি তোমার ওই মাদুলির কপালে। ধন্বন্তরী কইয়্যা দুইটা ট্যাকা নিয়া গ্যালা অহন দেখি কামের নামে অষ্টরম্ভা।

দয়ালচাঁদ — ক্যান ক্যান? অহনও তোমার পোলার ঘরে মন বসে নাই নাকি? বৌমারে ত অহন ঘন ঘন আদর-আহ্লাদ করনের কথা। কয় কি— অহনও করে না?

রামনাথের মা — আরে দূর, সে মাগি ত অহন সাতমাসের পোয়াতি।

দয়ালচাঁদ — পোয়াতি? তয় যে কইলা ঘরে মন বসে নাই? হে-হে, আসল কথা কী জান বউঠান, আমাগো রামনাথ বাবাজীর মধ্যে রজভাবের প্রাবল্য ত— হেই কারণে শুক্রের জোর বাড়ছে। একখান আধখান ইস্তিরি কম্ম না ওই গ্রহের শক্তি ধর‍্যা রাখা, বুঝলা না?

রামনাথের মা — পিছা মারি তোমার শক্তির কপালে? অহন কি তোমার কথায় আর একখান বউ আনুম নাকি ঘরে? সুখের সংসারে ভূতের কিত্তন?

দয়ালচাঁদ — আসলে বৈষ্ণবী মাদুলি দিছিলাম তো, তাই পরকীয়ায় টান একটু বেশি। গ্রহরাজ শুক্ররে দমন করনের লাইগ্যা দরকার হইল গিয়া—

রামনাথের মা — পিছা মারি তোমার দরকারের কপালে, তা দ্যাও নাই ক্যান যেইখান দরকার আছিল? আমি কি মানা করছিলাম?

দয়ালচাঁদ — অহন তাহলে কি পুনরায়—

রামনাথের মা — আবার কয় পুনরায়— গ্রহের ত্যাজ থাকলে গঞ্জে গিয়া ঘর ভাড়া করুক না, আমি কি আপত্য করছি? অর দাদারা যেমন রাখছে তেমনি রাখুক? পুরুষ মাইনসের সংগতি থাকলে রাখ্‌নি পোষে, তাতে এট্টা ইজ্জত আছে। কিন্তু ঘন ঘন এ মাইয়্যা ও মাইয়্যা লয়্যা লাড়াচাড়া ফুর্তি করলে লোকে চরিত্তিরের দোষ দিব না?

দয়ালচাঁদ — বটেই ত, বটেই ত।

রামনাথের মা — তয়? মনে কর দেখি রামনাথের বাবায় কতবড় মানী লোক আছিল। কত বড়ো নামডাকের মোড়ল? গঞ্জে ত তার তিনখান রাখ্‌নি মাগি আছিল, কিন্তু কেউ কুনদিন চরিত্তিরের দোষ দিতে পারছে তারে? কও?

দয়ালচাঁদ তাইলে ত এই মাদুলিতে চলব না। অর লাগ্যা চাই মহাভৈরব কামসিদ্ধ কবচ। ডবল শক্তিধর।

রামনাথের মা কচু সিদ্ধ। কত ট্যাকা হাতাইবার তাল করছ এইবার?

দয়ালচাঁদ এইডা তুমি কী কইলা বউঠান? আমার তো কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি নাই। তোমরা চাও কইয়্যা এইটা-ওইটা দি— নাইলে সবঐ ত আমি ত্যাগ দিছি বহুকাল।

রামনাথের মা পিছা মারি তোমার ত্যাগের কপালে। বুকের মইধ্যে হু হু করে— ঘরের ট্যাকা বারোভাতাইরায় লয়্যা যায়— একটা বিহিত করন লাগে কি না কও?

দয়ালচাঁদ হ লাগেই ত। মায়ের পরান—পোলার সুখের লাইগ্যা কী না করে মায়?

রামনাথের মা তোমরাই কও। দুই-দুইবার সুদে-আসলে প্রায় একশত ট্যাকা মাফ কর্যা এক ঘাতকের মায়্যার লগে বন্দোবস্ত কর্যা দিলাম, তাতে নি মন উঠলো পোলার? দুইদিন-একদিন গিয়াই ত্যাগ দিল তারে।

দয়ালচাঁদ আহা-হা, একশত ট্যাকা জলে পড়্যা গেল গিয়া—

রামনাথের মা গ্যাছে যাউক। বাপ মরা কোলের পোলা, অর শুকনা মুখ আর দ্যাখতে পারি না।

দয়ালচাঁদ আহা-হা—

রামনাথের মা তা দিও তোমার ওই কচুসিদ্দ না গুষ্টিসিদ্দ কবচ বানাইয়া—

বাসন্তী আসে

রামনাথের মা কী লো, তুই হঠাৎ কী মনে কর্যা?

বাসন্তী তোমার কাছে একটু আইলাম জেঠি।

রামনাথের মা হ সে ত দ্যাখলাম। কত দিতে হইব?

বাসন্তী এ্যাঁ?

রামনাথের মা তরে কই না। ঠাকুররে জিগাই, ওই কুচসিদ্দ ঝুলাইতে কত লাগব?

দয়ালচাঁদ মহাভৈরব কামসিদ্ধ কবচ বানাইতে খরচ পড়ব গিয়া তোমার— নয় টাকা নয় আনা, আর একখান গামছা।

রামনাথের মা গামছা?

দয়ালচাঁদ হ, নতুন গামছা। নববস্তর দেওনের নিয়ম আছে কিনা? অভাবে গামছা।

রামনাথের মা	পিছা মারি তোমার নিয়মের কপালে। চাইর পয়সার ঢোলক ঝুলাইয়া সাড়ে-নয় ট্যাকা ট্যাঁকে গোজনের মতলব আমি বুঝি না? আবার নববস্তর দেখায় আমারে!
দয়ালচাঁদ	শোন কথা। দেখাই কি সাধ কর‍্যা? রামনাথের চন্দ্র বক্রী না? চন্দ্রের ত বহু মায়্যা মাইনসের দোষ। তারে খণ্ডন করা কি সোজা কথা? তোমার পরতায় না আইলে অবশ্য—
রামনাথের মা	খাড়ও— খাড়ও। ত্যাজ দ্যাখাইও না বেশি। ট্যাকা আনতাছি।

চলে যায়

বাসন্তী	এসব কর‍্যা কুন উপকার হয় দয়ালকাকা?
দয়ালচাঁদ	কী জানি মা, মাইনসে বিশ্বাস করে, তাই দিই। দুইটা উল্টাপাল্টা কইলে যদি দুইডা পয়সা আসে— আমার আর আপত্য কী? বাঁচতে হইব ত? মালো জালে বাঁচে, চাষা হালে বাঁচে আর আমি এই তালে বাঁচি।

রামনাথের মায়ের পুনঃপ্রবেশ

রামনাথের মা	এই ন্যাও, তোমারে নয় ট্যাকা নয় আনাই দিলাম। নতুন গামছা কিইন্যা পাঠাইয়া দিমু কাইল। কিন্তু শোনো ঠাকুর, এইবারে যদি কাম না হয় তাইলে কিন্তু ওই নতুন গামছা তোমার গলায় বাইনধ্যা তিতাসের জলে চুবামু আমি, কথাখান মনে রাইখো।
দয়ালচাঁদ	কীযে কও বউঠান, কবচের মধ্যে এমন কামরূপ মন্তর গাইথ্যা দিমু যে পোলায় তোমার আর ঘরের বউগো ছাড়্যা লড়বই না।

চলে যায়

রামনাথের মা	অরে অ নিব্বইংশার ব্যাটা, হেইলে কি অর ভাইয়ের বউগোও ধর‍্যা টান মারব না কি অহন? গিদ্ধরের পুত?— আহা-হা, বাসন্তী আইজ আমার ঘরের দুয়ারে! কী ভাইগ্য আমার!
বাসন্তী	তোমার ভাইগ্য ভালো না হইলে আমরাই বা তোমার দরজায় আসুম ক্যান কও জেঠি? নদীর দুই কূল ত একসাথে ভাঙ্গে না। আমাগো

দিক যখন ভাঙ্গে, তখন তোমাগোর দিক গড়্যা ওঠে।

রামনাথের মা — আহা, এত ভালো ভালো কথা তরে শিখাইল ক্যাডা লো বাসন্তী? কিশোর?

বাসন্তী — মাইনসে যে শ্বাস টানলে বাঁচে, এইহান কি কাউরে শিখাইতে হয় জেঠি? জন্ম থাকতেই তা শিখে।

রামনাথের মা — বুঝলাম। তা কিশোর যে ম্যাঘনায় যায়, ফির‍্যা আইস্যা তরে বিয়া করব ত?

বাসন্তী — যাগো পোলা হ্যারা জানে আর আমার পাপে জানে, আমি কমু ক্যামনে?

রামনাথের মা — আহা, তগ কত ভাব, দেইখ্যা চক্ষু জুড়ায়। তা হ্যালা মা, গায় গতরে তগ ভাবসাব হসছে নাকি দুই-একদিন?

বাসন্তী — [চিৎকার করে] জেঠি! ইতরামি কইরো না।

রামনাথের মা — ইতরামির কী দেখলি? জোয়ান বয়েসে অমন এক-আধবার হয়ই, তাতে চটার কি আছে? [বাসন্তী চলে যেতে থাকে] আহা চললি কই? কামের কথা ত কইলি না কিছু?

বাসন্তী — বড়ো ঠ্যাকায় পইড়্যা বাবায় পাঠাইছিল দশটা ট্যাকার লাইগ্যা। জালখান ছিঁড়া গ্যাছে, সারাইতে না পারলে—

রামনাথের মা — আমার কাছে ত অহন আর নাই মা। তুই বরং রামনাথের কাছে গিয়া আমার কথা কইস, দিবনে দশ ট্যাকা। আহ্যা ম্যায়ামাইনসের দুঃখ আমার পোলায় মোটে সইহ্য করতে পারে না। শোন, সন্ধ্যাকালে একা থাকব যখন তখন যাইস, কেমন? সন্ধ্যাকালে।

বাসন্তী — জেঠি, আমাগো অভাব লইয়্যা ব্যবসা করতাছ কর, আমাগো চক্ষের জল দিয়া সুখ কিনতাছ কেন, কিন্তু মনে রাইখো— ভগবানের দুনিয়ায় এইটাই শ্যাষ কথা না। দিন বদলায়। আমাগো দিনও আইবো। আরও মনের রাইখো— এই দিন দিন না, আরো দিন আছে। এই দিনরে লয়্যা যামু হেই দিনের কাছে।

চলে যায়

রামনাথের মা — দিন তরও বদলাইব রে বাসন্তী। কিশোরের ঘর আর তরে করতে হইব না, তার আগেই রামনাথ তরে খাইব। আর হেই ব্যবস্থাটা বুঝি আমারেই কর‍্যা দিতে হয়। আহা, ত্যাজ মরাইতে যে আমার

বড়ো ভালো লাগে।

আঁচল থেকে পান মুখে দিয়ে চলে যায় অন্ধকার।

৪

রামকেশবের বাড়ি। কলসি কাঁখে কিশোরের মা ও বাসন্তী আসে

কিশোরের মা আমার যে মন মানে না বাসন্তী। কথাখান শোনার পর থিক্যা খাইতে পারি না, শুইতে পারি না— খালি বুকের মইধ্যে ধড়ফড়ায় কী হইব, কী হইব—

বাসন্তী ভাব্যা আর কী করবা জেঠি। মালোর মাইয়্যাগো বরাতে তো ভগবান এই বিধানই লিখ্যা দিছে, অহন খণ্ডনের উপায় কী?

কিশোরের মা মালোর পোলায় মাছ ধরব, তাতে ত না করি না। দয়ালঠাকুর কইছে, মা লক্ষ্মী নাকি মৎসকন্যার রূপ ধর‍্যা আসে মালোর সংসারে— হ্যারে অবহেলা করতে নাই। কিন্তু পদ্মা-ম্যাঘনায় যে বড় বিপদ রে বাসন্তী। তিতাস জননী আমাগো লক্ষ্মী।

বাসন্তী কিন্তু তিতাসের জল যে শুকায়্যা আসতাছে জেঠি। চর পড়তে আছে মাছ নাকি আর পাওন যায় না— হক্কলে কয়।

কিশোরের মা হেই কথাখান মিছা না। তোর জ্যাঠারে তো দেহি— কিশোররে ত দেহি, সারাদিন জাল বায়্যা দুই চারখান কুচামাছ লইয়া আহে ঘরে। তার খাইব বা কী— আর বেচবই বা কী?

বাসন্তী তাহলে আর আপত্য করনে লাভ কি? বাঁচতে ত হইবই। না খাওয়াইয়া রাখব নাকি ঘরের মানুষ গো? পুরুষ মাইনসে কি পারে?

কিশোরের মা পারে না জানি, তবু মায়ের পরান— চিন্তা হয় মনে। কী গহীন জল নদীর, কী বড়ো ঢেউ! পাড় ভাঙে, নৌকা ডুবায়। কত কামট কুমির আছে ওই সব নদীতে— ভয় করে না? আমাগো তিতাস কত শান্ত। ঝড় তুফানেও কুনো ডর নাই— জননী আমাগো স্বামী-সন্তানরে ঠিক ফিরায়্যা দিব কোলে। কিন্তু ম্যাঘনা?

বাসন্তী কু ভাবনা ভাইবো না ত? শীতের মুখে ত নদীর জলে ঢেউ থাকে না। আর চৈত-সংক্রান্তির আগেই ফির‍্যা আইব— এত ভাইব না তুমি।

কিশোরের মা — কত ভাবি— বাড়ি ভরা মেলা মানুষ, খায়-দায় আহ্লাদ-ফুর্তি করে, কিশোরের বাপ ব্যস্ত হইয়া ঘোরাঘুরি করে— পোলার বিয়্যা বইল্যা কথা। তগ দুইজনার হাতে হাত মিলায়্যা দয়াল ঠাকুর মন্তর পড়ে, আমি দূর থিক্যা দেহি—

নেপথ্যে কিশোরের কণ্ঠ

কিশোর — মা— ও মা—

বাসন্তী — ওই আহে তোমার পোলায়। আমি যাই।

চলে যায়

কিশোরের মা — কী রে কিশোর— কী হইছে বাপ?

কিশোর ও রামকেশব আসে

কিশোর — বাপ রে জিগাও, অহন নাও কেমন মজুবত কর‍্যা দিছি। তিন পোস্ত গাব দিছি— এমন চকচকায়— য্যান আরশি।

কিশোরের মা — তাইলে অহন জাল নামা তিতাসে কয়দিন। বেলাবেলি বাইয়্যা শ্যাষে রাইতের গোনে যাইস।

কিশোর — তিতাসে আরা মাছ নাই গ মা— দিনভর শুধু জাল টানাই সার।

রামকেশব — নাই-নাই কর‍্যাও যেটুকু আছে তাতেই ত বাঁচতে হইব মালোগো। বাঁট শুকায়্যা গেলেও বলদা বাছুরের লাকান গুতা মারতে হয়— চুয়াইয়া চুয়াইয়া যেটুক আসে।

কিশোর — তাতে কর‍্যা বাচন যাইব না বাপ।

রামকেশব — ওরে বাবা, মালোর পোলা, হাতে-জালে তফাৎ করবি না। যহন ঘুমাবি তখনও জালের দড়ি হাতে ধর‍্যা ঘুমাবি, দেখবি তিতাস খালি হাতে ফিরাইব না।

কিশোর — না-না, আমি ম্যাঘনায় যামু, আমি বুল্যা কত কষ্ট কর‍্যা সব ব্যবস্থা করলাম—

কিশোরের মা — হ— আমারও মন কয় ফিরাইব না। তিতাস আমাগো মা না? মায় কি পোলারে ফিরাইতে পারে? মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে।

কিশোরের মা	সে যে বড়ো দজ্জাল নদী বাপ। আমার বড়ো ভয় করে।
কিশোর	ভয় কিসের? আমার বাপ যায় নাই? আমি হেই বাপের পোলা না? আমি যামুই যামু।
রামকেশব	জিদ করিস না কিশোর। তিতাসের মালো আমরা, তিতাসের অমর্য্যাদা করিস না। ম্যাঘনা আমাগো সয় না। কী ভীষণ ঢেউ। এ পাড় নাই ও পাড় নাই, য্যান কালা বদর।
কিশোর	ভয় পাইয়ো না বাপ। হেই ডাগর ঢেউয়ের সওয়ার হয়্যা কালা জলের তলা থিক্যা তুইল্যা আনুম ডাগর ডাগর মাছ। হাট থিক্যা হাটে বেচুম নগদ কড়িতে। বাক্স ভর্যা ট্যাকা আনুম, তোমার লাইগ্যা কিন্যা আনুম ধুতি গামছা, মায়ের লাইগ্যা লাল পাইড়্যা শাড়ি আর শাঁখা। তোমারে আর কষ্ট করতে দিমু না বাপ, মায়েরে আর কষ্ট করতে দিমু না।
কিশোরের মা	কিশোর রে, বাপ আমার, তুই আমাগো একটাই পোলা, তরে ছাইড়্যা আমরা থাকুম ক্যামনে বাপ।
কিশোর	আর যেদিন ফির্যা আসুম, আবার গলুইতে খাড়াইয়া হাঁক দিমু বদর বদর'— তুই আমারে ধান-দুব্বা দিয়া বরণ করবি মা, বাপ আমারে চুমা খায়্যা হাত ধর্যা নামাইব নাওয়ের থন। দশজনায় ছুট্যা আইস্যা কইব, রামকেশবের ব্যাটা কিশোর মুল্লবম্মন ম্যাঘনা জিত্যা ফির্যা আইল হে— আমারে অনুমতি দে মা জননী— বাপ তুমি আমারে আশীর্ব্বাদ কর—

কিশোর গড় হয়ে দু'জনকে প্রণাম করে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে।

৫

রামনাথ ও সোনাউল্লা আসে

রামনাথ	বলদা না বক্না?
সোনাউল্লা	আইজ্ঞা?
রামনাথ	কই, তর বাছুরটা বলদা না বক্না?
সোনাউল্লা	আইজ্ঞা কত্তা বকনা।
রামনাথ	শূয়ার।
সোনাউল্লা	আইজ্ঞা?

রামনাথ — তরে কই না, মদনারে। বয়স কত?

সোনাউল্লা — কার আইজ্ঞা? বাছুরের?

রামনাথ — নাত কি তর শ্বশুরের?

সোনাউল্লা — আইজ্ঞা তিন বচ্ছর।

রামনাথ — খাট্টাইশ্।

সোনাউল্লা — আইজ্ঞা?

রামনাথ — তরে কই না, মদনারে। পাল খাইব কবে?

সোনাউল্লা — আইজ্ঞা কত্তা পাল খাইছে গ্যালো মাসে।

রামনাথ — হারামজাদা।

সোনাউল্লা — গাইলান ক্যান?

রামনাথ — তরে কই না, কই তগ মদনারে। হালায় দশ বছইর্যা এক বুড়া বলদ আনছিল আমার কাছে। বলদার মুখ দিয়া দেখি ফেব্বরি কাটে— মইর্যা যাইব তিনদিনের মাথায়। কয় বন্দক দিয়া বিশখান ট্যাকা দাও। শ্যাষে বলদা মরব আর আমার ট্যাকাও গায়েব। ভাব? আমারে যেন পোলাপান পাইছে সুমুন্দির পুতে।

সোনাউল্লা — না কত্তা, আপনে পোলাপান হইলে বুড়া মানুষ ক্যাডা? বাপ মরণের তর নাই, তার ত্যাজারতির ব্যবসাখান ধরছেন য্যান হাঙ্গারের দাঁত। বেহস্ত থিকা দেখ্যা বাপে কত শান্তি পাইতেছেন কন আইজ্ঞা?

রামনাথ — কথাখান ভালো-মন্দ মিশায়্যা মন্দ কস নাই। যাউক, হেই সকল কথায় আমি কিছু ভাবি না। বাপে কইছে ত্যাজারতি যহন করবা রামনাথ, তহন মনে করবা খাতক হইল নারায়ণ। ঈশ্বর তুল্য জ্ঞান করবা। করি। পিত্তি আজ্ঞা— ফ্যালতে পারি না। ক পারি?

সোনাউল্লা — আইজ্ঞা না।

রামনাথ — পারি না। তাই বুল্যা জরদ্গব বুড়া বলদও ত বন্দক রাখতে পারি না। তাতে যে পিত্তিরক্তের অপমান! ক?

সোনাউল্লা — আইজ্ঞা হ।

রামনাথ — এই যে তর বক্‌নাটারে আমি বন্দক রাখুম, আমি কি না কইছি ক?

সোনাউল্লা — আইজ্ঞা না। কিন্তু না কত্তা।

রামনাথ — কী না?

সোনাউল্লা — বক্‌না আমি বন্দক রাখুম না। আমার মায়্যা কান্দব।

রামনাথ — আহা হা— বড়োই দুঃখ। সব কিছু সওন যায়, কিন্তু মায়্যার চোক্ষের

জল? আ-হা-হা— ভাবতে পারি না।

সোনাউল্লা — কত্তা ওই বক্‌নাডারে ছোটবেলা থিক্যা মানুষ করছে আমার মায়্যা।

রামনাথ — অহন বুড়াকালে আমি মানুষ করুম অনে। গরু মানুষ করতে করতে তুই তো দেখি গরু হয়্যা গিছিস গিয়া সোনাউল্লা?

সোনাউল্লা — ক্যান?

রামনাথ — দশ টাকা কজ্জ নিছিলি গেল সনের আগের বর্ষায়। অহন চক্করবিদ্দিতে তর সুদ হইছে— খাড়ও দেইখ্যা কই [খাতা দেখে] আমার কাছে তঞ্চকতা নাই— এই যে সোনাউল্লা মিঞা বত্রিশ টাকা এগার আনা তিন পয়সা— শুধবি ক্যামনে? আইজ আবার দশ ট্যাকার লাইগা সন্ধ্যা থিক্যা ঘুরঘুর করতাছস?

সোনাউল্লা — আইজ্ঞা দুইগাছ মাকড়ি আনছি— আমার পরিবারের শ্যাষ সম্বল।

রামনাথ — কই দেখি? [সোনাউল্লা নীরব] গরু! আপনার ভালো হালায় পাগলেও বোঝে— এইটা দেখি আদত গরু। মায়্যা কান্দলে মায়্যারে ভুলাবি— অভাবে পর্‌য়া পরিবার কান্দলে জবাব দিবি কার কাছে? কলমা পরাইয়া সাদি করস নাই পরিবাররে? যা, কাইল সকালে বকনাটারে আইন্যা নিয়া যাইস দশ ট্যাকা। কী করুম, আপনজন তরা, তগ ত না করতে পারি না।

সোনাউল্লা — আমারে দয়া করেন কত্তা— বক্‌নাটারে ছাইর‍্যা দ্যান।

রামনাথ — আমি কি বাইন্ধ্যা রাখছি না কি? যা ত অহন, দিক করিস না। গঞ্জের বাবুরা রইছে। জরুরি কাম আছে তাগো লগে। অহন যা। কাইল আসিস।

সোনাউল্লা — হায় আল্লা, চায়্যা দ্যাখ, গরিবের চোক্ষের জলের কুন দাম নাই। ম্যায়ার মুখ ফুটাইতে পারি না, শুদা চোক্ষেব জল নামাইতে পারি। আমার এ গুনা তুমি মাপ কইর না। খোদা। আমারে তুমি কুনোদিন মাপ কইরো না।

রামনাথ — [সোনাউল্লার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে মুহূর্তকাল। তারপর কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে বলে] হুঁ! মাগ্নে নাই চাম, মুখে হরেকিস্ট নাম। দিল মৌতাতডারে নস্ট কর্‌য়া! [জোরে] হারান্যা— অরে অ হারান্যা— গেল কই হারামজাদায়? হারান্যা অরে অ নিব্বুইংশার ব্যাটা—

হারানের প্রবেশ

হারান — যাই আইজ্ঞা।

রামনাথ — থাকস কই কামের সময়? কইছি না, কুত্তার মতো বইয়্যা থাকবি দরজার গোড়ায়। হালায় চেঁচাইতে চেঁচাইতে আমার নাভিশ্বাস উইঠ্যা গেল গিয়া!

হারান — আমি তো ঘাটে গিছিলাম আইজ্ঞা। আপনে যে কইলেন বাবুর নাও আইল কিনা দেইখ্যা আয়।

রামনাথ — হ-হ কইছিলাম। আইছে নাকি?

হারান — আইছে। গলুইতে খাড়াইয়া মাগন সরকার দেহি মাঝিরে কূলে নাও ভিড়াইতে কয়। হেই দেখ্যাই ছুট্যা আইলাম আপনারে খবর দিতে।

রামনাথ — আইব ত লিচ্চয়। ওই মাছের গন্ধ পাইছে যহন বিড়ালের ছোকছোকানি ত কমব না। ইসে হইছে— হ্যায় করে কী অহন দেখলি নাকি?

হারান — দ্যাখলাম তো সাজনগোজন করে।

রামনাথ — [পুলকিত] করে নাকি?

হারান — হ কত্তা, চোক্ষে কাজল দিছে, ওষ্ঠে লাগাইছে আলতা। কপালে পরছে কাচপোকার টিপ আর শাড়িখান পরছে— কী কমু কত্তা— শরীলখান য্যান—

রামনাথ — থাউক— থাউক! হারামজাদা য্যান প্যাঁচড়ার মাছি, ঘায়ের গন্ধ পাইলে আর কথা নাই। যা, দ্যাখ গিয়া বাবুরা আইল নাকি? পান-তামুকের ব্যবস্থা রাখবি। হ ভালোকথা, বোতলগুলান রাখছস কই?

হারান — আইজ্ঞা চৌকির তলায়।

রামনাথ — ঠিক আছে, যা। ডাকলে য্যান আইতে দেরি হয় না।

রামনাথের মা আসে

রামনাথের মা — রামনাথ?

রামনাথ — কি গো মা?

রামনাথের মা — শোনলাম, বিনা বন্দকে তুই নাকি কিশোররে একশত ট্যাকা কজ্জ দিলি?

হারান — ক্যান, আপনের আপত্য আছিল নাকি?

রামনাথ — তুই থাম, হ, দিলাম গ মা। কাইল ম্যাঘনায় যাইব মাছ ধরতে।

নাও সারাইব, নতুন পাল কিনব...

রামনাথের মা — তর তাতে কি? তুই মহাজন, বন্দক নিবি ট্যাকা দিবি— খালি হাতে ট্যাকা দিয়া তর অত সাউঘুরি করনের কাম কি রে?

রামনাথ — আছে আছে, কাম আছে। দিন বদলাইয়া গ্যাছে গ মা। অহন আর গায়ের জোরে কাম হয় না, অহন লাগে বুদ্ধির জোর। দ্যাখলা না, ফিচারির লোন কম্পানিরে কলা দেখাইয়া গঞ্জের বাবুগো লগে ক্যামন ঋণ সমবায় খুললাম? ওই ব্যবসা যদি একবার জইম্যা উঠে—

হারান — উঠবো না মানে? আইজই ত তিনখান নাও বান্ধা পড়ছে আমাগো কাছে। ছোটো কত্তায় আমাগো খুবই চতুর গো মা জননী। এমন বুঝান বুঝাইল যে ফিচারির লোন কোম্পানির হাত থিক্যা হক্কল মালো চাষি ক্যামন সুর সুর কইরা চল্যা আসতাছে আমাগো সমবায়ে। তা নইলে কন, আইজ ভরত বণিকও ত ট্যাকা খাটাইতে চায় আমাগো লগে।

রামনাথ — তুই থাম। দুই-চাইরজনরে এইভাবে না দিলে অরাই বা বিশ্বাস কইর‍্যা আইব ক্যান আমাগো সমবায়ে, কও? তাছাড়া কিশোর সুবলার অহন একবার ম্যাঘনায় যাওনের দরকার আছিল।

রামনাথের মা — ক্যান?

রামনাথ — সত্য কমু? তা নাইলে যে ওই বাসন্তীরে একলা পাইতাম না।

রামনাথের মা — মরণ! যা না একবার বাসন্তীর কাছে— পিছা মারব তর মুখে।

রামনাথ — মারুক। পিছা খামু, তার লগে অরেও আমি খামু।

রামনাথের মা — আর কত খাবি? এইত গঞ্জ থিকা এক মাগিরে আন্যা তুলছস— পয়সার ছেরাদ্দ।

রামনাথ — পয়সা পয়সা কইর না ত। রোজগার করলে পয়সা থাকব, কিন্তু এই বয়স আর থাকব না। তুমি যাও, ঘরে যাও। আমার কাম আছে। চল হারান্যা—

হারান — চলেন।

রামনাথ — তয় একখান কথা শুইনা রাখ মা, আমার খুদা একটু বেশি। আমি সব খামু। যার যত সম্পত্তি আছে— জাল, নৌকা, জমি-জিরাত, বউ-ঝি সব খামু। পালায় শোনো নাই, খান্ডব বন পোড়াইয়া রাজধানী বানাইছিল যুদিষ্ঠির? একটু ধৈইর্য ধইর‍্যা থাক, আমিও হেইরকম গোকন গাঁও জ্বালাইয়া গঞ্জে গিয়া রাজত্ব করুম— তয় আমার নাম রামনাথ মালো। চল। "হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে"।

রামনাথ ও হারান চলে যায়

রামনাথের মা — আহা, এতদিনে পোলায় আমারা যুদিষ্ঠির হইল। হাঃ হাঃ হাঃ। খা খা যত পারিস খা— তয় অহন বদহজম না হইলেই বাঁচি।

চলে যায়

৬

কাদির শেখের বাড়ি। গরিবুল্লা, কাদির আর রামকেশবের আগমন

গরিবুল্লা — বাঁচুম না বড়ে মিয়া, হেইলে আমি আর বাঁচুম না। তুমিই বিচার কর দাদা, চাইর-চাইরখান রাইত পোয়াইয়া গেল, আর কি থাকন যায়, কও? চাষবাসের ব্যাবাক কাম ফেলা ছুট্যা আসছি বড় মিঞার দুয়ারে।

কাদির — ছুট্যা আসবা না মানে? ব্যাটারে শাদি দিছি কি বেটিরে তোমার ঘরে রাখবা কয়্যা? এইদিকে আমার ঘর আন্ধার, আসমানে চান্দ নাই!

গরিবুল্লা — আহা তোমারা চান্দ ত তোমারে দিয়াই গ্যালাম। অহন অনুমতি করলে বাপ-ব্যাটায় বিদায় হই।

কাদির — হঃ, বিদায় দিত্যাছি তোমাগো, আমার ঘরের রোশনি দুইমাস আটক রাখছিলা মনে নাই? অহনে তোমরা বাপ-ব্যাটাও আমার ফাটকে কয়েদ থাক দুইমাস, তারপর যাওনের কথা।

গরিবুল্লা — সব্বনাশ হয়্যা যাইব বড় মিঞা। জমিনে আমার ধান। গৌর, নিতাই দুই ভাইরে কয়্যা আসছি দ্যাখতে। অহন শীষে দুধ আসতাছে, অহন কি থাকন যায়— তুমিই কও দাদা?

রামকেশব — তাইলে আমি কই কী কাদির, জমিলায়ও একা গেছিল বাপের ঘরে। অহন তোমার হাতে বাপ-ব্যাটায় দুইজনে যহন ধর‍্যা পড়ছে, তহন এক-একজনার দুইমাস মেয়াদের বদলে, দুইজনার একমাস কইর‍্যা মেয়াদ দাও— তাতে সব্বদিক রক্ষা হয়।

গরিবুল্লা — মইর‍্যা যামু দাদা। তুমি যদি কাজিই হইলা, তাইলে লায্য বিচার কর। মাঠে ধান, ঘরে কচিকাচা—

এই কথার মাঝে জমিলা একটা সানকিতে মুড়ি আর পাটালি গুড় এনে দেয় রামকেশবকে

রামকেশব আহাহা, এইবার দেহি তুই আমার জাইত মারবি মা। নাইড়াগো হাতে খানা খায়্যা এইবার দেহি সাতজন্ম নরকে পচতে হইব আমারে। ছিছিছি— [পাটালিতে কামড় দেয়] আহাহা, শালা এই মোছলমানের হাতে গুড়ের সোয়াদই আলাদা।

এক খাবলা মুড়ি খায়

জমিলা এই গুড় বাপের ঘর থিক্যা আনছি। আমাগো জমিনের গাছ।

কাদির শোন মিঞা, বেটির গরব কত। ক্যানরে বেটি, আমাগো গুড় বুঝি তিতা?

গরিবুল্লা হেসে ওঠে

জমিলা আমি কি তাই কইছি?

কাদির দাদারে আর একখান পাটালি আন্যা দে। আর ছাদিরের হাত দিয়া ভাবিরে পাঠ্যায়া দিস দুইখান।

জমিলা বাসন্তীদিদিরে দিমু না?

কাদির দিস দিস। যারে তর মন চায় দিস। মাইনসেরে মিঠাই খাওয়ানো ভালো— তাতে সম্পর্ক মিঠা হয়।

রামকেশব এক ঘটি জল আনিস মা।

জমিলা চলে যায়

গরিবুল্লা আমাগো ঘরে জল খাইলে জাত যাইব না তোমার? তোমাগো যে পানিতে বড় মানামানি দাদা?

রামকেশব শোনো মিঞা, আমরা হইলাম মালো, জলে জলেই আমাগো জীবন কাটে। আমরা জানি জলে জাত যায় না, জলে জীবন বাঁচে।

জমিলা জল নিয়ে আসে, রামকেশব পান করে। ইসারায় গবিবুল্লাকে ডাকে জমিলা

গরিবুল্লা	কী কথারে মা?
জমিলা	শোনই না।
কাদির	আরে, যাও না মিঞা, অন্তরের দলিজাতে গিয়া বস না। নিজের বাপরে পাইছে হাতের গোড়ায়, কত পরানের কথা আছে। অহন কি আর আমাগো কথা অর মনে পড়ব?
জমিলা	আহা এমুন করে? তোমারে য্যান পরানের কথা কই না?

সকলে হাসে। থালা-ঘটি নিয়ে জমিলা চলে যায়। পেছনে গরিবুল্লাও যায়

গরিবুল্লা	[যেতে যেতে] আমার কথাখান বিবেচনা কইরো কিন্তু বড় মিঞা— দাদা, তোমারে মুরুব্বি মানলাম, এই যাত্রা আমাগোরে বাঁচাও।

চলে যায়

রামকেশব	আহা, মানুষখান বড়ো ভালো।
কাদির	হ মাটির মানুষ। আর মায়াখানরেও পাইছি এ্যাকেলে বুক জুড়াইন্যা।
রামকেশব	বউ পাইয়া তোমার বুক জুড়াইছে কাদির, আর পোলার কথা ভাইব্যা ভাইব্যা আমাগোর বুকখালি হয়্যা যাইত্যাছে।
কাদির	দুঃখু কইর না বড়োভাই, আমরা চাষি, মাটি আমাগো বান্ধে। তোমরা মালো, জল তোমাগো ভাসায়। ভাবিরে কইয়ো, মালোর পোলা উজানে ভাস্যা, ভাটিতে ফির‍্যা আসে। দুক্ষু যেন্ না করে। — তা সময় কহন থির হইল?
রামকেশব	দয়ালচান্দ ত পাজি দেইখ্যা কইছে পরশুদিন পোত্যুষে যাত্রা শুভ।
কাদির	তাইলে তো ভালোই হইল। হাতে একদিন সময় আছে অহনও। তা তিলকচাঁদ নেবে কত?
রামকেশব	সব্বস্যই ত তিলকচাঁদের হাতে তুল্যা দিলাম কাদির—শরীলের অদ্দেক আর পরানের যোলোআনা।

একটা পুটুলি হাতে করে জমিলা আসে

জমিলা এই পাটালি কয়খান লয়্যা যান চাচা। বাপের নাম কর‍্যা চাচিরে দিয়েন

বামকেশবের হাতে পুটুলি দেয়

কাদির তর কোন বাপের নাম কর‍্যা দিব রে পাগলি, কয়্যা দে। নিজের না পরের?

জমিলা আহা, দুই বাপই ত আমার নিজের গ? আমার দুই বাপের নামেই দিয়েন গ চাচা।

রামকেশব হ— দায় ঠ্যাকছে আমার। কারুর নামই আমি কমু না। গিয়া শুধু কমু, খাওগো বুড়ি, গুড় খাও। তোমার শাউড়ি তার পোলারে দিয়া বউরে গুড় পাঠাইছে। আনন্দ কইর‍্যা খাও।

সকলে হাসে।

৭

নদীব ঘাট। পিছন থেকে জাল কাঁধে উঠে আসে মদন ও বনমালী

বনমালী আনন্দ নাই, আমাগো জীবনে আর কুন আনন্দ নাই— কী যে দিনকাল পড়ল মদনা, মাঝে-জালে কুনো সাক্ষাৎ নাই, নাও বাওনঐ সার।

মদন হ এমুন রাগ লাগে একেক সময়, ইচ্ছা করে নাওয়ের গলুইটায় কপাল কুট্যা কুট্যা রক্ত বাইর করি। শ্যাষে তিতাসের জলে হেই রক্ত ধোয়াইয়া দিয়া কই— তিতাসরে, রক্ত দিলাম তর বুকে, অহনও কি তর সন্তানরে মরণের হাত থিক্যা বাঁচাবি না মা?

বনমালী তিতাসে মাছ থাকলে ত মায় দিব। মায়ের বুকের দুই এক-এক সময় শুকায়্যা যায় দেখস নাই?

মদন হ দেখছি ত।

বনমালী ক্যান যায় ক দেহি?

মদন ক্যান যায়?

বনমালী তখন যে পোলায় সমত্থ হয়। নিজের পায়ে খাড়াইতে শেখে। দাঁত উঠে, শরীলে শক্তি হয়। তখন মায় কয়, যাও বাপধন, যতক্ষণ অবল-অশক্ত আছিলা, ততদিন আমার বুকের দুধে তোমারে মানুষ করছি, অহন তোমারে শক্তি দিছি— অহনে আমার মুক্তি। আর তহনই

মায়ের বুকে দুধ শুকায়্যা যায় ধীরে ধীরে।

মদন — তাইলে ত দেহি কিশোরই বুদ্দিমানের কাম করছে।

বনমালী — করছেই ত। তিতাসে মাছ থাকলে ত মায় দিব। বড় গাঙে না গ্যালে বাঁচনের আর উপায় নাই মালোগো।

মদন — বড় গাঙে যাওন কি সহজ কথা রে, বনমালী? কতখানি খরচ, অত পয়সা পামু কই আমরা?

বনমালী — যাউক গিয়া। আমাগো বরাতে নাই ঘি, ঠকঠকাইলে হইব কী? অর যদি বরাত ফিরে, তাইলে অন্তত বুঝুম অনে, গরিবেরও ভগবান আছে।

মদন — বুঝলি বনমালী, আমারে যদি কইত কিশোর, আমিও ভাইস্যা যাইতাম অর লগে। এ্যাত ইচ্ছা করে, একবার বড় গাঙে গিয়া মাছ ধরি—

বনমালী — ইচ্ছা কি আমারও করেনা রে মদনা? আহাহা, ম্যাঘের লাহান কালা জলের তলায় রুপালি মাছ নাচে—তারে শক্ত হাতে তুইল্যা আনতে পারলে তয় না মালোর পরান বাঁচে।

মদন — আহা ঝড়েব সাথে লড়াই কইর‍্যা, ঢেউয়ের সাথে লড়াই কইর‍্যা, নাও বাইয়্যা যামু কালা ম্যাঘনায়। হেই লড়াইয়ে জিতলে বাঁচা, হারলে মরা। এই জীবনের কি তুল্য হয়রে বনমালী?

কোদাল কাঁধে সোনাউল্লা গান গাইতে গাইতে আসে

সোনাউল্লা — [গান] ও আমার চান্দের কনা, পাগল কইর‍্যা কই গেলি গা আমারে—

বনমালী — কী গো চাচা, এত ফূর্তি কিসের? ভর দুপুরে গলা চ্যাতাইয়া রসের গান ধরলা?

সোনাউল্লা — ট্যার পাও নাই? রদ্দুরের তাতে যে সকল রস গইল্যা যাইতাছে।

বনমালী — ট্যার পামু ক্যামনে? আমাগো যত রস সব তো তিতাসে।

মদন — হ্যার জল শুকাইলে আমাগো রসও শুকাইয়া যায়। তোমরা মাঠের মানুষ ত, তোমাগো কথা আলাদা।

সোনাউল্লা — প্যাটের টান বোধকরি আলাদা হয় না, কী কও?

বনমালী — তাই আবার হয় নাকি? আইলা কই থিকা?

সোনাউল্লা — তাইলে একখান গোপন কিচ্ছা শুনো— আমার একখান বাছুর আছিল— বকনা বাছুর।

বনমালী — দেখছি ত। তোমার মায়্যা লয়্যা লয়্যা ঘুরতো—

সোনাউল্লা — হ। প্যাটের টানে হেইটারে বন্দক রাইখ্যা, রামনাথের থিকা দশখান ট্যাকা কজ্জ লইছিলাম তিনদিন আগে।

মদন — তারপর?

সোনাউল্লা — বাড়ি ফির‍্যা দেখি কাইন্দা কাইন্দা মাইয়াটার জ্বর আইছে। দুই দিন জ্ঞান ফিরে নাই।

বনমালী — সে কী? অহন ক্যামুন আছে?

সোনাউল্লা — অহনে আছে ভালোই। জ্বর সাইরা গ্যাছে। এইতো ঘুম পাড়াইয়া রাইখ্যা আসলাম হিজুল গাছের নিচে। কবরের নিচে মাইয়্যা আমার কত নিচ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতাছে।

মদন — চাচা—

সোনাউল্লা — আর কান্দব না। কুনদিন আর কান্দব না—

[গান]

আন্ধার কইরা কই গেলি লো
পাগল কইরা কই গেলি গো
· ও আমার চাঁন্দের কণা—

সোনাউল্লা চলে যায়

মদন — চাচা, যাইও না, কথা শোনো—

বনমালী — কথা শোন চাচা যাইও না—আহাহা-হা, মানুষটা বোধকরি এইবার পাগল হয়্যা যাইব রে মদনা।

মদন — হ, তাইতো দেখি। তিতাস মায় যে আমাগোরে এমন কইর‍্যা কান্দাইব আগে তো বুঝি নাইরে বনমালী?

অন্ধকার।

৮

রামকেশবের বাড়ি। কথা বলতে বলতে আসে রামকেশব ও কাদির মিঞা

কাদির — না, না আর কুনো চিন্তা কইর না বড়ভাই, কিশোর সুবলার নামে গাজিপিরের দরগায় আইজ সিন্নি চড়াইছি, চিরাগ জ্বালছি। আর কুন ভাবনা নাই। দেখবা আল্লারসুল এইবার তোমার পোলাগো বৈঠায় আইস্যা ভর করব। ঝড়-তুফানের সাইধ্য আছে নাকি অগ নাওয়ের ধারে কাছে আহে?

রামকেশব — তোমারে যে আমি কী কমু কাদির ভাই— কত পুণ্য করলে যে মানুষ তোমার মতন ভাই পায়!

রামনাথ আসে

রামনাথ — খুড়া, কিশোর নাকি শুনি বড়ো গাঙে যায়?

রামকেশব — হ, যাইব কইর‍্যা ত মন করছে।

কাদির — ছাদিরেরও বড়ো সাধ আছিল অগ লগে যায়।

রামনাথ — তা গ্যাল না ক্যান?

রামকেশব — না না, আমিই মানা করছি। চাষার পোলা, মাটি চিনে, জল ত চিনে না।

রামনাথ — ভালোই হইছে। ওই মোচার খোলা লয়্যা ম্যাঘনা পাড়ি দেওন কি সহজ কথা? গোনে-বেগোনে একখান অঘটন ঘটতে কতক্ষণ?

কাদির — কু-ডাক ডাইকো না ত রামনাথ। কু-কথা মাইনসের বড়ো দুশমন।

রামনাথ — সহজ কথা সহজভাবে নিলে কিন্তু কু-কথা মনে হয় না চাচা, মনে প্যাচ থাকলেই হয়।

রামকেশব — কিন্তু কাদিরভাই, তুমি যে কিশোরের পথ-খোরাকি অত চাউল দিলা, হেই দ্যানা আমি শোধ করুম ক্যামনে?

কাদির — দ্যানা কইও না বড়োভাই। খোদাতালার মেহেরবাণীতে অহনও দু-মুঠা ধান ফলে আমার জমিনে। ওই চাউল আমার পোলাগো আমি খাইতে দিছি। তাতে যদি তোমার আপত্য হয়, কিশোর ট্যাকা কামাইয়া ফিরুক, অর শাদির কালে আমি না হয় আধমন চাউলের ভাত খাইয়া যামু অনে—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বৃদ্ধ তিলকচাঁদ আসে

তিলকচাঁদ — না-না, প্যাট ছাইড়্যা মরবা নাকি? ভাতের লগে মাছ ক্ষীর খাইতে

হইব না? না না, অত ভাত খাওন যাইব না। কই রামকেশবদাদা কই?

রামকেশব — আয়রে তিলক, আয়।

তিলকচাঁদ — ব্যালা থাকতে থাকতেই আইস্যা পড়লাম। সন্ধ্যা হইলে খানাখন্দগুলান ব্যাবাক পথের উপর উঠ্যা আসে। চলা ফিরায় এমুন মশকিল তখন—

রামকেশব — ভালোই করছ। আপৎকালে অহন তুমিই আমার ভরসা তিলক।

রামনাথ — তিলক খুড়ায় যে চক্ষে সব ফরসা দ্যাখে— এই ভরসায় তুমি পোলারে পাঠাইতাছ ম্যাঘনা গাঙে? ধইন্য সাহস।

তিলকচাঁদ — তুই ক্যাডা রে? বুধাই মোড়লের পোলা না? চক্ষে ভালো ঠাওর হয় না অহন।

রামনাথ — হ, আমারে ঠাওর করলে যে মশকিল আছে। কৰ্জ্জ নিলা—সুদ দিলা না, শোধ দিলা না, অহন কি আমারে চিনন উচিত? মায়ের অসুখের খবর পাও নাই?

তিলক — হ-হ, খবর পাইছিলাম, তর মায়ের অসুখ—ওলাওঠা হইছে। খবর পামু না?

রামনাথ — তা একবার দ্যাখতে গ্যালা না ক্যান? মায়ের কাছ থিকা ফুলুক ফালুক কত ট্যাহা নিছ, ভুইল্যা গেলা নাকি?

তিলক — যামু কী? খবর শুন্যা আমার তো হাত পাও কালায়্যা যায়— আহা, মা জননী চল্যা গ্যালে আমরা যে অনাথ হয়্যা যামু গিয়া। আশায় আশায় কয়দিন রইলাম যদি গঙ্গাপাপ্তির খবরখান আহে— তা শ্যাষ পর্যন্ত খবর যহন আইল না তহনে আনজাত করলাম, জননী আমাগো ট্যাসে নাই। আহা কি শান্তি তরে কী কমু রামনাথ— আমাগো হাতচিটাগুলান তাইলে আর তামাদি হইল না।

রামনাথ — এতদিনে তাইলে বুঝলা যে শকুনের শাপে গরু মরে না? যাউক হেই কথা, এই বয়সে ম্যাঘনায় যাইতাছ, ফিরতে পারবা ত?

তিলক — যাওন-আওন ত অনেককাল হয়্যা গ্যাল বাপধন, অহনে আর মালুম পাই না যাইত্যাছি না আইত্যাছি।

রামনাথ — বুঝছি বুঝছি, এক্কেলে শালগ্রাম শিলা, শোয়ন-বসনের আর উলটা সিধা নাই।

কাদির — আমি তাইলে অহনে চলি। কাইল যাত্রাকালে আমুনে আবার। খোদা হাফিজ।

চলে যায়

রামকেশব — তিলক, কাইল কিন্তু কাকভোরে রওনা দিতে লাগব। হবিগঞ্জ পার হয়্যা, উজানি খলায় শুকদেবপুর। হেইখানে বাঁশিরাম মোড়লের আচ্ছয়ে থাকবা। তারে আমার কথা বলবা। কিশোর সুবলরে কইবা বাপের লাহান মাইন্য করতে।

তিলক — ঠিক আছে, ঠিক আছে। মঙ্গলে উষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।

রামকেশব — চলো, ঘরে চলো, জল তামুক খাও।

তিলক — হ, ক্ষুদা পাইলে তামুক টানা ভালো। জল না, জলে বড়ো বাইরে যাইতে হয়।

উভয়ের প্রস্থান। নেপথ্যে সুবল ও কিশোরের গান শোনা যায়। গাইতে গাইতে তারা আসে

কিশোর — হবিগঞ্জ নবীগঞ্জ কোনাকুনি পথ
প্রাণবন্ধু গড়াইয়্যা দিছে ইলসাপাটা নথ—
সে নথ পইড়্যা গেল রে!

সুবল — হবিগঞ্জের ডালমুসুরি নবীগঞ্জের ত্যাল
সমবার চড়াইতে বধূর শাড়ি পুইড়া গ্যাল্
শুনছনি মালোর পুত গো—

রামনাথ আসে

রামনাথ — তগ দেখি ফুর্তির বান ডাকছে?

কিশোর — ডাকলে ক্ষেতি কি? কারুর ত উঠান ভাসাই নাই? [সুবলকে] দেখ্ দেহি সুবলা, বাপরে কইছিলাম রামদাওখান ধার দিয়া রাখতে—দিছে নাকি?

সুবল — কহন দিয়া দিছে, আর একখান সড়কি। ঘরে আইন্যা রাখছি, রাইতে লয়্যা যামুনে নাওয়ে।

রামনাথ — রামদাও সড়কি দিয়া কি করবি রে সুবলা? নদীতে মাছ মারবি, না ডাকাইতি করবি?

সুবল — এইসব কি আর এক পুরুষে হয় রামনাথদাদা। কিশোর ফিরা আইস্যা যদি টিনের চালা তুলে, তাইলে ভাবতে পার ডাকাইতি করছে।

রামনাথ — কী, আমাগোরে তুই ডাকাইত কইলি?

সুবল — পড়ল কথা সবার মাঝে, যার কথা হ্যার গায়ে বাজে। তুমি চট ক্যান?

রামনাথ — চটুম না? আমাগো টিনের চালা দেইখ্যা তগ বুকে জ্বালা ধরে আমি বুঝি না?

কিশোর — এই সুবল, থাম। যাত্রাকালে কলহ করতে নাই। তোমার কী খবর গ রামনাথদাদা? কিছু কইবা?

রামনাথ — একখান পরস্তাব আনছি। শোনার মন থাকলে কই।

কিশোর — কও।

রামনাথ — দিন দশেকের মধ্যেই আমি যাইত্যাছি ম্যাঘনায়। অহন তুই, আমি, সুবল, বনমালী, মদনা, এইরকম আটজনায় মিল্যা যদি যাই, তাহলে, কত ভালো হয়? বড় নৌকা, ভয়ের কুনো কারণ নাই, প্রাণভইর‍্যা মাছ ধরুম, মুঠাভইর‍্যা ট্যাকা আনুম। যাবি?

কিশোর — এত দেরি কইরা কইলা দাদা, অহন আর হয় কেমনে? সব যে গোছগাছ কর‍্যা ফেলাইছি।

রামনাথ — গোছগাছ করছ, খুলতে লাগে কতক্ষণ? তাছাড়া তর ওই এক চিলতা নৌকায় মাছ ধইর‍্যা কি পরতায় পোষাইব? আর তর ওই মশারির লাকান জাল লইয়্যা তুই ম্যাঘনায় মাছ ধরবিই বা ক্যামনে? মাছের নাগালই পাবি না— শুধা মুধা যাওন-আওন সার হইব তগ।

সুবল — হেই ভাবনাখান ত আমাগোই দাদা, তুমি ভাব্যা মর ক্যান?

রামনাথ — তগ ভালোর লাগ্যাই ভাবি, নইলে আমার কী? এইহান আমার বাপের শিক্ষা— স্বার্থপর হইস না রামনাথ— শুধা নিজের কথা ভাবলেই হয় না, স্বজনের কথাও ভাবতে হয়। তুইও ভাইব্যা দ্যাখ কিশোর, আমার নাওয়ে চল। সবাই মিল্যামিশ্যা যামুনে। রোজ খোরাকি এক টাকা কর‍্যাই দিমু।

কিশোর — না দাদা, নিজের জাল নাও থাকতে আর পরের নাওয়ে কাম করতে যামু না।

রামনাথ — তাহলে ভাগে চল? আমি আট আনা, তোরা আট আনা। আধাআধি।

সুবল — বারে দাদা, তুমি লইবা আটআনা, আর আমরা সাতজনে আটআনা। তুমি ত বিড়ালের পিঠা ভাগরেও ছাড়াইয়া গ্যালা।

রামনাথ	তাইলে কি যাবি না?
কিশোর	না।
রামনাথ	আবার ভাইব্যা দ্যাখ ভালো কইর‍্যা। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস না।
কিশোর	অহন আর সম্ভব না দাদা—
রামনাথ	বুঝলাম। তর বড়োলোক হওনের সাধ জাগছে। রোজগারে কিনা রামনাথ মালোর লগে পাল্লা দিব কিশোর মালো? দ্যাখ চেষ্টা কইর‍্যা। চলি। [প্রস্থানোদ্যত] তয় একখান কথা মনে রাখিস কিশোর, ট্যাকার ঘরেই ট্যাকা আহে— ভিকারির ঘরে লক্ষ্মী আহে না।
কিশোর	তাইলে তুমিও শুইন্যা যাও রামনাথদাদা— কিশোর মালো ভিখারি না। পরান বাজি রাইখ্যা সে মেহনত করতে জানে। লক্ষ্মী আমার মা। চায়্যা দ্যাখ, হেই মায়ের চরণ লাগ্যা আমার সাধের নাও কেমুন চান্দ সদাগরের সপ্তডিঙা ময়ূরপঙ্খী হয়্যা যাইতাছে।

অন্ধকার।

৯

তিতাসের ঘাট। ঢাক কাঁসি ও হুলুধ্বনির শব্দ। এক কলস জল নিয়ে কিশোরের মা এগিয়ে চলে। তার পিছনে তেল সিঁদুর ধান দূর্বা নিয়ে আসে বাসন্তী। এদের পিছনে গান গাইতে গাইতে চলে তিলক, কিশোর, সুবল, রামকেশব, কাদির, দয়াল, রামনাথের মা, সোনাউল্লা, বনমালী ও গ্রামবাসী

শিবপুত্র চাঁদবাইন্যা বাণিজ্যে চলিলা
সপ্তডিঙ্গা ভাসাইয়া রে,
পাল তুলিয়া বাণিজ্যে চলিলা
ডিঙ্গা বাওনা রে।
প্রথমেতে চলে ডিঙ্গা নামে মধুকর...
ডিঙ্গা বাওনা রে।
তার পাছেতে চলে ডিঙ্গা সুবন্ন ভোমর...
ডিঙ্গা বাওনা রে।
তৃতীয় ডিঙ্গাটি চলে নামেতে মঙ্গলা...
ডিঙ্গা বাওনা রে
পঞ্চম ডিঙ্গাটি চলে কালিদহ নামে...

ডিঙ্গা বাওনা রে

ষষ্ঠ ডিঙ্গা রূপবতী চলে তারি বামে...

ডিঙ্গা বাওনা রে

সপ্তডিঙ্গা ময়ূরপঙ্খী আগে আগে যায়...

ডিঙ্গা বাওনা রে

চলে নাও দূর দেশে বাণিজ্য আশায়...

ডিঙ্গা বাওনা রে

সমমেত কণ্ঠে — আরে চল চল সক্কলা।

কাদির — গোকন গাঁয়ের রামকেশব মালোর বেটা কিশোর মুল্লবম্মন বড় গাঙে যায় হে...

ছাদির — আলি...আলি...আলি...আলি...

সকলে — বদর বদর
ভাসিল ভাসিল চান্দ সদাগরের নাও
ডিঙ্গা বাওনা রে—
সপ্তসাগর ছেঁইচা আনে মানিক রতন
ডিঙ্গা বাওনা রে।

রামকেশব — সদা সাবধানে থাকবি বাপ। কারো লগে কাজিয়া করবি না। মাথা ঠান্ডা রাইখ্যা কাম করবি। হক্কলের লগে হাইস্যা কথা কবি।

কাদির — যেখানেই যাও, মাইনসেরে মান দিবা। বুড়াগো বাবা-চাচা কইবা। বয়স্ক মাইয়্যা লোকরে মা-খুড়ি কইবা। আর হক্কলে তোমাগো ভাই-বইন, দাদা-দিদি।

তিলক — যদি মনে ধইর‍্যা যায় এক—আধজনারে বউ কওন যাইব না?

কাদির — আহা-হা, বিদেশবিভুঁইয়ে ওই সব একটু সামলাইয়া-সুমলাইয়া চলন লাগে তিলক।

রামনাথের মা — বিদেশবিভুঁইয়ে শুনছি উটকা বউ দুই-একখান জুইট্যা যায়। তিলক এইবার একখান বউ লইয়্যা আসিস।

তিলক — আহা-হা, মোড়লগিন্নির বুঝ আছে। উটকা সোয়ামি পাইলে আনুম নাকি একখান?

রামনাথের মা — পিছা মারি তর সোয়ামির কপালে। আমি কারুর ভরসায় থাকি নাকি রে নিব্বুইংশার ব্যাটা?

দয়ালচাঁদ — দেরি না, দেরি না, সময় বইয়্যা যায়। মঙ্গলে ঊষা, সূয্যি উঠ্যা গ্যালে চলব না।

ভুল উচ্চারণে দয়াল সূর্য-প্রণাম মন্ত্র চিৎকার করো বলতে থাকে। সবাই হাত জোড় করে শোনে

রামনাথের মা — দয়াল ঠাকুরের কিরিয়া-কম্মে রীতকরণ ভালো।

কাদির — একখান কথা কই বাপজান—বিদেশবিভুঁইয়ে য্যান ধার-কজ্জ কইরো না।

রামনাথের মা — হ, দরকার থাকলে ক, আমিও নাহয় কিছু ট্যাকা দিয়া দি। চল্লিশ ট্যাকায় পঞ্চাশ ফিরত দিস। তগ কাছে বেশি নিমু না।

বাসন্তী ও কিশোরের মা উলু দিতে দিতে উঠে আসে। কিশোর এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে। ধান-দুর্বা মাথায় দেওয়া হয়। সুবলও প্রণাম করে

সুবল — তিলককাকা একটু সিন্দুর পর‍্যা যাও।

তিলক — তয় সিন্দুরের থালিখান দে, কাউরে পরাইয়া দিয়া ভাইস্যা যাই।

দৌড়ে প্রবেশ করো জমিলা। হাতে একটা পুঁটলি

জমিলা — ওঃ, এমন ছুটতে ছুটতে আসত্যাছি, ভাবলাম বুঝি নাও ছাইড়্যা দিলা তোমরা! এই ন্যাও ধর।

কিশোর — [পুঁটলি নেয়] কী করে জমিলা?

জমিলা — কিছু না। খানকয় চিড়ার মোয়া আর একটু তিলতক্তি। কতদূর পথে যাইবা—পথে লাগব ত।

কাদির — রাইত জ্যাইগ্যা জমিলা বানাইছে তোমাগো লাইগ্যা।

রামকেশব — আহা বড়ো লক্ষ্মীমন্ত বউ।

কিশোর — আমার কী ভাইগ্য রে জমিলা, যাবার কালে তগ মতন কত ভালোবাসার জন ফেলাইয়া যাইতাছি।

ছাদির — বিদেশ থিকা যখন ফিরবি, হেইখানেও এইরকম ভালোবাসার মানুষ রাইখ্যা আসবি।

কাদির — এই মন সোনার হইলে যত মানুষ তত মহব্বৎ।

দয়ালচাঁদ — নাওয়ে উঠ, নাওয়ে উঠ, দিনমণি বুধে পা দিত্যাছেন।

রামকেশব — হ-হ, ও তিলক, তুমি আগে নাওয়ে উঠ, তুমি হইলা জ্যেষ্ঠ, হাল ধর।

তিলক — হ— মাঠের হাল কাদিরের হাতে, নাওয়ের হাল আমার হাতে— দুইদিকেই বেহাল অবস্থা।

নৌকায় যায়

রামকেশব — কিশোররে— চৈতের টান লাগলে ফিরা আসিস বাপ, দুইটা বুড়াবুড়ি একা রইলাম। সুবল, তুই ওঠ।

সুবল — খুড়িমা, আমার পিসিরে একটু দেইখ।

রামনাথের মা — আরে, আমি থাকতে আর কাউরে লাগব না। মোড়লের বউ আমি, সব্বাইরে আমিই দেখুম। তুই ভাবনা করিস না।

কিশোর — বাপ, আমি ফিরা আস্যা ভাঙা ঘর নতুন কইরা ছামু। মা, তোর পাকের ঘরে আমি নতুন পিড়া বাইন্ধ্যা দিমু। এই কয়টা দিন একটু কষ্ট কইর‍্যা থাক। কাদিরচাচা, তুমি এ্যাগোরে দেইখো।

কাদির — ওরে, তর বাপও রামকেশব না, আমিও কাদির শেখ না। আমরা দুইজনা মিল্যা রাম-কাদির। দুইভাই। তুই নিশ্চিন্তে যা বাপজান।

কিশোর — মাগো কান্দিস না—

কিশোরের মা — [ছেলেকে জড়িয়ে] কিশোররে, তুই আমার একমাত্তর নাড়ি ছ্যাঁচা ধন। তরে যে আমি কুনোদিন কোল ছাড়া করি নাই বাপ।

কিশোর — মাগো, মালোর পোলার ত নদীও মা, আমি ত তার কোলেই রইলাম জননী।

রামনাথের মা — আহা-হা, শুনতেও ভালো। মায়ের কোলে বাঁচা-মরা, এর যে কী সুখ!

বাসন্তী — আইজকার দিনে মরার কথাহান মুখে না আনলেই হইত না জেঠি?

রামনাথের প্রবেশ

রামনাথ — রওনা দিত্যাছিস? ভালো। আমিও যাইতাছি কয়দিন পর, হয়তো গাঙেই দ্যাখা হয়্যা যাইব।

কিশোর — ভালোই ত।

রামনাথ — অনেক ট্যাকা কামাইয়া ফিরবি যখন, তখন আমাগোরে চিনতে পারবি ত?

দয়ালচাঁদ — উঠ, উঠ, এইবার নাও ছাড়তে হইব।

রামকেশব উঠ বাবা, দুগ্গা-দুগ্গা-দুগ্গা—

কিশোর নৌকায় ওঠে

কিশোর মাগো, আমি গ্যালাম। বাপ, দুঃখের দিনগুলান তিতাসে ভাস্যাইয়া দিয়া আমার পথ চাইয়্যা থাক, আমি সুখের নৌকা ভইর‍্যা আনুম। ইক্কলের কাছ থিকা বিদায় নিলাম— বাসন্তী, জমিলা, আইলাম রে—

ছাদির আলি— আলি— আলি— বদর বদর—

কাদির [সুর করে] গাজিপিরের দোয়ায় অগ নাও ভাসিয়া যায়।
আল্লারসুল খাড়াও অগ নাওয়েরই বৈঠায়।

নৌকা থেকে ধ্বনি ওঠে 'বদর বদর'

কিশোরের মা [চিৎকার করে] কিশোর রে—

রামকেশব পিছনে তাকাইও না।

দয়ালচাঁদ ঠিকঐ আছে, ঠিকঐ আছে। আগে হইতে পিছে ভালো যদি ডাকে মায়। চল, সব ঘরে চল। বাপ-মা কিন্তু পিছনে চাইয়ো না।

জনতা মঞ্চের কিনারে চলে যায়। আলোর জ্বলা-নেভায় নৌকা দূরে সরে যায়। হালে তিলক দাঁড়ে সুবল মাইমে নৌকা বায়। কিশোর হাত তুলে দাঁড়িয়ে। নৌকা অদৃশ্য। বাসন্তী কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে গেয়ে ওঠে—

বাসন্তী তিতাসে ভাসিল ডিঙ্গা কিশোর চান্দের
  ডিঙ্গা বাওনা রে...
মা মনসা জলে-স্থলে রক্ষা কর তারে,
  ডিঙ্গা বাওনা রে।

গান গাইতে গাইতে সবাই চলে যায়। একপ্রান্তে রামনাথ দাঁড়িয়ে থাকে। বাসন্তীর চোখ জলে ভরে যায়

রামনাথ তর বড়ো কষ্ট, না লো বাসন্তী? তুই কইলে তর ওই চক্ষের জল আমি সোনার বাটিতে ধর‍্যা রাখতে পারি।

বাসন্তী — মায়্যা মাইনসের চক্ষের জল বড়ো পাজি গো রামনাথদাদা। কহন যে আগুন হয়্যা জ্বল্যা ওঠে তার ত ঠিক নাই।

চলে যায়

রামনাথ — আহা-হা, সামনে শীত আসতাছে... ওই আগুনের তাতে শরীল আমার গরম হইব রে বাসন্তী। তহন আগুনে বড় সুখ।

অন্ধকার

১০

শুকদেবপুরের ঘাট। কিশোর ও সুবল আসে

সুবল — কোন বা দ্যাশে আইলাম রে কিশোর, কিছুই ত বুঝবার পারি না! তিন দিন ধর্য্যা শুধু বাইয়াই চলছি। পথ য্যান আর ফুরায় না।

কিশোর — উজানীনগরের খলা ত ছাড়াইছি, শুকদেবপুরের কাছাকাছি আইস্যা পড়ছি মনে লয়।

সুবল — মানুষজন কই? কাউরে ত দেখি না নদীর চরায়! কারে যে জিগাই?

কিশোর — এই হইল ম্যাঘনা। কী গাঙরে সুবলা— এপারে খাড়া হইলে ওই পাড়খান মুইছ্যা যায়। এই গাঙের দিকে চ্যাইয়া থাকলে মনখান ক্যামন উদাস-উদাস লাগে, নারে সুবলা?

সুবল — হ, দূরের মাইনসের লাইগ্যা মন পোড়ায়।

কিশোর — সত্য ক', বাসন্তীর লাইগ্যা তর মন পোড়ায়, না?

সুবল — ক্যান? বাসন্তীর লাগে আমার কী আছে?

কিশোর — কী আবার থাকব? টান আছে।

সুবল — ইস! তর উপর বাসন্তীর টান তুই বুঝিস না?

কিশোর — তর যে বাসন্তীর উপর টান, আমি বুঝি না? এই খ্যাপের ট্যাকা লইয়া দ্যাশে গ্যালে বাসন্তীরে আমার তর লাগেই সাতপাক ঘুরায়্যা দিমু।

সুবল — আহা রে! বাসন্তী যে অর হাঁড়িতে চাউল দিয়া রাখছে, তা য্যান হ্যায় জানেই না!

কিশোর — নারে সুবলা, আমার মনে লয় কথাহান ঠিক না। যারে ল্যাংটা থিকা দেখছি— ছোটোকালে যারে কোলে পিঠে লইছি, হাসাইছি, কান্দাইছি, ডর দেখাইছি, চুয়ারীর নাও বান্যায়্যা দিছি, তারে কি বিয়া করন যায়?

সুবল — তাহলে?

কিশোর — বিয়া করন যায় তারে, যার লগে কুনকালে দ্যাখাসাক্ষাৎ হয় নাই। দ্যাখাসাক্ষাৎ খালি মুখাচণ্ডীর সময়— গীত-জোকারের লগে পিড়ির উপর শাড়ির ঘোমটা তুল্যা যহন চোখ মেল্যা চায়— সে হয় সইত্যের ইস্তিরি। আর হক্কলে ত বইন রে সুবলা। তাগ কি বিয়াকরন যায়?

বাঁশিরাম, স্বরূপচাঁদ ও তিলকচাঁদ আসে

বাঁশিরাম — না যায় যাইব না। কাউরে আমি ত্যাল দিমু না স্বরূপচাঁদ। তুমি মাছ লইয়্যা চইল্যা যাও নবীগঞ্জের বাজারে। আমার নাম কইর‍্যা ভূষণচাঁদের আড়তে মাল ওজন কইর‍্যা দিয়া পয়সা নিয়া চইল্যা আসবা। রাইতে অর ত্যাল আমি বাইর করুম। হালায় ভাবে কী? কাক ছড়াইলে কি ভাতের অভাব? না কি কয়—

তিলক — আইজ্ঞা, ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব।

বাঁশিরাম — [স্বরূপকে] তুমি কইলা? [হঠাৎ তিলককে দেখে] আরে এইটা ক্যাডা?

তিলক — আইজ্ঞা আমি তিলকচাঁদ। পরদেশি।

বাঁশিরাম — কিন্তু কথা ত কও বেশি বেশি। আমাগো আলোচনার মইধ্যে নাক ঢুকাইল্যা কোন আক্কলে, শুনি?

তিলকচাঁদ — আইজ্ঞা নিরুপায় হইয়্যা। অনেকক্ষণ ধইর‍্যা আপনার পিছে পিছে আসত্যাছি একহান কথা জিগানের লাইগ্যা— কিন্তু আপনে এমুন ব্যস্ত যে—

বাঁশিরাম — বুঝলাম। অহনে জিগাও কী জিগাইবা। তুমি খাড়াইয়া আছ ক্যান? খাও—

স্বরূপচাঁদের প্রস্থান

তিলকচাঁদ — এইহান কি শুকদেবপুর?

বাঁশিরাম — ক্যান, কোন গেরাম চাই তোমাগো?

সুবল — আইজ্ঞা ওই শুকদেবপুরই চাই।

বাঁশিরাম [তিলককে] তুমি কইলা? তয়? [চমকে] আরে এইটা আবার ক্যাডা? ওরে বাবা, এ দেহি একজোড়া।

সুবল আইজ্ঞা আমরা—

বাঁশিরাম দামড়া। বুড়া মাইনসের কথার মইধ্যে কথা কস ক্যানরে? উদবক্কা!

তিলকচাঁদ আইজ্ঞা, পোলাপান মানুষ ভুল করছে। কিছু মনে কইরেন না।

বাঁশিরাম ঠিক আছে। এইটাই শুকদেবপুর। আসা হইতেছে কই থিকা?

কিশোর আইজ্ঞা, হেই চাইর দিনের পথ।

বাঁশিরাম উদুখল! জিগাই, আসা হইতেছে কই থিকা— না কয়, চাইর দিনের পথ? যাইবা কই?

সুবল শুকদেবপুর।

বাঁশিরাম আরে, এ ছাগলগুলানরে নিয়া করি কী ক দেহি? কইলাম না এইটাই শুকদেবপুর? কার বাড়ি যাইবা?

তিলকচাঁদ আইজ্ঞা বাঁশিরাম মোড়লের বাড়ি।

বাঁশিরাম কার বাড়ি?

তিলকচাঁদ বাঁশিরাম মোড়লের বাড়ি।

বাঁশিরাম বাঁশিরাম? বাড়ি চিন?

কিশোর আইজ্ঞা না। কুনোদিন আসি নাই ত?

তিলকচাঁদ পথখান যদি কয়্যা দ্যান—

বাঁশিরাম মোড়লরে চিন?

সুবল আইজ্ঞা না। কুনোদিন দেখি নাই ত?

বাঁশিরাম গাঁও চিন না, ঘর চিন না— অথচ তার কাছে যাইবা? জুয়ান চ্যাহারা, মতলবখান কী কও দেখি?

কিশোর আইজ্ঞা শুনছি তিনি মহদ্ লোক।

সুবল হিদয় আছে।

বাঁশিরাম তোমার মাথা আছে। পাঁঠারা কই থিকা আইতাছ কইতে পার না?

কিশোর আইজ্ঞা গোকনঘাট। তিতাস।

বাঁশিরাম নাম কি? পরিচয়?

কিশোর আইজ্ঞা কিশোর মুল্লবম্মন।

বাঁশিরাম তারপর?

কিশোর আইজ্ঞা?

বাঁশিরাম পিতার নাম কও।

কিশোর রামকেশব মুল্লবম্মন

বাঁশিরাম — রামকেশব? গোকনঘাট? খাড়ও খাড়ও— হ-হ, মনে পড়ছে, উজানীনগরের খলায় দ্যাহা হইছিল। কালা কুচকুইচ্যা দাড়ি—

সুবল — আইজ্ঞা না সাদা।

বাঁশিরাম — চোপ্, আমি দেখছি কুচকুইচ্যা কালা।

কিশোর — আইজ্ঞা চুলও সাদা।

বাঁশিরাম — হনুমান, তুই আমার চাইয়্যা বেশি জানস?

তিলকচাঁদ — আইজ্ঞা পাইক্যা গ্যাছে।

সুবল — দাড়িও কামাইছে।

বাঁশিরাম — পাইক্যা গ্যাছে? [চিন্তিত] হ, তা অনেকদিন ত হইল। আহা বড় ভালো মানুষ আছিল। আমারে ভাই ডাকছিল। আছেন তো?

তিলকচাঁদ — আছেন— তয় যাওনের পথে।

বাঁশিরাম — কয় ভাই-বইন তরা?

কিশোর — আমি একা।

বাঁশিরাম — বিয়া করছ কই?

সুবল — করে নাই। গিয়া করব।

বাঁশিরাম — তুই থাম।

তিলকচাঁদ — মোড়লের বাড়িটা কোনদিকে কইলে হইত না? অহন দেখি গল্প করতে করতে পোলাটারও না বাপের লাকান চুল পাইক্যা যায়!

বাঁশিরাম — তা মোড়লের কাছে কী দরকার?

কিশোর — আজ্ঞা, বাপ কয়্যা দিছে বিদেশবিভুঁই, মোড়লরে পিত্তিতুল্য জানবা। অজানা জলে মাছ ধরবা, তারে মুরুব্বি মাইন্যা তার আচ্ছয়ে থাকবা।

বাঁশিরাম — তা থাকো। ডাইনে-বাঁয়ে এই তিনকোশ এ্যালাকায় মাছ ধরো, কেউ কিছু কইব না অনুমতি করলাম।

কিশোর — আইজ্ঞা আপনে!

কিশোর ও সুবল প্রণাম করে

বাঁশিরাম — থাউক-থাউক।

তিলক — আইজ্ঞা পেন্নাম হই কত্তা।

বাঁশিরাম — তুমিও থাউক। আচ্ছয়ে যখন আস্যা পড়ছ— অহন ঘরে চল।

সুবল — আইজ্ঞা, আমাগো নৌকাতেই পাকশাকের বন্দোবস্ত—

বাঁশিরাম — [ক্ষেপে যায়] পাকশাকের বন্দোবস্ত? হেই আমার বৈঠাহান দে দেহি।

হারামজাদারে পিটাইয়া গাঙে ফ্যালাইয়া দি। আমি বাঁশিরাম মোড়ল, আমার আচ্ছয়ে আইস্যা বাবুরা নৌকায় পাক কর‍্যা খাইব? আস্পর্ধা কত! জানিস আমার তিনজনের সংসারে কয়খান পাত পড়ে? চইল্যা যা আমার ঘাট ছাইড়্যা, চইল্যা যা।

কিশোর	ও বুঝতে পারে নাই, মাপ কর‍্যা দ্যান। আমরা ত যামুই। বাবায় কইয়্যা দিছে না?
বাঁশিরাম	হ, হেই কথা মনে রাখবি। চল চল। আমার আগে আগে চল। [সুবলের কান ধরে] ক্যানরে হারামজাদা? কাকার বাড়ি আইলি, তগ কাকায় দুগা মাছ ভাত খাওয়াইতে পারে না? এতই অভাগ্য নাকি? আবার খাড়য়? এমুন মারুম বৈঠার বাড়ি। চল।

সুবল ও কিশোরকে প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে যায়

তিলকচাঁদ	বুড়ার চ্যাহারা দেইখ্যা ভয় পাইলে কী হইব— ঢাকের আওয়াজখান বড়ো মিঠা। আহা জমবো ভালো।

অনুগমন। অন্ধকার।

১১

মেঘনার পাড়। কলসি কাঁখে পিছন থেকে তিতাসের প্রবেশ। কলসি নামিয়ে রেখে উদাস মনে গান ধরে

তিতাস

জীবন আমার নদীর মতো
স্রোতে ভাস্যা যায়
কী করি উপায় গো, কী করি উপায়?
জানিনা সে ভিড়বে শ্যাষে
কোন বা আঘাটায়।।
মনের মাঝে আশা কত
হাতছানি দেয় অবিরত
যৈবন আমার বইয়া গেল
হইলাম অসহায়।।

পিছনে পা টিপে টিপে প্রবেশ করে উদয়তারা। সে তিতাসের সই। গানের শেষে ওর চোখে চেপে ধরে

তিতাস — কে?... ও উদয় মুখপুড়ি?

উদয়তারা চোখ ছেড়ে দেয়

উদয়তারা — তর এত দুঃখ কিসের লো সই?

তিতাস — কিসের আবার দুঃখ! নদীর কূলে একা বইসা আছি, একহান পুরানা গান মনে পড়লো হঠাৎ— কী করুম, অহনে কাম কাজ নাই ত কিছু?

উদয়তারা — আকাম ত আছে? আমার চক্ষুরে তুই ফাঁকি দিবি?

তিতাস — ক্যান আমি কি চুরি করছি নাকি?

উদয়তারা — আমি কমু ক্যামনে? তয় চুরি যে একহান হইছে এইহান সইত্য। অহনে চোরডারে ধরতে পারলে— এমুন সাজা দিমু—

তিতাস — আহা-হা রঙ্গ করে।

উদয়তারা — রঙ্গ করি? আমি য্যান কিছু বুঝি না?

তিতাস — কী বুঝিস লো? কি বুঝিস?

উদয়তারা গান গেয়ে ওঠে

উদয়তারা —

ও তোর মনের মানুষ বয়্যা আছে
নদীর কূলে আস্যা
ও তুই মন করিলে তারে লয়্যা
নাইয়র যাইব ভাস্যা
লো সই নাইয়র যাইব ভাস্যা।

তিতাস —

তরে থুয়্যা যামু ক্যামনে
হেই কথাহান ভাবি,
তর কাছে যে রাখছি আমার
পরানখানার চাবি
লো সই, পরানখানার চাবি।

উদয়তারা	তুইও বাপু কম ঢঙ্গি না।
তিতাস	আমি কী করলাম রে মুখপুড়ি? চাপান দিলি তুই, অহন উতর না দিয়া আমার উপায় আছে নাকি?
উদয়তারা	একখান কথা জিগাই সই?
তিতাস	কী কথা, ব্যাঙের মাথা?
উদয়তারা	আইজ যে পোলা দুইটারে লইয়্যা আসছে মোড়লকাকা, তার মইধ্যে তর পছন্দ কোনখান ক দেখি?
তিতাস	ক্যান?
উদয়তারা	হেইটারে ছ্যাড়া দিয়া বাকিডারে একবার নয়নভইর‍্যা দ্যাখতাম— তর জিনিসে ত নজর দিতে পারি না?
তিতাস	আহা, আমি য্যান নাম লিখ্যা রাখছি? চল ত, জল ভরবি চল। যত গাঙ ভাসাইন্যাকথা! সন্ধ্যা হইয়া আসতাছে, মায় বকব।

দুজনে কলসি নিয়ে নেমে যায় জলের ঘাটে। গান গাইতে গাইতে অন্য দিক দিয়ে আসে সুবল ও কিশোর। সুবল গান ধরে

সুবল

আহা কী দেখিলাম— কী হেরিলাম
পরান পুড়্যা যায়,
ওই ম্যাঘনা নদীর শীতল জলে
ডুব্যা মরি আয়,
অ দাদা, ডুব্যা মরি আয়।

কিশোর	তুই নিজে ডুব্যা মর গিয়া, আমারে ডুবাইস ক্যান?
সুবল	চুপ-চুপ। সুন্দরীরা ঘাট থিক্যা উঠতাছে জল ভইর‍্যা। তুই একখান কথা ক রে কিশোর, তর পায়ে পড়ি।
কিশোর	ক্যান, তুই ক না?
সুবল	আমার বাইক্য হর‍্যা গ্যাছে গিয়া। বুকের মইধ্যে কেমুন আউলা-ঝাউলা লাগে।

কলসি কাঁখে উঠে আসে উদয়তারা ও তিতাস। ওদের দেখে কেমন থমকে যায়

কিশোর — কিছু মনে কইর না গ। বিদেশি মানুষ আমরা— নদীর পাড়ের ওই ফুলগুলান ত চিনলাম না।

উদয়তারা — এ্যাঁ? মুরগাচণ্ডী। ওই ফুলগুলানরে কয় মুরগাচণ্ডী।

কিশোর — আহা বড় রঙিলা ফুল।

তিতাস — বিদেশি মানুষ, এমুন ফুল আগে দেখ নাই?

কিশোর — এই জীবনে না।

উদয়তারা — তাইলে দুই-একখান চারা লয়্যা যাও তোমাগো দ্যাশে। ফুল ফুটলে নয়ন ভইর‍্যা দেখবা।

কিশোর — আমাগো দ্যাশের মাটিতে ফুটবনি এমুন ফুল? জিগাই?

তিতাস — কইয়্যা দে, যত্ন থাকলেই ফুটব।

উদয়তারা — শুনলা ত? যত্ন কইর‍্যা লাগাইও তোমাগো উঠানে—সময় হইলেই দ্যাখবা এই রঙিলা ফুল ফুইট্যা উঠছে। তহন দাওয়ায় বস্যা দুইজনে নয়নভর‍্যা দেইখো।

চলে যায়

কয়েক মুহূর্ত ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকে সুবল ও কিশোর

কিশোর — আহা, বুকের মইধ্যে য্যান পদ্মফুল ফুইট্টা উঠলো রে সুবলা।

সুবল — হ, পিরিতের পদ্মফুলে যে এত মধু আগে তো বুঝতে পারি নাই রে কিশোর? তুই?

কিশোর — সইত্য কমু? আমিও না।

অন্ধকার।

১২

বিপরীত দিক থেকে আসে রামনাথ ও গৌরাঙ্গ

রামনাথ — পাইবা ক্যামনে?

গৌরাঙ্গ — এ্যাঁ?

রামনাথ — কই যে আঘাটায় ঘুইর‍্যা মরলে কি আর ঘাটের লাগাল পাওন যায়? কও?

গৌরাঙ্গ — না।

রামনাথ	তাছাড়া আন্দার রাইতে আঘাটায় পা ফ্যাললে পাও ত ভাঙ্গবই গৌরাঙ্গ?
গৌরাঙ্গ	হ।
রামনাথ	হেইলে অহন আর কপাল থাবড়াইয়া লাভ কি?
গৌরাঙ্গ	কী করি কও রামনাথ? ফিচারির বাবুরা কইল, আমাগো কাছে লোন লও, এইহানে চক্করবিদ্দি নাই। তাতে ভুইল্যা বেবাক মালো ফিচারির লোনে নাম লিখাইলো। ওই দ্যাখাদেখি আমিও তহন—
রামনাথ	ট্যাকা নিলা।
গৌরাঙ্গ	হ নিলাম।
রামনাথ	অহন গলায় কাঁটা বিন্ধছে বইল্যা বিড়ালের ঠ্যাং ধইরা টানাটানি লাগাইছ?
গৌরাঙ্গ	প্যাটের চিন্তা বড়ো চিন্তা রামনাথ। অভাবে পইড়্যা ট্যাকা নিছি, মরতে মরতেও সুদ দিয়া গিছি। হিসাব কইর‍্যা দ্যাখ, সুদে সুদে আসল ট্যাকা শোধ হইয়্যা গেছে দুই সন আগে। অহনও সুদের টাকা চায় ফিচারির লোন কোম্পানির বাবুরা।
রামনাথ	হ বড়ই অপরাধ করে। ট্যাকা নেওনের সময় ঠাকুর ঠাকুর, ফিরৎ চাইলেই সুমুন্দির পো?
গৌরাঙ্গ	কী বিপদে যে পড়লাম! তিতাসে মাছ থাকলে কি আর এই দুগ্গতি হয়? গোনে যদি মাছ পড়ে হেই ভরসাতে বয়্যা আছি। অহন তুমি দয়া না করলে রামনাথ, উপাস দিয়া মরুম।
রামনাথ	দয়া করণে বাধা কী? কিন্তু শোধ দিবা ক্যামনে? বন্দক রাহনের বস্তু আছে নাকি কিছু?
গৌরাঙ্গ	বন্দক?
রামনাথ	হ, বন্দক। আমি তা কল্পতরু বিরিক্ষ না— যে ঝাড়া দিলেই ঝরঝরাইয়া ট্যাকা পড়ব? দ্যাহ গিয়া, ঘরে যদি কিছু সামগগিরি থাকে, সন্ধ্যাকালে আইনো, হাতচিটা লিখ্যা দিমুনে দশটা ট্যাকা।
গৌরাঙ্গ	দশট্যাকায় কী হইব? বিশখান ট্যাকানা পাইলে অনিবায্য মরণ। জাল মেরামতির সুতায় লাগবো দশট্যাকা আর পরিবারের লাইগ্যা—
রামনাথ	রও রও। মোটে মায় রান্ধে না তারা তপ্ত আর পান্তা। দশ ট্যাকা জুটবো ক্যামনে তার ঠিক নাই, তায় আবার বিশ ট্যাকা! হাইস্যা বাঁচি না। নিজের শোওনের জায়গা নাই তার উপর পরিবারের সোহাগের লাইগ্যা দশ ট্যাকা?

গৌরাঙ্গ — হাইসো না রামনাথ। একমাস বউটা সান্নিপাতিকে শয্যাশায়ী। চিকিচ্ছার খরচ জুটাইতে পারি নাই। ঘরে একখান পিতলা হাঁড়ি আছে সাবেককালের, বিয়ার সময় পাইছিলাম—

রামনাথ — লইয়া আইসো তাইলে হাতে কইর‍্যা। আহা, মাইনষের দুঃখের কথা শুনলে এমুন করে বুকের ভিতরটা—। মায় তো কয়, এই মালোগুষ্টিরে দান করতে করতে তুই একদিন ফতুর হইয়া যাবি গিয়া রামনাথ। খুদকুড়া যেটুক আছে, হ্যাও ব্যাবাক ঘুচাইয়া দিবি দুইদিনে। তা আমি কই— মাগো, বাপের রক্ত আছে এই শরীলে। হেই রক্ত মালোর রক্ত। হেই মালোর দুঃখের দিনে যদি তাগো পাশে না খাড়াই, তয় তো নিজেরে মানুষ বইল্যা পরিচয় দিতে পারুম না মা। তুমি পরের মাইয়্যা, বুঝবা না— আমাগো রক্তের ধারাই অইন্য রকম। যতদিন বাঁচুম এইরকম দান-ধ্যান আনন্দ-ফূর্তির মধ্যেই জীবন কাটাইয়া যামু।

গৌরাঙ্গ — আমি কিন্তু দান চাই না রামনাথ। কজ্জ।

রামনাথ — একঐ কথা। যার নাম চাউল ভাজা হ্যারেই কয় মুড়ি। কজ্জ শোধ করতে না পারলে তো দানই হইল— ঠিক কিনা কও?

গৌরাঙ্গ — আমি শোধ দিয়া দিমু।

রামনাথ — চ্যাটাং চ্যাট্যাং কথা কইয়ো না তো গৌরাঙ্গ? কজ্জ শোধ দিমু। ওই ফিচারি লোনের ট্যাকা শোধ দিছ নাকি এতদিনে?

গৌরাঙ্গ — শোধ দিতে পারি নাই, কিন্তু সুদ তো দিত্যাছি মাসে মাসে।

রামনাথ — হেইলে তো লোন কোম্পানির বাবুগো সশরীরে স্বগ্গবাস হয়্যা গ্যাছে গিয়া। যাও যাও, আর জ্বালাইও না দেহি। সন্ধ্যাকালে আইসো পিতলা হাড়ি হাতে কইর‍্যা, দেখুম অনে যদি কিছু দেওন যায়।

গৌরাঙ্গ — দেওন যায় না, দিতে আমারে হইবই রামনাথ। বিশখান ট্যাকা আইজ না পাইলে তিতাসের জলে আমার ডুইব্যা মরণ ছাড়া গতিক নাই। আমি তোমার হাত ধইর‍্যা কই, এ যাত্রা আমারে বাঁচাও।

রামনাথ — খাইছে খাইছে—এতোদেহি উসকা মাটিতে বিড়ালে হাগে। নরম মানুষ পাইয়্যা আমারে দেহি তোমরা— যাও যাও, বাড়ি যাও, আমার কাম আছে।

রামনাথ চলে যায়

গৌরাঙ্গ	তিতাসরে, হাজার মালোর জননী— তোর বুক যদি খালি হয়্যা যায়, তোর সন্তানরা বাঁচবো কেমুন কর‍্যা মাগো? এই অভাগ্যরা বাঁচবো কেমুন কইর‍্যা?

ধীরে ধীরে চলে যায়। অন্ধকার।

১৩

বাঁশিরাম মোড়লের বাড়ি। উত্তেজিতভাবে ঢোকে বাঁশিরাম, স্বরূপচাঁদ এবং আরো কয়েকজন। সকলের হাতেই লাঠি

বাঁশিরাম	এত বড়ো আস্পর্দা। শুকদেবপুরের ঘাটে আইস্যা আস্ফালন করে বাসুদেবপুরের ছাগলগুলান? বাঘের ড্যারায় পাও দিছে ট্যার পায় নাই অহনো। লইয়্যা আয় আমার টাঙ্গি, সড়কি। আইজ এই খলার উপরেই পুইত্যা ফ্যালামু হালাকো;

মোড়লের স্ত্রী ও তিতাস আসে

গিন্নি	কী হইছে, কী হইছে গো? কিসের কাইজ্যা?
বাঁশিরাম	আরে, হেই গেল বছরে যে মাছের ভাগ লইয়্যা গোলমাল বাধছিলনা বাসুদেবপুরের লগে— এতদিন পর হালারা আবার জোট বাইন্ধা আইছে শোধ তুলতে।
১ম	একবার হুকুম করেন কত্তা, হালাগো শ্যাষ কইরা দি।
২য়	শুকদেবপুরের লাঠির জোর ট্যার পাইয়া যাউক অরা।
৩য়	হালারা ঘুঘু দ্যাখছে ফান্দ ত দেখে নাই?
১ম	আইজ দেহামু হালাগো।
৩য়	হুকুম করেন, হুকুম করেন আপনে।
গিন্নি	লজ্জাও নাই, হেইবার মাইর খাইয়্যা পলাইয়া গেল, আইজ আবার আইছে কোন মুখে?

অন্য দিক থেকে নিঃশব্দে আসে কিশোর ও সুবল

বাঁশিরাম	কুন কথা না। শোন্, এক-একডারে সড়কিতে গাঁইথ্যা ভাসায়্যা দে ম্যাঘনার জলে। শুকদেবপুরের লগে বিবাদ অগ চিরজন্মের মতো ঘুচায়্যা দিত্যাছি। কই, দিলি না আমার টাঙ্গি-বল্লম?
তিতাস	বাপ, তুমি যাইও না। আমার ডর লাগে।
বাঁশিরাম	দূর পাগলি! ডর কিসের? তর বাপের বুড়া হাড়ে অহনো কত জোর, দেইখ্যা যাউক সুমুন্দের পুতেরা।
কিশোর	আমাগোরে একখান লাঠি দ্যান ত আপনেরা।
সুবল	হ, একবার আমাগো কব্জির জোরখান দেখাই অগ।
গিন্নি	না-না, তোমরা যাইও না। তোমরা আমাগো অথিত। তোমরা গ্যালে আমাগোর নিন্দা হইব বাপ।
সুবল	তিনমাস ধর‍্যা আপনাগো অন্ন খাইত্যাছি, অহনও আমাগোরে অথিত কন?
কিশোর	জুয়ান পোলা ঘরে থাকতে আপনে লাঠি ধরবেন ক্যান? আমরা কি মইর‍্যা গিছি, না ভেউরা বনছি? আমাগোর আপন ভাবতে পারেন না?
বাঁশিরাম	থাম থাম। ম্যালা কথা কইস না। এইহান হইল আমাগো শুকদেবপুরের মর্য্যাদার লড়াই। বাঁশিরাম মোড়ল বাইচ্যা থাকতে আমি লাঠি ধরুম না, কি তুই ধরবি রে হারামজাদা?

মুখে আবা আবা ধ্বনি তোলে

কিশোর	[চেঁচিয়ে] আপনের পোলা থাকলে আপনারে লাঠি ধরতে দিত? পোলারা থাকতে বাপে লাঠি ধরে না। দ্যান লাঠি। [কেড়ে নেয়] চলেন আপনেরা আমাগো সাথে। চলরে সুবলা, তিতাসের মালোগো হাতের ভেল্কি দেখাইয়া দিই হালাগো।

সকলে ছুটে বেরিয়ে যায়। বাঁশিরাম স্তম্ভিত

বাঁশিরাম	দ্যাখলায় নি? দ্যাখলা হারামজাদাগো কাণ্ডখান? বাঁশিরামের হাতের লাঠি কাড়্যা নিয়া যায়! সাহস কত? দ্যাখতে এমুন ভিজা তুলসীপাতা—
গিন্নি	হইলে কী হইব, ভিতরে খুব ত্যাজ আছে।

তিতাস	কী রকম বাবড়ি ঝাঁকাইয়া চইল্যা গেল?
বাঁশিরাম	তুই হারামজাদা পরের পোলা— ভিনদেশি মানুষ! আমার আর মুখ থাকব, একখান যদি অঘটন ঘইট্যা যায়?
তিতাস	উঃ! মাগো—
গিন্নি	ওমা, তর আবার কী হইল?
তিতাস	আমার বড়ো ডর লাগে গ মা।
গিন্নি	তুমি আর অমঙ্গল গাইও না ত। জুয়ান পোলা, কাইজা করতে গ্যাছে। পাঁচ ঘা দিব, দুই ঘা খাইব— তাতে ভয়ের কী আছে?
বাঁশিরাম	ভয় পামু না? আমারে যে বাপ কয়্যা গেল শোনস নাই? আহা-হা, রামকেশব দাদাগো, এমুন পোলায় তোমারে নিত্য বাপ ডাকে!
গিন্নি	ক্যান? তোমার কি হিংসা হয় নাকি?
বাঁশিরাম	না, তয় লোভ হয়। কেউ যদি অমন দুইবেলা ওইরকম কইর‍্যা আমারে বাপ ডাকত, তোরে মা কইত—আহা, কত সুখ হইত ক দেখি?
তিতাস	ক্যান, আমি যে ডাহি, হেইখান কি গাঙের জলে ভাইস্যা গেল? কী স্বার্থপর গ তোমরা?
বাঁশিরাম	আহা, তুই ত আমাগর মা। পোলায় হইল গিয়া আলাদা জিনিস।
তিতাস	অ, হলে ওই পোলা কোলে কইর‍্যাই তোমরা বইস্যা থাক। সারাদিন বাপ-বাপ, ম্যা-ম্যা করব অনে— হেই তোমাগ ভালো।
গিন্নি	হেইলে পাকাপাকি যাতে বাপ-মা ডাকে হেই বন্দোবস্ত করুম নাকি রে?
তিতাস	ওমা, আমি তাই কইলাম নাকি?
বাঁশিরাম	হ— আমিও য্যান হেই রকমই শোনলাম মনে লয়?
তিতাস	মোটেই না— মোটেই না। তোমরা সব্বাই মিথ্যুক।

ছুটে পালায়। ওরা হাসে

বাঁশিরাম	কী বুঝলি?
গিন্নি	বোঝলাম, মায়্যা ডাগর হইছে, অহনে বিদায় দেওন লাগে। আইচ্ছা, এই কিশোররে তোমার পছন্দ হয়?
বাঁশিরাম	কিশোর? না-না, অতিরিক্ত বেয়াড়া পোলা। দেখলি না, হারামজাদা আমার হাতের লাঠি কাইড়্যা নিয়া গেল?... ক্যান, তর পছন্দ নাকি?

গিন্নি — বয়েসটা কি তোমার হাওয়ায় বাড়ছে? মায়্যার দিকে চাইয়্যা বোঝ না?

নেপথ্যে চিৎকার। বাঁশিরাম সচকিত

বাঁশিরাম — কী হইল? ওরে, আমার সড়কিখান দিলি না? গেরামে দাঙ্গা লাগছে আর আমি হালায় মোড়লবউয়ের আঁচল ধইর‍্যা বয়্যাম আছি? আমার টাঙ্গিখানও নিয়া আয় সত্বর।

আহত কিশোরকে নিয়ে সুবল ও স্বরূপ ঢোকে

বাঁশিরাম — কী হইল? কী হইল? ক্যামনে লাগল?

সুবল — পাঁচ-ছটারে ঘায়েল করার পর একজন আচমকাপিছন থিক্যা লাঠি মাইর‍্যা দিল মাথায়। আরে দ্যাহেন— । [কিশোরের লাঠি তুলে নেয়] এত সাহস! অভিমন্যুরে আঘাত করছে? কুরুক্ষেত্তর আইজ ছারেখারে দিমু।

আবা আবা ধ্বনি তুলে বেরিয়ে যায়। টাঙি নিয়ে ভিতর থেকে আসে তিতাস— কিশোরকে দেখে হাত থেকে অস্ত্র পড়ে যায়

তিতাস — উঃ মা! এ কী হইল গ মা?

গিন্নি — [কিশোরের মাথা নিজের কোলে তুলে নেয়] কিছু হয় নাই। সত্বর একমুঠা দুব্বা তুইলা ছেইচা নিয়া আয়। কপালে বাইন্ধ্যা দিই, রক্ত পড়া বন্ধ হয়্যা যাইব অহনে।

তিতাস দ্রুত চলে যায়

কিশোর — উঃ, মাগো—

গিন্নি — এই ত বাপ, এই ত আমি। কোথায় কষ্ট হইত্যাছে মানিক আমার?

কিশোর — মাগো মা—

গিন্নি — এই ত আমি গোপাল আমার, অহনি ভালো হয়া যাইবা। কুনো ভয় নাই বাপ। [তিতাসের উদ্দেশে] কইরে আনলি?

দূর্বা, কাপড়ের ফালি ও পাখা নিয়ে তিতাস আসে

তিতাস — এই যে আনছি মা।

গিন্নি — দে আমারে দে [যত্ন করে কিশোরের মাথায় ব্যান্ডেজ করে দেয়] অহনে একটু পাংখা কর দেখি বয়্যা বয়্যা— আমি একটু দুধ গরম কর‍্যা লয়্যা আসি।

চলে যায়। তিতাস তন্ময়ভাবে অর্ধঅচেতন কিশোরকে দেখে। কপালে হাত দেয়। দ্রুত সেই হাত তুলে নিজের বুকে রাখে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দ্রুত হাওয়া করে। কিশোর চোখ মেলে তাকায়।

কিশোর — তুমি ক্যাডা?

তিতাস — আমি— আমি... মায় দুধ আনতে গ্যাছে।

কিশোর — কপালে হাত দিল ক্যাডা? আঃ... বড় ঠাণ্ডা!

তিতাস — আমি যাই... মায়রে ডাইক্যা আনি।

কিশোর উঠে বসে ধীরে ধীরে। তারপর পড়ে থাকা টাঙ্গি দেখে সব মনে পড়ে। দূরে কোলাহল। টাঙ্গিটা তুলে নেয়। দুধ হাতে গিন্নির প্রবেশ।

গিন্নি — ওরে উঠিস না উঠিস না পাগল, পড়্যা যাবি। এই দুধটুকু খায়্যা নে বাপ আমার।

কিশোর — অহনো যে লড়াই চলতাছে মাগো, আমার আর সময় নাই।

গিন্নি — না, তরে আমি যাইতে দিমু না। বয় চুপ কইর‍্যা। দুধটুক খা।

কিশোর — মাগো, বাপের লাহান মানুষখান লাঠি হাতে কাইজ্যা লড়ব— আর আমি কি মায়ের কোলে বয়্যা—

গিন্নি — রক্ত পড়ত্যাছে—

কিশোর — এই শরীলে অনেক রক্ত আছে মাগো, কিছু যায় যাউক না? মালোর শরীলে ত মাইনসের রক্ত—বাপের জন্য যদি যায়, তয় সে তো মহাপুণ্য। এই পুণ্যটুক কুড়াইয়া আনতে তুমি আমারে মানা কইর না গ মা, আমারে তুমি মানা কইর না।

ছুটে চলে যায়

গিন্নি — ওরে, কান্দাবি কয়্যাই কি আমারে মা ডাকলি বাপ? কেস্টহয়্যা যশোদারে কান্দালি, অহন পরের পোলা হয়্যা আমারেও কান্দাবি গোপাল আমার?

চলে যায়। অন্ধকার।

১৪

কাদিরের বাড়ি। কাদির ও ছাদির কথা বলতে বলতে আসে

কাদির — [উত্তেজিত] আমার এই সাফ কথা ছাদির। আমি ঘরে না থাকলে আর কুনদিন ওই গঞ্জের বাবুগ আমার বাড়ির উঠানে ঢুকতে দিবি না। হালায় সোনার গাঁওখানরে চুইষ্যা আউখের ছিবড়া বানাইয়া দিল ইবলিশের বাচ্চারা?

ছাদির — আমি কি ডাইক্যা আনছি না কি অগ?

কাদির — শকুনগণে ডাকতে হয় না, মড়কের গন্ধ পাইলেই আহে। তা অগ মতলব খান কি?

ছাদির — জিগায় কত ধান উঠল? তিতাসের পানি শুকাইছে বুল্যাধানে কত চিট হইল—এইসব আর কি।

কাদির — কইলাম না শকুন? আকালের গন্ধ পাইছে? ওরে যতই ক্যান ছোঁক ছোঁক করস, কাদির শ্যাখ কোনদিন তগ ওই সমবায়ে জমি বান্ধ্যা রাইখ্যা কজ্জ করতে যাইব না।

ছাদির — জিগায় বছরের খোরাকি উঠল কিনা—

কাদির — ধান হয় নাই কলাই বুনছি। দরকার বুঝলে তিনমাস কলাই সিন্ধ খামু, তগ বাপের কি? তা তুই কি কলি?

ছাদির — না কইলাম, এই বছর একটু টানাটানি যাইতে পারে।

কাদির — [আরো উত্তেজিত] ঘরের অভাব বাইরে নাকাড়া পিঠাইয়া গাইতে গ্যাছ হারামজাদা? ক্যান, কবে তোর পাতে ভাত কম পড়ছে? ক' চুপ কইর‍্যা থাকলে চলব না— কবে ছেঁড়া লুঙ্গি পরছিস্ জবাব দে?

ছাদির — আমি কি নিজে কইতে গেছি—অর‍্যা জিগাইল কয়্যাইত—

কাদির — আমি বুঝি না, বাইচের নৌকা বেচ্যা দিছি কইয়্যা তর গোসা হইছে? ওরে বান্দর, নাও না ব্যাচলে খাজনা দিতাম কই থিক্যা? মাগন

সরকার গোমস্তায় আমারে কী প্যাঁচে ফেলছিল মনে নাই? সুখের দিনে ত নৌকা ভাস্যাইছিস, অহনে দুঃখের দিনে সামলাইয়া চলবার লাগে না?

ছাদির তোমার উপরে আমি কথা কইছি নাকি কুনদিন?

কাদির গোসা করিস না বাপ। খোদায় দিলে খুশি হইতে হয়, না দিলে ব্যাজার হইতে নাই। একটা বছর এট্টু হুঁশিয়ার হইয়্যা সংসারডারে সামাল দেওয়া, এইত? পারবি না?

ছাদির তুমি মাথার উপর থাকলে আমি সব পারুম বাজান।

কাদির আসলে কী জানিস বাপ, দুনিয়ায় দুইটা জাত— সজ্জাত আর বজ্জাত। ওই বজ্জাতগুলানরে সবসময় তফাতে রাখতে হয়।

কলসি কাঁখে জমিলা আসে। দুজনকে দেখে কাপড়ের আড়ালে কিছু লুকোয়

ছাদির এত বেলায় পানি লাগব কিসে?

জমিলা গোছল করুম ত? তাই ভাবলাম—

ছাদির গোছল করবি, তর গামছা কই?

জমিলা আছে।

ছাদির আছে ত জানি, লুকাইলি ক্যান কাপড়ের তলে?

কাদির এই হারামজাদা, আমার কাছে গাইল খ্যাইয়্যা তুই আমার আম্মাজানের উপর তম্বি করস? এত সাহস?

ছাদির তম্বি করি না। ও গামছায় লুকায়্যা কী লইয়্যা যায় তুমি জান?

কাদির কী আবার লইয়্যা যাইব? এইখানে কি অর বাপ-ভাইয়ের ঘর নাকি, যে লুকায়্যা শউরের ঘরের দব্য দিয়া আইব তাগরে?

ছাদির দ্যাখবা? দেহি তর গামছা?

জমিলা ও ত ভিজা গামছা।

ছাদির হ হ— এই ভিজা গামছাই দেহি [টান মেরে গামছা কেড়ে নেয়, গামছার প্রান্তে পুঁটুলি বাঁধা] দ্যাহ, বাজান দ্যাহ, ভিজা গামছায় দ্যাহো কেমন পানি বান্ধা আছে।

নীরবতা

কাদির চাউল লইয়্যা কই যাইতে আছিলি মা?

জমিলা — বাজান, বাসন্তীদিদির ঘরে দুইদিন উনান জ্বলে নাই। বাপ-বেটিতে উপাসে দিন কাটায়...

কেঁদে ফেলে

ছাদির — দুইদিন পরে যহন তর হাঁড়িতে টান পড়ব তহন তরে বাঁচাইব ক্যাডায়? খয়রাত করে! বাপের ঘর থিক্যা আইন্যা খয়রাত করবি, বুঝলি— আমার মেহন্নতের দানা ছড়াইবার লাইগ্যা না।

দ্রুত বেরিয়ে যায়

কাদির — কান্দিস না মা। খোদায় যদি নারাজ হয়, তখন একমুঠা দানায় ত সংসার বাঁচব না যা, তুই বাসন্তীরে দিয়া আয়।

জমিলা — বাজান, আমার উপর নারাজ হইয়ো না। আইজ আমি দুইবেলা উপাস দিমু।

কাদির — না রে বেটি, না। আইজ বরং আমরা মায়ে ব্যাটায় এক সানকির ভাত দুইজনে ভাগ কর্‌্যা খামু, কেমন?

জমিলার ঠোঁটে হাসি ফোটে। চোখে জল

জমিলা — তুমি কত ভালো বাজান, তুমি কত ভালো।

কাদির — না না, আর দেরি না। আইজ ত অরা বাঁচুক। কাইল যদি কেয়ামতের দিন আহে, তহন সব্বাই মিল্যা...চল, আমিও যাই তর লগে।

দুজনে চলে যায়। অন্ধকার।

১৫

বাঁশিরাম মোড়লের আঙিনা। দোল-উৎসব শুরু হয়েছে। একদল মানুষ নাচগান সহযোগে মঞ্চে আসে। তার মধ্যে তিতাস, উদয়, কিশোর, সুবলও আছে।

আইজ হোলি খেলব রে শ্যাম তোমার সনে
একেলা পাইয়াছি হেথা নিধুবনে।

আজিকে পাইয়াছি হেথা, পলাইয়া যাবে কোথা,
ধরিয়া রাখিব তোমায় সব সখীগণে।

লাল শাড়ি পড়াইব, পীতধড়া খসাইব
নারী হইয়ে মোহনবাঁশি আমরা বাজাব।
(ও লালা) নারী হইয়ে...

দুরন্ত বসন্ত আর যে আসে না—
তারে কইরো গো মানা।
আইলরে বসন্তকাল
দুঃখিনীর দুঃখের কপাল।
প্রাণকান্ত বিনে প্রাণ তো
আর যে বাঁচে না।
তারে কইরো গো মানা।
তোমার মোহন মুরলী রাখ না বন্ধুরে
ধর আজ রঙের পিচকারি
হোলি খেলিবে যত গোপনারী।

(তুমি) তুমি শুনরে, কালিয়া আবির ঢালিয়া
ঢাকিয়া বরণ তোমারি।
রঙে রাঙাইয়া তোমারে নেহারি।।

নাচের মধ্যে আবির ওড়ানো হয় এবং অকস্মাৎ চলন্ত নাচের ভঙ্গি স্থির হয়ে যায়। মঞ্চের উঁচু বেদিতে আলো জ্বলে ওঠে, দেখা যায় বাঁশিরাম ও তার গিন্নিকে

বাঁশিরাম — আহা-হা, পোলা-মাইয়্যাগুলানের এমন আনন্দ-ফুর্তি দেইখ্যা যৌবনকালের কথা মনে পইড়্যা যায় গো বউ— তখন এই দোল পুন্নিমার রাইতে কী কাণ্ডটাই না করছি ভাবলে অহনে হাসি পায়।

গিন্নি — তাই তো হয় গো। দ্যাহ নাই, শুকনা পাতা ঝইর্যা গ্যালে গাছে আবার নতুন পাতা দ্যাহা দেয়? আমার মনে লয় পুরানগুলাই তহন আবার নতুন রূপ ধর্যা আহে।

বাঁশিরাম — আহা, কথাখান বড়ো সুন্দর কইলি ত? হেইলে হেই পুরানদিনের

মতো, আয় তরে আইজ এট্টু আবির মাখায়্যা নতুন করি।

বাঁ হাতে বেড় দিয়ে ধরে রঙ মাখাতে যায়, ছিটকে যায় গিন্নি

গিন্নি ও মাগো, এমুন খোলা জায়গায়...

বাঁশিরাম [হাসে] তাইলে কি মশারির মইধ্যে গিয়া হোলি খেলনের ইচ্ছা হয় নাকি তর?

গিন্নি আহা যেমুন নাম, তেমুন স্বভাব। বোজের বাঁশিরাম আর তোমার মইধ্যে কুনো ফারাক নাই—দুইজনই সমান নিলাজ। কেউ যদি অহনে দেইখ্যা ফেলত?

বাঁশিরাম হাঃ-হাঃ-হাঃ, কী হইত? ও বোজনারী, তাইলে কি তার কলঙ্ক হইত নাকি রে, এ্যাঁ?

বাঁশিরাম হাসতে থাকে। মঞ্চবেদির আলো নিভে যায়। ওরা অদৃশ্য। সামনের আলোতে তখন স্থির চরিত্রগুলি সজীব হয়ে ওঠে

আইজ হোলি খেলব রে শ্যাম তোমার সনে
একেলা পাইয়াছি হেথা নিধুবনে।
আজিকে পাইয়াছি হেথা, পলাইয়া যাবে কোথা,
ধরিয়া রাখিব তোমায় সব সখীগণে।

নৃত্য গীত চলতে চলতে দৃশ্যটি পূর্ববৎ স্থির হয়ে যায়। মঞ্চবেদি আলোকিত হলে দেখা যায় তিতাস ও কিশোরকে

কিশোর ও রাইকিশোরী, এই কিশোরের লাইগ্যা তোমার থালিতে কোনো রঙ নাই নাকি?

তিতাস [লাজুক ভঙ্গিতে] শাদায় রঙ দিলে ধরে, ওই কালায় ত রঙ ধরবো না— মিছামিছি নষ্ট হইব।

কিশোর হইত না। বাইরের কারাবরণই দেখলা গো রাধারানি, ভিতরখান যে দুধের লাহান সাদা। তুমি বাইরে রঙ মাখাইলে, দ্যাখতা ভিতরখান আমার কেমুন রঙিল হয়্যা যাইত।

তিতাস কম্পিত হাতে কিশোরকে আবির মাখাতে যায়, এমন সময় আবার হৈ-হৈ চিৎকার। মঞ্চের স্থিরচিত্র ভেঙে যায়। নেপথ্যে বাঁশিরামের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

নেপথ্যে বাঁশিরাম লাঠি বল্লম বাইর কর রে সব— বাসুদেবপুর আবার হানা দিছে।

সকলে মঞ্চ থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়। কিছু লোক লাঠি বল্লম নিয়ে মঞ্চের উপর আসে। মারামারির দৃশ্য। মঞ্চের উপর দিয়ে ওরা ছুটে বেরিয়ে যায় শুধু দেখা যায় মঞ্চবেদিতে তিতাস সবলে কিশোরকে আকড়ে ধরেছে ভয়ে

কিশোর আমারে ছাড়। বাসুদেবপুর আবার হানা দিছে— আমারে যাইতে হইব। শুকদেবপুররে বাঁচাইতে হইব।

তিতাস না আমার ডর লাগে।

হাত থেকে থালা পড়ে যায়। দেখা যায় মেয়েটি ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ে যাচ্ছে। ভয়ে মূর্ছা গেছে। কিশোর কী করবে ভেবে পায় না। বাইরে কোলাহল বাড়ে

কিশোর কন্যা, ডর পাইও না, আমি আছি। কন্যা, চোখ মেইল্যা চাও? মাগো, তোমার মাইয়্যা ডরে মূর্ছা গেছে গো মা— ঘরে লয়্যা যাও— জলবাতাস দাও। মা গো, তোমার কইন্যারে নাও গো মা। কইন্যারে নাও।

তিতাসকে সবল বাহুতে তুলে নেয় কিশোর। অন্ধকার।

১৬

রামকেশবের বাড়ি। দয়ালচাঁদ ও কিশোরের মা কথা বলতে বলতে আসে

কিশোরের মা আমিও না, আমিও আর পারিনা গো ঠাকুর। বুড়া হাতে এই সংসারের কলুর ঘানি আর টানতে পারি না।

দয়ালচাঁদ এইবার দুঃখের দিন তোমাগ ফুরায়ে আসতাছে গ বউঠান, আর চিন্তা নাই। এইবার পোলায় ফিরলেই দেইখো, তোমার এই সংসার আবার ক্যামন ঝলমলাইয়া উঠছে।

কিশোরের মা — কবে ফিরব পোলায়? একবার গুইনা কও না গ ঠাকুর, কবে আমার বুক জুড়াইব? আশায় আশায় বয়্যা বয়্যা তিনমাস তো কাইট্যা গেল! আর যে আমার মন মানে না গ? পরবাসে পইড়্যা রইল— ক্যামন আছে কে জানে?

দয়ালচাঁদ — রবি অহন মকরে আর চন্দ্র হইল গিয়া আইজ— রও দেখি— [পাঁজি দেখে] হ কর্কটে। বাঃ বাঃ, স্বঘরে আছে। একী! আবার বিস্পতি দেখি মেষে! তাইলে ত বড় শুভ যোগ। পোলায় তোমার ভালো আছে গো জননী।

বাসন্তী আসে

বাসন্তী — গণনা কর নাকি দয়ালকাকা?

কিশোরের মা — হ, কয় কিশোর নাকি ভালোই আছে। আয়—

বাসন্তী — কবে লাগাদ ফিরব, দ্যাহা যায় নাকি কিছু?

দয়ালচাঁদ — হ এইত, রবি মীনে আসলেই প্রোত্যাগমন যোগ। চত্তির পড়লেই রওনা দিব।

কিশোরের মা — পথে কুন বিপদ-আপদ?

দয়ালচাঁদ — রাহুটা বক্রী বল্যা যৎসামান্য বিঘ্নি দেখা যায় বটে— তবে কাইট্যা যাইব।

রামনাথের মা আসে বাইরে থেকে

রামনাথের মা — সিধাকরনের লাইগ্যা কত খরচ পড়ব কও।

দয়ালচাঁদ — কি?

রামনাথের মা — তোমার ওই রাহু না বাহু কি বক্রী কইলা— ওইটা সিধাকরনের লাইগ্যা কত খরচ পড়বো কও। আমি দিমু।

দয়ালচাঁদ — তুমি খরচ দিবা?

রামনাথের মা — পোলায় আমার ম্যাঘনায় গ্যাছে— বিপদ-আপদের ডর নাই নাকি? এইত হারান্যাগঞ্জ থিক্যা শুনইন্যা আসল বড়োগাঙে নাকি ডাকাতি হইছে পর পর কয়খান জাউল্যা নাওয়ে। কও দেখি কী বিপদ?

কিশোরের মা — একী সব্বনাইশা কথা শুনাইলা গ দিদি— বুকখান যে আমার তরাসে কাঁপে।

রামনাথের মা — আহা— তাই বুইলা সব নাওয়েই হইতাছে নাকি? না সব মালোরে কাইট্যা ফ্যালাইতেছে? কথায় কয় সাবধানের মাইর নাই। তাই কইলাম ঠাকুররে, কত পড়ব কও। আমার পয়সা যায় যাউক, হক্কলার তো মঙ্গল হইব।

দয়ালচাঁদ — এ ক্ষেত্রে একখান বিঘ্ননাশক-কবচ ধারণ করা অবশ্য দরকার।

রামনাথের মা — পিছা মারি তোমার দরকারের কপালে। কতখানি গলা কাটবা কও?

দয়ালচাঁদ — যামুনে বিকালে তোমার কাছে। হিসাব-টিসাব কর‍্যা লয়্যা যামুনে। অহনে চলি? কুণ্ড মশায়ের বাড়ি পিছা মারতে—নাকি কয়, পাঁচালি পড়তে ডাকছে। যাই। পরে আমুনে।

কিশোরের মা — আর আমি ভাবতে পারি না। কোথায় যে পইড়্যা রইল পোলাগুলান! ঠাকুর, এত কইর‍্যা ডাকি তোমারে, তবু কি তোমার দয়া হয় না গো?

চলে যায়

রামনাথের মা — আহা, বড়ো ভাইঙ্গা পড়ছে। একখান পোলা ত? ভাবনা ত হইবই। অ বাসন্তী, শুনলাম তর বাপে নাকি অহন শয্যাশায়ী। বাতের ব্যথায় উঠতে পারে না?

বাসন্তী — সে ত অনেকদিন হইয়্যা গেল গ জেঠি, হক্কলেই ত জানে।

রামনাথের মা — তাইলে তগ অহন চলে কী কইর‍্যা?

বাসন্তী — গরিব মাইনষের চলা না-চলা দুই-ই তো সমান গো জেঠি। এইসব নিয়া আবার কেউ ভাবে নাকি? ছিঃ।

চলে যায়

রামনাথের মা — ও—ত্যাজ? বাইদ্যানির সামনে কুলাপানা চক্কর? আইচ্ছা। ফির‍্যা আসুক রামনাথ, তারপর দেখুম অনে, ওই বিষদাঁত ভাইঙ্গা ক্যাডা তোরে নাচায়!

অন্ধকার।

অন্ধকারের মধ্যে উলু ও শঙ্খ ধ্বনি তীব্র হয়ে বাজে বসন্ত-বাহারে সানাইয়ের সুর দ্রুত লয়ে চলে। আলো ফুটতে দেখা যাবে মঞ্চবেদির উপর বরবেশে কিশোর ও বধূবেশে তিতাস দাঁড়িয়ে আছে। তিতাসের গলায় ফুলের মালা এবং আর একটি মালা পরিয়ে দিল কিশোরকে। মোড়ল গিন্নি উলু দেয় এবং উদয়তারা শাঁখে ফুঁ দিল। অন্য পাশে বাঁশিরাম, তিলক ও সুবল মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

গিন্নি — আমার কইন্যারে আইজ তোমার হাতে তুইল্যা দিলাম গোপাল আমার। তোমাগো পরানের জানাজানি আমি মালায় বাইন্ধ্যা দিলাম। ঘরে ফির‍্যা বাপ-মার সামনে আবার শাস্তরের বিয়া কইর‍্যা লইও। আমার বুকের ধন তোমারে দিলাম। আমার পরানের সুখটুকু তোমারে দিলাম, অর পরান তুমি সুখে ভইর‍্যা দিও বাপ আমার।

বাঁশিরাম — ম্যাঘনার মাইয়্যা তিতাস। অহনে তিতাসের পোলা আইয়া ম্যাঘনার সব্বস্য লয়্যা গেলা। বছর বছর আইসো। তোমাগো আবার দেহনের আশায় বাঁইচ্যা থাকুম আমরা।

তিতাস আর কিশোর বাঁশিরাম ও গিন্নিকে প্রণাম করে। উলু ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে মঞ্চ অন্ধকার হয়। আবার আলো ফুটলে দেখা যায় মঞ্চ খালি। কিশোর দাঁড়িয়ে আছে, তিতাস তাকে প্রণাম করছে। কিশোর দু'হাতে তুলে নেয় তাকে। সানাইয়ের সুর বাজে

কিশোর — আমার ভাঙ্গাঘরের চান্দ, তরে আমি অহন কই রাখি?

তিতাস — পায়ে রাখো।

কিশোর — পায়ে না— তুই আমার বুকে রাখার ধন।

কাছে টানে

তিতাস — আমার কেমুন ডর লাগে

কিশোর — ডর কি? অহন থিক্যা আমি ত আছি। এই ত তর বুকের কাছে।

অন্ধকার। জলের ছলছল শব্দ। দূরে ভাটিয়ালির সুর। আলো ফুটলে দেখা যাবে মেঘনা নদী, চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। মঞ্চবেদির উপর তিতাস বসে আছে, যেন কোনো নৌকার কেন্দ্রে। তিলক হালে এবং সুবল দাঁড়

টানছে। কিশোর দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। নেপথ্যে গান ভেসে আসে

আরে ও ভাটিয়াল গাঙের নাইয়া
ঠাকুর বাইরে কইয়ো গিয়া
নাইওর য্যান যায় লয়্যা।

সুবল — কার নাও?
নেপথ্যে — হবিগঞ্জের
সুবল — যাই কই?
নেপথ্যে — ভৈরবের বাজারে।

জলে দাঁড় টানার শব্দ শোনা যায়। মঞ্চবেদি আলোকিত হয়। সুবল ও তিলক ডুবে যায় অন্ধকারে

কিশোর — মন কেমুন করে?
তিতাস — করে।
কিশোর — আমারে তর ভালো লাগে নাই?
তিতাস — তুমি ত ডাকাইত।
কিশোর — ক্যান?
তিতাস — কাইল রাইতে একটু কালের লাইগ্যা ঘুমাইতে দিছিলা নাকি আমারে?
কিশোর — সে ত আইজও দিমু না।
তিতাস — ইস্?

কেন্দ্র অন্ধকার। নৌকার দুইপ্রান্ত আলোকিত। দুইপ্রান্তে সুবল ও তিলক

সুবল — তিলকখুড়া, পচ্চিম আকাশে ম্যাঘ জমতাছে মনে লয়?
তিলক — তাই ত দেহি। গতিক ত ভালো বুঝি না রে সুবলা।
সুবল — কলাপুরের খাল আর কতদূরে?
তিলক — মনে লয় এক দণ্ডের পথ। জোরে টান বাপ, আমি নাও কিনার দিয়া বাই। ঝড় উঠলে মাঝগাঙে বিপদ।

কেন্দ্রে পুনরায় আলো জ্বলে। নৌকার দুইধার অন্ধকার। ভাটিয়ালির সুর আবার স্পস্ট হয়। কিশোর ও তিতাস কথা বলে

কিশোর বউ, তর নাম কিরে?

তিতাস জানি না।

কিশোর ক্যান, তার বাপ মায়ে তরে কুন নাম দেয় নাই?

তিতাস দিছে। হেইখান ত তাগর নাম। তোমার দরকার থাকলে তুমি নাম দিবা।

কিশোর ঠিক আছে। তাইলে তর নাম দিলাম আমি... তিতাস।

তিতাস তিতাস?

কিশোর হ, তিতাস।

তিতাস তিতাস তো একখান নদীর নাম?

কিশোর হ, নদীরনাম। তিতাস আমাগ পরান। আমাগ সর্বস্ব। তুই আমার হেই তিতাস, বউ। তর বুকে আমি উথালি-পাথালি ভ্যাইসা যামু। তিতাস... আমার তিতাস...আমার ক্ষুধার অন্ন, তি—াসের জল, সুখের স্বপন...তিতাস রে...

কাছে টানে। অন্ধকার। দুপাশে আলো জ্বলে। দেখা যায় সুবল ও তিলককে

সুবল ঝড় উঠতাছে...নদীর বুক ফুল্যা উঠতাছে, চাইয়্যা দ্যাখ ঢেউয়ের মাথায় ফ্যানা...

তিলক দম ধইর‍্যা দাঁড় টানরে সুবলা— কথা কইস না—

ঝড়ের শব্দ, বিদ্যুৎ চমকায়, জলে তোলপাড়। দাঁড় টানার শব্দ শোনা যায়।

সুবল তিলকখুড়া, কার নাও য্যান এইদিকে আসতাছে। বড়ো নাও একখান।

তিলক কে যায় গো? কার নাও? কথা কও না ক্যান? হাল ভাঙছে নাকি?

সুবল একী একী? এত কাছে আস ক্যান? ধাক্কা লাগব যে।

তিলক আরে আরে আমাগর নাওয়ে উঠ কেন?

মুখে গামছা জড়ানো তিন-চারটে লোক লাফিয়ে ওঠে নৌকায়। হাতে তাদের লাঠি, রামদা-চক্চক্ করে

রামনাথ খবরদার!

তিলক বাবা, আমরা গরিব মানুষ, আমাগরে দয়া কর।

রামনাথ — আর একখান কথা কইলে বুড়া, তোমারে টুকরা কইর‍্যা লাস ভাসায়্যা দিমু ম্যাঘনার জলে।

১ম ডাকাত — বান্ধ এইডারে।

সুবল — কিশোররে, সড়কি বল্লম বাইর কর—

মারামারি চলতে থাকে, সুবল আহত হয়ে পড়ে যায়। বেরিয়ে আসে কিশোর

কিশোর — তোমরা কারা?

২য় ডাকাত — তর বাপ।

কিশোর একজনের হাত থেকে আচমকা লাঠি কেড়ে নিয়ে আক্রমণ করে। হঠাৎ হাতে আঘাত পেয়ে আর্তনাদ করে ওঠে কিশোর। বিদ্যুৎ চমকায়। খোলাচুলে রামদা হাতে এগিয়ে আসে তিতাস। দুজন লোক পিছন থেকে তিতাসকে জাপটে ধ'রে রামদা কেড়ে নেয়

তিতাস — ছাইড়্যা দে আমারে। মরবি, তরা মরবি মরবি মরবি। মা মনসার নামে অভিসম্পাত করি— তরা মরবি, ঝাড়ে বংশে তরা নির্বংশ হবি—

তিতাসকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে ডাকাতের দল

রামনাথ — হাঃহাঃহাঃ, তিতাসের ভিখারি, রাজা হইবার চায় ম্যাখনায় আইস্যা। তোল মাগিরে। আমার নৌকায় তোল—

কিশোর — ক্যাডা? ও তুমি?

সঙ্গে সঙ্গে একটা লাঠির আঘাত পড়ে কিশোরের মাথায়। অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ে সে। হঠাৎ ঝপাং করে শব্দ হয়

অন্য ডাকাতরা — ঝাঁপ দিছে! জলে ঝাঁপ দিছে মাইয়্যাটা—

রামনাথ — ধর ধর, ট্যাইনা তোল। না পাইলে কচু কাটা করুম সব কয়ডারে। [লাথি মারে কিশোরের অচেতন দেহে। টাকার বাক্স তুলে নেয়] আমারে চিনবি না? অহনে পইচ্যা মর নৌকায়।

চলে যায়। ঝড়ের শব্দে বাকি কথা মিলিয়ে যায়। দূরে কোথায় যেন করুণ সুরে বাঁশি বাজিয়ে চলে যাচ্ছে কোনো নৌকা। একটু পরে ধীরে ধীরে উঠে আসে বৃদ্ধ তিলকচাঁদ

তিলক — চইল্যা গ্যাছে। অ কিশোর, অ সুবল, উঠ বাপ—ডাকাইতর‍্যা চইল্যা গেছে—

হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে তিলক। ধীরে ধীরে সম্বিত ফিরে আসে সুবলের। অস্ফুট আর্তনাদ করে

সুবল — তিলকখুড়া, অগ মইধ্যে একজনের গলা আমাগো রামনাথদাদার মতো না?

তিলক — ঝড়ের দাপটে আমি কিছুই বুঝি নাইরে সুবলা।

সুবল — কিশোর? কিশোর কৈ?

তিলক — ওই ত পড়্যা আছে। আমাগো নতুন বউরে লইয়া গ্যাল রে সুবলা। ট্যাকার বাক্সও লইয়্যা গেল।

সুবল — কও কী, কও কী তুমি? তাইলে যে অর সর্বস্ব ঘুচাইয়া দিলাম তিলকখুড়া? অর যে সর্বস্ব ঘুচাইয়া দিলাম আমরা?

কিশোরের চেতনা ফেরে। দূরে সেই ভাটিয়ালির সুর শোনা যায়

কিশোর — আঃ— তিতাস— তিতাস কই?

সুবল — তিতাস আরো একদিনের পথ রে কিশোর।

তিলক — আর ম্যাঘনায় আমু না বাপ কুনোদিন। আমাগো তিতাসই ভালো।

কিশোর — আমি যে তিতাসের ঢেউয়ে সাঁতার কাটতে ছিলাম, ডুইব্যা যাইতেছিলাম — ভাইস্যা যাইতেছিলাম— তিতাসের থই থই জলে একটা রূপালি মাছ খেলা করত্যাছিল— আমি দ্যাখতেছিলাম...

সুবল — কিশোর এমুন করে ক্যান তিলকখুড়া?

তিলক — মাথায় চোট খাইছে খুব। তাড়সে ভুল বকে মনে লয়। শোয়াইয়া দে— ঘুমাইলে সব ঠিক হয়্যা যাইব।

কিশোর — [চিৎকার] লইয়্যা যায়... আমার তিতাসরে অরা লইয়্যা যায়... আমার রূপালি মাছ লইয়্যা যায়... তিতাস—

ঝড়ের শব্দে ওদের কণ্ঠস্বর ঢাকা পড়ে। অন্ধকার।

১৮

তিতাসের ঘাট। মঞ্চে আসে রামকেশব, কাদির, বাসন্তী, দয়ালচাঁদ ও গ্রামবাসী।

রামকেশব — দুর্গা, দুর্গা, বদর বদর। এতদিনে মনে পড়লো বুড়াবুড়িরে? দুর্গা, দুর্গা, বদর বদর। কিশোর কইছিল, গলুইতে খাড়াইয়া হাঁক দিব বদর বদর—

কাদির — গোকন গাঁয়ের রামকেশব মালোর ব্যাটা কিশোর মুল্লবম্মন ম্যাঘনা জিতা আইল হে—

কিশোরের মা — কইরে, আমার কিশোর কই? আমার বুকে আয় বাপ।

রামকেশব — খাড়া— খাড়া— ঘাটে উঠতে দে।

প্রথমে তিলক উঠে আসে। বিষণ্ণ বিধ্বস্তভঙ্গি

রামকেশব — ও তিলক, কথা কস্ না ক্যান? কিশোর কই? সুবলা?

তিলক — আছে— আছে, সব আছে। আমারে আটকাইও না তোমরা। আমারে যাইতে দাও।

উদভ্রান্তের মতো চলে যায়। জাল কাঁধে উঠে আসে সুবল

কাদির — ও সুবল, কথা কস না ক্যান?

সুবল — কাদিরচাচা, আমারে তোমরা মাইর‍্যা ফেলাও

চলে যেতে যায়। কিশোরের মা বাধা দেয়

কিশোরের মা — কী হইছে আমারে কইয়া যা বাপ— কী হইছে কিশোরের?

সুবল — কওনের ভাষা নাই খুড়ি। কিশোর—

রামকেশব — হ কিশোর?

কাদির — কিশোর?

সুবল — কিশোর— পাগল হইয়া গেছে।

নিস্তব্ধতা

বাসন্তী	কী কইল্যা সুবলদাদা?
কাদির	এ কী কথা শুনাইলিরে সুবলা একি— সর্ব্বনাইশা কথা?
ছাদির	আমাগো কিশোর পাগল হইয়া গেছে?
সুবল	হা-চাচা, নতুন বউ লয়্যা ফিরত্যাছিল ঘরে, সঙ্গে বাক্স বোঝাই রূপার ট্যাকা— তোমার লাগ্যা, জমিলা-বাসন্তীর লাগ্যা কত কী সওদা কর‍্যা আনছিল—
ছাদির	তারপর? তারপর কী হইল ক?
সুবল	ম্যাঘনায় পড়লো ডাকাইত... আটাকাইতে পারলাম না— আহা-হা, আমারে মাইর‍্যা ফেলাও তোমরা— আমি নিমক খাইলাম, কাম করতে পারলাম না— আমারে তোমরা মাইর‍্যা ফেলাও।

বৈঠার মাথায় ওড়না পরিয়ে প্রবেশ করে পাগল কিশোর

কিশোর	উলু-উলু-উলু-উলু— জোকার দ্যাও— জোকার দ্যাও পুরনারীগণে। ওই শাঁখ বাজা সক্কলা— ও মা, বউ ঘরে তুলবি না? তর পুতের বউ? রূপার তোড়া দিবি কইছিলি? কই, দে? উলু-উলু-উলু-উলু—
কিশোরের মা	কিশোররে—

কান্নায় ভেঙে পড়ে, রামকেশব তাকে জড়িয়ে ধরে

কিশোর	বাইদ্য বাজা, বধূবরণ কর। ও আমার ভাঙ্গা ঘরের চান্দ, চলো। ঘরে চলো। উলু-উলু-উলু...

চলে যায়

দয়ালচাঁদ	আহা-হা, দয়ালঠাকুর, এ তোমার কেমুন বিচার?

রামনাথের মা আসে

কিশোরের মা	ছাদিররে, আমার সাধের লাল ডিঙ্গাখান যে ম্যাঘনায় ডুব্যা গেল

বাপ?

কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়

রামনাথের মা — পাগল হওনের আর সময় পাইল না? দেখ দেখি, এতগুলান ট্যাকা রামনাথের, আর কি উসুল হইব কুনদিন?

রামকেশব — ওরে আগুন জ্বাইলা দে... আমার ঘরখানে... আমার পরানখান পুড়্যা যায়... ভগবান—

উদভ্রান্তের মতো চলে যায়

দয়ালচাঁদ — ও রামকেশবদাদা, শোন— কথা শোন—

কাদির — ও বড়ো ভাই— ওরে তরা দৌড়াইয়া যা— মানুষটার আর মাথার ঠিক নাই। হায় আল্লা, এমন ক্যান হইল? যহন সংসারে সুখের রোশনি জ্বলার সময় আসল, তহন ক্যান ঝড়ে উইড়্যা গেল চালখান? কী তোমার মর্জি খোদা তুমিই জান।

চলে যায়

বাসন্তী — সুবলদা—

সুবল — আমারে কিছু জিগাইস না বাসন্তী। আমার সব গ্যাছে, আমার সব গ্যাছে—

বাসন্তী — আমারো যে সর্ব্বস্ব গ্যাল রে। তুই আমার সামনে-পিছনে আন্ধার ঢাইল্যা দিলি সুবলদাদা— অহন আমি আর কী নিয়া বাঁচুম?

চলে যায়

রামনাথের মা — আঃ মরণ! হ্যাঁরে সুবলা, রামনাথের লগে তগ দেখা হইছিল?

সুবল — কী জানি? হইছে কি হয় নাই...

রামনাথের মা — ও আবার কেমুন কথা?

সুবল — তারে চিনতে পারছিলাম না পারি নাই...মনে নাই...আমার কিছু মনে নাই জেঠি...আমারে কিছু জিগাইও না।

চলে যায়

রামনাথের মা কথাখান ক্যামুন ব্যাঁকা ঠ্যাকলো? তাইলে কি রামনাথই ডাকাইতি করছে? হইব। বাপেরই পোলা ত। কিন্তু সুবলায় কি চিনতে পারছে নাকি? আসুক রামনাথ। কথাখান কানে তুল্যা দিই। সইত্য হইলে, পোলায় আমার, শুত্তুরের শ্যাষ রাখবো না।

চলে যায়। অন্ধকার।

১৯

বিজয় নদীর তীরে গৌরসুন্দরের বাড়ি। জমিলা আসে

জমিলা সই? ওলো সই—

ভিতর থেকে তিতাস আসে

তিতাস কী লো সই, কী হইছে? বাড়িতে কি ডাকাইত পড়লো না কি?

জমিলা মস্করা রাখ তো বাজানে বাড়ি গিয়া কইল তুই নাকি আমাগো লগে গোকন গাঁয়ে যাবি?

তিতাস হ, যাবার ত মন করছি। আর কতকাল বাপের ঘরে থাকুম, ক?

জমিলা কিন্তু গোকন গাঁয়ে গিয়া থাকবি কই?

তিতাস ভাবি নাই ত! শুধা ভাবছি, একদিন নদীর জলে ভাসতে ভাসতে যেমুন কর‍্যা এই বিজয় নদীর চরে আস্যা ঠেকছিলাম, হেইরকম ভাসতে ভাসতে আবার যদি কুন চরায় গিয়া...তুই ভাবিস না সই, নিজের আগুনে নিজেই জ্বইল্যা পুইড়্যা মরুম—কাউকে আমি জ্বালামু না।

জমিলা ও আবার কী কথা?

তিতাস মরণ আমারে যে নেয় না সই। নিলে কি আর ডাকাইত গো হাত থিকা বাঁচতে পারতাম? না, ঝড়ের গাঙে ঝাঁপাইয়া ভাসতে ভাসতে আইস্যা ঠেকতাম তগ দুয়ারে? ভাগ্যের হাতে নিজেরে তুইল্যা দিছি সই, ভবিষ্যতের কথা অহন আর ভাবি না।

জমিলা ঠিক আছে, চল। গোকনগাঁয়ে আমার বাসন্তীদিদি আছে—আহা বড়ো

দুঃখী হইয়া মাইয়্যা—তরে পাইলে ঠিক বুকে টাইন্যা লইব।

তিতাস দুঃখী ক্যান? অর বিয়াতেই তুই যাইতাছিস শুনলাম?

জমিলা তা ঠিক। কিন্তু এইডা যে সুখের শাদি না সই, দুঃখের শাদি।

তিতাস ক্যান?

জমিলা যার লগে শাদির কথা অছিল, কিশোরদা, হ্যায় ত পাগল হইয়া গেছে—অহনে তার বন্ধু সুবলদাদার লগে অর সাদি। মায়্যামানুষ লতার মতো, গাছ না পাইলে বাঁচে ক্যামনে ক?... কী হইল সই? কী হইল তর?

তিতাস কিচ্ছু না। মাথাটা হঠাৎ কেমন চক্কর দিল।

জমিলা চল, চল, ভিতরে চল। মাথায় একটু পানি দে, সব ঠিক হইয়া যাইব।

জমিলা ও তিতাস চলে যায়। বিপরীত দিক থেকে গরীবুল্লা ও গৌরসুন্দর আসে

গৌরসুন্দর শ্যাষ হয়্যা গেল। একটা বছর ধইর‍্যা আমাগোর এই লক্ষ্মীছাড়ার সংসারে খেলাঘর বান্ধছিল আমায় মায়, আইজ তা শ্যাষ হয়্যা গেল!

গরীবুল্লা দুঃখ কইরো না গৌরভাই, মায়্যা মাত্রেই ত এই। শিশুকাল থিকা বুকে পিঠে কইর‍্যা মানুষ করবা—সময় হইলেই দ্যাখবা বুকখান খালি কইর‍্যা উড়্যা গ্যাছে খশমের ঘরে। য্যান কাকের বাসায় কুকিলের ডিম—ডান্না মজবুত হইলেই উড়াল দিব।

গৌর এই লক্ষ্মীছাড়া গো ঘরে লক্ষ্মী আসে নাই ত কুনোদিন। কিন্তু বুড়াকালে যেইদিন আমাগো বিজয়নদীর চরায় মায়েরে আমার কুড়ায়্যা পাইলাম—

গরীবুল্লা হ মনে আছে ত! হক্কলে মিলা ধরাধরি কর‍্যা তুইল্যা আনা হইল জমিলার মায় আইস্যা কত সেবা করল, জ্ঞান ফিরাইল। কিন্তু হিন্দুর মায়্যা বুইল্যা আমি রাখতে পারলাম না।

গৌর হেই ভাগ্যেই তো তহন থিকা মা জননী আমাগোর ভূতের সংসার সাজাইয়া বসল। সারাজীবনের এত কষ্টের মইধ্যে এই কয়খান দিন বড় সুখ পাইছিলাম গো মিঞা। আইজ আবার বিসজ্জনের বাজনা বাজল। কত কইলাম, কই যাবি মা? অজানা এ্যালাকা, অচেনা মানুষ...একলা বসত করবি...কুন বিপদ-আপদ হইলে দেখনের তো কেউ নাই।— তা শোনে না। জেদি মাইয়্যা— শুধা চক্কের জল

ফ্যালে। তা যাউক— মন টানছে যহন, কী আর কমু?

গরীবুল্লা — ডর পাইয়ো না। বদ মতলব লয়্যা তোমার মাইয়্যার কাছে ঘ্যাসন সোজা না। ওই মাইয়্যা তোমার খুবঐ তেজি।

গৌর — জানি জানি। ত্যাজ না থাকলে কি আরা অতগুলান ডাকাইত গো হাত ছাড়াইয়া ঝড়ের গাঙে ঝাপাইতে পারে? কও? মাইয়্যা আমার মানুষ না মিঞা, দেবী, দেবী দুগ্গা!

গরীবুল্লা — গোকনগাঁয়ে গিয়া থাকব কই, কিছু ঠিক করছে?

গৌর — হ বুধাই মোড়লের বিধবার লগে একখান কতা কইছি। একজনের খালি ভিটা নাকি পইড়্যা আছে একখান। কইছে, তোমার মাইয়্যা যহন, আমি দিমুনে থাকতে। জাউল্যার মাইয়্যা, জালের সুতা পাকাইব ঘরে বয়্যা। একখান প্যাটের আবার ভাবনা কী? হ্যায় সব ব্যবস্থা কইরা দিব কইছে।

গরীবুল্লা — ভালোই হইল, এই গোকনগাঁয়েই ত আমার জামাই-বেয়াই থাকে। তাগোরে কয়্যা দিমু। তাছাড়া জমিলাও আছে, কুনো অসুবিধা হইব না মাইয়্যার।

গৌর — তবু কই মিঞা, যদি মর্য্যাদা দেখ, তোমার মাইয়্যারে নামাইয়া দিয়া, আমার মাইয়্যারে লয়্যা চল্যা আইস। গরিবের সংসার— ভাত দিতে পারি নাই, কাপড় দিতে পারি নাই, তবু মায় আমার ঘর আলো কইর‍্যা আছিল এতদিন... আইজ বিসজ্জন। [কাঁদে] মাগো, বোধনে তরে আনতে পারি নাই মা, আইজ বিসজ্জনে তরে ভাসায়্যা দিলাম।

চলে যায়

গরীবুল্লা — বড়ো মন্দ নসিব মায়্যাটার। কই আছিল, কই থিকা আইল, কই বা যাইব কে জানে? মোনাজাত করি, এই দুঃখী মাইয়্যাটারে তুমি দেইখো খোদা, তারে তুমি দোয়া কইরো।

অন্ধকার।

১৯

গোকনঘাট। রামনাথের বাড়ি। কথা বলতে বলতে মায়ের সঙ্গে আসে রামনাথ

রামনাথ — তুমি আমারে হাসাইলা মা— আর দশজনা মালোার লাহান কান্ধে জাল ফ্যালাইয়া দিনভর মাছ ধর‍্যা বেড়াইলে কি আর আমাগো চাইর-চাইরখান টিনে চালা আর সিন্দুক ভর‍্যা ট্যাকা হইত—না, তোমার ওই সারা গাঁয়ে— পিছা মাইরা বেড়ান চলত, কও? সাধুগিরি দেখাইয়া ভিক্ষা পাওন যায় গো মা, সুদের ট্যাকা ট্যাঁকে গোজন যায় না।

রামনাথের মা — হেই কথা কই না— ম্যাঘনায় ডাকাইতি করছিস, কর— মানা করি না— তর বাপেও ত কত করছে! কিন্তু চিনা জানা মাইনসের মইধ্যে না করনই ভালো।

রামনাথ — ক্যান?

রামনাথের মা — ক্যান কি? এই যে সুবলা তরে সন্দেহ করতাছে, অগ নাওয়ে তুই নাকি ডাকাইতি করছস— এই কথা গেরামে রইট্যা গেলে আমাগো বদনাম না? এক গুষ্টির মানুষ আমরা, লোকে কলঙ্ক দিলে তখন কি আর গোকনগাঁয়ে মাথা উচায়্যা চলন যাইব?

রামনাথ — যাইব, যাইব। ট্যাঁকে ট্যাকা থাকলে গায়ে গু মাখলেও লোকে চন্দন কয়। পিদ্দিমে ত্যাল থাকলে সইলতার বুক পোড়ে না মা। শুধাশুধি অইন্য লোকের ত্যাল বাড়াইয়া নিজের পরকাল খোয়াইবা ক্যান কও?

রামনাথের মা — কী কস তুই মানে বুঝি না।

রামনাথ — আইজ যে তিতাসের জল শুকাইছে, অহনে কিশৈরা যদি ম্যাঘনা থিকা অনেক ট্যাকা কামাইয়া ফিরত, তাইলে অর দেখাদেখি অনেকেই ত যাইত বড়ো গাঙে। যাইত না?

রামনাথের মা — যাইত, যাইত। আমাগ কী?

রামনাথ — আমাগ এই যে, হক্কলার ট্যাঁকে ট্যাকা থাকলে আমাগ ট্যাকট্যাকানি শুনতো কোন সুমুন্দির পুতে?

রামনাথের মা — কী জানি বাপু, তগ আইজকালকার কত রকমের বুদ্দি!

রামনাথ — সুবলা আমারে ভালো কর‍্যা চিনতে পারে নাই গ মা— পারলে এত তাড়াতাড়ি বাসন্তীরে বিয়্যা কইর‍্যা সংসার পাততো না। তুমি কিছু ভাইবো না, ঘরে যাও। বুধাই মোড়লের পোলা আমি— বাপের নাম আমি রাখুমঐ।

রামনাথের মা চলে যায়

রামনাথ — সুবলা রে, তর কথা ভাইব্যা আমার বড় মায়া হয়। আহা, শুধাশুধি আমারে চিনতে গেলি ক্যান, ক দেখি? চুক্-চুক্-চুক্-চুক্—

অন্ধকার

২০

সুবলের বাড়ি। বাসন্তী ছেঁড়া জাল মেরামত করছে আরা আপন মনে গান গাইছে

বাসন্তী —
যে বন্ধু যায় পরবাসে সে ত আসে না,
পরান দিলাম যারে, সে ত ভালোবাসে না।
এ পাড় থিক্যা দিয়া পাড়ি
বন্ধু গেল আনবাড়ি
ওই পাড়েতে হাসে বন্ধু, হেথায় হাসে না।

সুবল আসে, তাকে ক্লান্ত ও অসহায় মনে হয়

বাসন্তী — কী হইল গো? কিছু আশা দিল কাদিরচাচায়?

সুবল — আশা? [ম্লান হাসে] ছেঁড়া জালে তালি দিয়া কি জল বান্ধন যায় রে বাসন্তী? তবু ত চেষ্টা করতেই হয়।

বাসন্তী — তোমার কথা বুঝি না, কী হইল কও।

সুবল — কাদিরচাচা কইল, আর মাসখানেকের মধ্যেই ব্যাবাক ধানে পাক ধরব— তখন ত মুনিস লাগাইতে হইব ঐ মাঠে। তখন গ্যালে মাঠের কামে লাগাইয়া দিব আমারে।

বাসন্তী — [দীর্ঘশ্বাস] অহনো একমাস?

সুবল — হ একমাস। দিন চলনের সংগতি নাই যাগো, তাগো কাছে একমাস ত একখান যুগ। [নীরবতা] এই মুঠায় যে চিরকাল বৈঠা ধরছি রে বাসন্তী, মালোর পুত হয়্যা অহন ধানের গোছ ধরুম ক্যামনে?

বাসন্তী — আমি কি বুঝি না গো? তিতাস শুকাইছে, দড়ির লাকান একখান চিকন জলের রেখা পইড়্যা আছে তিতাসের বুকে। তবু ত ছেঁড়া জাল মেরামত করি, যদি কুনোদিন পুকুরে-ডোবায় খেউ দিয়া কিছু ধরতে পার। তহন প্যাটে ক্ষুধা থাকলেও পরানে দুঃখ থাকব না।

সুবল — তর লাইগ্যা আমি সব করুম রে বাসন্তী। ধান কাটুম, মাটি কোপামু, মুনিস খাটুম। জীবনপাত কর‍্যাও আমি তরে বাঁচায়্যা রাখুম।

বাসন্তী — চেষ্টার ত কিছু কম কর নাই তুমি। জল নাই গাঙে, তুমি আর কী করবা?

সুবল — আমি জন্ম ভিখারি রে বাসন্তী। তর মতন মাইয়্যারে ঘরে আইন্যা দুঃখ ছাড়া আর কিছুই আমি দিতে পারলাম না।

বাসন্তী — তুমি দয়া কইর‍্যা আমারে চরণে ঠাঁই দিছ— আমার কত সৌভাগ্য, নইলে এতদিনে আমারে ত শিয়াল-কুকুরে ছিঁড়্যা খাইত। আইজ আমার কুনো দুঃখ নাই। শুধা একখান দুঃখ—

সুবল — কী দুঃখ রে?

বাসন্তী — তোমার সামনে রোজদিন ভাতের থালিখান আমি ধইর‍্যা দিতে পারি না।

সুবল — [জড়িয়ে ধরে] বাসন্তী!

বাসন্তী — তাছাড়া আমার কত সুখ? কয়জান মাইয়্যার ভাগ্যে এই সুখ থাকে কও?

সুবল — কাইলই আমি আনন্দবাজারের গঞ্জে যামু। শুনছি ওইখানের পাট গুদামে মাল বওনের লোক লাগব।

রামনাথ আসে

রামনাথ — মালোর পোলা হইয়্যা পাটগুদামের কুলি হবি— সরম লাগব নারে সুবলা?

সুবল — সরম ধুইয়্যা জল খাইলে ত প্যাট ভরে না রামনাথদাদা। দ্যাখতে পাওনা, তিতাসের বুকে অহনে আর জল নাই?

রামনাথ — তাই বুল্যা মালোর পোলায় কুলি হইব, আর আমি নিজে মালো হয়্যা তাই খাড়য়ে খাড়য়ে দেখুম? ক্যান আমাগো কি শক্তি নাই? কব্জির জোর কইম্যা গেছে?

সুবল — মালোর কব্জির জোর যে তার বৈঠায় থাকে গ রামনাথদাদা। পাগলা ঢেউয়ের লগে পাঞ্জা লড়্যা সে তার শক্তি বুঝায়।

রামনাথ — হ, আমিও তো হেই কথাই কই। পাগলা ঢেউয়ের লগে তরে পাঞ্জা লড়তে হইব।

সুবল — কী কও তুমি?

রামনাথ — তিতাসের জল শুকাইছে। বড় গাঙে না গ্যালে তিতাসের মালোরা বাঁচব না। তিনখান বড়ো নাও লইয়্যা আমি ম্যাঘনায় যামু। যতজনা মালোরে পাই হক্কলারে তুইল্যা লমু নাওয়ে। তরে আমার লগে যাইতে হইব সুবলা।

সুবল — এ তুমি কী কথা শুনাইলা রামনাথদাদা?

রামনাথ — না, আর কুন কথা না। তিতাসের মালোগ আমি কিছুতেই গঞ্জে গিয়া পাটের গুদামের কুলি হইতে দিমু না। কিছুতেই না।

সুবল — বাসন্তী?

রামনাথ — এই নে একশত ট্যাকা। রাইখ্যা দে বাসন্তীর হাতে। [টাকা দেয়] খোরাকি ছাড়া রোজ দুই ট্যাকা কইর‍্যা পাবি। আমাগোরে বাঁচতে হইব রে সুবলা। মালোর পোলারা কহনও হার মাইন্যা মরে না। [প্রস্থানোদ্যত] বাসন্তীরে একখান ভালো কাপড় কিন্যা দিস। ছেঁড়া কাপড়ে বউটা ঘোরে, দুঃখ হয় না? চলি।

চলে যায়

বাসন্তী — ট্যাকা নিলা, তুমি বড় গাঙে যাইবা?

সুবল — হ, যামু বাসন্তী, কতকাল জল দেহি না। আহা ম্যাঘনার সেই উথাল-পাথাল ঢেউ। আমি হাত ভইর‍্যা ট্যাকা আনুম। তোর লাইগ্যা সুখের দিন কিন্যা আনুম রে বাসন্তী— তুই আমারে মানা করিস না।

চলে যায়

বাসন্তী — না, মানা করি না। জলের মানুষ, জলের স্বাদ পাইছে, তারে বাধা দিই না। শুধা মনে পড়ে, একজন মানুষরে ম্যাঘনা কাড়্যা লইছিল একদিন— হেই রাক্ষুসির কি তাতে ক্ষুধা মিটছে?

অন্ধকার।

২২

রামকেশবের বাড়ি। কিশোর একটি খেলনার ধনুককে নৌকা বানিয়ে খেলা করে। পিছনে একটা ভাঙা কলাইয়ের থালায় ভাত নিয়ে আসে কিশোরের মা। ছেলেকে ভাত খাওয়াবার চেষ্টা করে

কিশোরের মা — ও কিশোর, ভাত দুগা খা বাপ— আয় আমি তরে খাওয়াইয়া দিই।

ভাত খাওয়াবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না

কিশোর — ময়ূরপঙ্খি নাওরে, উইড়্যা চল্যা যাওরে...যাও, যাও, যাও, ধনমানিকা বোঝাই নাও, চান্দবাইন্যার কাছে যাও। ডাকাইতে ধরলে কিন্তু আমি জানি না... হি-হি-হি-হি...

কিশোরের মা — অ কিশোর, আয় বাপ, মানিক আমার।

জাল কাঁধে ক্লান্ত রামকেশব আসে

রামকেশব — ও বউ, ওই ভাত দুগা আমারে দিবি? ক্ষুধায় আমি আর চলতে পারি না রে...

কিশোরের মা — তুমি কও. কী? পোলার মুখের ভাত তোমারে দিমু? অয় খাইব কী?

রামকেশব — জানি না। অয় খাইব আর আমি কি উপাস দিমু? কত কষ্টে বুল্যা এক পোয়া চাউল লয়্যা আইলাম কাদিরের থন, হেই ভাত ওই আকাইম্যা রাইক্ষসটারে খাওয়াইয় হইব কি?

কিশোরের মা — পোলারে কও রাইক্ষস? তুমি অর বাপ না? কিশোর তোমারা পোলা না?

রামকেশব — হ পোলা! যে পোলা বুড়াকালে বাপরে খাওয়াইতে পারেনা— শুধা নিজে গিলতে পারে, হ্যায় আবার কিসের পোলা? ওই গতর নিয়া বয়্যা আছে, কাম নাই কাজ নাই— হ্যারে অহন পঞ্চব্যাঙ্গুন রাইন্ধ্যা খাওয়াও! সুখ কতয়!

কিশোরের মা — হ, কতয় খাওয়াইতেছি! একবেলা দুগা লবণ ভাতও দিতে পারি না বাছার মুখে— তারে কয় পঞ্চব্যাঙ্গুন। ভালো আছিল যে কালে, খাটে নাই? খাওয়ায় নাই তোমাগো? ...ও কিশোর, বাপ— ভাত

দুগা খা সোনা। আহা-হা, পোলাডার মুখের দিকে তাকান যায় না।

কিশোরের মুখে ভাত দিতে কিশোর খায় ও মুচকি মুচকি হাসে

কিশোর — এই বুড়া ভাত খাবি? নাও বাবি, ম্যাঘনায় যাবি? ময়ুরপঙ্খি নাও?

কিশোরের মা — আদাড়ে-পাদাড়ে ঘুইর‍্যা বেড়ায় সারাদিন— নাওয়া নাই খাওয়া নাই...ক্যাড্যা দ্যাহে অরে? ক্যাডা খবর লয়? আয় বাপ খা। [কিশোর সরে যায়] না খাইয়্যা মরতে বসছে পোলাডা—

রামকেশব — মরুক মরুক ও মইর‍্যা যাউক। অর ভাত দুগা খাইয়া আমি বাঁচি। দে বউ, আমারে দে।

থালার দিকে এগোয়, কিশোরের মা সরে যায়

কিশোরের মা — হায় ভগবান, আমারে তুমি ন্যাও— আমি আর পারি না।

রামকেশব — আমিও আর পারি না। কতদিন, কতদিন পারে মানুষ? দে বউ।

কিশোরের মা হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে

রামকেশব — ও বউ, না খাইলে পাগল মরে নারে, পাগলের ক্ষুধা তেষ্টা নাই। আমারে বাঁচতে দে বউ, আমি তোর পায়ে পড়ি।

কাঁদতে কাঁদতে কিশোরের মা ভাতের থালা নামিয়ে রাখে। রামকেশব এগোতে যাবে এমন সময় কিশোর লাফিয়ে ওঠে

কিশোর — হেই খবরদার! আর এক পা আউগাইলে তর গল্লাখান কাট্যা গাঙের জলে ফালাইয়্যা দিমু... হালায় মাইয়্যা চোর! আমার ভাত কই? আমার ভাত? [ভাতের থালা টেনে নিয়ে ভাত মুখে দেয়, নাড়াচাড়া করতে থাকে তারপর থু থু করে মুখের ভাত ছিটোতে শুরু করে] এই বুড়া ভাত খাবি? ভাত খা—

কিশোরের মা — [কিশোরের পিঠে ঠাস ঠাস করে চড় মারে] মর মর তুই, মইর‍্যা যা... আমি আর পারি না। [কান্নায় ভেঙে পড়ে] ঠাকুর, আর কতদিন— আর কতদিন—

কিশোর [মার খেয়ে মুচকি হাসে। তারপর ধনুক নিয়ে আবার খেলা করে] ময়ূরপঙ্খি নাওরে...উইড়্যা চল্যা যাওরে...হি-হি-হি-হি...

রামকেশব কিশোরের পরিত্যক্ত থালা নিয়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকে। মাটিতে ছিটোনো ভাত খুটে খুটে খায়। সব মিলিয়ে যেন এক করাল দুর্ভিক্ষের স্থিরচিত্র।

২৩

গোকনঘাটে তিতাসের বাড়ি। বাসন্তী ও তিতাস জল নিয়ে ফিরছে

বাসন্তী এমুন দিনে গোকনাঘাটে বসত করতে আইলি নতুন বউ, যহন এই গেরামের সুখের দিনটুকু শ্যাষ হয়্যা গেল। অহন আমাগো সামনে ঘুটঘুট্যা এক আন্ধার রাইত। কিছু দ্যাহন যায় না। কিছু বুঝন যায় না। শুধা এই আন্ধারের দিকে চাইয়্যা বস্যা থাকা ছাড়া য্যান আর কুনো কাম নাই।

তিতাস আমিও যে আন্ধার-কপাইল্যা মাইয়্যা দিদি। তা নাইলে আর তোমাগো দুয়ারে আইস্যা নাও বান্ধুম ক্যান?

বাসন্তী তর কথা শুনছি জমিলার কাছে। কই থিকা তুই আইতেছিলি মনে পড়ে?

তিতাস না।

বাসন্তী বিয়া হইছিল কই?

তিতাস মনে নাই।

বাসন্তী সোয়ামির নাম? তার মুখ মনে পড়ে না?

তিতাস কিছু মনে পড়ে না গো দিদি। শুধা মনে পড়ে, কোন দ্যাশ থিকা য্যান রওনা হইছিলাম কতবছর আগে...তারপর থিকা ভাস্যাই চলতাছি। এই তিতাসের মতন, একখান য্যান মরা সোতা—পুরাপুরি মরণ ছাড়া এই চলা বোধকরি থামব না কুনোদিন। দিদি—

বাসন্তী কী লো?

তিতাস কিছু মনে কইরো না, জিগাই, তোমার ঘরের মানুষ কবে ফিরব গো?

বাসন্তী ক্যান লো ছুঁড়ি, তারে দিয়া তর কী হইব?

তিতাস তোমার মুখে তার কত কথা শুনলাম, বড়ো দ্যাকবার ইচ্ছা করে।

মনে লয় মানুষটা থাকলে বোধকরি আমার দুঃখ ঘুচত।

বাসন্তী — ও মুখপুড়ি, তুই কি আমার ঘর ভাঙবি?

তিতাস — না গো দিদি, তারে দাদা ডাকুম। দাদার ভরসায় বুক বান্ধুম। দাদায় আমারে কোলে তুইল্যা দুঃখের নদী পার কইর‍্যা দিব।

বাসন্তী — এই ত আর কয়টা দিন পরেই ফিরব। এই দোলের পর চৈত্যের শ্যাষাশেষি।

তিতাস — দোলের পর? চৈতের শ্যাষাশেষি?

বাসন্তী — ক্যান?

তিতাস — না এমনি। আচ্ছা দিদি, তোমরা যে পাগলের কথা বল, তারে একদিন দেখাইবা?

বাসন্তী — হ্যায় কোথায় বনে বাদাড়ে ঘুইর‍্যা বেড়ায়— আইলে তরে দ্যাখামুনে।

অন্ধ তিলকচাঁদ আসে

তিলকচাঁদ — রামকেশবদাদা আছ নাকি?

বাসন্তী — না ত তিলককাকা, জ্যাঠা ত নাই। পোলো নিয়া বাইর হইছে।

তিতাস — এ কে গ বাসন্তীদিদি? এরে য্যান—

বাসন্তী — কই থিকা দেখবি? আমাগো তিলককাকা। হেইবার অগ লগেই গেছিল ম্যাঘনায়। অহন আর চক্ষে দ্যাহে না। আহা বড়ো কষ্ট।

তিলকচাঁদ — না রে মা। চক্ষু গিয়া আমার সুবিধাই হইছে। গঞ্জে গিয়া খাড়াইলে দুগা ভিক্ষা পাওন যায়। মাইনসের দয়া হয়। শুধা গরিব দ্যাখলে ত দয়া হয় না।... এই ত আইজও আট-দশআনা ভিক্ষা পাইছি।

বাসন্তী — চক্ষে দ্যাখ না, এত দূরের পথ চিন্যা যাও ক্যামনে?

তিলকচাঁদ — প্যাট চিনায় মা। প্যাটের ক্ষুধা পথ দেখায়। যাই, রামকেশবদাদারে চাইর গন্ডা পয়সা দিয়া আসি। মুড়িটুক্ ত জুটুক। হারে পাপ, তিলকচাঁদ, একার ভিক্ষায় কয়জনারে বাঁচাবি তুই?

চলে যায়

তিতাস — অন্ধ হয়্যা গেছে? একজনা অন্ধ হইল, আর একজনার বিশ্বভুবন ক্যামন য্যান আন্ধার হয়্যা গেল।

পাগল কিশোর আসে

কিশোর যাও যাও যাও ময়ূরপঙ্খি নাও। হাঃ-হাঃ-হাঃ, কই যাইবা? বৈঠা ডোবে না। গলুই ভাসে না। বালির চড়ায় ময়ূরপঙ্খির তলা ফাইস্যা গ্যাছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ— আর ডাকাইতি করবি, হালায় মাইয়্যা চোর?

তিতাস আঃ!

বাসন্তী কী হইল? অ বউ, কী হইল তোর?

তিতাস এ কী চ্যাহারা গ বাসন্তীদিদি?

বাসন্তী এই তো হেই পাগল, কিশোরদা, পাগল হয়্যা গ্যাছে গিয়া। তুই ঘরে যা, আমিও যাই। আমার ডর লাগে—মাঝে-মইধ্যে এমুন ক্ষেইপ্যা যায়—

চলে যায়

কিশোর হাঃ-হাঃ পলায়— হক্কলে পলায়— আমারে ডর পায়, হে-হে-হে—

তিতাস কই আমি তো পাই না?

কিশোর ক্যান, পাইস না ক্যান?

তিতাস আমি যে তোমাকে চিনি।

কিশোর না, কেউ চিনে না আমারে।

তিতাস তুমিও তো আমারে চিন গো?

কিশোর না, চিনি না, কাউরে চিনি না আমি।

তিতাস হ চিন। দ্যাখ ভালো কইর‍্যা? আমি যে তোমার আশায় আশায় পথ চাইয়্যা বস্যা আছি গো। তিতাসের বুক উথাল-পাথাল কইর‍্যা তুমি সাঁতার কাটবা— আমি সুখে পাগল হয়্যা যামু।

কিশোর নাই, তিতাস নাই— চর পর‍্যা গ্যাছে জল নাই শুধা বালি। তিতাসে আর ময়ূরপঙ্খি ভাসে না— আমি ম্যাঘনায় যামু। ওই দ্যাখ, ঝড় উঠছে... ডাকাইত...ডাকাইত পড়ছে...আমার রামদাও শান দে—। [চিৎকার] অরে লইয়্যা যায়... আমার তিতাসরে লইয়্যা যায় ডাকাইতে... আমার তিতাস... আমার রুপালি মাছ... নিয়া যায়...তিতাস....তিতাসরে...

কিশোর ছুটে বেরিয়ে যায়

তিতাস — হায়রে, চিনতে পারল না! আইজ আমারে ও চিনতে পারল না। আর কতদিন ঠাকুর— আর কতদিন আমি এই আশা নিয়া বাঁইচ্যা থাকুম? দয়া কর ঠাকুর— তুমি আমারে দয়া কর। আমি যে আর পারি না।

অন্ধকার।

২৪

মেঘনা। ঝড় জলের রাত। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকায়। চকিত আলোয় নৌকার উপর বিভ্রান্ত মানুষের ছুটোছুটি দেখা যায়

১ম — গাজিপিরের দোহাই লাগে—

সকলে — বদর... বদর...

২য় — কর্ত্তা নাও রাখন যায় না— হাল ঘুইর‍্যা যাইতাছে।

রামনাথ — দুইজনে চাইপ্যা ধর, হাল ঠিন না থাকলে নাও উল্টাইয়া যাইব। পাড় কতদূর—

৩য় — অন্ধকারে ঠাওর হয় না—

১ম — বাতাসের ঝাপটায় চোখ মেলন যায় না কর্ত্তা—

রামনাথ — জোরে জোরে দাঁড় টান হক্কলা, জোরে জোরে টান। এই ঝড়ের দাপট থিকা নাও বাঁচা। মারো টান হেঁইয়ো— জোরে টান— হেঁইও—

সুবল — তুমি কিছু ভাইবো না রামনাথদাদা— শুধা পাড় দেখা গেলেই কইবা। নাইলে ঝড়ের মইধ্যে নাও কূলে আছাড় খাইলে গুঁড়া হইয়া যাইব।

রামনাথ — মারো টান হেঁইয়ো, আরো জোরে হেঁইয়ো, বৈঠা মারো হেঁইয়ো, জোরসে টানো হেঁইয়ো, জুয়ান মালো হেঁইয়ো, ঝড় সামালো হেঁইয়ো—সুবলারে চায়্যা দ্যাখ কাছাকাছি আইস্যা পড়ছি মনে লয়।

সুবল — হ তাই য্যান মনে লয়। গাজিপিরের দোহাই লাগে— আমি জলে ঝাঁপ দিলাম রামনাথদাদা—

রামনাথ — আর কেউ ঝাঁপ দিবি না—

২য় — লগি না মারলে নাও সামাল দেওয়া যাইব না কর্তা।

সুবল — নাও পাড়ে উঠ্যা আসতাছে— সামাল— সামাল—

৩য় — এ আপনি কি করলেন কর্ত্তা—

১ম — সুবলরে মাইরা ফেলাইলেন—

২য়	নাও যে ওর বুকের মধ্যে উইঠ্যা গেল—
রামনাথ	চুপ। লগি দিয়া নাও আটাকাইতে গেছিল, ঝড়ের ব্যাগ সামলাইতে পারে নাই। নৌকা উইঠ্যা পড়ছিল বুকের উপর। পিষ্যা ফালাইছে সুবলারে। [ঝড়ের গর্জন] সুবলা হওনের ইচ্ছা আছে নাকি তগ?
১ম ও ২য়	আইজ্ঞা না কত্তা
রামনাথ	তাইলে যা কইলাম,তাই দেখছস তোরা। কথা উলটা-পালটা হইয়্যা গেলে— দেখলি তো, আমি শত্তুরের শ্যাষ রাকি না? সামনে খাঁড়ি। নৌকা ঢুকা খাড়ির মইধ্যে। চালা বৈঠা। জোরে চালা। জোরে। অনেক বক্‌শিস পাবি। হেঁইয়ো...

জল এ বৈঠা চলার শব্দ। বিদ্যুৎ চমকায়, ঝড়ের গর্জন

রামনাথ	[চিৎকার করে] সুবলারে, তর বাসন্তী অহন থিকা আমার কাছেই থাকব— চিন্তা করিস না।

অন্ধকার

২৫

গোকনঘাট। বাসন্তীর ঘরের দাওয়ায় তিতাস ও বাসন্তী

তিতাস	আমার সুবলদাদায় কবে ফিরব গো দিদি?
বাসন্তী	দুই-একদিনের মধ্যেই ফিরব মনে লয়। দোলের সময় আইব কইছিল ত— আমার চক্ষুরে তুই ফাঁকি দিতে পারবি না বউ। আমার মনে লয়, তুই হেই রাইক্ষসি...
তিতাস	কার কথা কও?
বাসন্তী	যারে বিয়া কর‍্যা আননের কালে ডাকাইতে ধইর‍্যা নিয়া যায়—
তিতাস	জান না— না— না—
বাসন্তী	তয় তরে দেইখ্যা পাগল এমন শান্ত থাকে ক্যান? তুই কইলে পাগলে খায়, তুই কইলে ঘুমায়?
তিতাস	জানি না, আমি জানি না।
বাসন্তী	জানস। [দু'হাত ধরে] আমারে সইত্য ক, তুই কি হেই....
তিতাস	[কেঁদে ফেলে] আইজ না-গ দিদি, আইজ না। আমারে ছাইড়্যা দ্যাও...

ঠাকুর যদি মুখ তুইল্যা চায়, তোমার ঘরের মানুষ ফির‍্যা আসুক, হেইদিন তোমারে আমি সব কমু দিদি, সব কমু।

প্রবেশ করে রামনাথ

রামনাথ	বাসন্তী—
বাসন্তী	কে? [আনন্দিত] অ তুমি? কহন ফিরলা?
রামনাথ	আমি ফিরি নাই রে বাসন্তী, ফিরছে আমার প্রেতাত্মা। হায় ভ্গাবান—এ তুমি আমারে কি শাস্তি দিলা—
বাসন্তী	কী হইছে কও, চুপ কর‍্যা থাইকো না— কী হইছে কও?
রামনাথ	আমার ভাষা নাইরে বাসন্তী, আমার কইলজাখান ছিঁড়্যা গ্যাছে। আমি যে হাতে ধর‍্যা অরে ঘর থিক্যা ডাকা লয়্যা গেলাম—! বাসন্তীরে, আমি যে তর আঁচলের গিট খুইল্যা অরে লয়্যা গেছিলাম বড়গাঙে, এ আমার কী হইল?
বাসন্তী	কী কইতাছ রামনাথ দাদা? তুমি কি আমার সব্বনাশ কর‍্যা আইলা?
রামনাথ	অকালের ঝড় রে বাসন্তী... নদী ফুইল্যা উঠতে লাগল পাহাড়ের লাকান... নাও সামাল দিতে গিয়া অতগুলা মানুষ হিমসিম খায়... হেই নৌকা ঝড়ে উড়াইয়া আনল কুলের কাছে। প্রাণ বাঁচাইতে সুবলা গিয়া লাফাইয়া পড়ল কূলে, আর নৌকাখান... হায় হায়— তবে কী কমু বাসন্তী, নৌকাখান চড়চড়াইয়া উইঠ্যা গেল সুবলার বুকের উপর... আহা-হা...

রামনাথ বিলাপের ভান করে

বাসন্তী	[চিৎকার করে] না না—
রামনাথ	আমার নৌকা তিতাসের চড়ায় আইটকা গ্যাছে। তবু অর ট্যাকা কয়খান আমি লয়্যা আসছি বাসন্তী।
বাসন্তী	চাই না— চাই না ট্যাকা— অরে তোমরা ফিরায়্যা দাও রামনাথদাদা। আমার শ্যাষ সম্বলটুকু কাড়্যা নিও না তোমরা, কাড়্যা নিও না।
রামনাথ	কান্দিস না বাসন্তী, কান্দিস না। সুবলা নাই, কিন্তু আমি তো আছি—আমি তোরে মাথায় কর‍্যা রাখুম।

কিশোর ছুটে আসে রামনাথের দিকে

কিশোর — ডাকাইত... ডাকাইত... ম্যাঘনার ডাকাইত আইছে, ওরে আমার রামদাওখান দেরে তিতাস— আমি হালার গল্লাখান কাট্যা ফেলাই— [রামনাথ পিছিয়ে পিছিয়ে পালায়] আমার রামদাও কই— [হঠাৎ কাল্পনিক কোপ বসায় বাতাসে] মর— মর— মর— আঃ! রক্ত! রক্ত! আমার দুই হাতে ডাকাইতের রক্ত! পাপের রক্ত! আঃ! আমার রক্ত ধুয়্যা দে তিতাস... আমার এই পাপ ধুয়্যা দে...এই যন্তন্না ধুয়্যা দে...

ছুটে চলে যায়

বাসন্তী — [ওঠে] নতুন বউ, তুই তর দাদার পথ চাইয়্যা বস্যা ছিলি না? আর কুনোদিন সে ফিরব না রে নতুন বউ, আর কুনদিন ফিরব না।

চলে যায়

তিতাস — হায় ভগবান— একজনা পাগল হইল, একজনা অন্ধ, বাকি আছিল যেই মানুষটা, ম্যাঘনায় তারেও লয়্যা গেল! রাক্ষুসি, তুই আর কত খাবি? কত?

হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে। অন্ধকার।

২৬

গঞ্জের পথ। অন্ধ তিলকচাঁদ ও কিশোরের মা আসে

তিলকচাঁদ — কত কী আইজ দ্যাখলা কও বউঠান? এই হইল গঞ্জের বাজার।

কিশোরের মা — হ, পোড়া বরাতে আমার এই বাজার দ্যাহনও বাকি আছিল।

তিলকচাঁদ — দুঃখ কইরো না। পেরথম পেরথম একটু লজ্জা লজ্জা করব, বাধো বাধো ঠেকব, কিন্তু, দু-একদিন গ্যালেই দ্যাকবা কত সুবিধা। কুনো ভাবনা নাই, চিন্তা নাই— শুধা আপন মনে ঘ্যানর ঘ্যানর কইরা যাও— দ্যাকবা জীবনখান য্যান বইয়া যাইতাছে কাদির শ্যাকের রঙ্গিলা বাইচের নাও।

কিশোরের মা — ছিঃ ছিঃ! কী লজ্জা! কী লজ্জা! ঘরের বউরে আইজ কিনা পথে বাইর কইরা দিলা ভগবান? অহন মাইনসের দয়ার দানে, ভিক্ষার অন্নে প্যাট ভরাইতে হইব— হায়রে অদৃষ্ট!

তিলকচাঁদ — উপায় কী কও বউঠান? দাদায় আইজ শয্যাশায়ী, পোলায় তোমার পাগল হইয়া বনবাদাড়ে ঘোরে— অহন পথের মাইনসের সাহায্য ছাড়া বাঁচনের আর উপায় কী? চল, পথের ওই দিকটায় যাই— অন্ধ নাচার বাবা— কাম করণের ক্ষ্যামতা নাই— দয়া কর বাপসকল।

চলে যায়। বিপরীত দিক থেকে রামনাথ ও হারান আসে

হারান — আমাগো এইখানকার ম্যায়ফিলের দিন তাইলে শ্যাষ হইয়া গেল, কী কন ছোটোকত্তা?

রামনাথ — উপায় কী ক? তিতাসের জল শুকাইছে। অহনে জাল নৌকা মালোগো আর কোন কামে লাগব? অহনে সব ত ভিখারি, নয়তো পাটগুদামের কুলি। এইখানকার ব্যবসা মনে লয় এইখানেই শ্যাষ।

হারান — তাইলে অহন উপায়?

রামনাথ — উপায় আর কী? গঞ্জে গিয়া পাটের ব্যবসা করুম। আর এই সব বন্দকি কাগজ সস্তাদরে আনন্দবাজারের সাহাগো কাছে বেইচ্যা দিমু— হেই রকমঐ কথাবার্তা হইছে। অহনে যা পাওন যায় হেইটুকঐ লাভ।

হারান — তা ঠিক। আপনের বাহাদুরি আছে ছোটোকত্তা। একখান গেরামরে ধীরে ধীরে ক্যামন ল্যাংটা কইরা দিলেন? বাপের নাম রাখলেন আপনে।

রামনাথ — উপায় কী? আমাগর বাঁচতে হইব ত? একদল লোকরে না মারলে আর একদল মানুষ বাঁচে ক্যামনে ক? জগতের একটা নিয়ম আছে তো? চল, তাইলে আনন্দবাজারে যাই।

হারান — হ চলেন।

চলে যায়। বিপরীত দিক দিয়ে পুনরায় তিলকচাঁদ ও কিশোরের মা আসে

কিশোরের মা — পথ যে আর ফুরায় না গো ঠাকুর— ঘর আর কতদূর?

তিলকচাঁদ — ঘরে ভাত না থাকলে ঘর আর পথ দুই ত সমান গো বউঠান— তহন আর ঘরের চিন্তা কইরা লাভ কী? হ্যার চাইয়া চল— শুনছি

আইজ থিকা নাকি গঞ্জে লঙ্গারখানা খুলব—

কিশোরের মা — লঙ্গারখানা? হেইখান আবার কী?

তিলকচাঁদ — ওইখানে নাকি বিনাপয়সায় খিচরি খাওয়াইব ভিখারি গো। যদি বরাতে জুইট্যা যায়, তাইলে হয়ত এই বেলাটা বাইচ্যা যামু। চল বউঠডান—পাও চালাইয়া চল—

কিশোরের মা — ভগবান! আর যে আমি চলতে পারি না। তোমার হেই লঙ্গারখানাটা আর কতদূর গো? ভিখারির লঙ্গারখানা? আর কতদূর? ঠাকুর, আর যে আমি পারি না...

অন্ধকার

২৭

তিতাসের বাড়ি। নেপথ্যে দোলের গান শোনা যাচ্ছে। থালায় আবির নিয়ে আসে তিতাস ও বাসন্তী। বাসন্তীর বিধবার বেশ

তিতাস — কইলাম ত ঠাকুররে রঙ দিলে কুনো দোষ হয় না। রাধামাধব তো হকল নারীরই পতি। তুমিও চল দিদি, দুইজনায় দোলতলায় যাই?

বাসন্তী — নারে নতুন বউ, দোলতলায়ও যামু না, কাউরে আর রঙও দিমু না। না, তগ ওই রাধামাধবরেও না। ক্যান দিমু? যে আমার হকল রঙ মুছ্যা দিল, হ্যারে আমি রঙ দিমু কোন লজ্জায়? আমার কি মান-অপমান নাই?

তিতাস — তোমার হকল মান-আপমান যে অভিমান হয়্যা তোমার চক্ষের জলে ভাইস্যা যাইতাছে দিদি। আমি তোমার বুইন, আমি কই— তুমি রাধামাধবরে নিবেদন কর। দেইখো, ঠাকুরই তোমার জ্বালা নিভাইবেন।

বাসন্তী — হেই কথা বাদ দে। তর পাগলরে যে দেখি না। গেল কই? আইজ রঙ মাখাবি না তারে?

তিতাস — তারে পাইলাম কই? পাইলে কি আর অতদূরে দোলতলায় যাই?

জমিলা আসে, হাতে একটি পুঁটুলি

তিতাস — সই, তুই? এতদিনে মনে পড়ল? পোটলা কিসের?

জমিলা — আমি... আমি চল্যা যাইত্যাছি রে।

বাসন্তী	তরাও গেরাম ছাড়্যা দিলি জমিলা?
জমিলা	বাসন্তীদিদি, আমারে অরা বাপের ঘরে পাঠায়্যা দিতাছে। অরা বাপ-ব্যাটায় নবীগঞ্জের বাজারে আলুর দোকান দিছে।
বাসন্তী	কাদিরচাচা ফেরে নাই?
জমিলা	না। কইছে আর কুনদিন ফিরব না। আমারে বাপের ঘরে লামায়্যা দিয়া তোমাগ ভাইও যাইব আইজ নবীগঞ্জে।

কেঁদে ফেলে

তিতাস	কান্দিস না সই। দিন ফিরলে দেহিস, তরে আবার ঠিক লয়্যা আইব।
জমিলা	ক্যান যামু বাপের ঘরে? ক্যান? আমি কি ভাতের লাইগা কান্দছি কুনদিন? না খাইয়া থাকি নাই দিনের পর দিন?
বাসন্তী	তর এই কষ্ট ছাদির ভাই সইহ্য করতে পারে নাই বুল্যাই ত তরে বাপের ঘরে পাঠাইতেছে বুইন। দিন ফিরলে দেহিস, আবার ঠিক নিয়া আইব নিজের কাছে।
জমিলা	আমু না— আমু না কুনদিন আর আমু না আমি। আমারে তোরা ভুইল্যা যাইস দিদি। মনে করিস তগ জমিলা মইর্যা গ্যাছে।
তিতাস	ছিঃ! অমুন কথা কয় না সই। আবি না ক্যান?
জমিলা	ক্যান আমু? ক্যান? দুঃখের দিনে যদি খসমের পাশে থাকতে না পারলাম, তয় সুখের দিনে থাকুম ক্যান? আমি কি কসবি? আমি অর বিবি না?

জমিলা কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়

বাসন্তী	জমিলা! সব দিক শূন্য হয়্যা যায়... সব আলো নিভ্যা নিভ্যা আসে... সব রঙ মুছ্যা মুছ্যা যায়...

কিশোর আসে

কিশোর	রঙ কই, রঙ? আমারে দিবি না? রঙ দিয়া সাজা— আমারে রঙ দে— লাল রঙ... টকটক্যা লাল... রক্তের মতন লাল... নাই? তগ রঙ নাই? তগ লাল রঙ নাই?

তিতাস আছে।

কিশোর [দ্রুত এগিয়ে আসে] কই? দেহি? রঙ কই?

তিতাস এই ত দ্যাহো। ঠিক হেই দিনের মতন— ভালো কর‍্যা দ্যাহো—

কিশোর হেই দিনের মতন? কই? না-না হেইদিন আমার তিতাসের হাতের থালিতে যে আমার বুকের তাজা রক্ত টকটক করতে আছিল... তিতাস রাঙা হয়্যা যাইতেছিল...

তিতাস আইজও দ্যাহো তোমার তিতাসের বুকের সব রক্ত এই থালিতে টকটক করে। এইত তুমি রাঙা হয়্যা যাত্যাছ...

গান গাইতে গাইতে কিশোরকে আবির মাখায়

আইজ হোলি খেলব রে শ্যাম তোমার সনে—

গান শুনতে শুনতে তিতাসের মুখে কিশোর কী যেন খোঁজে

কিশোর তুই কে?

তিতাস আমি গো আমি। দ্যাহো, ভালো কর‍্যা দ্যাহো, তুমি আমারে ঠিক চিনতে পারবা।

কিশোর [মনে করার চেষ্টা করে] তুই... তুই... [তিতাসের হাত থেকে আবিরের থালা পড়ে যায় কিশোর চিৎকার করে ওঠে] তিতাস— তিতাস— [আলিঙ্গনে বাঁধে] তুই তিতাস... আমার তিতাস...

তিতাস ডাকো, ওগো ডাকো... আহা... আবার ডাকো... এমনি সুখের মরণে আমি য্যান মর‍্যা যাই... আঃ!

কিশোর তিতাস... আমার তিতাস...

তিতাস কতদিন... কতযুগ পর...

কিশোর মনে পড়ে... হেই কবে নৌকায় কর‍্যা আসতেছিলাম... হালে দাঁড়ে কারা য্যান আছিল মনে নাই... তখন ম্যাঘনায় ঢেউ. . আমরা ভাইস্যা যাইতেছি... ওই— ওই যে ঝড় ওঠে... ঝড়। সুবলারে— চৈতের গাঙে ঝড় উঠছে... নৌকা সামাল দে... এই তোরা কারা? ডাকাইত? নাওয়ে ডাকাইত পড়ছে... না, দিমু না— আমার তিতাসরে দিমু না—

তিতাস ওগো তুমি অমন কইরো না, এইত আমি তোমার সামনে...

কিশোর [তিতাসের গলা টিপে ধরে] ছাইড়্যা দে— ছাইড়্যা দে আমার তিতাসরে

— নাইলে শ্যাষ কইরা দিমু তগ... হক্কলরে শ্যাষ কইরা দিমু...

তিতাস ছটফট করে, ছুটে আসে বাসন্তী। কিশোরের হাত থেকে তিতাসকে ছাড়াবার চেস্টা করে

বাসন্তী — সর্বনাশ! কর কী? ও কিশোরদা, ছাইড়্যা দাও, ওরে ছাইড়্যা দাও।

কিশোর — না ছাড়ুম না। আমার তিতাসরে অরা নিয়া যাইব এত সাহস? দিমু না আমার তিতাসরে দিমু না—

বাসন্তী — ছাড়ো, ছাইড়্যা দাও, মাইয়্যাটা যে মর‍্যা গেল!... এ তুই কি করলি কিশোরদা— এ তুই কি করলি?

তিতাসের দেহ শিথিল হয়ে লুটিয়ে পড়ে কিশোরের হাতে

কিশোর — কইন্যা, ডর পাইও না। আমি আছি। চোখ মেল্যা চাও—

বাসন্তী — ও আর কুনদিন চোখ মেলব না। এ তুই কি করলি কিশোরদা। এ তুই কী সর্বনাশ করলি!

কিশোর — মাগো, তোমার মায়্যা ডরে মুচ্ছা গ্যাছে গ মা—ঘরে লয়্যা যাও— জল-বাতাস দাও, মা গো, তোমার কইন্যারে নাও গো মা। তোমার কইন্যারে নাও।

ধীরে ধীরে তিতাসের দেহ শুইয়ে দেয় মাটিতে। প্রবেশ করে বাঁশিরাম। তার হাতে বল্লম, হাঁড়ি ও পুঁটুলি

বাঁশিরাম — কই রে মা— হেই হারামজাদাটা কই? দুই বচ্ছর হয়্যা গেল একবার যাইবার নাম নাই? ওমা, এই দ্যাখ, তগ লাইগ্যা কী আনছি, এ কী?

কিশোর অবাক হয়ে দেখে। ধীরে ধীরে চলে যায়

বাসন্তী — ওই পাগল, ওই কিশোরদাদা আপনের মায়্যারে মার‍্যা ফেলাইছে।

বাঁশিরাম — [যেন বুঝতে পারে না] মর‍্যা গ্যাছে? জননী আমার— [চিৎকার করে কাঁদে। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে মেয়ের মাথায় হাত বোলায়] কত দিন দেহি

নাই... কত পথ বালির উপর দিয়া হাইট্যা হাইট্যা... রামকেশবরে পাই না... কিশোররে পাই না... সুবল, তিলকচাঁদ কাউরে খুঁইজ্যা পাই না... এইখানে আস্যা তবে পাইলাম। মা— কতদিন পর তর মুখখান দ্যাখলাম জননী— এই দ্যাখ তর লাগ্যা সরের নাড়ু পাঠাইছে তর মায়... আমি তর লাগ্যা আলতা, ডুর্যা শাড়ি কিন্যা আনছি... তুই নিবি না মা? [শাড়ির ভাঁজ খুলে আস্তে আস্তে তিতাসের উপর বিছিয়ে] তর পথ চায়্যা চায়্যা তর মায়... আমি তরে লয়্যা যাইতে আইছি মা... স্বামীর ঘরে আইলে কি বাপের ঘর ভুইল্যা যাইতে হয় রে বেটি? চল সোহাগি, চল, তর বাপের ঘরে চল—

দু হাতে তুলে নেয় তিতাসের দেহ

বাঁশিরাম	উলু দ্যাও গো পুরনারীগণ, উমা যে আইজ ম্যানকার ঘরে যায়... চল মা উমা, তুই তর মায়ের ঘরে চল...

বাঁশিরাম মৃতদেহ বহন করে চলে যায়। বাসন্তী চিৎকার করে কেঁদে ওঠে

বাসন্তী	না— নতুন বউ, তুইও আমারে ছাইড়্যা চল্যা গেলি?

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদে। বাতাসে করুণ রাগিণীর মূর্ছনা। নিঃশব্দে প্রবেশ করে রামনাথ

রামনাথ	বাসন্তী—
বাসন্তী	কে? চল্যা যাও., চল্যা যাও এখান থিকা। চল্যা যাও।
রামনাথ	যামুই ত। কিন্তু একা না। তুইও যাবি আমার লগে।

বাসন্তী পিছু হটে রামনাথ এগোয়। মঞ্চ প্রদক্ষিণ করে

রামনাথ	আয়— আমার কাছে আয়... তর লাগ্যা কতকাল অপেক্ষা কর্যা আছি। আয়—
বাসন্তী	না।
রামনাথ	গাঁয়ের হক্কলে মড়া পোড়াইতে শ্মশানে যায়... কেউ কোথাও নাই...

বাসর জাগনের এই ত সময়... আয়...

বাসন্তী	না— না—
রামনাথ	তর পরনে ছেঁড়া কাপড়।
বাসন্তী	গরিবের লজ্জা থাকতে নাই—
রামনাথ	তর পরনে ছেঁড়া কাপড়।
বাসন্তী	গরিবের লজ্জা থাকতে নাইয়
রামনাথ	তর প্যাটে ভাত নাই।
বাসন্তী	গরিবের ক্ষুধা থাকতে নাই—
রামনাথ	তর ভিটা আমার কাছে বন্দক আছে।
বাসন্তী	আমি ঘর ছাইড়্যা পথে নামুম।
রামনাথ	আমি তরে ট্যাকা দিমু— তুই চাউল কিনবি, কাপড় কিনবি, ত্যাল, চিরুনি, আলতা কিনবি।
বাসন্তী	চাই না— চাই না— কিছু চাই না।
রামনাথ	আমি তর ঘর সারায়ে দিমু। পালঙ্ক কিনা দিমু—

খপ করে বাসন্তীর হাত ধরে কাছে টানে। ছাড়াবার চেষ্টা করে বাসন্তী

বাসন্তী	বাঁচাও, কে আছো বাঁচাও।
রামনাথ	হাঃ-হাঃ-হাঃ— কেউ বাঁচাইব না। কার সাহস আছে? গোকনগাঁয়ে আমি ছাড়া হক্কলেই ত মরা— হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

জোর করে বাসন্তীকে কাছে টানে। মাটিতে ফেলে বলাৎকারের চেষ্টা করে। পিছন থেকে প্রবেশ করে কিশোর

কিশোর	ডাকাইত, ডাকাইত পড়ছে নৌকায়— ম্যাঘনার ডাকাইত— [বল্লমটা তুলে নেয়] এইবার—
রামনাথ	[আতঙ্কিত] সর‍্যা যা কিশোর। মরবি—সর‍্যা যা—
কিশোর	আমার তিতাসকে নিবি না ডাকাইত? অহনে যাবি কই? অহনে?

রামনাথ মণ্ডপবেদির পিছন দিয়ে পালাতে যায়— কিশোর বল্লমে গেঁথে ফেলে ওকে

রামনাথ	আঃ—
কিশোর	হাঃ-হাঃ-হাঃ— তিতাস রে, ডাকাইত মারছি— ম্যাঘনার ডাকাইত। একি! রক্ত ক্যান? এত রক্ত? পাপের রক্ত?
বাসন্তী	কিশোর দা—
কিশোর	এত রক্ত! ধুয়্যা দেরে তিতাস। এই পাপের রক্ত তর জলে ধুয়্যা দে—

বলতে বলতে ফ্রিজ হয়ে যায়। নেপথ্যে দয়ালচাঁদের গান ভেসে আসে

চিরদিন কাঁচা বাঁশের খাঁচা থাকবে না
পাখি যাবে উড়ে থাকবে পড়ে
কেউ রাখিতে পারবে না।
যারে বল আপন আপন
কেউ তো সঙ্গে যাবে না মন,
আসবে শমন করবে দমন
কেউ রাখিতে পারবে না।

অন্ধকার নেমে আসে